

মীর মশাররফ হোসেন রচনাসংগ্রহ

(প্রথম খণ্ড)

সম্পাদক : ডঃ বিষ্ণু বসু

কমলা সাহিত্য ভবন

৪ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ : ১৫ই আগস্ট, ১৯৫৭

কমলা সাহিত্য ভবনের পক্ষে
শ্রী মদন সিংহ কর্তৃক ৪, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলকাতা-৭০০০৭৩ হইতে প্রকাশিত ।

প্রচ্ছদ শিল্পী : শ্রীঅলকেন্দ্রশেখর পত্রী

অলংকরণ ও মುದ্রণে : কোলাজ
২, চৌরঙ্গী রোড,
কলকাতা-৭০০০১০ ।

বিষয় বিবৃতি

রক্তবতী	১
গোরাই ব্রজ অথবা গোঁর-সেতু	১২৫
জমীদার দর্পণ	৩৮
এর উপায় কি	৮০
উদাসীন পথিকের মনের কথা	১২০
বসন্তকুমারী নাটক	৩০২
গো জীবন	৩৫১

প্রথম পরিচ্ছেদ

একদা প্রভাকর দৈনিক কার্য সমাধানান্তর লোহিত-বসনাবৃত হইয়া পশ্চিমাচলে গমনোত্তোগ করিতেছেন, এমন সময় রাজনন্দন ও মন্ত্রিতনয় অত্যাৎকষ্ট বেষভূষায় ভূষিত হইয়া প্রদোষকালে বিগুপ্ত বায়ুসেবন করিতে বহির্গত হইলেন। ইতস্ততঃ নগরের স্নচাক শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে রাজনন্দন স্নকুমার মৃদুমধুর সন্ধ্যোদনে প্রাণাধিক মিত্র মন্ত্রিপুত্রকে বলিলেন, সখে! বল দেখি, ধন শ্রেষ্ঠ কি বিত্তা শ্রেষ্ঠ? মন্ত্রিপুত্র হাস্ত করিয়া বলিলেন, বন্ধো! ইহা আর জিজ্ঞাস্ত কি? ধন অপেক্ষা বিত্তা সহস্র অংশে শ্রেষ্ঠ। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজনন্দন বিরক্ত হইয়া কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, না তাহা কখনই হইতে পারে না। আমরা সচরাচর দেখিতেছি ধনবানেরা জগজ্জনমধ্যে বিশেষ গণ্য ও আদরণীয় হন। তাঁহারা কোন বিষয়ে নির্ধন লোকের ত্রায় চিন্তাজরে জর্জরীভূত হন না, বিপদেও চিন্তাহৃত সন্তোষ করিয়া নিশ্চিন্তে কালযাপন করেন। এমন কি তিলাঙ্ককালের জ্ঞাতও হুঃখিত থাকেন না। নির্ধন ব্যক্তি যতই কেন বিত্তাবুদ্ধি-সম্পন্ন হউন না, তাঁহাদিগকে চিরদিন ধনীদিগের পদানত ভূত্য থাকিতে হয়। তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, ধনহীন ব্যক্তির জন্মই বৃথা। ধনীরা বিপদাপন্ন নিরাশ্রয় ব্যক্তিগণকে ধনদ্বারা নিরাপদ করিয়া আশ্রয় প্রদান করিতে সর্মথ হন। পরিবারদিগকে স্বচ্ছন্দে ভরণপোষণ করিয়া পরমানন্দে কালাতিপাত করেন, এবং সমদায় ধর্মই তাঁহাদের আরম্ভে থাকে। সুতরাং ধনই সর্বশ্রেষ্ঠ।

স্বমস্ত অতি বুদ্ধিমান ও কৃতবিদ্যা, স্বতরাং রাজনন্দনের এই অযৌক্তিক বাক্য শ্রবণে কিয়ৎকাল মৌনভাবে থাকিয়া বলিলেন, বন্ধো! পরম কারুণিক পরমেশ্বর যে সৃষ্টদায় বৃত্তি প্রদান করিয়া মানবকুলের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, বিদ্যা ভিন্ন তাহা পরিমার্জিত হয় না। যে জ্ঞানের নিমিত্ত মহুগ্ধেরা সকল প্রকার জীবজন্তুর উপর একাধিপত্য স্থাপন ও ঈশ্বরের অস্তিত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহাও বিদ্যা ব্যতীত লব্ধ হয় নাই। আপনি কিঞ্চিৎ স্থির চিন্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন, বিদ্যাদ্বারা সকল কার্যই সাধিত হইতে পারে। অভাবনীয় ও অশুচ্য অশুচ্য কাব্যসমূহ কেবল বিদ্যাবুদ্ধি দ্বারাই সম্পন্ন হইতেছে। যে কাব্য বিদ্যাহীন লোক প্রাণ পণ্যস্ত পণ করিয়াও সমাধা করিতে পারে না, তাহা বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি অনায়াসে সাধন করিয়া আপামর সাধারণের হিত সাধন করেন। মিত্র! বিদ্যা-বুদ্ধিবিহীন ধনীর বিজ্ঞলোকের হায় নিতা চিন্তিত্ব সন্তোষ করিতে পাবেন না। ধনৌদিগের অন্তঃকরণ সর্বদাই অস্থির; কেননা তাহারা কুসংস্কারের ক্রীতদাস। সামান্য বিষয়েই তাহারা উৎকণ্ঠিত ও ব্যাকুল হন। আপনি কি বিবেচনায় বিদ্যা অপেক্ষা ধনের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতেছেন, বৃত্তিতে পারি না। বোধ হয় প্রমাদে পতিত হইয়াছেন।

আপন সিদ্ধান্তের বিপরীত বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজকুমার সংক্রোধ লোচনে বলিলেন, কি বৃথা তর্কবিতর্ক কবিতোছ? আমি চিরকালই জানি, তুমি আমার বাক্য খণ্ডন করিতে সাধ্যমতে ক্রটি কর না, কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানিবে যে পৃথিবীর কেহই আমার বাক্য খণ্ডন করিতে পারে না। তুমি নিস্তব্ধ হও, ধনই জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পদার্থ। স্বমস্ত কহিলেন, যুবরাজ! অকারণ ক্রোধ করেন কেন? এ তর্কের মীমাংসা স্বদেশে হইবার সম্ভাবনা নাই। যে দেশ উভয়েরই অপরিচিত এমন এক দেশে গমন করা যাউক, তাহা হইলে দেখা যাইবে, ধন দ্বারাই বা কি কাব্য সিদ্ধ হয় এবং বিদ্যাদ্বারাই বা কি কর্ম সম্পন্ন হয়। রাজকুমার তাহাতে সন্মত হইলেন। অতঃপর ভিন্নদেশে গমন করাই স্থির হইল। সেই দিনই রাজনন্দন পশ্চিমাভিমুখে এবং ময়িনন্দন পূর্বাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রাজনন্দন নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে বনপধ্যাটনে প্রকৃত হইলেন। সপ্তাহকাল নিবিড় বন পধ্যাটন করিয়া এক দিবস প্রভাতকরে প্রথমে করণে অত্যন্ত তৃষ্ণা অনুভব করিতে লাগিলেন, কিন্তু ঐ চৌকোতেও

জলপ্রাপ্ত হইলেন না। একে মার্শ্বেণ্ড প্রৱণ্ড করণ, তাহাতে আবার অনেকক্ষণ পধ্যস্ত বনে বনে ভ্রমণ করাতে :ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন এবং মৃত্যু নিকটবর্তী জানিয়া খেদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, হা পরমেশ্বর! আমি আপন দোষে আপনি বিপদে পড়িয়াছি, ঘোরতর পিপাসা আমার জীবন-নাশিনী হইয়াছে, আর সঙ্ক হয় না। এই তৃষ্ণার্ত নরাধম সন্তানের প্রতি রূপাটুপাত করিয়া কিঞ্চিৎ জীবনদানে জীবন রক্ষা করুন। রাজপুত্র এবশ্রকার আক্ষেপ করিয়া পুনরায় জলাশয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়দূর অতি কষ্টে গমন করিয়া হঠাৎ এক মনোহর উত্থানমধ্যস্থিত একটি সুরমা সরোবর দৃষ্ট হইলে রাজকুমার ত্রস্তভাবে তাহার তটবর্তী হইলেন। রাজপুত্রের পিপাসা ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইতে লাগিল। এই সময়ে তিনি আব এক আশ্চর্য ঘটনা অবলোকন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। সেই জলাশয়ের সোপানপার্শ্বে একটি কপিবর তপস্বী বেশে করে অক্ষমালা ধারণ করিয়া নয়ন মুদ্রিয়া জগদীশ্বরের ধ্যান করিতেছিল। যুবরাজ বক্ষিম চক্ষে তাহাকে দর্শন করিতে করিতে সরোবরে অবরোহণ পূর্বক হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার পদভ্রষ্ট একবিন্দু বারি কপিবেশধারী তপস্বীর গায়ে পতিত হইবামাত্র কপিদেহ পরিবর্তন হইয়া তাঁহার মনুজদেহ হইল। তখন তিনি অতি ভয়াবহ গভীর শব্দে কহিতে লাগিলেন, ওরে নরাধম পাপিষ্ঠ, কে তুই? তুই কি জগু আমার সমাধি ভঙ্গ করিলি? কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, প্রতিকূল প্রদান করিতেছি। রাজনন্দন স্বকুমার তাঁহার তর্জনে কম্পিতকলেবর হইয়া কহিলেন, হে তাপসশ্রেষ্ঠ! আমার অজ্ঞাতনামে বারিবিন্দু আপনার গাত্রে পতিত হইয়াছে। অতএব রূপা করিয়া আমার এই অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি বহু কষ্ট সহ করিয়া ভবদীয় শ্রীচরণ দর্শন করিতে আশিঁয়াছি। রাজতনয়ের এবভূত সাকাতর স্তুতিবাক্যে তপস্বী ক্রোধ সম্বরণ করিয়া কহিলেন, তুমি কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ? এবং কি নিমিত্ত এই তরুণ বয়সে বনপধ্যটনযন্ত্রণা সহ করিতে বাধ্য হইয়াছ? সবিশেষ সমস্ত বর্ণন কর, শুনিতে একান্ত ইচ্ছা হইতেছে। রাজনন্দন আত্মবিবরণ আত্মোপাস্ত বর্ণন করিলেন। উদাসীন হাস্য করিয়া কিয়ৎক্ষণ মোনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। স্বকুমার ক্লতাজলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া বিবিধ প্রকার স্তব করিতে লাগিলেন। তপস্বী যোগবলে তাঁহার মনোহত ভাব অবগত হইয়া আপন করত্বিত অনুরীয়ক তাহাকে প্রদান করিলেন। কহিলেন, বৎস, এই অনুরীটি গ্রহণ কর। ইহার নিকট তুমি যখন বাহা চাহিবে, তৎক্ষণাৎ

তাহা প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু তুমি এই অরণ্যানীর উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব প্রদেশ পরিভ্রমণ করিও, পশ্চিম প্রদেশে কদাচ গমন করিও না। তাহা হইলে বিপদ ঘটিবে। স্বকুমার অঙ্গুরী প্রাপ্ত হইয়া তপস্বীর পদচুষন পূর্বক পুনরায় স্তব করিলেন। তপস্বী তাঁহাকে বিদায় করিয়া পূর্ববৎ বানরাকৃতি হইয়া আপন ইষ্ট দেবতাতে মনোনিবেশ করিলেন। রাজনন্দন আপন উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হইলেন।

পূর্ব, দক্ষিণ, উত্তর এই তিনদিক ভ্রমণ করিয়া রাজকুমার চিন্তা করিলেন, যোগী পশ্চিমে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন। কি জ্ঞান নিষেধ করিলেন? পরে এই স্থির সিদ্ধান্ত হইল পশ্চিম দিকে কোন আশ্চর্য্য পদার্থ থাকিতে পারে, অতএব তাহা অবলোকন করা কর্তব্য। আমার বিপদ হইবার সম্ভাবনা কি আছে? তপস্বী-দত্ত অঙ্গুরীয়কের নিকট যাহা প্রার্থনা করিব তাহাই পাইব। এক্ষণে পশ্চিম প্রদেশেই গমন করা বিধেয়। এই ভাবিয়া তিনি একাদিক্রমে পশ্চিমাভিমুখে গমন আরম্ভ করিলেন। এইরূপে বিংশ দিবস নানা বন উপবন ও পর্বতশ্রেণী উত্তীর্ণ হইয়া পবিশেষে একটি অপূর্ব নগরে প্রবেশ করিলেন। তত্রতা অভিনব বস্তু, মানবমণ্ডলী ও নগরের শোভা দর্শন করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, দেখিলেন, সম্মুখেই রাজবাটীর প্রবেশদ্বারে একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরফলকে স্বর্ণাক্ষরে এই লিখিত আছে, “এই রত্নপুর সাম্রাজ্যেশ্বরের দুহিতা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সপ্তাহকাল তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারিবেন, তিনি তাহাকেই পতিত্ব বরণ করিবেন। যিনি উক্ত সাতদিন অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করিতে পরাশ্রুত হইবেন, তাঁহাকে যাবজ্জীবন কারাবাসে থাকিতে হইবে।”

নৃপনন্দন উক্ত বিজ্ঞাপনী পাঠ করিয়া এবং অল্প অল্প লোকের নিকট রাজদুহিতার রূপলাবণ্যের কথা শ্রবণ করিয়া একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন, এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কপিক্রপী তপস্বী-দত্ত যে অমূল্যরত্ন আমার নিকটে আছে, তাহার সহায়তায় রাজকুমারীর অভীষ্ট সমুদায় অবলীলাক্রমে প্রদান করিতে পারিব, অতএব রাজদুহিতার পাণিপীড়নে যে আমি সমর্থ হইব, তাহার কোন সন্দেহ নাই। এইরূপ কল্পনাপথবর্তী হইয়া সাহস ও উৎসাহ সহকারে পান্থবস্তী উদ্ভাষণ করিলেন।

তৎক্ষণাৎ কতিপয় পরম স্নন্দর যুবা পুরুষ আসিয়া রাজনন্দের হস্তধারণ-

পূর্বক নৃপতিসন্নিধানে সভামণ্ডপে লইয়া গেল। রাজা যথোচিত সমাদরে নিকটবর্তী অপূর্ব আসন গ্রহণ করিতে অমুমতি করিলেন। রাজনন্দন ভূপতিকে সবিনয় সম্ভাষণ করিয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন। নৃপতি যুবরাজের ভুবন-মোহন রূপলাবণ্য দর্শনে বিমোহিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই যুবকটি অবশ্যই কোন রাজকুল অনঙ্গত করিয়াছেন, কিন্তু আমার কণ্ঠা কি দুর্ভাগ্যবতী, এইরূপ স্নেহময়ের অঙ্কলক্ষ্মী না হইয়া বরং যথাসর্বস্ব হরণপূর্বক ইহাকে বিপদে পাতিত করিবে। যাহা হউক, এই উৎসাহোন্মত্ত যুবককে সবিশেষ অবগত করাইয়া পূর্বেই সতর্ক করা আমার কর্তব্য হইতেছে। এইরূপ চিন্তা করিয়া নরপতি স্নানবদনে মুহুঃ সম্বোধনে কহিলেন, বৎস! তোমার আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া আমার অনুভব হইতেছে, তুমি কোন সম্ভ্রান্ত বংশ বা রাজকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ, দেশ পর্যাটন ব্যতীত তোমার অণু কোন অভিসন্ধি ছিল একরূপ বোধ হয় না। যাহা হউক, তুমি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া উদ্ধাধ্বনি করাতে ইচ্ছা করিয়া বিপদহস্তে আত্মদমর্পণ করিয়াছ। কতশত রাজপুত্র অসংখ্য ধনরত্ন ও বিবিধ প্রকার আশ্চর্য্য বস্তু প্রদান করিয়াও আমার অঙ্গজার মনস্তৃষ্টি সাধন করিতে পারেন নাই। বিবাহ করিয়া স্নত-সন্তোগ করা দূরে থাকুক, কারাগারে চিরকষ্ট ভোগ করিতেছেন। আপনার সহিত ধনজন কিছুমাত্র দেখিতেছি না। কি প্রকারে রাজকন্ডার মনোঅঙ্ক পূর্ণ করিবেন, বুঝিতে পারিতেছি না। বৎস! আমি পুনঃপুনঃ নিষেধ করিতেছি, ইচ্ছা করিয়া অনলে অঙ্গ বিসর্জন করিও না। জীবন্তলাভলালসা পরিত্যাগ কর। আমার দুহিতার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলে তখন আমার রক্ষা করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। যুবরাজ নৃপতির বাক্য শুনিয়া মনে মনে নানা প্রকার আন্দোলন করিতে লাগিলেন। এখন উপায় কি করি। নৃপদুহিতার অলৌকিক রূপলাবণ্য আমার মনোহরণ করিয়াছে, স্নতরাং চিত্তবারণ ধৈর্য্যাক্রমশেও বারণ না মানিয়া সেই পদ্মিনী গ্রহণ করিতে প্রতিজ্ঞা সরোবরে ধাবিত হইতেছে। এইরূপ চিন্তা করিয়া ক্রুতাজলিপুটে কহিলেন, মহারাজ! আপনার অমৃতময় উপদেশ আমার শিরোধার্য্য; তথাচ এই নিবেদন করিতেছি, আমি যাতনা সহ্য করিয়া যখন এ পর্য্যন্ত আসিয়াছি, তখন অভিলষিত রত্ন লাভ করিতে পারিব না বলিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিব না। যাহা ভবিষ্যে লিখিত আছে, তাহাই ঘটিবে। আমি আপনার তত্ত্বজ্ঞান মানস পূর্ণ করিতে সমর্থ কিনা, ইহা আপনি কিরূপে বুঝিতে পারিলেন? আমার সহিত ধনরত্ন ও রথ গজ নাই।

বলিয়া অবজ্ঞা করিবেন না। যেহেতু সকল মহম্মদ একভাবে নহে। আমি যে একাকী এই অপরিচিত দূরদেশে আসিয়া শতশত রাজপুত্র যে কার্য সাধন করিতে সমর্থ হয় নাই তাহা সিদ্ধ করিতে সাহস প্রকাশ করিতেছি, ইহার অবশ্যই কোন নিগূঢ় কারণ থাকিতে পারে। তজ্জন্ম আপনি চিন্তা করিবেন না। আপনার দুহিতার নিকটে দূত প্রেরণ করুন, তাঁহার কি বাঞ্ছা, জানিতে পারিলেই অবিলম্বে পূর্ণ করিম। রাজা স্কুমারের এই সাহসের বাক্য শ্রবণ করিয়া আহলাদে গদগদচিহ্ন হইয়া সভাসদৃদিগকে বলিলেন, ইহার সাহস দেখিয়া বোধ হইতেছে, ইনি অনায়াসে রাজকন্য়ার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারিবেন। এক্ষণে কন্যা নিকটে ইহাকে প্রেরণ করা কর্তব্য। এই বলিয়া সভা ভঙ্গ করিতে আদেশ করিলেন।

ভূপতি রাজনন্দন স্কুমারকে আপন অন্তঃপুরে লইয়া ভোজনাদি করাইলেন এবং তাহার বিশ্রামার্থ একটি প্রকোষ্ঠ নিরূপিত করিয়া দিলেন। রাজনন্দন তথায় বিশ্রাম-সুখানুভব করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা শয়নমন্দিরে উপস্থিত হইয়া মহিষীকে বলিলেন, প্রিয়ে! অগ্ন তরুণবয়স্ক একটি রাজপুত্র তোমার হৃদয়নন্দিনীর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে আসিয়াছেন। তিনি অতিশয় রূপবান। তাহার মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করিলে হৃদযাদুধি আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠে। আর এক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহার সহিত ধনজন মাত্র নাই, তথাচ তিনি কন্যার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে অভূতপূর্ব সাহস প্রকাশ করিতেছেন। তুমি কন্যাকে সংবাদ প্রদান কর, আমি রাজকুমারকে এই স্থানে আনয়ন করিতেছি।

রাজকন্যা স্কুমারের আগমনবার্তা পূর্বেই অবগত হইয়া সহচরী সমভিব্যাহারে তাঁহার গর্ভ খর্ব করিবার উপায় চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময় রাজমহিষী দুহিতার নিকটবর্তিনী হইয়া বলিলেন, বৎসে! তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে এক রাজপুত্র উপস্থিত হইয়াছে, মহারাজ তাঁহাকে তোমার নিকটে লইয়া আসিতেছেন, এখন তুমি কি করিবে স্থির কর। মহিষীর বাক্যাবসান হইতে না হইতেই একজন কিস্করী আসিয়া বলিল, ঠাকুরানি! মহারাজ সেই রাজপুত্রের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন। এই বাক্য শ্রবণে বানী কিঞ্চিৎ অন্তবালে দণ্ডায়মান হইলেন। রাজা দুহিতার প্রকোষ্ঠে স্কুমারের সহিত আসন পরিগ্রহ করিলেন।

রাজনন্দিনী, যুবরাজ স্কুমারকে দর্শন করিবামাত্র সগর্বে স্বীয় সহচরীকে সৌন্দর্য করিয়া বলিলেন, আমি যুবরাজের নিকট বিংশতি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রার্থনা

করি। রাজনন্দন এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ রাজনির্দিষ্ট স্বীয় বাসস্থানে প্রত্যাগত হইয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন এবং করস্থিত অঙ্গুবীৰ্য্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, অঙ্গুরীয়ক ! রাজকন্টার অভিলষিত মূদ্রা প্রদানে আমাকে রুতার্থ কর। নিমেষকালমধ্যে মূদ্রা উপস্থিত হইল। তখন নৃপনন্দন বিংশতি সহস্র স্বর্ণমূদ্রা গণনা করিয়া রাজনন্দিনীর সহচরীর করে অর্পণ করিলেন। রাজা এই আশ্চর্যা ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল বদনে যুবরাজের অনেক প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং ভাবিলেন, এই ব্যক্তি রাজকন্টার সম্পূর্ণ বাজা পূর্ণ করিয়া নিঃসন্দেহ পাবি গ্রহণ করিবেন।

দ্বিতীয় দিবস বাজা পূর্বাপেক্ষা অধিক সম্মান সহকারে রাজপুত্রকে ভোজনাদি করাইয়া তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত অবগত হইতে লাগিলেন, কিন্তু রাজকুমারী অত আবার কি প্রার্থনা করেন, এই চিন্তায় রাজকুমারের অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইতে লাগিল। অঙ্গুবীৰ্য্যকের অলৌকিক গুণ স্মরণ হওয়াতে পুনর্বার মনোযোগপূর্বক ভ্রমণবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন। বজ্ঞনীযোগে রাজকন্টা তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া মূর সম্বোধন বলিলেন, যুবরাজ ! কল্যা আপনি এ দাসীর অভিলষিত অর্থ প্রদানে চরিতার্থ করিষাছেন, অতঃপরে প্রকাশ করিয়া বিংশতি সহস্র রৌপ্যমূদ্রা প্রদান করুন। রাজপুত্র শ্রবণমাত্র পূর্ববৎ উপায়াবলম্বন করিয়া বিংশতি সহস্র রৌপ্যমূদ্রা তৎক্ষণাৎ প্রদান করিলেন। এই রূপে চতুর্থ দিবস তাঁহার বাজা পূর্ণ করিয়া নৃপনন্দনের অন্তঃকরণে রুতকার্য্যেব আশা ক্রমেই বলবতী হইতে লাগিল। রাজনন্দিনী কি কৌশলে রাজপুত্রকে প্রতিজ্ঞাজালে বদ্ধ করিবেন, একান্তমনে সেই উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন; সখীকে কহিলেন, সহচরি ! আর তিন দিবস প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিলেই আমার গর্ভ সম্পূর্ণরূপে খর্ব্ব হইবে, স্ততরাং বিবাহ করিয়া রাজনন্দন যে, আমার অহঙ্কার চূর্ণ করিতে সক্ষম হইবেন, তাহা বলা বাহুল্য। অতএব যাহাতে মান রক্ষা হয়, এক্ষণ উপায় কর। এই আগন্তুক যুবাংকুরদের সহিত কোনরূপ অর্থ থাকি। দূরে থাকুক, দ্বিতীয় পরিধেয় বস্ত্রও নাই। অতএব ইনি কোথা হইতে আমার অভিলষিত অর্থ সংগ্রহ করেন, তাহার অনুসন্ধান করা অত্যাশঙ্ক্য। বোধহয়, ইহার নিকট কোনরূপ দুর্লভ বস্তু আছে, তাহার নিকট বাহা প্রার্থনা করেন, তৎক্ষণাৎ তাহাই প্রাপ্ত হন। রাজকন্টা চতুরা সহচরী এই বাক্য শ্রবণে

সতর্ক হইয়া তত্ত্বাসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। স্বকুমার নৃপতিসম্মিধানে উপবিষ্ট হইয়া ভ্রমণবৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছেন, এই অবকাশে রাজকন্টার সহচরী স্বকুমারের নিদ্দিষ্ট বাসস্থানে এক্রূপ কৌশলে আত্মগোপন করিল যে, সমুদায় দেখিতে পায়, কিন্তু তাহাকে কেহ দেখিতে পায় না।

রাজহুহিতা স্বকুমারকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, রাজপুত্র! গজমুক্তা হাব পরিধান করিতে আমাব একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে, আপনি একশত মুক্তা প্রদান করিয়া বাজ্ঞাপূর্ণ করুন। বাজনন্দন অবিলম্বে শয়নালয়ে উপস্থিত হইয়া দ্বারাবরোধ পূর্বক করস্ত অঙ্গুরীয়কে বলিলেন, প্রিয় অঙ্গুরি! অত রাজকন্টার বাসনা পূর্ণ কর। এই কথা বলিবামাত্র একশত গজমুক্তা নিকটস্থ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ সেইগুলি বস্ত্রমণ্ডিত করিয়া স্বয়ং রাজকুমারীর সম্মিধানে প্রফুল্লান্তঃকরণে উপস্থিত হইলেন।

চতুরা সহচরী গোপনভাবে থাকিয়া সমুদায় অবলোকন পূর্বক বিস্মিতান্তঃকরণে নিঃশব্দে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া নৃপনন্দিনীর নিকট উপস্থিত হইল। যুবরাজ কন্টার প্রার্থিত গজমুক্তা প্রদান করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান কবিলে সহচরী রাজকন্টার সমুখবর্তিনী হইয়া সমুদায় বর্ণন করিল। নৃপস্বতা শুনিয়া বিশ্বয়োৎফুল্ল লোচনে কহিলেন, সখি! আমি যাহা চাহিব, নৃপনন্দন তাহাই অনায়াসে প্রদান করিবেন, স্ততরাং আব দুই দিবস পরে আমারে তাঁহার ক্রোড়গামিনী হইতে হইবে। আমি যে, এত রাজপুত্রকে কৌশল চক্রে বদ্ধ করিয়াছি, বোধহয়, তাহার প্রতিশোধ লইতেই এই মহাত্মা আগমন করিয়াছেন। অতএব এখন উপায় কি করি, স্থির কর।

সখী ঈষৎ হাস্ত করিয়া কহিল, রাজনন্দিনী! চিন্তা কি? যখন অঙ্গুরীয়কের সন্ধান পাইয়াছি, তখনই আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। আর চিন্তা নাই। আপনি রাজকুমারের নিকট তাঁহার করাস্থিত অঙ্গুরীটি প্রার্থনা করিবেন। তাহাতে দুই প্রকারেই আপনার ইচ্ছা ফলবতী হইবে। কেননা যদি রাজনন্দন অঙ্গুরীয়ক প্রদানে অস্বীকৃত হন তাহা হইলেও তিনি আপন প্রার্থিত বস্ত্র প্রদানে অক্ষম হইলেন এবং যদি প্রদান করেন, তবে আপনি পরদিন যাহা প্রার্থনা করিবেন, অঙ্গুরী না থাকিলে তিনি কখনই তাহা দিতে সমর্থ হইবেন না। অতএব সর্বথা আপনার মঙ্গল দেখিতেছি। রাজতনয়া এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ধারণনাই আফ্লাদিত হইলেন। ষষ্ঠ দিবস উপস্থিত হইলে, যুবককে আহ্বান করিয়া বলিলেন,

রাজকুমার! অগ্নি আমি একটি মালিক্যাসুরী প্রার্থনা করিতেছি। ভবিষ্যৎ-জ্ঞানশূন্য নির্বোধ রাজকুমার অঙ্গুরীয়কের নিকট মালিক্যাসুরী যাচঞা না করিয়া আপন অঙ্গু লিঙ্গিত অঙ্গুরীটি তৎক্ষণাৎ সখীর হস্তে অর্পণ করিলেন। সহচরী রাজতনয়াকে অঙ্গুবী প্রদান করিয়া বলিল, আপনার বাহ্য সিদ্ধি হইল, আর চিন্তা কি? নৃপতনয়া সহাস্ত বদনে অঙ্গুরী পরিধান করিলেন।

বাজপুত্র বাসস্থানে উপস্থিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, অঙ্গুরীয় প্রাপ্ত হইয়া রাজকন্যা সন্তুষ্ট হইয়াছেন; বোধহয় অগ্নি কোন বস্তু আর প্রার্থনা করিবেন না। এই সময় দিননাথ অস্তাচলে গমন করিলেন। দিকসকল যেন ভূপতি পুত্রের ভাবী দুঃখেই মলিনা হইল। নির্বোধ রাজপুত্র দুঃখাশার বশবর্তী হইয়া রজনীর অন্তকাল মূহমূহঃ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কেননা তাহার মনে দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছিল যে, প্রভাতেই রাজকন্যার পাণিগ্রহণে সন্মত হইবেন। শশিসৌম্যাস্ত্রনৌ যামিনী বাজপুত্রের ভাবী দুঃখ দুঃখিনী হইয়া গমনসময়ে বিহগকুলের কলরবই যেন ক্রন্দন এবং শিশির পতনচ্ছলেই যেন অশ্রু বিসর্জনে কবিতা করিতে প্রস্থান করিলেন। কমলমুখী রাজকন্যার শুভোদ্দেশ্যেই যেন সূর্য্যদেব উদ্ভিত হইলেন। তদর্শনেই যে তিনি প্রফুল্ল হইলেন ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

প্রাতঃকালেই রাজা রাজসভায় উপস্থিত হইলেন এবং সভাসদগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, অগ্নি আমার কি শুভদিন! এত দিনের পরে বুদ্ধি জগদীশ্বর আমাব প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন। যাহা কখনই সংঘটিত হইবে না মনে ছিল, অগ্নি তাহাবই সংঘটনের লক্ষণ সকল প্রত্যক্ষ করিতেছি। কতগত রাজপুত্র আমার দুহিতার মনোরথ পূর্ণ কবিতা না পারিয়া চিরকালের নিমিত্ত কারাবাসী হইয়াছেন। স্বকুমার ষষ্ঠ দিবস তাঁহার কাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রদান করিয়াছেন। অগ্নি সপ্তম দিবস। বোধ হয়, ঈশ্বরের রূপায় তিনি কৃতকার্য্য হইবেন। সভাসদেরা রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, রাজকুমারের লক্ষণ দেখিয়া বোধহয়, তিনি সামান্য মল্লয়া নহেন। তিনি যে, অগ্নি আপনার দুহিতার অভিলষিত দ্রব্য দানে তদীয় পাণিপীড়ন করিবেন, তাহাতে সংশয় হইতেছে না।

ওদিকে রাজপুত্রী নৃপপুত্রকে আহ্বান করিয়া সাদর সম্ভাষণে বলিলেন, রাজপুত্র! আমি আপনার দোজ্ঞ ও বুদ্ধিকৌশলে যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়াছি। অগ্নি আমার প্রার্থিত বস্তু প্রদান করিয়া প্রতিজ্ঞা পূরণ করুন। আর একটি

মাণিক্যাজুরীয়ক প্রার্থনা করিতেছি। রাজকুমারী এই প্রার্থনা করিণামাত্র যুবরাজের মস্তকে যেন বজ্র পতিত হইল। তিনি চতুর্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। রাজপুত্রীর প্রার্থিত অঙ্গুরী কোথায় পাইবেন? তপস্বী-দত্ত অমূল্য অঙ্গুরী আর নিকটে নাই। স্তবরাং রাজকন্যার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে অসমর্থ হইলেন।

রাজনন্দন ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া নির্দিষ্ট বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন। তথায় নির্জনে আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন—হা বন্ধো! তুমি কোথায়? আমি যে বিষম বিপদে পতিত হইয়াছি, তুমি ইহাব কিছুই জানিতে পারিতেছ না। তোমার বাক্যে অবজ্ঞা করিয়া জীবন থাকিতেই শমনভবন দর্শন করিলাম! কোথায় রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার সুধাময় প্রণয়সুধাপানে পিপাসিত চিত্তচকোবকে পরিতৃপ্ত করিব, না কোথায় চিবকালের নিমিত্ত কাবাগারবাসী হইতে চলিলাম।

হা মৃত্যু! কাবাগারে প্রবেশ করিবার পূর্বে তুমি কেন আমাকে গ্রহণ করিতেছ না? পৃথিবী! তুমি বিধা হও, আমি তোমার গর্ভে প্রবেশ করি। তাহা হইলে জীবনমৃত্যুকারিণী লজ্জা আমাকে আর যন্ত্রণা দিতে পারিবে না। হায়! আমি কি নির্কোষ! লোভ আমার সর্বনাশ করিল। যদি লোভ না করিয়া বুদ্ধির অন্তগত হইতাম, তাহা হইলে ছদ্মশা আমাব সহচরী হইত না। আমি করস্থ অমূল্য অঙ্গুরীয়ক রাজকুমারীকে কেন প্রদান করিলাম? কেন আমি অঙ্গুরীয়কের নিকট অঙ্গুরী প্রার্থনা করিলাম না? তাহা হইলে অদ্বৈত রাজপুত্রীর প্রার্থনা পূর্ণ করিতে সক্ষম হইতাম। এখন কি করিব? নিজ বুদ্ধিদোষে নিজ মস্তকে আপদকে স্থানদান করিলাম। হা পিতঃ! হা মাতঃ! তোমরা কোথায়? হা! কেন আমি পিতামাতাকে স্মরণ করিতেছি! নির্কোষ পুত্র যে, পিতামাতার হৃদয়শেল, সে যে নরাধম, সে কখনও তাহাদিগকে স্মরণ করিবার পাত্র নহে। আমি নির্কোষ, আমার তুল্য নরাধম জগতে নাই।

স্বকুমার এইরূপে খেদ করিতেছেন, ইত্যবসরে প্রভাকর যেন তাঁহার দুঃখেই দুঃখিত হইয়া ক্রমে ক্রমে মলিন হইতে লাগিলেন। তাঁহার সমদুঃখিনী হইয়া অন্ধকারময়ী রজনী উপস্থিত হইল। রজনীকান্ত চন্দ্রমা যেন নিজ রমণীকে পরদুঃখে কাতরা দেখিয়া প্রফুল্ল হইলেন। এই সময়ে রাজকন্যা স্বীয় সহচরীদিগকে

বলিলেন, রাজপুত্র অনেকক্ষণ গমন করিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত প্রত্যাগত হইলেন না, তিনি অরুতকার্য্য হইয়াছেন সন্দেহ নাই। রজনীপ্রভাতে তাঁহাকে কারাগারে প্রেরণ করা আবশ্যক।

সুকুমার সমস্ত রজনী চিন্তাশয্যায় শয়ন করিয়া অতিবাহিত করিলেন। তাঁহার সুকুমার মুখচ্ছবি লাবণ্যহীন হইল। নিশাপতি তাঁহারই বদনপ্রতিমা ধারণ করিয়াই যেন মনোদুঃখে লুক্ষায়িত হইলেন। রাজপুত্র রাজপুত্রীর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, পাখীরা যেন সেই কথা বলিয়াই কলরব করিয়া উঠিল। সুকুমার এতক্ষণ অন্ধকারে লজ্জাপিত কলেবর আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন, সূর্য্যদেব কিরণজাল বিস্তারপূর্ব্বক তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইতে লাগিলেন। রাজপুত্রের মুখচন্দ্রমা ক্রমেই মলিন হইতে লাগিল।

রাজতনয়া রজনীপ্রভাতে সহচরীদিগকে বলিলেন, কারাধ্যক্ষকে সংবাদ দাও, রাজপুত্র আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারেন নাই, অতএব তিনি তাঁহার কর্তব্যকর্ম্ম সমাধা করুন। সহচরী নৃপকুমারীর আদেশানুসারে কারাধ্যক্ষকে সংবাদ দিল। কারাধ্যক্ষও সুকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রতিজ্ঞানুসারে তাঁহাকে কারাগারে আবদ্ধ করিলেন। নৃপতি সেই বাক্য শ্রবণে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া বলিলেন, আমার দুহিতার মনোমত পাত্র পৃথিবীতে আর নাই। রাজনন্দন ছয় দিবস তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলে ভাবিয়াছিলাম, সপ্তম দিবসেও তিনি কৃতকার্য্য হইবেন। কিন্তু সে আশা বৃথা হইল। তাদৃশ গুণাকর রাজকুমার যখন পরাস্ত হইলেন, তখন অণু কেহ যে, জয়ী হইবেন, তাহার ভরসা ফুরাইল। বোধহয়, রাজপুত্রীকে ঠিককাল অনুচাবস্থায় থাকিতে হইবে। অতএব এটি তাহার প্রতিজ্ঞা নহে, বিধাতার বিড়ম্বনা। রাজা এইরূপ মনস্তাপ প্রকাশ করিয়া নিস্তব্ধ হইলেন। যুবরাজ কারাগারে নিষ্কিন্তু হইয়া অশেষ যজ্ঞা ভোগ করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পাঠক মহাশয়! রাজকুমার সুকুমার রত্নপুরের কারাগারে থাকুক, আত্মন, আমরা মন্ত্রিপুত্র স্বয়ম্ভের অন্বেষণ করি। তিনি কোথায়? আত্মন দেখিতে পাইবেন? স্বরণ থাকিতে পারে, মন্ত্রিতনয় পূর্ব্বদিকে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি বহুস্থান পর্য্যটন করিয়া যে স্থানে তপস্বী কপিরূপ ধারণ করিয়া তপস্তা করিতেছেন,

সেই স্থানে অকস্মাৎ উপস্থিত হইলেন। কপিবর মন্ত্ৰেণের ত্রায় ধ্যানপরায়ণ হইয়া রহিয়াছে দেখিয়া তাঁহার বিস্ময় জন্মিল। অনন্তর হস্তস্থলিত জলকণা কপি-তপস্বীর অঙ্গে নিক্ষিপ্ত হইল। তিনি সেই বারিস্পর্শে কদাকার মন্ত্ৰাশরীর ধারণ পূর্বক তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, কে রে পাপিষ্ঠ! অকারণে আমার সমাধি ভঙ্গ করিলি? মন্ত্ৰিপুত্র এক আশ্চর্য্য হইতে অপর আশ্চর্য্য ঘটনা অবলোকন করিয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, অনন্তর যোগিবরের পদানত হইয়া কাতরস্বরে বলিলেন, ভগবন! আমি বিদেশী, অজ্ঞাতসারে এই কুকর্ম্ম করিয়াছি। আপনি রূপা করিয়া ক্ষমা না করিলে উপায়ান্তর নাই। তপস্বী তাঁহার বিনয়বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন ভয়, নাই, অজ্ঞানরূত অপরাধ ক্ষমা কবিলাম। মন্ত্ৰিনন্দন আশঙ্ক হইয়া সবিনয়ে তপস্বীকে অনেক স্তব কবিলেন। তাহাতে তিনি সদয় হইয়া বলিলেন, বৎস! আমি তোমাকে বর প্রদান করিতেছি, তুমি জগদীশ্বরকে স্মরণ করিয়া, যে প্রকার শরীর ও প্রকৃতি ধারণ কবিতো ইচ্ছা কবিবে, তৎক্ষণাৎ তাহাই হইবে। মন্ত্ৰিনন্দন এই বর প্রাপ্ত হইয়া, তপস্বীকে প্রণাম প্রদক্ষিণ পূর্বক গমনোন্মুখ হইলেন। তপস্বী তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত সমস্ত অবগত হইয়া বলিলেন, তুমি অণু কয়েক দিকে ভ্রমণ করিও, কিন্তু কদাচ পশ্চিম প্রদেশে গমন কবিও না। তথায় অনিবার্য্য বিপদের সম্ভাবনা আছে। মন্ত্ৰিপুত্রকে এই সমস্ত উপদেশ প্রদান করিয়া তপস্বী পুনর্ব্বার সরোবরের পার্শ্বস্থ ঘাটে অবগাহন করিয়া কপিকলেবর ধারণ করিয়া জগদীশ্বরের ধ্যানে মনঃসংযোগ করিলেন।

মন্ত্ৰিনন্দন স্তম্ভ, সরোবরের যে প্রান্তের জল স্পর্শে কপিক্রপী তপস্বী মানবরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং পুনর্ব্বার যে প্রান্তের জলে অবগাহন করিয়া কপিরূপ ধারণ করেন, তৎসমুদায় নিরীক্ষণ করিয়া চমৎকৃত ও আনন্দিত হইলেন, এবং ঐ দুই স্থানের জল ভিন্ন ভিন্ন আধারে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। গমন করিতে করিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন, তপস্বী আমাকে পশ্চিম ভ্রমণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, বোধ হয়, তথায় কোন অদ্ভুত বস্তু থাকিতে পারে। তাহা দর্শন করা আবশ্যক। যদি নিতান্ত বিপদ ঘটে, তবে তপস্বী-দত্ত বরপ্রভাবে বুদ্ধির সহায়তায় অবশ্যই পরিত্রাণ পাইব। এই চিন্তা করিয়া আগে পশ্চিম দিকেই চলিলেন। কিয়দূর গমন করিয়া তপস্বী-দত্ত বর পরীক্ষার্থ অস্তঃকরণে ষোড়শী রূপসী দিব্যাজনার রূপ চিন্তা করিবা মাত্র, তৎক্ষণাৎ তাঁহার শরীর তদ্রূপ হইল। তদ্রূপে

তিনি একবারে বিমোহিত ও চমৎকৃত হইলেন। নারীরূপ ধারণ করিয়া ভ্রমণ করা অল্পচিত্ত বিবেচনায় ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া পুনর্বার আপন স্বাভাবিক পুরুষদেহ প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে কিয়দিন গমনানন্তর রত্নপুবে উপস্থিত হইলেন। নগরের শোভা দর্শন করিয়া তাঁহার আনন্দ বৃদ্ধি হইল। স্মরণ্য কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া রাজধানী ভ্রমণ করিতে চলিলেন। সিংহদ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র দেখিতে পাইলেন, নির্মল রূক্ষবর্ণ প্রস্তরফলকে স্ববর্ণবর্ণে রাজকন্ঠার প্রতিজ্ঞা বিবরণ পূর্ববৎ লিখিত আছে। তাহার সম্মুখে ঘণ্টা দোঁড়লামান রহিয়াছে। প্রহরিগণ নিঃশব্দে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। মন্দিরনন্দন দেখিবামাত্র বৃত্তিতে পাবিলেন, যে ব্যক্তি রাজকন্ঠার প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে সম্মত হয়, সে এই ঘণ্টা বাদন দ্বারা তাঁহাকে সংবাদ প্রদান করে। যাহা হউক, ইহার বিশেষ বৃত্তাস্ত অবগত না হইয়া ঘণ্টাধ্বনি করা অল্পচিত্ত। কাবণ ইহাতে বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা আছে। এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই স্থান পরিভ্রমণ পূর্বক নির্জনপথে একটি বকুলবৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। মন্ত্রিপুত্র উপবিষ্ট হইয়া নানা প্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় রাজবাটী হইতে কুন্তকক্ষে কতিপয় পরিচারিকা তাঁহার নিকটবর্তী বৃক্ষেব অন্তরালে উপস্থিত হইল, এবং পরস্পর কথোপকথন করিতে করিতে বলিল, “রাজকন্ঠা যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা কখন যে, পূর্ণ হইবে, এরূপ বোধ হয় না। রাজনন্দন স্কুমার, তাঁহার প্রতিজ্ঞাত প্রার্থনা ছয় দিবস পূর্ণ করিয়াছিলেন। একদিন অসমর্থ হওয়াতে কল্যাণকাগবে নিষ্কিপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার দুর্দশা দেখিয়া আমাদের হৃদয় বিদারিত হইতেছে।” এই কথা বলিবামাত্র মন্ত্রিপুত্রের দিকে দৃষ্টি নিষ্কিপ্ত হওয়াতে তাহার কথোপকথনে বিরত হইয়া জল আনয়নার্থে প্রস্থান করিল। তৎশ্রবণে মন্ত্রিপুত্র চিন্তা করিলেন, ইহার রাজপুত্র স্কুমারকে লক্ষ্য করিয়া কথাবার্তা কহিতেছিল। বোধহয় ঐ স্কুমার আমার বন্ধু হইবেন। যাহা হউক, রমণীগণ ফিরিয়া আসিলে, সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিব।

পরিচারিকাগণ জলপূর্ণ কুন্তকক্ষে করিয়া প্রত্যাগত হইলে মন্ত্রিপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার বোধ হইতেছে, তোমরা এই রাজবাটীর পরিচারিকা হইবে। যদি আমার অল্পমান মিথ্যা না হয়, তবে কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিয়া আমার কয়েকটি বাক্যের উত্তর দান করিলে, উপকৃত হই। এ রাজ্যের রাজার নাম কি? এবং সিংহদ্বারে একটি বৃহৎ ঘণ্টাই বা ঝুলিতেছে কেন? একটি কিস্করী উদ্ভিদ

করিল, মহাশয় আমাদের রাজার নাম রত্নধ্বজ, তাঁহার পুত্রসন্তান হয় নাই। একটি পরমাসুন্দরী কন্যা আছেন। সেইটিই আমাদের মহারাজের একমাত্র সন্ততি। রাজা ও রানী সেই কুমারীটিকে অতিশয় ভালবাসেন। কন্যার নাম রত্নবতী। আপনি যে বৃহৎ ঘটাব কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, রাজকুমারীর একটি কঠিন প্রতিজ্ঞাই সেই ঘটনা বুলাইবার কারণ। কিন্তু সে কথা এক্ষণে বলিবার সময় নয়। আমরা রাজকন্যার পরিচারিকা। প্রতিদিন তাঁহার স্নানার্থ জল আহরণ করিয়া থাকি। যে জল আমরািগের কক্ষে দেখিতেছেন, তাহা দ্বারা পাষণনির্মিত ক্ষুদ্র পুষ্করিণী অত্যন্ত পূর্ণ করিয়া রাখিব, কলা নৃপনন্দিনী ইহাতে স্নান করিবেন, অতএব অধিকক্ষণ বিলম্ব করিতে পারি না। আপনি যদি কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করেন, তবে পুনরায় আসিয়া আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি। মন্ত্রিপুত্র তাহাতেই সম্মত হইলেন; এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইহারাজকন্যার পরিচারিকা, ইহাদিগের নিকট রাজপুত্রীর অনেক সংবাদ পাইতে পারিব।

পরিচারিকাগণ পুনরায় জল লইতে আসিলে মন্ত্রিপুত্র ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা যে রাজকন্যার প্রতিজ্ঞার কথা বালিতেছিলে তাহার বিস্তারিত শুনিতে ইচ্ছা করি। পূৰ্বপরিচিতা পরিচারিকা বলিল, মহাশয়! আমরািগের রাজকুমারী প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যিনি সাতদিন তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন, তিনিই তাঁহার পতি হইবেন। তাঁহার ক্লেশগুণের কথা শ্রবণ করিয়া পৃথিবীর চতুর্দিক হইতে কতশত রাজপুত্র আসিয়াছিলেন, কেহ এক কেহ দুই বা তিন দিবস পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতিজ্ঞাপূর্ণ করিয়া পরিশেষে অসমর্থ হওয়াতে কারাগারে নিষ্কিপ্ত হইয়াছেন। সম্প্রতি যে একটি রাজপুত্র আসিয়াছিলেন, তিনি আপনার সমবয়স্ক এবং পরম ক্লেশবান। সেই রাজপুত্র অসাধারণ গুণে ছয় দিবস রাজকন্যার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া গতকলা কারাগারে নিষ্কিপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার নিমিত্ত এ রাজ্যের সকলেই কাতর হইয়াছেন। সেই রাজপুত্রের নাম স্কুমার। এইরূপ পরিচয় দিয়া কিছুকাল স্তম্ভকে সন্মোদন পূর্বক কহিল, মহাশয়! দেখিতেছি, আপনিও বিদেগী পথিক, আমরা আপনার রাজকন্যার প্রতিজ্ঞা শ্রবণে আগ্রহাতিশয় দেখিয়া নিষেধ করিতেছি, কখনো জলও অনলে প্রবেশ করিবেন না। বোধহয় কাৰ্য্যান্তরে বিদেশ পরিভ্রমণ ক্রেশ স্বীকার করিয়াছেন, কাৰ্য্য সমাপন করিয়া অবিলম্বে স্থানান্তরে প্রস্থান করুন। মন্ত্রিপুত্র কহিলেন, তোমাদিগের সতপদশে নিতান্ত স্বার্থী হইলাম।

কিঙ্করীরা জলানয়নার্থ সরোবরে গমন করিল। মন্দিপুত্র মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন! বন্ধু তবে এই রমণীর মোহিনীপাশে আবদ্ধ হইয়া কারাপায়ে নিষ্কিন্তু হইয়াছেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই। আরও অনেক রাজপুত্র সেই কূটযন্ত্রে বদ্ধ হইয়া কষ্টভোগ করিতেছেন। অতএব ইহাদিগের উদ্ধার সাধন করা আমার নিতান্ত কর্তব্য। তন্নিমিত্ত যদি প্রাণ পর্য্যন্ত যায়, তাহাও আমার পক্ষে জ্ঞেয়ঃ। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, পরোপকারে মৃতব্যক্তির জীবন সার্থক। এইরূপ চিন্তা করিয়া বুদ্ধিবলে কোন উপায় স্থির করিলেন। এই সময়ে পরিচারিকাগণ বারি-পূর্ণ ঘটকক্ষে তাহার নিকটবর্ত্তিনা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, পথিক! কি চিন্তা করিতেছ? স্তম্ভিত বলিলেন, অনেকক্ষণ ভ্রমণ করাতে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হইয়াছি। যদি অল্পগ্রহ করিয়া কিঞ্চিৎ জল দাও, তবে নিতান্ত উপকৃত হই। পরিচারিকাগণ বলিল, পাত্র বাহির করুন, জল প্রদান করিতেছি। পথিক বলিলেন, আমার নিকট পাত্র নাই, পরিচারিকাগণ বলিল, তবে কিঞ্চিৎ বিলম্ব করুন, পাত্র আনিয়া জল প্রদান করিব। পথিক বলিলেন, বিলম্ব সহ্য না। পরিচারিকারা বলিল, তবে উপায়? পথিক বলিলেন, আমি অঞ্জলি পাতিতেছি, অল্পগ্রহ করিয়া কুণ্ড হইতে প্রদান কব। তাহারা স্বীকৃত হইল। মন্দিপুত্র জলপান করিতে লাগিলেন। ইত্যবকাশে যে বারিম্পর্শে মনুজ্যশরীর কপি হয়, সেই বারি কৌশলক্রমে কলসীর জলে মিশ্রিত করিয়া দিলেন। পরিচারিকাগণ তাহার কিছুই জানিতে পারিল না; স্বতরাং প্রফুল্লচিত্তে রাজবাটীতে গমন করিল এবং রাজপুত্রীর স্নানার্থ সেই জল রাখিয়া দিল।

পাঠকগণ! বোধ করি রাজকন্ডার ভুবনস্থার বিষয় কিছু আলোচনা করিতেছেন। আমরাও তাহাই বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। সেই বারি দ্বারা স্নানাগারস্থ কৃত্রিম হ্রদ পরিপূর্ণ করিয়া পরিচারিকাগণ স্নানার্থ নৃপনন্দিনীকে আহ্বান করিল। তিনি অবিলম্বে তথায় গমন করিলেন। সেই জলে অবতরণ করিবামাত্র তিনি কপিকায়ী প্রাপ্ত হইয়া অদ্ভুত একটি বানরী হইলেন। রাজ-কুমারী আপনাব অঙ্গ আপনি নিরীক্ষণ করিয়া বিস্মিত নয়নে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সহচরীগণ এই অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া যেমন তাহাকে ধরিতে সেই জলে অবতরণ করিল, অমনি তাহারাও তৎক্ষণাৎ বানরী হইয়া রাজকন্ডার সঙ্গিনী হইল। চতুরা নারী দাসী স্বচক্ষে এই ভয়ানক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া প্রথমে চমৎকৃত হইয়াছিল, পরে বিলম্ব বৃদ্ধিতে পারিল যে কৃত্রিম হ্রদস্থ জলের

গুণেই এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। অতএব সে জল স্পর্শ না করিয়া দ্রুত-পদে রাজমহিষীকে সংবাদ দিতে চলিল, এবং অশ্রুত্যাগ করিতে করিতে কাতর বচনে বলিল, ঠাকুরানি! সর্বনাশ উপস্থিত। রাজনন্দিনী স্বানার্থ কৃত্রিম হৃদস্থ বারিস্পর্শ করিবা মাত্র বানরী-রূপ ধারণ করিয়াছেন। রানী এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রথমতঃ তাহাকে ক্ষিপ্ত মনে করিয়াছিলেন। পরে যখন হৃদের নিকটবর্তিনী হইয়া হুহিতার ছুববস্থা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিলেন, তখন শোকে হতজ্ঞান প্রায় হইলেন, এবং শিবে কবাঘাত করিতে করিতে কণ্ঠ্যাকে ধরিবার নিমিত্ত যেমন হৃদমধ্যে অবতরণ করিলেন, আপনিও একটি বৃদ্ধা বানরী হইয়া চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন! চতুর্দিক বানবীময় হইয়া উঠিল!

রাজা সভামণ্ডপে বসিগা অমাত্যবর্গ সমভিব্যাহারে বিচার কবিতেছেন, এমন সময় চতুরা দাসী রোদন-বদনে রাজ সভায় উপস্থিত হইয়া করপুটে নিবেদন করিল, ধর্মাবতাব! ওদিকে সর্বনাশ উপস্থিত। রাজমহিষী, রাজকন্যা, এবং তাঁহার সখীগণ সকলেই বানরী হইয়াছেন। পুর্বমধ্যে জনমানব নাই, কেবল বানরীদলে পরিপূর্ণ। মহারাজ! শীঘ্র চলুন, স্বচক্ষে দর্শন করিয়া উদ্ধারের উপায় করিবেন। রাজা এই পর্বমাস্তব্য অদ্ভুতোক্তি শ্রবণমাত্র নিস্তব্ধ হইলেন। ক্ষণকাল পরে দাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, চতুরে! তুমি কি বলিতেছ? তোমার একপ ভাব কেন হইল? বুদ্ধি স্থির কর। চতুরা পুনরায় করপুটে বলিল, মহারাজ! আমার বুদ্ধির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। মহারাজের নয়নগোচর হইলেই সত্যাসত্য প্রকাশ হইবে।

রাজা আর ধৈর্য ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া মস্তকে কবাঘাত করিতে করিতে কণ্ঠাস্তঃপুরমধ্যে গমন করিলেন। পুরী যেন জনশূন্য বিজনবনসদৃশ বোধ হইতে লাগিল। যে রাজপুরী সর্বদা আনন্দ ধ্বনিতে পূর্ণিত হইত, এইক্ষণে সেই পুরীতে অনিবার বানরধ্বনির প্রতিধ্বনি হইতেছে! ভূপতি ক্রমে ক্রমে দাসী সমভিব্যাহারে রাজকন্যার অবগাহনস্থানে উপস্থিত হইয়া সমস্ত অবলোকনান্তর এককালে জ্ঞানশূন্য হইলেন। যেন তিনি কি অবনৌমণ্ডল, কি শূন্য মার্গে, কি জাগরিত, কি নিদ্রিত, কিছুমাত্র স্থির করিতে পারিলেন না। মহিষীবানরী মহারাজকে দর্শন করিয়া নেত্রনীরে ভাসিতে লাগিলেন। রাজা কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া কেবল পুনঃ পুনঃ সেই বিপত্ত্যারণ জগৎকারণ জগদীশ্বরকে স্মরণ করিতে

লাগিলেন। হে ভগবন্! তোমার অসাধ্য কিছুই নাই, আমার কি গুরুপাপে সমস্ত পুরবাসিনী বানরী হইল। আমি কিরূপে সজ্জন-সমাজে মুখ দেখাইব? এইক্ষণে আমার মৃত্যুই শ্রেয়স্কর। হে কাল! কেন তুমি তোমার করালগ্রাসে আমাকে কবলিত করিতেছ না? আমার প্রতি তোমার কি এমনই ঘৃণা জন্মিয়াছে যে, পরিবাবগণের এই দুর্দশা দর্শনেও জীবিত বহিয়াছি। রাজা এবস্ত্রকাব আক্ষেপ করিয়া সভাস্থ জনগণ-সমীপে উপস্থিত হইলেন। সভাগণ মহারাজের মুখশ্রী বিবর্ণ দেখিয়া চতুর্দিকে অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। বিজ্ঞমন্ত্রী করযোড়ে বলিলেন, ধর্ম্মাবতার! দাসী যাহা বলিয়া গেল, বোধকরি, তাহা অসত্য নহে। নৃপতি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অশ্রুলোচনে গদগদ স্ববে কহিলেন, মন্দির! জগদীশ্বর নিতান্ত বিমুখ হইয়াছেন। দাসীর বাক্য সকলই সত্য,—যাহা আমি কখন স্বপ্নেও জানি না এবং কাহারও মুখে শুনি নাই, অতঃ তাহাই প্রত্যক্ষ করিলাম। কথান্তঃপুরীস্থ সমস্ত রমণীই বানরী হইয়াছে। বোধকরি, এবস্তৃত আশ্চর্য ঘটনা ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে কেহ কখনও নয়ন-গোচর কবা দূবে থাকুক, শ্রবণও করে নাই। এক্ষণে কি কর্তব্য, স্থির করিয়া এ অসীম বিপদমাগর হইতে আমাবে উদ্ধার করুন।

মন্ত্রী মহারাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া এককালে বিস্ময়াপন্ন হইলেন, ভূপতিও নিজাসনে ম্লানবদনে উপবিষ্ট হইয়া কি কর্তব্য ভাবিতে লাগিলেন।

এদিকে স্তমস্ত স্বকায সাধন করিয়া মনে মনে স্থির করিলেন যে, আমি অতি প্রাচীন গণক ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করি। পরমেশ্বরের রূপায় এবং তপস্বিবরের বরপ্রভাবে স্তমস্ত তৎক্ষণাৎ অতিপ্রাচীন ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিলেন। ক্রমে ক্রমে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া মহারাজের জয় হইক, বলিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। কহিলেন, মহারাজ! আপনার বড় অমঙ্গল উপস্থিত দেখিতেছি। রাজা ব্রাহ্মণের মুখে অমঙ্গল বাক্য শ্রবণে গলবন্ত হইয়া বলিলেন, ঠাকুর! কি অমঙ্গল দেখিতেছেন অতঃপ্রহ করিয়া বলুন। স্তমস্ত ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, মহারাজ! আপনার অমঙ্গলের কথা আর কি বলিব, জ্যোতিষে গণিয়া দেখিলাম, অন্তঃপুরের সমস্ত কামিনী বানরী হইয়াছে। আপনার পাপের সীমা নাই। জগদীশ্বর! তুমি সত্য, তুমি সত্য! উঃ! কি ভয়ানক ব্যাপার। আহা, কেবল অধর্ম্ম-চরণেই না একরূপ বিরূপ দশা ঘটিল। সভাস্থ সমস্ত সভ্য ব্রাহ্মণের এই আশ্চর্য

ভাবী গণনা শ্রবণে যে কি পর্য্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইলেন, তাহা প্রিয় পাঠকগণ অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছেন।

রাজা কৃতাজ্জলিপুটে কাতর বচনে ত্রাক্ষণকে কহিলেন, ঠাকুর! আমার এ পাপ কিসে মোচন হইবে? ত্রাক্ষণ উত্তর করিলেন, মহারাজ! এ ত যৎসামান্য পাপ নহে যে, ত্রাক্ষণতোজন এবং দান-ধান করিলেই বিমোচন হইবে; এ গুরুতর পাপ, সহজে মোচন হইবার নয়। রাজা পুনরায় বলিলেন, ঠাকুর! এমন গুরুপাপ কিসে সংঘটিত হইল? গণক ত্রাক্ষণ কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, মহাশয়! আপনার দোষে এ পাপ জন্মে নাই, আপনার দুহিতাই ইহার মূলকারণ। আপনিই বিবেচনা করুন, রাজকন্টার পানিগ্রহণাংশে কতশত রাজপুত্র এবং সম্ভ্রান্ত ভদ্রসম্ভান আগমন করিয়াছিলেন। কন্টার মোহিনী মায়াপাশে আবদ্ধ হইয়া তাঁহারা সকলেই সমস্ত ধনে জলাঞ্জলি দিয়া চিরকাবাগাবে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। আহা! এ কি সামান্য দুঃখের বিষয় যে, বিবাহ-আশে প্রথমে ধনসম্পত্তি বিনাশ, শেষে জীবনাশে নিরাশ। হে কৰুণাময় জগদীশ্বর! তোমার যথার্থ বিচার। মহারাজ! বিবেচনা করুন, এ কি সামান্য পাপ।

মহারাজ! আপনিই বিবেচনা করুন, কারাস্থ যুবকগণের অন্তরে কিরূপ ভাবের উদয় হইতেছে এবং তাহাদের পিতামাতার অন্তঃকরণেই বা কিরূপ ভাবের আবির্ভাব হইতেছে। রাজা ও অমাত্যবর্গ স্তম্ভের এই সমুচিত বাক্যের উত্তর প্রদানে সমর্থ হইলেন না, সকলেই মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে সভাস্থ সভাগণ স্তম্ভের নিকট গলবস্ত্র হইয়া করঘোড়ে বলিতে লাগিলেন, প্রভো! এখন উপায় কি দেখিতেছ, আপনি ভিন্ন এখন আর কেহই এ বিপদ হইতে রক্ষাকর্তা নাই। হুচতুর স্তম্ভ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, এ পাপ সহজে বিমোচন হইবার নহে, আমার সাধ্য নাই যে মহারাজকে এই যৌরতর বিপদ হইতে উদ্ধার করি। তবে কল্যা মহারাজের বহির্দ্বারস্থ সরোবরতটে এক সন্ন্যাসী আগমন করিবেন, তিনি যতপি সদয় হন, তাহা হইলেই উদ্ধারের উপায় হয়।

স্তম্ভের মুখে এতদ্বিবরণ শ্রবণে রাজা কৃতাজ্জলিপুটে বলিলেন, দ্বিজবর! সন্ন্যাসীর আগমন পর্য্যন্ত আপনি এস্থানে অবস্থান করিলে উপকৃত হই। স্তম্ভ বলিলেন, মহারাজ! আমি দরিদ্র বাক্যক ত্রাক্ষণ, একস্থানে দুদিন থাকিলে চলে না। ভগবানের কৃপায় আপনি বিপদ হইতে উদ্ধার হইবেন। পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে।

রাজা পুনরায় বলিলেন, ঠাকুর ! আমাকে হতাশ করিবেন না। স্তম্ভ মহারাজকে অশেষপ্রকার প্রবোধবাক্যে বুঝাইয়া গমনে উদ্যত হইলেন। রাজা তখন কোষাধ্যক্ষকে আহ্বানপূর্বক আজ্ঞা করিলেন, ইহাকে একশত স্বর্ণমুদ্রা প্রদান কর।

স্তম্ভ কহিলেন, মহারাজ ! স্বর্ণমুদ্রা দূরে থাকুক, এক তাম্রমুদ্রাও গ্রহণ করিব না। যখন এ দারুণ বিপদ হইতে মুক্তলাভ করিবেন, সে সময়ে অল্পগ্রহণ করিয়া যাহা প্রদান করেন, শিরোধার্য্য করিয়া লইব। স্তম্ভের একরূপ সৌজা দর্শন করিয়া সভাস্থ সভাগণ একবাক্যে তাঁহার অগণ্য প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

মন্ত্রী করযোড়ে বলিলেন, মহারাজ ! জগদীশ্বর মানবজাতিকে ঘোরতর বিপদে নিক্ষেপ করেন, আবার তিনিই তাহার মুক্তিপথ প্রকাশ করিয়া দেন। বিবেচনা করুন, এই ব্রাহ্মণ হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া অব্যক্ত সমুদায় বিষয় প্রকাশ করিলেন। অতএব তিনি যে সন্ন্যাসীর আগমনের কথা কহিয়াছেন, তাহা অবশ্যই সত্য হইবে। মহারাজ ! ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া অন্তরের চিন্তা অন্তর করুন।

এদিকে সূর্য্য অস্ত হইল। নিশানাথ সহচরগণে বেষ্টিত হইয়া জনগণের মনোবঞ্জন করিতে করিতে পূর্বদিক হইতে উদ্ভিত হইলেন। ভূপতি সমস্ত রাত্রি চঞ্চলভাবে জাগিয়া কাটাইলেন। নিদ্রা মহারাজের দুঃখে দুঃখিত হইয়া ক্ষণকালের জগুও তাঁহার নেত্রাসনে উপবেশন করিলেন না। দুঃখের রজনী এত দীর্ঘ যে, কোনমতেই অবসান হইতে চাহে না, মহারাজ ক্ষণে ক্ষণে নিদ্রিষ্ট নক্ষত্র দর্শন করিয়া নিশার শেষ বিবেচনা করেন। কিন্তু মন কোনরূপেই স্থির থাকে না। একবার বোধ করেন যেন, তমোনাশিনী উষা পূর্বদিক হইতে আগমন করিল, আবার কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার কিছুই দৃষ্ট হয় না। একবার বিবেচনা হয় যেন, বিহঙ্গমগণ স্ব স্ব কুলায়ে বসিয়া স্তম্ভরস্বরে জগদীশ্বরের গুণগান করিয়া উঠিল। আবার ক্ষণকালের পরে সেভাবে কিছু থাকে না। রাজা এইরূপে চঞ্চল হইতেছেন, এমন সময়ে বিহঙ্গনিচয় দিনপতির আগমনবার্ত্তা উন্মেষের ঘোষণা করিতে লাগিল। ভূপতি বিহঙ্গমুখে এতদ্বার্ত্তা শ্রবণে মহাহর্ষচিত্তে সঙ্গিগণকে বলিলেন, আর বিলম্বে কাজ নাই; রজনী শেষ হইল। ইহাদের মুক্তির চেষ্টা পাওয়া কর্তব্য। এদিকে নিশাপতি আগমনকাল নিকটবর্ত্তী জানিয়া চাকরবর্গ লুকাইত করিতে লাগিলেন। আগমনকাল নিকটবর্ত্তী বটে, কিন্তু এ আগমন কাহার ? দিনপতির ?

রজনী প্রভাত হইল। প্রভাতে কমলবন প্রফুল্ল হইতে লাগিল। কুমুদিনী কাস্ত-বিরহে মলিনী হইয়া সলিলে ডুবিল।

ওদিকে স্বমস্ত সরোবরতীরে মনে মনে চিন্তা করিলেন, এই শুভ অবসর উপস্থিত, এই সময় সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া প্রিয়বন্ধুর উদ্ধারের উপায় করা কর্তব্য। ইহা স্থির করিয়া একমনে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে লাগিলেন। তপস্বিদণ্ড বরপ্রভাবে জগদীশ্বরপ্রসাদে তৎক্ষণাৎ তাঁহার তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসীর রূপ আবির্ভূত হইল। জটা, বকুল, শ্মশ্রু, জপমালা, কমণ্ডলু প্রভৃতি যোগিযোগ্য আভরণ সমস্ত, যেন শূন্য হইতে উপহাব দিলেন। যোগিরূপী স্বমস্ত নবীনবেশে সরোবর-সোপানে যোগাসনে উপবেশন করিয়া মুদিতনয়নে ধ্যান করিতে লাগিলেন।

এদিকে রাজসভাপণ্ডিতগণ বাজনিয়োগান্তসাবে অতিসম্মত সরোবর-তীরে উপনীত হইলেন। গমনমাত্রই ধ্যানোপবিষ্ট যোগিবরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা সবিস্ময়লোচনে সন্ন্যাসীকে নিবীক্ষণ করিয়া করযোড়ে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। মায়াবী সন্ন্যাসী মায়াধানভঙ্গে নয়ন উন্মীলন করিয়া স্বাগত প্রশ্নদ্বারা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তোমরা? কি নিমিত্ত, কি অভিলাষে কুতাঞ্জলিপুটে আমার নিকট দণ্ডায়মান আছ?

পণ্ডিতেরা একবাক্য হইয়া কহিলেন, প্রভো! আমাদের অন্তরের বাক্য কি আপনার অন্তরে অবিস্তৃত আছে? এই নগরস্থ মহারাজ অসীম বিপদমাগরে নিপতিত হইয়াছেন, আপনি অম্লগ্রহ প্রকাশ করিয়া একবার বাজবাটতে পদার্পণ করিলেই রাজপুত্রী পবিত্র হয় এবং মহারাজও বিপদমুক্ত হন। সন্ন্যাসিরূপী স্বমস্ত উত্তর করিলেন, আমি একরূপ ক্ষমতাবান নহি যে, তোমাদের রাজাকে ঐ ভয়ঙ্কর বিপদমাগর হইতে উদ্ধার করিতে পারি।

এদিকে ভূপতি সন্ন্যাসীর আগমনবার্তা শ্রবণমাত্র স্বয়ং সরোবরতীরে গমন করিয়া সন্ন্যাসীর নিকটে করযোড়ে কাতরস্বরে বলিলেন, ভগবন্! আমার অপরাধ মার্জনা করুন। আমি যৎপরোনাস্তি বিপদগ্রস্ত হইয়া আপনার চরণে স্মরণ লইয়াছি। সন্ন্যাসী মহারাজের কাতরতা ও দীনতা দর্শনে কিঞ্চিৎ কৃষ্ণস্বরে কহিলেন, রাজন্! তোমার ছুহিতাই ইহার মূলকারণ। সেই পাপীয়সীর পাপেই একরূপ ঘটনা হইয়াছে। সেই দুষ্টার ছলনায় কতশত রাজপুত্র কারাগারে বন্দী হইয়াছেন। রাজা পুনরায় কাতরতা প্রকাশ করিতে সন্ন্যাসী তৎসমভিব্যাহারে রাজভবনে গমন করিলেন। রাজা নিজেই স্বর্ণময় সিংহাসন আনয়নপূর্বক সন্ন্যাসীকে উপবেশন

কবিতা দিলেন। সভাস্থ সভাগণ সন্ন্যাসীকে অর্দ্ধচন্দ্রবৎ বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। ক্ষণকাল পবে সন্ন্যাসী রাজাকে বলিলেন, মহারাজ ! কত দেশেব কত যুবরাজ তোমার কন্টার পাণিগ্রহণ-আশায় আগমন করিয়া তাহার মোহিনী মায়াপাশে বদ্ধ হইয়া কারাগারে কষ্টভোগ করিতেছেন, তাঁহাদের কত অর্থ অপহরণ করিয়াছ, এ কি সামান্য পাপ ! প্রথমতঃ ঐ সকল অবরুদ্ধ রাজপুত্রকে মুক্ত করিয়া তাঁহাদের অর্থের দ্বিগুণ দান কর, তাহার পর অল্প উপায় হইবে। নতুবা যাবজ্জীবন এই ঘোরতর বিপদায়িতে দক্ষীভূত হইতে হইবে। রাজা সন্ন্যাসীর বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাই করিতে স্বীকৃত হইলেন। সন্ন্যাসী বসুখেই রাজা কারাগারস্থ যুবরাজগণের নামধাম পরিচয় দিয়া তাঁহাদের স্ব স্ব অর্থের দ্বিগুণ প্রদান করিয়া বিদায় করিতে লাগিলেন। অবশেষে সেই রাজপুত্র স্ককমাব উপস্থিত হইলে রাজা কহিলেন, প্রভো ! ইনিই কেবল ছয় দিবস কন্টার মনোবাক্ষা পূর্ণ করিয়া একদিবস অক্ষম হওয়াতে কারাগারে নীত হইয়াছিলেন। স্তমস্ত প্রিয়তম বন্ধুর দুর্বস্থা দর্শনে অত্যন্ত কাতর হইলেন। নরপতিকে কহিলেন, মহারাজ ! তবে এই রাজপুত্রকে বিদায় করিবেন না। ইহার দ্বারা কোন বিশেষ কার্য্য সম্পাদন কবিতা হইবে। সন্ন্যাসীর বাক্য অলঙ্ঘনীয়, স্তবরাং মহারাজ তাঁহাকে বিদায় করিলেন না। তখন স্ককুমার মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, হায় ! আমি বন্ধুবাক্যবিরোধী হইয়া এত কষ্ট সহ করিলাম, তথাপি সে আশা ফলবতী হইল না। বে অদৃষ্ট ! অত্যাগ রাজপুত্রগণ তাঁহাদের অর্থের দ্বিগুণ লইয়া স্বদেশে গমন কবিলেন, আমি এমনি হতভাগ্য যে কারাগার হইতেও মুক্তি পাইলাম না।

মহারাজ সন্ন্যাসী-সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, গুরুদেব ! আপনার আদেশানুসারে রাজপুত্রগণকে বিদায় করা হইয়াছে। কেবল যুবরাজ স্ককুমার এই উপস্থিত আছেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, প্রথমতঃ রাজাস্তঃপুরের গ্রহশান্তি হউক, তাহার পর স্ককুমারের প্রতি যাহা কর্তব্য তাহা করা বাইবেক। রাজা সন্ন্যাসী-সমভিব্যাহারে স্তমস্তপুরে গমন করিলেন। স্তমস্ত প্রথমতঃ পূতবারি-প্রভাবে মহিষীকে মানবী করিলেন। রাজা এবং অমাত্যবর্গ সন্ন্যাসীর এই আশ্চর্য্য ক্ষমতা দর্শনে এককালে বিশ্বয়াপন্ন হইয়া রহিলেন। সন্ন্যাসী ক্রমে ক্রমে স্তমস্ত বানরীকে মানবী করিলেন, কিন্তু রাজকন্টা রত্নবতী বানরীই রহিলেন। রাজা গলবদ্ধ হইয়া বলিলেন, প্রভো ! সকলেই বন্ধা পাইল, কিন্তু কি দোষে কন্টাটি

বানরী হইয়া রহিল ? সম্রাসী অবিলম্বে উত্তর করিলেন, রাজন ! তোমার কণ্ঠার গুরুতর পাপ ; তাহাকে মুক্ত করা আমার সাধ্য নয়। রাজা তখন সজলনয়নে বলিলেন, যদি কুমারীটি বানরী রহিল, তবে আমার জীবনে কি ফল ? রাজ্যেই বা প্রয়োজন কি ? এবং এসকল পরিবারই বা থাকিয়া কি করিবে ? আমার আর তিলাঙ্ক বাঁচিবার সাধ নাই। এই প্রকার নির্বেদ প্রকাশ করিয়া রাজা পুনর্বার সম্রাসীর পদানত হইয়া নেত্রনীরে তাঁহার পদরজঃ স্নেহ করিতে লাগিলেন। কহিলেন, গুরুদেব ! আপনি আমারে এই দুস্তর বিপদপারাবার হইতে নিস্তার না করিলে আর কে রক্ষা করিবে ? আমি আপনারে এই সমস্ত রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য দান করিতেছি, রত্নবতী রত্নটিও আপনারে দান করিব। কেবল তাহার পূর্ব্ব রূপটি দর্শন করা আমাব ইচ্ছা।

সম্রাসী কহিলেন, মহারাজ ! তোমার যদি সেই ইচ্ছাই হয়, তবে ষথার্থই আমাবে অধ্বরাজ্য যৌতুক দিয়া রত্নবতী দান করিতে হইবে। রাজা যে আজ্ঞা বলিয়া তৎক্ষণাৎ অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া দিলেন। সম্রাসী কয়েকটি কৃত্রিম মগ্ন পাঠ করিয়া পাত্তস্ত বাবি প্রক্ষেপপূর্ব্বক বানরী বাজুকুমারীকে মানবী করিলেন। রাজা ও রাজপুত্রী সকলে তাঁহার এই অলৌকিক ক্ষমতা দর্শন করিয়া যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ে নিমগ্ন হইলেন। বাজপুত্রী আনন্দময় হইল। রাজা বাজপ্রসারণপূর্ব্বক তনয়াকে কোড়ে লইয়া আনন্দাশ্রুধারে তাঁহার সর্কশরীর সিক্ত করিতে লাগিলেন। রত্নবতী পূর্ব্ববৃত্তান্ত কিছুই জানেন না, অথচ অন্তঃপুর লোকাকীর্ণ দেখিয়া নানা প্রকার চিন্তা করিতে করিতে পিতৃকোড়ে মস্তক নত করিলেন। রাজা অশ্রুধারা কণ্ঠার চিবুক উত্তোলন করিয়া কহিলেন, বৎসে ! পুনর্বার তোমারে কোড়ে লইব এ আশা ছিল না। পরমেশ্বরের রূপায়, আর এই যোগীবরের প্রসাদে অজ্ঞ হারানিধি প্রাপ্ত হইলাম, এই কথা বলিয়া সম্রাসীর দিকে অশ্রুনির্দেশ করিলেন। রত্নবতী এই কথা শুনিয়া সেই ভুবনমোহন কটাক্ষ সম্রাসীর দিকে একবার ফিরাইলেন। ছদ্ম যোগিকল্পী স্তম্ভ রাজকণ্ঠার রূপমাধুরী দর্শন করিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ভাবিলেন, পরমেশ্বর এই সুবর্ণলতাটি কোন ভাগ্যবান তরুর আশ্রয় করিবার অভিপ্রায়ে স্বজন করিয়াছেন ? প্রিয়বন্ধু স্বকুমারের অদৃষ্ট কি সুপ্রসন্ন, এই মৌলদ্য-সর্বোত্তমের পদ্মফলটি আজ তাঁহার হৃদয়-সর্বোত্তমের শোভা সম্পাদন করিবে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া সম্রাসী রাজাকে কহিলেন, মহারাজ ! আমি বিষয়-তাগী যোগী, গৃহী হইতে আমার অভিলାষ নাই। ভূমি অঙ্গীকার করিয়াছ, অত্বেক

রাজ্যসহ এই কঠোরত্ব আখ্যারে দান করিবে, কিন্তু আমি তাহা! লইয়া কি করিব ? আমি কহিতেছি যে, স্বকুমার রাজকুমার আপনার হৃদিতার জন্ত স্তবীৰ্যকাল কাটা-বাস করিলেন, তাঁহারেই দান কর। রাজা তচ্ছ বণে উল্লসিত হইয়া শুভদিনে শুভলগ্নে স্বকুমারকে রত্নবতী দান করিলেন। নগর উৎসবময়, রাজবাটী মঙ্গলময়, এবং রাজপথ আনন্দধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

এদিকে বাসরগৃহে মহিলাগণ বরের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কেহ গবাক্ষদ্বারে বদনার্ণব করিয়া, কেহ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া, কেহ বা অগ্রগামিনী হইয়া শ্রেণীবদ্ধ বাসন্তীতরুর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। এদিকে সন্ন্যাসী অমাত্যকে কহিলেন, মন্ত্রী ! মহারাজকে বল, আমি অণু রাজপুত্রের সহিত বাসরগৃহে যামিনী যাপন করিব। মন্ত্রী এই কথা রাজাকে বলিবামাত্র রাজা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। মন্ত্রী স্বকুমারের সহিত সন্ন্যাসীকে বাসরে লইয়া গেলেন। রাজকুমার সন্ন্যাসীকে নিকটে দেখিয়া লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন। পূর্বাধি যে যে ঘটনা হইয়াছিল, সেইসকল বিপদের কথা তখন স্মৃতিপথাক্রম হওয়াতে বন্ধুবিচ্ছেদে মন আবুল হইল। এই অবসরে সন্ন্যাসী নিজরূপ ধারণ করিয়া ঈষৎ হাস্যবদনে স্বকুমারকে কহিলেন, বয়স্ত ! চিনিতে পাব ? এখন বল দেখি, ধন বড় কি বিজা বড় ? যুবরাজের শরীর লোমাক্ষিত হইল। বিষ্ময়ান্বিত হইয়া দেখিলেন, সেই আশৈশব-পরিচি-বন্ধু স্তম্ভ সম্মুখে উপস্থিত। তৎক্ষণাৎ তিনি হর্ষবিধাদে পরিপূর্ণ হইয়া সাত্ত্বনয়নে বন্ধুকে আলিঙ্গনপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। আনন্দে তাহার মন এতনি বিহ্বল হইয়াছিল যে, পুনঃ পুনঃ বন্ধু বন্ধু শব্দ উচ্চারণ করিয়া চিত্রপুস্তলিকার ন্যায় অনিমিষলোচনে বন্ধুর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। দৃষ্টি আর ফিরিল না। উভয়ের চিত্তে জনমিতরঙ্গের ন্যায় প্রশয়হিল্লোল বহিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে লাগের যেমন বায়ুপ্রতিঘাতে বেলাকে আঘাত করে, সেইরূপ তাহাদিগের দুঃখজ্বলধি চিন্তাবায়ুর প্রতিঘাতে স্ফীত হইয়া ক্ষণেকে আঘাত করিতে লাগিল।

কণ্ঠাজামাতা বাসরগৃহে কুরুপ প্রেমালাপ করে, পুরবাসিনীগণ সচরাচর তাহা দেখিতে অভিলাষিণী হন, তাহাতে আগর বাসরগৃহে সন্ন্যাসী আছে, এই আশ্চর্য ঘটনা দেখিবার জন্ত তাঁহাদের কোতুহল আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। যাহারা গবাক্ষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহারা গৃহমধ্যে হঠাৎ সন্ন্যাসীর রূপপরিবর্তন, জামাতার সহিত আলিঙ্গন, জামাতার ক্রন্দন এবং পরস্পরের স্নেহ-সস্তাষণ দর্শন করিয়া

বিশ্বয়াকুল মনে ক্রতপদে রানীকে সংবাদ দিলেন। রানী সেই দ্ব্যাপার দর্শনের অপেক্ষা না রাখিয়াই শয়নগৃহে গিয়া রাজাকে কহিলেন, মহারাজ ! এই অদ্ভুত বার্তা শ্রবণ করুন। সম্রাসীকে বাসরগৃহে রাখিয়াছেন বলিয়া কণ্ঠাগণ কেহই তথ্য যান নাই। জামাতা, রত্নবতী, আর সেই সম্রাসী তিনজনেই বাসরে আছেন, ইতিমধ্যে সম্রাসী যুবাক্রপ ধারণ করিয়াছেন। জামাতা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। রাজা এই আশ্চর্য্য ও অবিশ্বাস্য বাক্য শ্রবণে অতি ব্যস্ত হইয়া বাসরগৃহাভিমুখে চলিলেন। ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া দেখিলেন, সম্রাসী নাই, একটি দিবা পুরুষের সহিত জামাতার কথোপকথন হইতেছে, রত্নবতী পার্শ্বে বসিয়া আছেন। রাজা রত্নবতীকে দ্বার খুলিতে বলিলেন। বাজার স্বব শুনিয়া স্ককুমার আপনিত দ্বার খুলিয়া দিলেন। রাজা গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াই, “সম্রাসী কোথায় ? এই সুপুরুষ যুবাপুরুষ কে ?” এই প্রশ্ন করিলেন। স্তমস্ত নতশিরে উত্তর কবিলেন, মহারাজ ! আমিই সেই সম্রাসী। রাজা ইহা শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হইলেন। কহিলেন, এই আশ্চর্য্য ঘটনার আশোপাস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে অত্যন্ত কৌতুহল জন্মিতেছে ! স্তমস্ত প্রথমে তাহাঙ্গিরের বাল্যসখ্য, উভয় বন্ধুতে তর্ক, মীমাংসার্থ দেশভ্রমণে বহির্গমন এবং কপিক্রপী তপস্বীর সহিত সাক্ষাৎ ও বরপ্রাপ্তি অবধি পরস্পর বিচ্ছেদ ও রত্নপুরে আগমন, পরিশেষে এই বিবাহ পর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। রাজা অভিনিবেশপূর্ব্বক এতদ্বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া স্তমস্তের বিজ্ঞা-বুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। কহিলেন, বৎস স্তমস্ত ! তুমি বলিয়াছিলে ধনাপেক্ষা বিজ্ঞা শ্রেষ্ঠ, তাহা যথার্থ, তোমরাই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইলে। এইরূপ নানা কথাপ্রসঙ্গে কিয়ৎক্ষণ তথ্য থাকিয়া রাজা শয়নগৃহে গমন করিলেন। বজ্রনৌ প্রভাত হইলে রাজা সভাসীন হইয়া আপন মন্ত্রিকণ্ঠার সহিত স্তমস্তের পরিণয়-সম্বন্ধ স্থির করিলেন। শুভদিনে শুভক্ষণে বিবাহ হইল। স্ককুমার ও স্তমস্ত কিছুদিন খণ্ডরালয়ে বাস কবিয়া সস্ত্রীক স্বদেশে গমন করিলেন।

গোয়াই ঘিঞ অথবা গৌরী-সেতু

ত্রৈতাযুগে সীতানাথ সীতা উদ্ধাবিতে ।
বেঁধেছিল সিঙ্কুসেতু বানর সহিতে ॥
নল নীল হনুমান জাম্ববান আদি ।
সমতুল কপিকুল নাহি অন্তবাদী ॥
প্রাণপণে সযতনে সবে করি বল ।
বাঁধিল দুবস্তু সিঙ্কু মরি কি কোশল ॥
ধন্য ধন্য ধন্য বীর ধন্য রঘুমনি ।
সেতু বেঁধে উদ্ধারিলে আপন বমণী ॥
সেতুবন্ধ রামেশ্বর মহা তীর্থস্থান ।
কতই হয়েছে মরি তাহার সম্মান ॥
এবে কলিকালে দেখ কলি মহারাজ ।
সাজায় ভারত-মায়ে মনোমত সাজ ॥
এমন নিষ্ঠুর রাজা দেখি না কোথায় ।
লৌহহার পরাইছে মায়ের গলায় ॥
ওদিকে হয়েছে সারা পশ্চিম প্রদেশ ।
বাকি ছিল তাও হল বাঙ্গালার দেশ ॥
ধিক তোরে কলিরাজা বলিব কি আব ।
বুঝা মার গলে দেও লৌহময় হার ॥
বাঙ্গালী হবে না এত নিষ্ঠুর হৃদয় ।
তাই ভেবে রাঙ্গামুখ কবেছ আশ্রয় ॥
রাঙ্গামুখ কটা চ'ক বড় বুদ্ধিমান ।
কৌশলে মায়ের গলে মালা করে দান ॥
কলিকাতা ঢাকা আর কেন ফাক রয় ।
দেও হার গলে তুলি কলিরাজ কয় ॥

অমনি মাজিল বীর কত শত শত ।
 জগতী হইতে সবে হইল নির্গত ॥
 সে কালের মত বীর এরা কেহ নয় ।
 অসি চক্ষু বর্ষ আদি কিছু নাহি লয় ॥
 দড়া দড়ি খুট খস্তা এদের সম্বল ।
 ধন্য ধন্য রাঙ্গামুখ ধন্য বুদ্ধিবল ॥

বাঙ্গাল কাঙ্গাল বড় কিছু দড় নয় ।
 ধবল মুখের বোলে কম্পিত হৃদয় ॥
 ছিলাম জঙ্গলে সবে বাঙ্গাল দেশেতে ।
 কটা চ'কে তোষি কত প্রাণের ভয়েতে ॥
 ঘরবাড়ী ভেঙ্গেচুরে করে ছারখার ।
 তবু বলি রক্ষা কর ধর্ম-অবতার ॥
 দেখিতে দেখিতে গৌরীতটে উপনীত ।
 ছজুর মজুর লয়ে বড়ই দুঃখিত ॥
 বেগবতী শ্রোতস্বতী গৌরী ভয়ঙ্করী ।
 দেখে ভেবে ভয়াকুল উপায় কি করি ॥
 এর পারে লৌহহার কেমনে লইব ।
 কেমনে লজ্জিব এরে কেমনে ঘাইব ॥
 সকলেই এই ভেবে হইল অস্থির ।
 বাধিব গৌরীতে সেতু শেষে করি স্থির ॥
 সেতু বেঁধে পার হব পারে লব হার ।
 দেখিব গৌরীর গর্ভ দেখিব এবার ॥
 দলে দলে স্নেতকায় জুটিল আসিয়া ।
 কেমনে বাধিবে গৌরী ভাবিছে বসিয়া ॥
 পরামর্শ হল শেষ অশেষপ্রকার ।
 বাধিব বাধিব সেতু বাধিব এবার ॥

দলের প্রধান যিনি বসি উচ্চাসনে ।
 করিলেন আজ্ঞা সবে মধুর বচনে ॥
 গৌরীর পশ্চিম তটে কিছু ভয় নাই ।
 চারিদিকে ঘিরে আছি আমরা সবাই ॥
 স্তনিয়মে সব কার্য্য সমাধা হইবে ।
 অল্প সংখ্যা লোক মাত্র এপারে থাকিবে ॥
 পূর্ব পায়ে আমাদের থাকিবে সকল ।
 ধন্য ধন্য বাক্সামুখ ধন্য বুদ্ধিবল ॥

পূর্বপারে আমাদের কোন মিত্র নাই ।
 সতর্কে থাকিতে হবে একত্রে সবাই ॥
 আমরা বিদেশী এসে ঘিবিগাছি দেশ ।
 কাজেই হইবে মনে তাহাদের ঘেঘ ॥
 ঢাকাই বাক্সাল দল আমাদের দলে ।
 আসিয়া মিলিছে তারা ফল পাবে ব'লে ॥
 কিন্তু তারা এদেশেব কিছুই জানে না ।
 এদেশে তাদের কথা কেহই বোঝে না ॥
 ছলে হ'ক বলে হ'ক কৌশল কবিয়া ।
 দিতে হবে দেশী লোক দলে মিশাইয়া ॥
 শুধু চাষা নিলে কিছু উপকাব নাই ।
 সব দল হতে কিছু কিছু লওয়া চাই ॥
 চাষাদের কুলি ব'লে কর সম্ভাষণ ।
 তাতেই সমুদয় হবে তাহাদের মন ॥
 শাদা বস্ত্র জুতা পায় যাদের দেখিবে ।
 বাবু বলে সম্ভাদব তাদের করিবে ॥
 হিন্দুস্থানী মারয়ারী থোটা বুনগণ ।
 বাছিয়ে লইবে সংখ্যা করিয়ে গণন ॥
 এসকলে কোন কালে হবে না প্রশয় ।
 আমরা করিব তাহা যাহা মনে লয় ॥

হবে না হবে না ঐক্য, এ দল ও দল ।
ধন্য ধন্য রাজ্জামুখ ধন্য বুদ্ধিবল ॥

অর্থের অসাধ্য কিছু নাই এ মহীতে ।
উপস্থিত হল সব দেখিতে দেখিতে ॥
কাব্যকর্তা হইলেন লেসলী প্রধান ।
ইহার বুদ্ধিতে সেতু হইবে নিশ্চয় ॥
বেনিডিক্ট এসিষ্টেন্ট হইল তাঁহার ।
নিকলসন আস্ কেরি গুণের আধার ॥
রাজ্জা কাল শাদা মুখ সাহেব-তনয় ।
ঝাঁকে ঝাঁকে পালে পালে উপস্থিত হয় ॥
বাধিতে গৌরীর সেতু হবষিত মন ।
শাদা বস্ত্র জুতা ধাবী জোটে অগণন ॥
বাপের তাড়ান কত মাযের খেদান ।
জোটা মাত্র পদ পেয়ে বাড়িল সম্মান ॥
রাম কৃষ্ণ, যত্ন যাহু, প্রসন্ন রাখাল ।
নসী, শশী, নন্দ, চন্দ্র, গোবিন্দ, গোপাল ॥
সূর্য্য, শীল, আইজদৌ, মহেন্দ্র, মহেশ ।
গুপ্তবাবু জিতেল্লিয় গুণেতে অশেষ ॥
আর কত বাবুগণ কে পারে গণিতে ।
কতজন সাজে বঙ্গে কে পারে বর্ণিতে ॥
নানা রঙ্গে বাজিরাজি সাজায় বিস্তর ।
মহিষ বলদ মেঘ কুবুর শূকর ॥
সংগ্রহ করিছে কত নানামত ফল ।
ধন্য ধন্য রাজ্জামুখ ধন্য বুদ্ধিবল ॥
দাঁড়াইল গৌরীতীবে সারি সারি সবে ।
দেখি চমকিত লোক এরা কারা হবে ॥
গৌরী পার হবে ব'লে সাজিল সকল ।
বাজিল বাশির বাজু ইঞ্জিনারী কল ॥
ষ্টীমার পল্টন জোড়া বোট ডিঙি ।

ফ্লেট ঢাকাই বোট বড়লাল ডিঙি ॥
 আসিল এপারে সবে করিবারে পার ।
 দেখি হরষিত-চিত মনি কি বহিার ॥
 সকলেই পাবে যাবে বলে দাঁড়াইল ।
 হামি হামি কর্তা আমি কহিতে নাগিল ॥
 ক্রমে পাব হও সবে হয়ো না অস্তিৰ ।
 হয় নাই এ পারের কোন কার্য স্থির ॥
 কে থাকিবে কাষাকর্তা, কুলি কতজন ।
 কে কবিবে বার্তাবহকাষ্য সংঘটন ॥
 জীবামে রাখিয়া যাই কাষাভার দিয়া ।
 বার্তাবহ কর্তা দেই সূর্য্যকে করিয়া ॥
 সূর্য্য যদি বার্তাবহকর্তা হয়ে বয় ।
 স্তনিয়ে সব কাষ্য হইবে নিশ্চয় ॥
 অপর এপারে থেকে না পাইবে দিশে ।
 থাক সূর্য্য এই পারে মনেব হরিষে ॥
 এত বলি সবে মিলি তবী আরোহিল ।
 বদর বলিয়া মাঝি তরণী খুলিল ॥
 ঈমারে ধপ ধপ করিতেছে কল ।
 বোটে দাঁড় মারে দাঁড়ী করে কত বল ॥
 দরিয়া গাঙ্গি বলে কেহ ছাড়িয়া তরণী ।
 পড়িছে ছিড়িয়ে দাঁড় উঠিছে অমনি ॥
 ওপারে চলিয়া যায় দেখিতে দেখিতে ।
 গৌরী পার হলো সবে হাসিতে হাসিতে ॥
 ভীষণ তরঙ্গ গৌরী করে কল কল ।
 ধন্য ধন্য রাজ্জামুখ ধন্য বুদ্ধিবল ॥
 উঠিল কাসীমপুরে একত্রে সকলে ।
 নিরুপিত স্থানে স্থানে সব যায় চ'লে ॥
 কাসীমপুরেতে কেহ, কেহ বা কয়্যায় ।
 রহিলেন বাসা করি ষথায় তথায় ॥

কোন বাবু বিবি আনি রাখিলেন ঘিরে ।
 কেহ মাঠে কেহ গ্রামে কেহ গৌরীতীরে ॥
 শত শত বারনারী আসিয়া জুটিল ।
 কেহ নিজে ঘরে কেহ বাসায় রহিল ॥
 সাহেবের বিবি সব গাউন পরিয়া ।
 সকালে বিকালে মাঠে বেড়ায় খুরিয়া ॥
 'বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী' কটা কটা কেশ ।
 মুখে গন্ধ, সব মন্দ স্নিগ্ধ ভাল বেশ ॥
 কেবা বা কার ভালবাসা, কেবা কার নারী ॥
 অঙ্গভঙ্গ রঙ্গ দেখে চিনিবারে নারি ॥
 সকলেই করে কর, করিছে দলন ।
 সকলেই মুখে মুখ, করিছে চুষন ॥
 দেখিয়া অবাক মোরা, বাঁচি না লজ্জায় ।
 কেবা কার চেনা ভার, এত বড় দায় ॥
 এ দেখে এ দেশে নারী-স্বাধীনতা কাজে ।
 মত দিতে বিধিমতে হৃদে শেল বাজে ॥
 স্বরেশ্বরী ধাতেশ্বরী বোতল সহায় ।
 উপস্থিত হইলেন আসিয়া কয়ায় ॥
 গলবস্ত্রে কত বাবু কবে জোড় কর ।
 কত মতে করিতেছে মায়ের আদর ॥
 বারান্ধনাগণ সবে প্রাঙ্গণে আসিয়া ।
 কহিছে কাতরে কত মিনতি করিয়া ॥
 থাক মা এপারে থাক স্রার ঈশ্বরী ।
 সেবির তোমারে মোরা, ওমা ধাতেশ্বরী ॥
 সাহেবেরা করিবে না তোমার আদর,
 ক্ষতি নাই তাতে দুখ, করো না অন্তর ॥
 আমরা করিব সেবা, তোমার চরণ ।
 গটুহেল ক'রে দিব, রাক্ষা মুখগণ ॥

আসিতে দিওনা কাছে, সাহেবের দল ।
ধন্য ধন্য রাজামুখ ধন্য বুদ্ধিবল ॥

শিকলে আঁটিয়া কল দোলাইল কত ।
রথ কল টানা কল, কল নানা মত ॥
জল তোলা, মাটি কাটা, কাদা করা কল ।
কত কল পল্টুনেতে, মরি কি কৌশল ॥

স্বত্বধর বুন কুলি, খাটে অগণন ।
প্রাণপণে খাটে কত দেশী বাবুগণ ॥
শিকলে আঁটিয়া কত বড় বড় চঙ্গ ।
পুঁতেছে গৌরীর গর্ভে ক'রে নানা রঙ্গ ॥
ধপ ধপ করে ওঠে, এঞ্জিনের ধুম ।
পল্টুনে গৌরীর গর্ভে লেগে গেল ধুম ॥
গৌরীজল কলে ওঠে এত বল ক'রে ।
দু দিন শুকায় গৌরী যেন যাবে ম'রে ॥
ছলে বলে স্বকৌশলে গৌরীর বৃকেতে ।
ক্রমে লৌহস্তম্ভ সব লাগিল পুঁতিতে ॥
পাথর ফেলিল কত গৌরীর জীবনে ।
মারিবে জীবনে গৌরী আশা আছে মনে ॥
তরঙ্গের রঙ্গ আর দেখা নাহি যায় ।
কেবল কান্দিছে গৌরী ক'রে হায় হায় ॥
এদিকে খালাসী দল আল্লা আল্লা ব'লে ।
পুঁতিছে লোহার থাম জঁতা কলে বলে ॥
হা ইলেছা ব'লে সবে টানিতেছে কল ।
ধন্য ধন্য রাজামুখ ধন্য বুদ্ধিবল ।

কারো কারো বাসায় নিশিতে বড় রং ।
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ দেয় সং ॥
সাহেব মাতিছে মদে বিড়ালাক্ষী নিয়ে ।
পড়িছে বিবিধ গায় চলিয়ে চলিয়ে ॥

মাতামাতি লাফালাফি কত গীত গায় ।
 তালে তালে নাচিতেছে শাখামুগ প্রায় ॥
 সেরী চেরী ত্রাণ্ডি ধরা মেজের উপরে ।
 মেজের আলোয় আবো বড় শোভা করে ॥
 যার যাহা হচ্ছা তাহা কবিতেছে পান ।
 দারা রারা সুরে কেহ কবিতেছে গান ॥
 কোন বিবি সুরা ঢালি গেলাসেতে করি ।
 দিতেছে সাহেব-মুখে আ মবি আ মরি ॥
 বিড়ানাক্ষী শাদামুখী ধবল বসন ।
 বাতিব আলোতে আরো উজ্জ্বল বরন ॥
 বুক উচ্চ কুচ গিরি অর্দ্ধ আবরণ ।
 কে বলিবে আছে তাব উপরে বসন ॥
 শান্তিপুর্বে ডুরে পবা আমাদেব মেয়ে ।
 শতগুণে ভাল তাবা বিবিদেব চেয়ে ॥
 ওদিকে কতক বাবু ব'সে নানা দলে ।
 কেহ ব'সে গীত গায় কেহ পড়ে ট'লে ॥
 ধাতেশ্বরী ভাজা চাল, ভাজা ছোলা নিয়ে ।
 এ উহাব গালে দেয় আমোদে মাতিয়ে ॥
 দিশী মদ দিশী বাবু দিশী বিবিগণ ।
 সাদা জলে রাঙ্গা চ'ক সাদা করি মন ॥
 তবলার বোলে মন উঠিছে ফুলিয়া ।
 নাচিছে কামিনীকব আদরে ধরিয়া ॥
 উন্নত হইয়া কেহ বাবনারীসনে ।
 কি আশে বিদেশে আসা নাহি ভাবে মনে ॥
 কোন বাবু শিরে পাগ ঠাধিয়া তথায় ।
 চামর লইয়া হাতে রামায়ণ গায় ॥
 ধিক ধিক নাচ আর কেদারার বোল ।
 গাঁজাখুরি গানে আরো বাড়িতেছে গোল ॥

বেড়াইতেছে বারনারী বাজাইয়া মল ।
 ধন্য ধন্য রাজামুখ ধন্য বুদ্ধিবল ॥
 প্রভাতে বাঞ্ছিল বাঁশি কামারশালায় ।
 যার যার যেই কাজ সেই কাজে যায় ॥
 ক'রশালে কি কৌশল করিয়াছে কলে ।
 সব কল চলিতেছে এঞ্জিনেব বলে ॥
 এঞ্জিনে ঘুবিছে চাকা চক্ষের পলকে ।
 ধাঁদা নেগে যায় চক্ষে অগ্নির ঝলকে ॥
 কত কল কত চাকা ঘোরে অনিবার ।
 কেবল এঞ্জিন সব কল মূলাধার ॥
 চিবিতেছে বাহাহুরি কাঠ শত শত ।
 লোহাতে চিরিছে লোহা কত আর কত ॥
 স্তরকি হইছে ইটে সিন্দূবের প্রায় ।
 যার যাহা ইচ্ছা করে এঞ্জিন প্রভায় ॥
 ওদিকে রথের কলে শিকল ঝাটিয়া ।
 বড় বড় চোঙ্গ আনে অনাসে টানিয়া ॥
 তিনশত লোকে যাহা টানিলে না চলে ।
 ছয়জন টানি লয় কলের কৌশলে ॥
 কত বল ধরে কল কৌশল এমন ।
 শত মণ লোহা লয়ে যায় দুইজন ।
 থাম পৌতা হলো শেষ বিশেষ যতনে ।
 টানিহে গার্ডার সবে হরষিত মনে ॥
 এখন ভাবনা নাই থাম পুঁতিয়াছি ।
 বাঙ্কিব বাঙ্কিব সেতু ভরসা পেয়েছি ॥
 গার্ডার টানিতে কত আহত হইল ।
 অর্থলোভে কত চাষা প্রাণ হারাইল ॥
 ঘুরিছে উপরে কল শিকল লইয়া ।
 হঠাৎ ছুটিল হাত, মরিল পড়িয়া ॥
 মাথা ভেঙ্গে ঘাড় ভেঙ্গে পড়ে কত জন ।
 হস্ত পদ ভাঙ্গা কত কে করে গণন ॥

হস্ত পদ ভাঙ্গিতেছে পড়িতেছে পায় ।
 তবু জোর করি লয় ডাক্তারখানায় ॥
 নেটিভ ডাক্তার তারা প্রসন্ন এয়ার ।
 এয়ার সিবিল বটে সাহেব এয়ার ॥
 হস্ত পদ ভাঙ্গা পেলে কেটে ফেলে তায় ।
 আর্ডনাতে কান্দে সবে করে হায় হায় ॥
 গার্ডার টানিতে সবে হইল কাতর ।
 দিবস-রজনী কাজ করে নিরন্তর ॥
 লোরী কলে ঠেলিতেছে—ধন্য রে কৌশল ।
 ধন্য ধন্য রাঙ্গামুখ ধন্য বুদ্ধিবল ॥
 গার্ডার লাগান শেষ হইল যখন !
 আনন্দে মাতিল সব কর্মচারিগণ ॥
 শ্বেত পীত লাল নীল পতাকা বিস্তর ।
 বাক্সিয়া গার্ডার শিরে সাজায় তৎপর ॥
 অগণন জনগণ দাঁড়ায় ঢুকূলে ।
 সেতু বান্ধা হলো শেষ দেখে কুতূহলে ॥
 তরী আরোহিয়া কত শ্বেতকায়গণ ।
 আসিছে গৌরীর সেতু করিতে দর্শন ॥
 দিনমনি অস্ত যায় পশ্চিম অচলে ।
 দেখিয়া চলিছে কল আর বলে বলে ॥
 গার্ডার লাগান সাবা হইল যখন ।
 আনন্দমাগরে মন ভাসিল তখন ॥
 করতালি কোলাকুলি হবে ছরে বোল ।
 তিন ঘণ্টা হলো তবু নাহি গেল গোল ॥
 মশাল করিয়া হাতে নাচিতে লাগিল ।
 হরষে সরস প্রাণ আবুল হইল ॥
 কেহ বোটে কেহ তীরে কেহ বা নৌকায় ।
 করিতেছে লাফালাফি যত শ্বেতকায় ॥

এতদিনে হলো আজ শ্রমের সফল ।

ধন্য ধন্য রাঙ্গাগুথ ধন্য বুদ্ধিবল ॥

সেতু বেঁধে লৌহ-হার লয়ে গেল পারে ।

ধন্য রে বিলাতী বুদ্ধি ধন্য বে সবারে ॥

পূর্বপাবে লৌহ-হার গেল কত দূর ।

রথে চড়ি দেখিবেন মেয়ো বাহাদুর ॥

এ রথ সে রথ নয় মনোরথ-গতি ।

আসিবেন বাস্পরথে চড়ি মহামতি ॥

সমস্ত ভারতভার শিরে আছে যার ।

সহিবে গৌরীর সেতু আজি তাঁর ভার ॥

লেসলীর কারিকুরি আজি জানা যাবে ।

যদি সেতু ঠিক রয় পুরস্কার পাবে ॥

আমপাতা বাঁশপাতা গাঁদাফুল দিয়া ।

রাখিল মনের মত সেতু সাজাইয়া ॥

দুব দুব করিতেছে লেসলী-হৃদয় ।

না জানি আমার ভাগ্যে আজি কিবা হয় ॥

শারীরিক মানসিক পরিশ্রম যত ।

বুঝি আজ ভাগ্যদোষে সব হয় হত ॥

কত অর্থ ব্যয় হলো আমাব কথায় ।

যদি সেতু নাহি রয় কি হবে উপায় ॥

লোকের গঞ্জন প্রাণে সহিবে কেমনে ।

জীবন তাজিবে আজি গৌরীর জীবনে ॥

লর্ড মেয়ো বাহাদুর গুণের আধার ।

দেখিবেন গৌরী-সেতু সবে চমৎকার ॥

সেতু উপলক্ষ করি হবে আগমন ।

কাসিমপুরেতে তাঁর হবে পদার্পণ ॥

কাশীতুল্য মান্য হবে কাসিমপুরের ।

নবতীর্থস্থান হবে কুল উদ্ধারের ॥

দর্শনে পাইবে ফল মোক্ষফল সবে ।
 এ তীর্থে ধর্মের ভেদ কিছু নাহি রবে ॥
 সকল ধর্মেতে হবে সম অধিকার ।
 দেখা মাত্র শত কুল হইবে উদ্ধার ॥
 লর্ড মেয়ো বাহাদুরে দেখিবার তরে ।
 গৌরীর দু-তীরে লোক কোলাহল করে ॥
 কেহ বলে ঐ দেখো দেখা যায় ধূম ।
 আসিছে কলেব গাড়ী ক'রে কত ধূম ॥
 দেখিতে দেখিতে রথ নক্ষত্র-সমান ।
 ধূম ছাড়ি হুডহুড়ি করিল প্রস্থান ॥
 চক্ষের পলকে সেতু হয়ে গেল পার ।
 দেখে চমকিত লোক সন্তোষ অপার ॥
 খামিল রথের গতি সেতু পার হয়ে ।
 দেখিল ওপাব-বাসী নিকটেতে বয়ে ॥
 মহামান্য গণনীয় মহোদয়গণ ।
 লর্ড মেয়ো বাহাদুর অতি বিচক্ষণ ॥
 নামিলেন রথ হতে লয়ে দল বল ।
 ধন্য ধন্য রাঙ্গামুখ ধন্য বুদ্ধিবল ॥
 যমুনা পদ্মার সনে মিলেছে যথায় ।
 হার লয়ে সবে ব'সে ভাবিছে তথায় ॥
 ঢাকায় হলো না যাওয়া, হলো না এবার ।
 সাধ্য নাই পদ্মা-পারে লয়ে যাইবার ॥
 কিছু দিন এই স্থানে থাকিতে হইল ।
 সম্মুখে আসিয়া পদ্মা বড় বাধা দিল ॥
 এদিকে গৌরীর সেতু করি দরশন ।
 লর্ড মেয়ো করিলেন রথে আরোহণ ॥
 হুইল ঘুরিল জোরে বাঁশরী বাজিল ।
 হুস্ হুস্ করি কল চলিতে লাগিল ॥

গৌরী-সেতু হলো শেষ বিশেষ জানিয়া ।
 হরষে সকলে যায় আবাসে চলিয়া ॥
 ঢাকায় চলিয়া গেল ঢাকাই বাঙ্গাল ।
 শিলটে শিলটী যায় বাঁধিয়া জাঙ্গাল ॥
 বাবুগণ বিবি লয়ে হইলেন পার ।
 সঙ্গে করি লইলেন যার যার তার ॥
 ক্রমে ক্রমে সব গেল কিছু রহিল না ।
 দুদিনে ভাঙ্গিল ঘর কিছু থাকিল না ॥
 কেবল রহিল হজ্জ সেতুর রক্ষক ।
 রক্ষক বলিছে কিন্তু নামেতে দর্শক ॥
 অকস্মাৎ একদিন সেতু-দরশনে ।
 গিয়ে প্রাণ গেল তার গৌরীর জীবনে ॥
 সেতু' পরি চড়ি জল মাপিছে যখন ।
 অমনি গৌরীর গর্ভে হইল পতন ॥
 আর কি উঠিতে পারে গৌরী-গর্ভ হতে ।
 হজের হরিল প্রাণ দেখিতে দেখিতে ॥
 কান্দিছে হজের মেম করি হায় হায় ।
 সেম্ সেম্ ও গোরাই যাব রে কোথায় ॥
 হায় কটি ছেলেমেয়ে অপোগণ্ড দল ।
 কোথা যাবে কি থাইবে ও গোরাই বল্ ॥
 হজ্জ মল হেজ্জ এলো কিছুদিন তরে ।
 অঙ্গনা লইয়ে সঙ্গে কত মজা করে ॥
 হইল না চির-সুখী তাহার কপাল ।
 ইয়ং হইল কর্তা নন্দের গোপাল ॥
 ধন্য রে লেসলী তোর ধন্য বুদ্ধিবল ।
 বাঁধিলে গৌরীতে সেতু ধন্য রে কৌশল ॥

জমীদার-দৰ্পণ

নাট্যকাক্স ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

হায়ওয়ান আলী	—	জমীদার
সিৰাজ আলী	—	জমীদাৰেব জোষ্ঠভ্ৰাতা
আবু মোল্লা	—	অধীন প্রজা
জামাল প্রভৃতি	—	জমীদাৰেব চাকর
		সাক্ষীদ্বয়
আবজান ব্যাপারী	—	জুৰি

নট, স্ত্রধাৰ, মোসাৰেব চাৰিজন, জজ, মাজিস্ট্ৰেট, ব্যাৰিস্টাৰ, ডাক্তাৰ সাৰেব,

ইনস্পেক্টৰ, কোর্ট-সাব-ইনস্পেক্টৰ, উকিল, মোক্তাৰ, পেশকাৰ,

কনস্টেবল, চাষা, আবদালী, দৰ্শকগণ ইত্যাদি ।

স্ত্ৰীগণ

নূৰ্জ্বেহাৰ	—	আবু মোল্লাৰ স্ত্ৰী
আমিৰণ	—	আবু মোল্লাৰ ভগ্নী
কুম্ভমণি		
নটী		

প্রস্তাবনা

(সূত্রধারের প্রবেশ)

সূত্র—(পদচারণ করিতে করিতে)

হা ধর্ম ! তোমার ধর্ম লুকালো ভারতে ;
 জমীদার-অত্যাচারে ডুবিল কলঙ্কে !
 পাতকীর কণ্ঠদোষে হলে পাপভাগী,
 পাপীরা ধনের মদে না মানে তোমায়
 না মানে যেমন বাঁধ স্রে তস্থতী নদী,
 দ্রুতবেগে চলে যায়, ভাসিয়া ঢুকল ।
 রাজ-প্রতিনিধিরূপী মধ্যবর্তী সম,
 জমিদার ! রাজরূপে পালক প্রজার
 সর্ব্বনর-ধনপ্রাণমান-রক্ষাকাবী ।
 সেই হেতু রাজবিধি দিয়াছে পদবী !
 ববি যথা নিজ রশ্মি বিতরি শশীবে
 কবেন শীতল কবে ভুবন শীতল,
 সে পদবী হীন পদে শোষিছে মেদিনী,
 শোষে যথা চৈত্র মাসে খর প্রভাকর
 নদনদী জলাশয় খরতর কবে ।
 কি কুদিনে আজি আমি প্রবেশি এ দেশে,
 স্মরিয়া বিদরে বুক নিকলে নিশ্বাসে—
 ঘন শ্বাসে দহে প্রাণ জলন্ত আগুন,
 তুহানলে জ্বলে তথা ঢাকা হতাশন—
 ধিক্ ধিক্ গুমে গুমে না হয় প্রকাশ—
 সেইরূপ দহিতেছে আমার অন্তর ।

[নটের প্রবেশ]

নট—একা একা পাগলের মত কি বলছেন ?

সূত্র—কেন ? অগ্নায় কি বলেছি, সত্য বলতে ভয় কি ?

নট—আমি সত্য অসত্যের কথা বলছি, ভয়ের কথাও বলছি, বলি কথাটা কি ?

সূত্র—কথা এমন কিছু নয়। কলিকালের প্রজারা মহা স্থখে আছে। কলিরাজও প্রজার সুখচিন্তায় সর্বদা ব্যস্ত; কিসে প্রজার হিত হবে, কিসে স্থখে থাকবে এরি সন্ধান করছেন। কিন্তু চক্ষের আড়ালে দুর্বলের প্রতি সবলেরা যে কত অত্যাচার, কত দৌরাস্ত্য করছে তাব খোঁজখবর নেই।

নট—কেন, এ আপনার নিতান্তই ভুল। রাজার নিকট সবল-দুর্বল, ছোট-বড়, ধনী-নিধন, সুখী-দুঃখী সকলি সমান! সকলি সম স্নেহের পাত্র। সকলের প্রতিই সমান দয়া। আজকাল আবার দীন-দুঃখীদের প্রতিই বেশ টান!

সূত্র—(ক্ষণকাল নিস্তব্ধ) আচ্ছা, মফস্বলে একরকম জানওয়ার আছে জানেন? তারা কেউ কেউ শহবেও বাস করে, শহরে কুকুর, কিন্তু মফস্বলে ঠাকুর! শহরে তাদের কেউ চেনে না, মফস্বলে দোহাই ফেবে। শহবে কেউ কেউ জানে যে, এ জানওয়ার বড় শাস্ত—বড় ধীব, বড় নম্র; হিংসা নাই, দ্বेष নাই, মনে দ্বিধা নাই, মাছ-মাংস ছোঁয় না। কিন্তু মফস্বলে শাল, কুকুর, শূকর, গরু পর্যন্ত পাব পায় না। বলব কি, জানওয়ারেবা আপন আপন বনে গিয়ে একেবারে বাঘ হয়ে বসে।

নট—কি কথাই বললেন, বাঘ বুঝি আব জানওয়ার নয়?

সূত্র—আপনি বুঝতে পারেন নাই। এ জানওয়ারদের চারখানা পাও নাই আর ল্যাজও নাই। এরা খাসা পোশাক পবে, দিকি সব চালের ভাত খায়। সাড়ে তিনহাত পুরু গদিতে বসে, খোসামোদে কুকুররাও গদির আশে-পাশে ল্যাজ গুড়িয়ে ঘিরে বসে থাকে। কিছুই অভাব নাই, যা মনে হচ্ছে তাই করছে। বিনা পরিশ্রমে স্বচ্ছন্দে মনেব স্থখে কাল কাটাচ্ছে। জানওয়ারেরা অপমানভয়ে নিজে কোন কাষাই করে না। ভগবান তাদের হাত-পা দিয়েছেন বটে, কিন্তু সে সকলই অকেজো। দিকি পা আছে অথচ হাঁটবার শক্তি নাই! দেখতে খাসা হাত কিন্তু খাণ্ডসামগ্রী হাতে করে মুখে তুলতেও কষ্ট হয়! কি করে? আহাবের সামগ্রী প্রায় চাকরেই চিবিগে দেয়! এরা আবার দুই দল।

নট—দল আবার কেমন?

সূত্র—যেমন হিন্দু আর মুসলমান ।

নট—ঠিক বলেছেন । ঐ দলের এক জানওয়ার যে কি কুকাণ্ড করেছিল, সে কথা এখনও মনে হলে পিলে চমকে ওঠে—এখনও চক্ষে জল এসে পড়ে । উঃ, কি ভয়ানক !

সূত্র—এখন পথে এস । আমিও তাই বলছি ।

নট—যাক, ও সকল কথা বলে আর কাজ নাই, কি জানি—

সূত্র—কেন বলব না ? আপনি তো বলেছিলেন, যদি কোন দিন ভগবান দিন দেন, তবে মনেব কথা বলবো । আজ আমাদের সেই শুভ দিন হয়েছে !

নট—কি করে ?

সূত্র—একবার ওদিকে চেয়ে দেখুন না !

নট—(চতুর্দিকে দৃষ্টি করিয়া) তবে আমাদের আজ পবন ভাগা ।

সূত্র—আব বিলম্বে কাজ নাই । আমাদের চির-মনোসাধ আজ পূর্ণ করবো । যত কথা মনে আছে সকলি বলবো ! এমন দিন আর হবে না । কপালে যা থাকে জানওয়ারদের এক দলেব নকশা এই রঙ্গভূমিতে উপস্থিত কবতেই হবে !

নট—তাই তো ভাবছি, কোন্ নকশা অবিকল কে তুলেছে সেইটি ভাল করে বেছে নিতে হবে ।

সূত্র আপনি শুনে নাই ‘জমীদার-দর্পণ’ নাটক যে নকশাটি এঁকেছে, তার কিছুই সাজানো নয়, অবিকল তুলেছে ।

নট—তবে আব কথা নাই, আস্থন, তারই যোগাড় কবা যাক ।

[উভয়ের প্রস্থান]

[পুষ্পাঙ্কলে ধরিয়া নটীর প্রবেশ]

নট—বেশ, ইনি তো মন্দ নন । আমায় ডেকে আবার কোথায় গেলেন ? পুরুষের মন পাওয়া ভার । নারী-জাতকে ঠকাতে পারলে আর কসুর নেই । তা যাক, আমি আর খুঁজে বেড়াতে পারিনে । এই অবসরে মালা গেঁথে নেই ।

[উপবেশন এবং মালা গাঁথিতে গাঁথিতে সংগীত]

(রাগিণী মল্লার—তাল আড়া)

পাষণসমপ্রাণ পুরুষ নিদ্রয় অতি ।

মনে এক মুখে আর—ভিন্নভাব অন্তমতি ॥

কত কথার কত ছলে, রমণীরে কত ছলে,

হাসি হাসি কত কত কথা বলে, মজায় অবলা-জাতি ,

নিত্য নব রসে মন, বসে মন আকিঞ্চন,

দ্বিপদ ষট্ পদগুণ, কি হবে এদের গতি ॥

এই মালা নিয়ে আজ আমোদ করবো ।

[নটের প্রবেশ]

নট—প্রিয়ে ! সকলই তো বলেছি আর শুদিকেও সকল যোগাড় করে এলুম !

এখন আর বিলম্ব কি ; আর কথাই বা কি ?

নটী—না, আমার কোন কথা নাই । আপনি যা মানস করেছেন আমি কি আর তাতে কোন বাধা দেই ? দেখুন, আমি মনের সাধে এই মালাছড়াটি গেঁথেছি । এই হাতে ঐ গলে পরাব বলে ইচ্ছে হচ্ছে ।

নট—(সহাস্তে) একবার তো পরিয়েছ, আবার কেন ?

নটী—(মুহূ হাসে) এও এক স্তম্ভ !

নট—প্রিয়ে ! মালাতো পরালে, এখন আর একটি গান গাও ।

নটী—আর কি গান গাইব ? মনেব কথাই বলি, কিন্তু আপনি না বললে আমি বলবো না ।

নট—তাতে আর ক্ষতি কি ?

উভয়ের দঙ্গীত

[লক্ষ্মীয়ের স্বর—তালে কাওয়ালী]

মরি দুর্বল প্রজ্ঞার পরে অত্যাচার ।

কতজনে করে, করে জমীদার ॥

তারা জানে মনে, জমীদার বিনে

নাহি অত্বে কেহ দুঃখ শূনিবার ।

প্রজ্ঞা কত সহে, কিছু নাহি কহে:

মনে ভাবে এর নাহি উপায় আর ॥

জমীদার ধরে জরিমানা করে
মনোসাধ পুরে, নাশিছে প্রজার ।
শুন সভ্যজন, করিয়ে মনন
দেখাইব আঙ্কি অভিনয় তার ॥

[উভয়ের প্রস্থান]

পটাক্ষপণ

নেপথ্যে সংগীত

[রাগিণী খাষাজ—তাল কাওয়ালী]
ওরে প্রাণ মিলনসলিল কর দান
যায় যায় যায় প্রাণ, ওষ্ঠাগত হলো প্রাণ
বিনে প্রেমবারি পান ।
মনপ্রাণ সব সঁপেছি হেরে ও বয়ান
তবে কেন হেন জনে হান প্রিয়ে বিষবাণ ?

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কোশলপুর

(হায়ওয়ান আলীর বৈঠকখানা)

(হায়ওয়ান আলী ও প্রথম মোসাহেব আসীন)

হায়—দেখেছো ?

প্র মো—হুজুর দেখেছি ।

হায়—কেমন ?

প্র মো—সে কি আর বলতে হয়, অমন আর ছুটি নাই !

হায়—কিন্তু ভারী চালাক, কিছুতেই পড়ছে না !

প্র মো—(সহাস্তে) সে কি ? সামান্য জ্বীলোক কিছুতেই পড়ে না ।

হায়—তোমরা বোধ কর সামান্য, কিন্তু আমি বেড়িয়ে বেড়িয়ে দেখেছি, স্বভাব-

চরিত্র যতদূর জেনেছি, তাতে বোধহয় সেটি অসামান্য !

প্র মো—অন্য লোভ কিছু দেখিয়েছেন ?

হায়—টাকার লোভ দেখিয়েছি, কত গরনার লোভ দেখিয়েছি, কিছুতেই ভোলে না !

প্র মো—ওর স্বামীও তো এমন স্ত্রী পুঙ্খ নগ যে, তাতেই ভুলে বয়েছে ।

হায়—না, তাই বা কি করে ? আবু মোল্লা নব কাস্তিক ! বিধিবিধি নিকর দেখ !

চাষাব হাতে গোলাপ ফুল, এ কি প্রাণে সয় ? “হায় বিধি ! পাকা আম দাঁড়কাকে খায় !”

প্র মো—(ক্রোধে) কি আর বলবো । যদি আমার হাতে পড়তো তবে দেখতে পেতেন ! শুধু টাকাতেও হয় না, কথাতেও হয় না, পায়ে ধরেও হয় না ; হওয়ার আরও উপায় আছে ; একদিন—

হায়—আমি যে না বুঝি তা নয় । যে কাজ তা তো জানতেই পাচ্ছে। তাগ আবার যদি বলপূর্বক করা হয়, সে অবগু অগায় ! অথের লোভ দেখিয়ে কি অন্য কোন কৌশলে হলে সকল দিকই বজায় থাকে । আমি আজ মনে মনে যে কারিকুরি এঁকেছি, সেটা পরখ করে দেখে যদি না হয়, শেষে অন্য উপায়—

প্র মো—কি এঁকেছেন হজুর !

হায়—একটা ভান করে মোল্লাকে ধরে আনা যাক । এদিকে একটু নরম-গরম আদম্ব করে ওদিকে রুম্মনিকে পাঠিয়ে দেই । সে গিয়ে বলুক যে, তুমি আজ সন্ধ্যার পব একবাব বৈঠকখানায় গে’ দেখা কর, সব গোল চুকে যায় !

প্র মো—বেশ যুক্তি হয়েছে হজুর, বেশ যুক্তি হয়েছে । এখনই চাব-পাঁচজন সর্দার পাঠিয়ে মোল্লাকে ধরে আনা যাক, তা হলে আজ রাত্রেই—

হায়—আজ রাত্রেই ?

প্র মো—রাত্রেই—এখনি—

হায়—সেদিন তারে দেখেছি, সেদিন হতেই সেই জ্ঞান, সেই ধ্যান—যেন উন্নত ! (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) ওরে জামাল !

[সর্দারবেশ, জামালের প্রবেশ]

জাম—(সেলাম করিয়া দণ্ডায়মান) হজুর—

হায়—আর সকলে কোথায় ?

জামা—(ঘোড়হস্তে) সকলেই দেউড়িতে হজুর ।

হায়—পাঁচ আদমী যাও, আবুকো পাকড় লাও, আবি লাও ।

জামা—যো! হজুর ।

[সেলাম করিয়া প্রস্থান]

হায়—দেখা বাক ! ফাঁদ তো পাতলেম ; এখন কি হয় । যদি এতেও বিফল হয়, হবে যা মনে আছে তাই ! (মুদ্রস্থরে) সাবেক আমল হলে কোন দিন কাজ শেষ কবে দিতুম । তা কি বলবো । এখনকার আইন খারাপ ! মনের দুঃখ মনেই রয়ে গেল ; তা যদি এতেও না হয়, তবে—

প্র মো—বোধহয় এইবাবেই হবে । আর অন্য চেষ্টা করতে হবে না । এইবারেই হবে ।

হায়—কৈ তা হয় ? ক'মাস হলো কত চেষ্টা করিছি, কত হাটাহাটি করিছি, কৈ কিছুই তো হয় না । (দীর্ঘ নিঃশ্বাস)

প্র মো—অধঃপাতে গেছেন ! আপনাদের পূর্বপুরুষের মতন তেজ থাকলে এত দিন কবে হয়ে যেত !

হায়—ওহে, আমাদের তেজ না আছে এমন নয়, আমরা যে কিছু না করতে পারি তাও নয়, তবে সে এক কাল ছিল, এখন ইংবেজী আইন, বিবদাঁত ভাঙ্গা !

প্র মো—সে বোজও এদেশে নাই ।

হায়—এক বকম সত্য বটে, আগে আগে আমরা মফস্বলে কত কি করেছি, কার সাধ্য যে মাথা তুলে একটা কথা বলে ? এখন পায় পায় জেলা, পায় পায় মহকুমা, কোণের বউ পর্যন্ত আইন-আদালতের খবর রাখে, হাইকোর্টের চাপরাসীরাও ইকুয়িটি আর কমন-ল'র মারপাঁচ বোঝে ।

প্র মো—হজুর যে কন্দী এঁকেছেন, এতেই সব কাজ সিদ্ধ হবে এখন—

[নেপথ্যে আজ্ঞান দান, নামাজ পড়িবার পূর্বে কর্ণকুহরে অঙ্গুলী দিয়া উটচঃস্বর]

“আল্লাহ্ আকবর, আল্লাহ্ আকবর, আল্লাহ্ আকবর, আল্লাহ্ আকবর ।
আশ্‌হাদো আল্লা এলাহা ইল্লাল্লাহ্, আশ্‌হাদো আল্লা এলাহা ইল্লাল্লাহ্,
আশ্‌হাদো আমরা মোহাম্মাদ-র রাসুল্লাহ্ । আশ্‌হাদো আমরা মোহাম্মাদ-
র রাসুল্লাহ্ । হাইয়া আল্লাস সালাহ্, হাইয়া আল্লাস সালাহ্ । হাইয়া
আলাল ফালাহ্ । হাইয়া আল্লাল ফালাহ্ । আল্লাহ্ আকবর, আল্লাহ্
আকবর । লাএলাহা ইল্লাল্লাহ্ ।”

হায়—নামাজের সময় হয়েছে, চল নামাজ পড়ে আসি । ততক্ষণে হারামজাদাকে ধরে আনুক । (গাত্রোত্থান)

[উভয়ের প্রস্থান]

পটক্ষেপণ

নেপথ্যে গান

[রাগিণী সিন্ধু—তাল জং]

কুবাসনা যার মনে তার উপাসনা কি ?

মনে এক, মুখে শুধু হরি বলে ফল কি ?

মধুমাখা বোল মুখে, গরল রয়েছে বুক,

হেন ছদ্মবেশী তাব অধর্মেতে ভয় কি ?

সতীর সতীত্বধন হরিবাবে কব পণ,

মুখে বিভু-পদে মন, এদের, অন্তকালে হবে কি?

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

আবুমোল্লাহ বাহিব বাটীর ঘর

(সদ্ধারগণ-বেষ্টিত দণ্ডায়মান আবুমোল্লাহ)

আবু—(কাতরস্বরে পাট জড়াইতে জড়াইতে) আপনারা বসুন, চাদরখানা নিয়ে আসি ; মনিব ভেকেছেন, না গিয়ে কাঁচতে পারি ?

জামা—নেওয়াতী রাখ, তোর নেওয়াতী রাখ, মান রাখতে পারিস তো একটু দাঁড়াই । নৈলে চল (গলাধাক্কা)

আবু—(সক্রন্দনে) দোহাই আপনাদেব, চাদরখানা আনি । আমি কোমর-খোলাই দিচ্ছি । অপমান করো না ।

জামা—রাখ তোব চাদর, দিবি তো দে আগে দে ।

আবু—কিঞ্চিৎ কোমর-খোলাই দিচ্ছি ।

জামা—দিচ্ছি কি ? কটাকা দিবি ? আগে টাকা আন, তবে বসবো, তোর কথায় বসবো ? তেরা বাত্‌মে বায়ঠেগা ? চল (গলাধাক্কা)—

আবু—দিচ্ছি, এখনি দিচ্ছি ।

জামা—আন পাঁচজনার কোমর-খোলাই পাঁচ টাকা আন, বসছি । তা না দিস, ঘাড়ে হাত দিয়ে কান মলতে মলতে কাছারিমুখো করবো । (ঘাড়ধারণ ।)

আবু—দোহাই খাঁ সাহেবরা, আমায় বে-ইজ্জত করবেন না, আমি কোমর-খোলাই টাকা দিচ্ছি।

জামা—টাকা দিচ্ছি তো কত বারই বললি, টাকা আন না।

আবু—আমি নিতান্ত গরীব। (কৌচার মুড়া হইতে এক টাকা ও কাছার মুড়া হইতে এক টাকা, এই টাকা লইয়া) আপনাদের পান খাবার জন্ত এই দুটি টাকা।

জামা—(মোল্লার হাতে সজোরে আঘাত করিয়া টাকা ভূমিতে নিক্ষেপ) বেটা কি টাকা দেনে-আলা! আমরা ভিক্ষে কবতে এসেছি? দুটো টাকা নেব? চল (ঘাড়ে হাত দিয়া পাক দেওন এবং পৃষ্ঠে চার-পাঁচটা মুঠাঘাত)।

আবু—দোহাই পেয়াদা সাহেব, আমি তাই দিচ্ছি, তাই দিচ্ছি।

[নেপথ্যে (অস্তবাল হইতে স্ত্রীলোকের হাতে তিনটি টাকা) গাও আর কি করবে, যা কপালে ছিল তাই হলো।]

আবু—(হাত বাড়াইয়া ক্ষণকাল পরে) নেন, এই পাঁচটি টাকাই নেন।

জামা—(টাকা হাতে করিয়া উপবেশন ও সঙ্গীতের প্রতি) বসো হে বসো।

আবু—(তামাক সাজিতে সাজিতে) আমি তো কোন অপরাধ করিনি; তবে জুলুম কেন? (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) সকলই আমার নসিবেব দোষ, আমি কোন কথার মধ্যে যাইনে, কোন হের-ফের বুঝিনে, (টিকায় ফুঁ দেওন) কেউ চড়া কথা বললে কি দু'ঘা মাল্লেও পিঠে সই। দোষ কল্লেই সাজা হয়, তবে যখন সাজা আছি—তখন—সকলি নসিবেব—(ডাবা হ্কায় কলিকা চড়াইয়া দান) একালে যে যত সোজা থাকে তার পাছে কাঠি দিতে কেউ রেয়াত করে না। আমি ভাল জানিনে, মন্দ জানিনে, আমার উপর পাঁচজন পায়দা! বাবা! কাকের উপর কামানের আওয়াজ! (গাত্রোত্থান ও ঘোড় করিয়া পশ্চিমদিকে ফিরিয়া) এ আল্লা, তুই জানিস আমি কোন মন্দ করিনি, হাকিমের বা কি করেছি যে হক না-হক মাচ্ছেন? মাটির হাকিমের কুনজরে পলে কি আর বাঁচা যায়? কথায় বলে, “রাজা বাদী, উস্তর নাদি!” আপনারা বহন, আমি চাদরখানা নিয়ে আসি।

জামা—না, তা কখনই হবে না—এই ভাবেই কাছারি নে' যাব। যেমন আছে তেমনি চল, হুকুমত কাজ করতে হয়। এ তো তোমার অপমার ঘরাও কথা নয়, হজুরের যে রাগ তাতে যে কি হবে তা খোদা জানেন আর তিনি জানেন।

আবু—এমন ঘাট আমি কি করেছি? আপনারা কিছু শুনেছেন?

জামা—আমরা আর কি শুনবো? গেলেই শুনবে, চলো।

(সকলের গাত্রোথান)

আবু—হবে চল, কপালে যা থাকে তাই হবে!

[সকলের প্রস্থান]

পটক্ষেপন

(নেপথ্যে গান)

[বাগিণী ঝিঝট খাম্বাজ—তাল আড়া ঠেকা]

সুখী বলে কোন জন?

অধীনতাপাশে বাধা যাদেরি চরণ ॥

ক্ষমতা হোলো না আর করি পদ অগ্রসর

দেখে আসি একবার, প্রেয়সী-বদন ॥

দু'জন দু'হাত ধরে, লয়ে যায় জোর করে

কেহ মিছে বোষ ভরে, মারে অকারণ।

দেখিলে চক্ষের পরে কেমন প্রভুত্ব করে

আনিতে দিলা না মোরে আমারি বসন ॥

তৃতীয় গর্ভাক্ষ

হায়ওয়ান আলীর বৈঠকখানা।

(হায়ওয়ান আলীর মোসাহেবদের সহিত তাস-ক্রীড়া। হায়ওয়ান আলী ও প্রথম মোসাহেব একদিকে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মোসাহেব অপর দিকে।)

হায়—(তাস দেখিতে দেখিতে) বিস্তি নাই?

দ্বি মো—কি বড়?

হায়—বিবি বড়!

দ্বি মো—প্রত্যেক হাতেই যে বিবি বড় ? আপনার নিকটে বিবির বড় বাড়ী-
বাড়ি দেখতে পাচ্ছি ! বিবি যে আর ছাড়ে না !

হায়—বিবি ছাড়ে বৈ কি, সাহেবই ছাড়ে না ! খেল না। দেখুন দেখি সেই বিবির
জন্তো কতখানা হয়ে যাচ্ছে, কৈ একবারও সাহেবের পানে ফিরেও তাকায়
না ! বড়ের দশ আমার ।

দ্বি মো—আপনি তাকে যথার্থ ভালবেসে থাকেন, সেও ভালবাসবে ; এ তো চির-
কালই আছে, মনে মনে যে যাকে ভালবাসে সেও তাকে ভালবাসে ।

হায়—সে যথার্থ, কিন্তু আমার ভাই কিছুতেই বিশ্বাস হয় না । যাব জন্তু একেবারে
আহার-নিদ্রা তাগ, পূর্বে যে বড় ভালবাসার ছিল, তাকেও আর
দেখতে ইচ্ছে করে না । বলবো কি, জ্বীযন্তে মবার যাতনা ভোগ করছি ।
অদৃষ্টেব এমন দোষ যে সে আমার নামও শুনতে পারে না ! কাবার বিস্তি !

দ্বি মো—(তৃতীয় মোসাহেবের প্রতি) দেখে খেল হে, দেখে খেল ! গোচ বড়
ভাল নয় !

প্র মো—কাবার ইস্তক ।

দ্বি মো—তবে ঠ'ক্লেম ।

ত মো—কাজেই, ওঁদের পড়তা পড়েছে, পড়তা প'লে এই হয় । (গান)
‘পড়তা ছিল ভাল যখন, ফি হাতে হন্দর তখন, মেরে তাস করিতাম
হত লো ।’ এই টেক্কা, হাতের পাঁচ আমার ।

হায়—হাতের পাঁচ নিলে কি হবে, ওঁদিগে যে চা'র কুড়ি সাত দেখাতে হবে ।
আব এই বারেই পঞ্জা (প্রথম মোসাহেবের প্রতি) ওহে একখানা কাগজ
ধব (তাস একত্রে করিয়া সম্মুখে ধারণ) কাটুন দেখি ।

দ্বি মো—(হস্ত বাড়াইয়া) এই নিন গোলাম কেটেছি, আর পায়েম না, গোলামেই
সব হবে ।

হায়—কি হবে ? এত ভয় কেন ?

দ্বি মো—আবার ভয় কেন ? সব হবে—গোলামেই সব হবে ।

হায়—ওহে ! আমরা সাধে জিতছি, আমাদের যাত্রা ভাল ; ওঁদিগের খবর
শুনেছ তো ?

দ্বি মো—কতক কতক ! কৈ এতক্ষণও যে আনছে না ? বোধহয় পালিয়েছে ।

হায়—পালাবে কোথায় ? একটু বসো না, এখনি দেখতে পাবে ।

তু মো—দেখবে, এই দেখ (তাস নিক্ষেপ) হন্দর হয়েছে !

হায়—এমন সময় এমন কাজ কল্পে ? হাতে না তুলতেই হন্দর—

প্র মো—(দূরে সন্দারগণকে দেখিয়া)—ঐ আবুকে আনিছে ।

হায়—চুপ কর, ওদিকে তাকিও না—এইবারে খেলাটা হয়ে থাক ।

(সন্দারগণ-বেষ্টিত আবুর প্রবেশ)

আবু—(শেলাম করিয়া দণ্ডায়মান)

জামা—হুজুর ! আবু হাজির ।

হায়—কীহা হায় ? পঞ্চাশ ! (হেট মুখে সক্রোধে) আরে আবু ! তুই জানিস

আমি তোঁর সব কর্তে পারি ? তোঁর ভিটেয় গুণু চরাতে পারি ?

আবু—(ভয়কাতর স্বরে) হুজুর ! আপনি সব কর্তে পারেন ; আপনি রাজা ;
জানজাহানের মালিক ; মাঝেও মারতে পাবেন ; বাথলেও বাথতে
পারেন !

হায়—তোঁর এতদূর আশ্পন্দা ? আমার সঙ্গে অ-কোশল ? তুই ভেবেছিস কি ?

আমি তোকে সোজা কর্কই কর্ক ! কাবার পঞ্চাশ—জামাল ! হারাম-
জাদাসে পঁচাশ-বোপেয়া, জ'বানা আদা কর !

জামা—যো হুকুম !

আবু—(ষোড়করে) হুজুর ! আমি কি ঘাট করেছি ?

হায়—চোপরাও হারামজাদা ! আবতাক্ হামরা সাম্নে মুখোলকে বাৎ কাহতা-
হায় ! আভি লে যাও ! লে যাও ! (ক্রোধে উচ্চস্ববে) ঘন্টে কা
দারমিয়ান রোপেয়া আদা কর ।

জামা—(মোল্লার হাত ধরিয়া টান) চল !

মোল্লা—খোদাবন্দ ! আমায় মাপ করুন ।

হায়—মাপ কা, আ মাপ হায় নাই ! জামাল ! ওকে চোদ্দ পোয়া করে মাথায়
ইট চাপিয়ে দে', তা না হলে ও ত্রাকা কখনও টাকা দেবে না !

জামা—(চোদ্দ পোয়া করন)

আবু—খাঁ সাহেব, আমার মাথায় ইটই দিন আর আমারে কবরেই দেন, আমায়
দিয়ে এত টাকা হবে না । বাড়ি-ঘর ছেড়ে দিলুম, বেচে নিন !

হায়—হারামজাদা ! আমি তোঁর ঘর বেচবো ! তুই যেখান থেকে পারিস টাকা

এনে দে। (সর্দারগণের প্রতি) আরে তোরা এখনও ওর মাথায় ইট দিলিনি !

[একজন সর্দারের প্রস্থান]

আবু—হজুর ! আমি বড় গরীব, কুপুস্তি গলায়, বিষয়-আশয় হজুরের অজানা কি ?

এত টাকা কোথেকে ছোটাই ? দোহাই খোদাবন্দ ! ঝাপ করুন !

প্র মো—কেন ? তোমার কুপুস্তি এমন কে ?

দ্বি মো—আরে জান না, ছোটলোকের ঘরে যার একটু স্বন্দরী-বিবি তার এক পুষ্টিতেই একশ' ! নিত্যানতুন ফরমাস—নিত্যানতুন আবদার !

প্র মো—ওর বিবি বুঝি খুব খুশনুস ?

দ্বি মো—উরির মধ্যে ।

হায়—তবে অবশি টাকা দিতে পারবে । তার গয়নাই থাক, নগদই থাক, আর যার কাছে থেকেই হোক, টাকার তার অভাব কি (ইট লইয়া সর্দারের প্রবেশ) দে ওর মাথায় চাপিয়ে দে ।

(সর্দার কর্তৃক আবু মাথায় ইট দেওন)

আবু—দোহাই সাহেব ! আর সময় না, আমায় ছেড়ে দিন, আমি বাড়ি গে, ঘটি-বাটি যা থাকে বেচে এনে দিচ্ছি ! হজুর ! কপালে যা ছিল, তাই হোলো ! আমার কোন পুরুষেও এমন অপমান হইনি ! এর চেয়ে মরণই ভাল !

হায়—চোপরাও, চোপরাও । (মোসাহেবগণ প্রতি) কি বল আর খেলবে ? না আর কাজ নেই ! (চতুর্থ মোসাহেবের প্রতি) আপনি একটা কথা শুনে যান ।

চ মো—(নিকটে গিয়া) বলুন ?

হায়—(কানে কানে প্রকাশ) এখনই যান, আর বিলম্ব করবেন না ! গিয়েই পাঠিয়ে দেবেন !

চ মো—যাচ্ছি !

হায়—বদি স্বথবর আনতে পারেন তবে গাল ভরে চিনি দেব !

আবু—(চতুর্থ মোসাহেবের প্রতি—চুপে চুপে) কর্তা ! আমার জন্তে একটু—আমি আপনাকে (পাঁচ অঙ্কুলি প্রদর্শন) দেব !

চ মো—(হায়ওয়ান আবার নিকট যাইয়া চুপি চুপি) আবু কি ততক্ষণ ঐ অবস্থায় থাকবে ? ও অবস্থায় রাখা আমার বিবেচনা হয় না !

হায়—(মুহূর্ত্তে) আচ্ছা, আপনি ওর জন্তে উপরোধ করুন, আপনার আসা পর্যন্ত বসিয়ে রাখা হুকুম দিচ্ছি !

চ মো—(প্রকাশ্যে) দেখুন হুজুর ! আবু আপনারই প্রজ্ঞা, ওর ক্ষমতা কি যে আপনার অবাধ্য হয় ? এখানে ওকে এ প্রকার কষ্ট দিলে তো টাকা পয়সা আদায় হবে না ! জামিন নিয়ে ছেড়ে দিন, টাকার ষোগাড় করে নিয়ে আস্তক ।

হায়—তা হবে না, আমি ওকে ছেড়ে দিতে পারি না । তবে আপনি বলেছেন, এ অবস্থায় না রেখে সন্ধ্যা পঙ্কজ দেউড়িতে কয়েদ থাকুক ! সন্ধ্যার পর টাকা না দেয়, যা মনে আছে তাই করবো ; তখন আর কারও উপরোধ শুনবো না ।

চ মো—আপনি সব করতে পারেন । আমার কথায় যে এই কল্লেন এতেই রুতর্ষ হলেম !

(প্রস্থান)

হায়—জামাল ! আবুকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বসিয়ে রাখ । সন্ধ্যার পর টাকা না দেয়, যা করতে হয় কববো । এখন দেউড়িতে নে যা ।

(জামাল, আবু মোল্লা ও সর্দারগণের প্রস্থান)

দ্বি মো—আমি এ ঠার ঠোব কিছুই বুঝতে পারছি না ।

“সীতা নাডে অঙ্গুলী, বানরে নাডে মাথ’

বুঝিতে না পারি নরবানরের কথা ।”

হায়—বুঝবে কি, আজও যে গাল টিপলে দুধ পড়ে !

দ্বি মো—দুধ পড়ে তাতে ক্ষতি নেই, হুজুর কিন্তু বুঝে চলবেন, শেষে চক্ষের জল না পড়ে ! তখন আর ঠারেঠোরে বলা চলবে না । “ঠারে ঠোরে উনিশ বিশ দাদার কড়ি”—প্যাচ ঘটাতে সকলে পারে কিন্তু ম্যাও ধরবার বেলায় কেউ নেই !

হায়—(মুখের উপর হাত নাড়া দিয়া) অবিকারী মশায় চূপ করুন, আপনার আর ছড়া কাটিতে হবে না ।

দ্বি মো—চূপ কল্লেম বটে, কিন্তু আমার ভাল বোধ হচ্ছে না । যাই করুন, আগে পাছে বিবেচনা করে করবেন ।

হায়—সেজ্ঞাপ আপনাকে বড় ভাবতে হবে না । আমি আপনার চেয়ে ভাল বুঝি—চল, আড্ডায় যাওয়া যাক !

দ্বি মো—গুলিতে যে হাড় কালি হয়ে চললো !

হায়—চূপ কর হে চূপ কর ; বেশী ব’কো না, মাথা ঘুরবে !

(সকলের প্রস্থান)

পটাস্করণ

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাস্ক

আবু মোল্লা'র অন্তর-বাড়ি

(নূরুন্নাহাব ও আমিবণ আসীনা)

আমি—(কাঁথা সেলাই করিতে করিতে) আবু কাঁদলে কি হবে । জমীদারের হাত
কখনও এড়াতে পারবে না, টাকা দিলেই হবে ।

নূর—পঞ্চাশ টাকা কোথায় পাব ? আজ যে কবে প্যাংদাব কোমর-খোলাই পাঁচ
টাকা দিয়েছি তা আর কি বলবো । আর একটি পয়সাও ফিকির নাই,
জিনিসপত্র সব কয়েকখানা বেচলে কিছু টাকা হতে পারে । তা এ
অবস্থায় কে-ই না কিনতে সাহস করে ? টাকা না দিলেও তো রক্ষা নাই ।
আমি কি করবো ? এত টাকা কোথায় পাব ? তিনি কাছারিতে আটক
রইলেন, আমি মেয়েমানুষ কোথা থেকে এত টাকা দেবো ? গরীব বলেও
কি তাব দয়া হলো না ? পঞ্চাশ টাকা একসাথে তো আমরা চক্ষেও
দেখিনি । আজ আর কোথা হতে দেব ।

আমি—না দিয়ে কি আর বাঁচবে ? জ্বিমানা না দিয়ে যে অন্য কোনো হাকিমের
মাটিতে পালাবে, মনেব কোণেও সে কথা ঠাঁই দিয়ো না !

নূর—পালাব ! সে তো পরের কথা, বাত্রে যে তাঁকে কত কষ্ট দেবে, কত মারই
মারবে, কত বাবট যে খাড়া করবে, আমার সেই কথাই মনে পড়ছে !
তাঁব হাতে একটি পয়সাও নেই (বোদন) । টাকাব জন্ম তাকে মেরে
মেরে একেবারে খুন করে ফেলবে ।

আমি—মাটিব হাকিমে মেরে ফেললে তুমি কি করবে ? তাঁব নামে তো আর
সাহেবদের কাছে নালিশ করতে পাববে না ? নালিশ কলে এই হবে,
একদিন তোমার ভিটেয় পুরুব কবে দেবে । জমীদারের সঙ্গে কার কথা,
সে কি না করতে পারে !

নূর—পারেন বলে কি একেবারে মেরে ফেলবেন ? এই কি জমীদারের বিচের ?
জমীদার বাপের সমান, কোথায় প্রজার ধন-প্রাণ-মান রক্ষা করবেন, ওমা
তা গেলো মাটি চাপা ! উল্টে দিনে ডাকাতি !

আমি—চুপ কর চুপ কর, ঐ কেষ্টগণি আসছে। যদি কিছু ওর কানে গে থাকে, তবে এখনই বলে দেবে। মা গো, ওতো সামান্টি মেয়ে নয়!

নূর—তাই তো, ও আবার আসছে কেন? একে দেখলেই যে আমার প্রাণ উড়ে যায়!

(ঝোলা কক্ষে, ঘটি হস্তে কুষ্মগণির প্রবেশ)

কুষ্ম—“জয় রাধে কুষ্ম বল মন!”—মা ভিক্ষে দেও গো! ওমা, তোমায় আজ এমন দেখছি কেন গো? কৈদে কৈদে ছুটো চোখ যে একেবারে বাঙা করেছে, ওমা, এ কি গো?

আমি—ও মবে গেছে, ও কি আর আছে! মোল্লাকে যে কাচারি ধবে নে গেছে, তুমি শোননি?

কুষ্ম—তুই চক্ষের মাথা পাই মা! আমি কিছুই শুনিনি! ধবে নিসে গেছে, সে কি? কেন, আবু তো দোষ করবাব লোক নয়।

আমি—শুধু ধবে নিয়ে গেছে! ধবে নিয়ে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হৈকেছে; আরও কত অপমান কছে, টাকার জন্তা মাথায় ইট দিয়ে খাড়া কবে নাকি রেখেছে! এদের তো ঘর কুড়ুলে পাঁচটা পয়সা বেরোবে না; এত টাকা কোথায় পাবে? এই কি হাকিমের বিচার?

কুষ্ম—(কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) আহা-হা, এত করেছে? তা কুষ্ম! কি কববে বাছা! জমীদার দণ্ড করলে আর বাঁচবার উপায় নেই! টাকা দিতেই হবে—জমীদার টাকা নেবার জন্তে ধল্লৈ আর এডান নেই। তবে একে ভয়ও করতে হয়—তার কথা শুনতে হয়, জমীদার আস্ত বাঘ।

নূর—দুর্জনকে সকলেই ভয় করে! এই কি তাঁর বিবেচনা? আমাদের দিন চলাই দায়, কোন কোন দিন উপোস করেও কাটাতে হয়, এতে যে বিনি দোষে এত টাকা জরিমানা কল্লেন, কোথেকে দেব? ঘরদোর ঘটিবাটি বেচলেও তো পঞ্চাশ টাকার অর্দ্ধেক হয় না। দেখ দেখি বাছা, এ তাঁর কেমন বিচার? হাকিমে এমন করে বিচারে মাল্লে আর কার কাছে দাঁড়াব? এরপর যদি হাকিমের পর হাকিম থাকতো, তবে এর বিচের হতো!

কুষ্ম—ও মা! হাকিম থাকলে করতে কি? জমীদারের হাত কদিন এড়াবে? হাকিম তো আর সকল সময় কাছে বসে থাকবেন না! জমীদার যখন মনে

করবে তখন ধরে নিয়ে জরিবানার টাকা আদায় করবে।—হা! বেলা গেলো আর থাকতে পারিনে, একমুঠো ভিক্ষে দাও, যাই, আর কি করবে হা! (দীর্ঘশ্বাস)

নূর—(ভিক্ষা আনিতে গমন)

কৃষ্ণ—(পশ্চাৎ ঘাইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান)

নূর—(ভিক্ষা লইয়া ভিখারিনীর ঘটিতে দান)

কৃষ্ণ—(ভিক্ষা লইতে লইতে) চুপে চুপে শুন মা! জমীদারের হাত এড়াতে পারবে না, আমি শুনেছি তোমার জ্ঞাত একেরারে পাগল। দেখ না, একমাস হলো তোমার পাছেই নেগে আছে, তুমি মনে করলেই সব মিটে যায়।

নূর—(সক্রন্দনে) আমি আবাব কি মনে করবো!

কৃষ্ণ—আর এমন কিছু নয়, আজ রাতে যদি তাঁর বৈঠকখানায় যেতে পার, তা হলে যত রাগ দেখেছো একেবারে জল হয়ে যাবে। তুমি উল্টে আবার তার ডবল ঘরে আনতে পারবে!

নূর—আমি বৈঠকখানায় যাবো মাসি? (চক্ষে অঞ্চল দিয়া) এতকাল পরে তুমি আমায় এই কথা বললে? তাঁর কি এমন কষ্ট কবা উচিত? অধীনে আছি বলেই কি এমন অধর্মে কাজ করবে? এই কি তার ধর্ম?—এ বড় দারুণ কথা, আমা হতে এমন কষ্ট হবে না! তিনি যা করুন, তা করুন, প্রাণ থাকতে আমা হতে এমন কুকাজ হবে না—আমি বৈঠকখানায় কখনও যেতে পারবো না। যদি বড় পেড়াপীড়ি হয় তবে এই রাতেই গলায় দড়ি দিয়ে মরবো!

কৃষ্ণ—(জিভ কাটিয়া) সেও তো ভদ্রসন্তান, তায় আবাব জমীদার, এ কথা কে শুনবে? কেউ জানতে পারবে না। জানলেও কার দুটো মাথা এ কথা মুখে আনে মা! তুমি রাজার রাজরানীর মত স্থখে থাকবে! দেখ, জমীদার, সে কি-না করতে পারে? তোমায় ধরে নিয়ে যেতেও তার ক্ষামতা আছে; জাবান কল্লোও তো করতে পাবে। সে যখন পণ করেছে তখন ছাড়বে না! তবে কেন অপমানে বুল মজাবে? মান থাকতে আগেই তার কাছে গিয়ে কাতর হয়ে পড়, আদর পাবে। তিনি যা বলেন, তাইতো রাজী হওগে মা! তুমিই যে একা এ কাজ করছো তা তো নয়, জমীদারের নজরে পড়ে কত কোণের বৌ পঙ্কজ এ কাজ করেছে! চৌধুরীদের কথা

শোননি ? ওমা ! তারা আস্ত ডাকাত ! পাড়া-পড়সী, জগত-কুটুম, পর্জার-ঘব কাউকেও ছাড়েনি ! যার উপর নজর করেছে তারির মাথা খেয়েছে ! কৈ কে তার কি করেছে ? যে তার অবাধ্য হয়েছে তার ভিটে-মাটিতে একেবারে উলকুড উঠিয়ে দিয়েছে ! মা, আমি তোমার ভালোর জন্তেই বলছি, মানে মানে থাকি 'ভাল', শেষে মানও যাবে আর জানতেও পাচ্ছে—বুঝেছ—

নূর—বুঝেছি সব, কিন্তু সে কাজ আমি পারবো না, জান থাকতে তো নয়, ! আগে আমায় খুন করুন, তারপর যা ইচ্ছে তাই কববেন । (ঘৃণা ও বিরক্তির দৃষ্টিতে শশবাস্ত গমনোত্তর) ।

কৃষ্ণ—দাঁড়াও না শু—

নূর—আমি শুনবো না (আমিরণের নিকট গমন) ।

কৃষ্ণ—শুনলে না শুনলে না ! আচ্ছা, যাই আগে, থা সাহেবের কাছে এই সত্যিপনাব যা শুনাতে হয় তা হবে সকল । শেষে জানতে পাববে আমি কেমন 'কৃষ্ণমণি' ।

(সক্রোড়ে প্রস্থান)

আমি—কৃষ্ণমণি হাত মুখ নেড়ে কি বলছিল বউ ?

নূর—তোমার আর শুনে কাজ নেই । সে কথা আব মুখে আব জানবো না । ছি, ছি, বড মাহুঘের এই আচরণ ।

আমি—কি কথা, বল না শুনি ?

নূর—তবে শোন । (কানে কানে প্রকাশ)

আমি—(গালে হাত দিয়া) এমন ! তা হবেই তো ; ওরা ছাগলের জাত ।—পজ্জন্ত পার পায় না ! তুমি আমি তো ছার কথা । বলতেও লজ্জা করে বন ; শুনতেও লজ্জা ! ওদের মেয়েমাহুঘ দেখলেই চোখ টাটায়, জমীদার হলেই প্রায় একথুরে মাথা মুড়নো ! কেউ চিরকাল বাইবে বাইরে কাটাচ্ছেন, ঘরের খবর চাকরেরাই জানে ! যেখানে যান সেখানেই মরেন, একদিনেব জন্তুও ছেড়ে থাকতে পাবেন না ! বাঈ ! বাঈ ! বাঈ ! বাঈ বই ঢনিয়াতে তাঁদের যেন আর কেউ নাই ! এঁরাই আবার বডলোক । সাহেবদের কাছে বসতে পান, কত খাতির হয়, তাতেই আবার গাজ ফলে ফলে ওঠে ! সংকাজের বেলায় এক পয়সা মা-বাপ ! কিন্তু ওদিক কল্লতরু ! চুল পেকেছে,

দাঁত পড়েছে, মুখের চামড়া ঢিল হয়েছে, কিন্তু সক এমনি দাঁতপড়া বাঘের মতন এখনও জ্বিভ লকলক করে ! সেই বাজারে মেয়েগুলো এসে কত লালুনা দিয়ে যায়, তবু লজ্জা নাট ! কিছুদিন খাবার পরবার নোভে থেকে বেশ দশ টাকা হাত করে মুখে চুনকালি দিয়ে চলে যায়, আবার বেদিনী যুগিনী, চাড়ালনী, কলুনী, চারজাতের চাবজনকে নিয়ে কেউ কেউ বুড়ো বয়সে রঙ্গ কোরঙেন, কেউ ঘরের বাইরে রঙ্গিনী নে উন্মত্ত ; কেউ ঘরের দিবি স্ত্রী ফেলে পাডাতেই কাল কাটালেন ! তা বোন, এদেশের জমীদারদের অনেকের দশাই তো এই ! তা বলে আর কি করবে বল ? যে গতিকে পারে তোমার মাথা খাবেই থাকে ! তা এখন চল, ওদিকে—

নূর— ওদিকে আব তুমি কি বলবে ভাই (দীর্ঘনিশ্বাস) আমি আজ বুঝেছি । আজ মাসাবদি লোকের দ্বারায় কত বকমের কথাব ঠারে কত লোভ দেখাচ্ছে ! থা সাহেবও বিকেলে সন্ধ্যার পর পব মিছিমিছি শিকারের ছতো কবে বাড়ির আশেপাশে ঘূবে বেড়াচ্ছেন ! আমি আজ সকলি বুঝেছি ! আমি যা যা বলেছি বোধ হয় কৃষ্ণমণি তা'ব দ্বিগুণ বাড়িয়ে বলবে, আমার কি হবে ? আমি কোথায় পালাব ? এখন যদি আমাকে ধবে নিয়ে যায় তবে আমার কি দশা হবে ? কাব কাছে গে এ বিপদ থেকে রক্ষা পাব ? এমন কি কেউ নেই ?

পটাস্করণ

(নেপথ্যে গান)

(বাগিনী বাগশ্রী—তাল আডাঠেকা)

আব কে আছে আমার

এ দুঃখ-পাথারে কে বা হবে কর্ণধার ?

যে তরিতে এ দুস্তারে, নিজে সে ভাসে পাথারে,

না হেরি সে প্রাণেশ্বরে, বুঝি অনিবার ।

আমাবি, আমারি লাগি প্রাণকাস্ত দুঃখভাগী

বিপক্ষ হোলো বিরাগী, না দেখি নিস্তার ।

সুনেছি ভারতেশ্বরী, দুইজন-দণ্ডকাবী

তবে মাগো কেন হেরি, হেন অবিচার ?

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্গ

গুলির আড্ডা

(হায়ওয়ান আলী, মোসাহেব চারজন এবং একজন গুলিখোর আসীন)

হায়—ওহে বসো বসো, কেবলই টানছো, দু-একটা গল্প চলুক !

তু মো—হুজুর ! গৌরী নদীর পুল বৈধেছে—

প্র মো—বৈধেছে বটে, তার ওপরে কলেব গাড়িও চলেছে বটে, কিন্তু—

তু মো—(সক্রোধে) কিন্তু আবার কি ?

প্র মো—(মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) সে পুল টেকবে না ; দুমাস পরেই হোক,
আর ছমাস পরেই হোক, ভেঙ্গে পড়বেই পড়বে। যত বেটাৱা গাড়ির মধ্যে
থেকে উঁকি মেবে হাত নাড়া দিয়ে চলে যান, তারা গৌরী ব জল খাবেই
খাবে ! গৌরী তাদের খাবেনই খাবেন।

হায়—না হে না, ভাঙ্গবে না। শুনিছি ভাবি ভাবি লোহার খাম পুতেছে।

প্র মো—হুজুর খাম পুতলে কি হবে ? ওদিকে যে গোড়া নড়বড়ে—

হায়—নড়বড়ে, কি বকম ?

প্র মো—শুনেছি পদ্মার কাছে গৌরা গিয়ে ন'লিশ কবেছিল যে পুলের ভায় আর
সইতে পারি নে, তাহে পদ্মা বলেছেন যে লেসলী সাহেব পুল বৈদে
বেলাতমুখে হন, আমি একদিন ভেঙ্গেচুরে একেবারে কুমাবখালি গিয়ে
ধরো !

হায়—এ তো শুনলেম। জোংদার বেটাৱা খ্রীষ্টান হবে বলে পাদবী সাহেবেব
কাছে পড়েছিল, তার কি হয়েছে।

প্র মো—হুজুর, খ্রীষ্টান হওয়া মিছিমিছি। খ্রীষ্টান হওয়া ওদের কাজ নয়, তবে যে
গিয়েছিল, সে কোন কাজ পাবার লোভে ! ওদের দলের যিনি কর্তা তাঁর
কোন মতেই বিশ্বাস নাই। আসলে যদি বলেন, তবে তারা সেই এক
রকমের লোক ! ভালমা'লুম হোলে স্বভাব চরিত্র গুরুত্ব হোত না। দেখতে
সেই লাঙল-ঘাড়ে চাষাদের মতো দেখায় ! মুসলমানের আবার আচার-
ব্যাহার ? ধর্ম কিছুই নাই বলতে কি, তারা কোরান কেতাব কিছুই মানেন
না। কোনো বিচার ধার ধারে না, কেবল বড়াই করে বাড়ির ভেতরে
মেয়েদের সামনে অপরের নিন্দা কর্তে মজবুদ।

হায়—আমি জানি ওদের দলের যিনি কণ্ঠা তিনি সকল বিষয়েই কণ্ঠা।

প্র মো—হজুর! কৃষ্টির কণ্ঠা একবার কণ্ঠার বড়কণ্ঠামু বার করেছিলেন। মাথায় ইট চাপানো পর্যন্ত বাকি ছিল না। ওরা—

“যখন দেখে আঁটাআঁটি

তখন কেঁদেকেটে ভিজায় মাটি।”

তারপর অমনি চোখ উল্টে বলে ফেলে, তো-তো-তো তোমি কেভা হে?

হায়—সে কথা থাক, আন্দ বিশ্বাসের মকদ্দমার কি হলো?

প্র মো—সে কথা আর কি বলবো? কলিকালে সকলেই গেলো। বমজানের চাঁদে বোজা বেখে মস্ত মস্ত কাঁচা-পাকা দাড়িওয়ালা সাহেবেবা তসবি টিপতে টিপতে হলফ করে হাকিমের সামনে মিছে কথা কইলেন, শুনে অবাক হয়েছি, যে এ বাবাজিদের অসাধ্য কিছু নেই।

হায়—তা তো কইলেন, তাবপর?

প্র মো—(ঈশৎ হাস্য করিয়া) এখন যেমন আইন, তেমনি আদালত, টাকার জোরে কিনা হয়? ডিসমিস হয়েছে!

হায়—বেশ হয়েছে! ভদ্রলোকের জ্ঞাত পাঁচলো! শুনেছিলাম এ মোকদ্দমায় বড় বোগাড় হয়েছিল।

প্র মো—যোগাড় করে কি হবে। অমন বিচক্ষণ হাকিমকে কি কেউ ঠকাতে পারে? হজুব, আব-এক কথা শুনেছেন? হিঁদুদের নিকে হোচ্ছে!

হায়—শুনেছি। আমাদের সঙ্গে কি হিতব মেয়েব নিকে হতে পারে না? না বাবা? তার কাজ নেই, পাবনায় সেদিন রাড কনে আর তার বরকে বাসরঘরেই পাড়ার হিন্দুরা জুটে পুড়িয়ে ফেলাছিল, ভাগ্যিস হারিশ ভাস্কর ছিল তাই রক্ষে হোলো! তবে—তবে তো বাবা! একেবারে আগুনে পুড়িয়ে ফেলবে।

প্র মো—সে কথা থাক, এদিগের কি হোলো?

হায়—হাজ যে বোগাড় করেছি তা তো শুনিইছ!

প্র মো—হজুর আমি শুনেছি সে নাকি গর্ভবতী আছে।

হায়—না হে না, সে কোন কাজের কথা নয়, ও কথা শুনলেম না, আমি কালও দেখেছি, ওসব ভো কথা! আমাকে ভয় দেখাবার জন্তে মিছিমিছি একটা

বটনা কচ্ছে, আমি তাতেই প্রায় ভুলে গেলাম আর কি । এ কি ছেলের হাতের পিঠে ।

প্র মো—(হেঁট মুখে) আপনি দেখেছেন, তাতে কোন কথাই নেই, কিন্তু আমি যেন শুনেছিলাম, যে সত্য সত্যই গর্ভবতী ।

হায়—হোক, তায় ক্ষতি কি ?

(চতুর্থ মোসাহেবের প্রবেশ)

হায়—চালাক দাস ? খবর কি । গালভরে চিনি দেব না দুটো ছিটে টানবে !

চ মো—(কুজ হইয়া আব্দুলী নাড়িয়া) ছিটেকোটাব কাজ নয়, (নিখাস ত্যাগ) সব দফা বকা—

হায়—সে কি ? একেবাবেই যে শেষ করে ? ব্যাপারখানা কি ?

চ মো—কোনমতেই না ! সে হাত নুখ নেড়ে কত কি বললে ! আরো বললে, এদের উপর হাকিম থাকত তাহলে এব শোধ নিতেম । কি আশ্চর্য্য ! মেয়ে-মানুষের এমন কথা । কৃষ্ণমণি আপনও অনেক বললে, সে কথা এখন বলবো না, আর এক সময় শুনেতে পাবেন ।

হায়—কি ? তার স্বামীকে এনে কানমলা নাকমলা দিচ্ছি, খাড়া কবে রেখেছি, আর তার এত বড় আশ্পদী ! মেয়েমানুষের এত হেম্মত ! হাকিম দেখায় আমাকে ! তবে এব প্রতিফল এখনই দিচ্ছি । আব বলতে হবে না, আমি সব বুঝতে পেরেছি ! আপনি সদ্দাবদেব ডাকুন ।

(চতুর্থ মোসাহেবের প্রস্থান)

প্র মো—আপনার উপরে হাকিম দেখাতে চায়, এতদূর বকের পাটা ! আমি—

হায়—এখনই তারে হাকিম দেখাচ্ছি । বড় সতী হোয়েছে । সতীপনা এখনই মালুম পাওয়া যাবে ।

(জামাল, কামাল ও চতুর্থ মোসাহেবের প্রবেশ)

জামা—(সেলাম করিয়া দণ্ডায়মান)

হায়—দেউড়িতে যত সদ্দার আছে সব যাও । মোল্লাকো জরুরকো পাকাড় লাও । মোল্লাকে ছেড়ে দাও । আমি মোল্লা চাইনে, নুরম্মেহর চাই ।

জামা—হজুর! আমরা চাকর। যে হুকুম করবেন তামিল করবই! কিন্তু শেষে যেন মারা না যাই!

হায়—তোমাদের কি? এর জগে যদি আমার সর্বস্ব যায়, তাও স্বীকার,! নূর-
ম্নেহার কেমন সান্না দেখবো! আর বিলম্ব করো না, এখনই যাও, আর
সহ হয় না! কি? মেয়েমানুষেব এত বড় কথা!

জামা—জুজুবের হুকুম, চলেম!

(সেলাম পূর্বক জামাল-কামালের প্রস্থান)

হায়—(কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) আর ভাবলে কি হবে, যা অদৃষ্টে থাকে তাই হবে!

(তৃতীয় মোসাহেবেব প্রতি --) গুহে টান না?

তু মো—(গুলি টানিতে আরম্ভ করিল)

গু থো—(আগুন দিতে অগ্রসর)

হায়—শুধু শুধু টান। কেউ গান ধর না—

তু মো—আচ্ছা এই ছিটেটা ওড়াই।

গু থো—কর্তা, আমি সারাদিন কিছুই খাইনি।

হায়—কিছুই খাসনি! এই যে এত ছিটে খোল।

গু থো—কর্তা, না জলুকুণ্ড মুখে দিইনি।

তু মো—আচ্ছা এই দুটো পয়সা নে, বাজারে জলপান কিনে খেগে যা! (দুটো
পয়সা দান)

(সেলাম পূর্বক গুলিখোরের প্রস্থান)

হায়—একটা গান ধর না।

তু মো—আচ্ছা। (মোচের তাল দিয়া, একটু চাট খাইয়া) তবে একটা মধ্যমান
গাই।

(রাগিনী জঙ্গলা—তাল আড়খেমটা)

যে বলে হয় হাড় কালী সকের ছিটে টানলে পরে

দু'গালে চার চড় লাগাই তাব, দেখা পেলে

রাস্তার ধারে।

যে পেয়েছে গুলির মজা, উড়ছে তার নামের ধজা

মনে মনে হয় সে রাজা, যখন আড়ায় এসে

সাজ্জা করে ।

তু-চার ছিটে উড়িয়ে দিলে চতুর্ভুজ ফলটি ফলে
নবাবজাদা কাছে এলে, কে আর তারে কেয়ার করে ?
নয়ন দুটি বুঁজে, ঢুলি যখন মাথা গুজে
স্বর্গ মর্ত দেখি থুঁজে, তেমন মজা নাই সংসারে !

(প্র মো বাতীত সকলের উচ্চস্ববে গান)

প্র মো—এই বুঝি তোমাদের মধ্যমান ?

তু মো—নয় তবে এটা কি ? ভায়া ভারি কলোয়াত ।

প্র মো—ওরে তোব মাথা ! এটা আড়াখেমটা! আর বাগিগী শঙ্করা ।

তু মো—কে জানে তোর খেমটা, আর কে জানে তোব শঙ্করা ।

হায়—(উষ্ণ ভাবে) একটু চূপ কর হে চূপ কর ! (উচ্চস্ববে—) ওহে তোমরা
কি পাগল হোয়েছ ? একটু চূপ কর না ! (মোসাহেব পূর্বমত উচ্চস্ববে
তাক্ লাক্সিন ধিনিতাক)

হায়—(হস্ত দ্বারা বিছানায় আঘাত) চূপ কর না ! তোমাদের কাণ্ডজ্ঞান নাই ।
ওদিকে যে ভয়ানক গোল হচ্ছে ! (মোসাহেবগণ নিস্তব্ধ) শুনেছ ? বড়
গোল হচ্ছে ! চল একটু এগিয়ে গিয়ে দেখা যাক ।

সকলে—চলুন, আপনি যাবেন, আমরাও যাচ্ছি ! (উচ্চস্ববে “আল্লা আল্লা”
করিয়া) (নেপথ্যে—উচ্চস্ববে—ছোট বিবি মলেম, (সকলের প্রস্থান)
আমায় নিয়ে চলো, এইবার গেলাম ।) দ্বিতীয়বার নেপথ্যে । এগোরে
নিয়ে গেলরে, তোরা এগোরে, দোহাই মহারানীর তোরা এগোবে ।

পটাস্কপণ

তৃতীয় গর্ভাস্ক

কোশলপুর

হায়ওয়ান আলীর বৈঠকখানা

(মোসাহেবগণ, সর্দারগণ এবং হাওয়ান আলী নূরম্মাহারের হস্ত ধরিয়া
দণ্ডায়মান । নূরম্মাহার হেঁট বদনে কম্পিতা)

হায়—কেমন ? এখন তো হাতে পড়েছো ! এখন আর কে রক্ষা করবে ?
বাড়িতে বসে বসে যে বলেছিলে, ওর উপরে কি আবু হাকিম নেই ? কই

‘কাজেও যে দেখতে পাইনে ! তোমার সে বাবারা কোথায় ? এখন দেখ না ! এসে রক্ষা করে না !’ সতী সতী করে বড় ঢুলে পড়তে ! এখন সতীত্ব কোথায় থাকবে ? আমার হাতে তো পড়তেই হলো, তবে আর এতো জিরকুটি কল্লের কেন ? আমার ক্ষমতা আছে কি না তাও তো দেখলে ? আরও এখনই দেখতে পাবে জান ! এতদিন আমার জানকে এত হয়রান করেছে জান ! এস তার প্রতিফল দিই ।

নূর—(সকলুণে) আপনি সব কর্তে পারেন । আমি আপনার প্রজা, আমি আপনার মেয়ে, আপনি আমার বাপ ! জাত মান রক্ষা কবতেও আপনি, প্রাণ রক্ষা করতেও আপনি । আমি আপনার মেয়ে, আপনি আমার বাপ !
(রোদন) আপনিই আমার জাত কুল রক্ষা কোরবেন !

হায়—এই তো কচ্ছি ! (নূরমহারকে টানিয়া লইতে উত্তত)

নূর—(মাটিতে গড়াইয়া পড়িয়া সরোদনে) আমার ছেড়ে দিন ! গলায় কাপড় দে বলছি আমার ছেড়ে দিন ! আমি আপনার মেয়ে ! আপনি আমার বাবা ! আমার কাপড় অসামাল হলো, কাপড় পরি, ছেড়ে দিন ।

হায়—(কমাল দ্বারা মুখ বন্ধন করিতে কবিতে) কাপড় নেওয়াচ্ছি !

নূর—(গোড়াইতে গোড়াইতে) পায় ধ-রি—আমা—

হায়—(মোসাহেবগণ প্রতি) আপনারা দুইজন হারামজাদীর হাত ধকন, আমি চুল ধবে টেনে নিচ্ছি !

(তৃতীয় ও চতুর্থ মোসাহেব বেগে হস্তধারণ এবং খাঁ সাহেব কর্তৃক নূরমহারকে ধরে অগ্রসর ।)

(প্রস্থান)

স্বি মো—(ক্ষণচিন্তাব পব) হুজুরের যে রাগ দেখতে পাচ্ছি এতে যে কি করে বসেন, তার নিশ্চয়তা কি । কিন্তু এর ভোগ শেষে ভুগতেই হবে !

জামা—দেখুন আমরা চাকর, হুকুম কল্লের আর অতুল কল্লের পারিনে । এ কাজটা বড়ই অগ্নায় হচ্ছে । মোল্লার স্ত্রী গর্ভবতী, তারপর এই জাবরান । এ কাজটা বড় অগ্নায় হচ্ছে ! কি করি ! এর অধীনে থেকে একেবারে সর্বনাশ হবে ! এর তো দিগ-বিদ্বিগজ্ঞান কিছুই নাই, গ্নায় হোক, অগ্নায় হোক একটা করে বসেন, যে ভাব দেখতে পাচ্ছি, এতে আমাদের জাতকুল

থাকাই তার। আজ আবু মোল্লার যে দশা হলো, কোনদিন বা আমাদের ওরূপ ঘটে।

(হায়ওয়ান আলীর পুনপ্রবেশ)

হায়—ওহে, তোমরা এখানে কি কচ্ছে? ওদিকে যে—যাও না এমন দিন—!

প্র মো—আচ্ছা যাই।

(প্রস্থান)

হায়—(সন্দর্ভগণ প্রতি) তোমরা আমায় খুঁশী করছো, আমি মনের মতো খুঁশী করবো।

জামা—হজুর আমবা হকুম পেলে কাউকে ভয় কবিনে, তবে দেখবেন শেষে যেন একেবারে দয় ডুবে না মবি! সময় বড় খাবাপ, সাবেক আমল হলে এতো ভাবতেম না।

হায়—তার জন্তে ভয় কি? মকদ্দমা আছে মামলা আছে কবুল! জামাল ওকে কি বকম ধল্লো?

জামা—আমরা ঐ সেই কোটার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলুম! কোনমতে আর ফাঁক পাইনে। অনেকক্ষণ পরে কানে আওয়াজ এলো যে, একটু দাঁড়াও আমি বাব থেকে আসি। আবার গুনলুম যাও, চাঁদনির বাত ভয় কি? তারপরই দেখি নূরুন্নাহার বাইরে এয়েছে! তখন একবার লাফিয়ে ধরে শূত্তে শূত্তে আনতে লাগলুম! ও কেবল মুখে বল্লো, ‘ছোট বিবি মলেম!’...তারপরই আপনি গিয়েছেন। মোল্লাকে যে রকমে তাড়িয়েছি তা তো দেখেছেন! হজুর, আমবা যেন নষ্ট না হই!

হায়—তোমাদের ভয় কি? টাকার অসাধ্য কি আছে বল দেখি?

জামা—হজুর। সে যথার্থ, কিন্তু আমবা গরীব, সেইটি যেন মনে থাকে।

হায়—মনের মত বখ শিখ কববো।

(প্র মোসাহেবের প্রবেশ)

প্র মো—হজুর সর্বনাশ হয়েচে।

হায়—কি হলো?

প্র মো—আর কি দেখেছেন, নূরুন্নাহার কেমন কচ্ছে, বুঝি বাঁচে না।

হায়—বটে (তন্তে উঠিয়া)

প্র মো—তার ভার দেখে ভাল বোধ হচ্ছে না।

(উভয়ের প্রস্থান)

(এবং জামাল কামাল ব্যতিরেকে অবশিষ্ট সর্দ্ধারগণের অপর দিক দিয়া
বেগে পলায়ন)

জামা—অদৃষ্টে কি জানি কি হয় ? গতিক বড় ভাল বোধ হচ্ছে না। (হায়ওয়ান
আলী মোঁসাহেবগণের সাহায্যে হাত পা ধবিয়া নূরম্মাহারকে লইয়া প্রবেশ)
হায়—(মাটিতে বাঁথিয়া) যথার্থ কি মবে, না ওর সব মিছে ? ও কিচুই নয়, ও
এক কাপ করে বয়েছে !

দ্বি মো—না, না, দেখুন গর্ভবতী যথার্থই ছিল ! ঐ দেখুন তলপেট তোলপাড়
কচ্ছে !

হায়—(নিকটে যাওয়া বিস্ময়ে) যথার্থই গর্ভের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে ; তলপেট অতো
নড়ে কেন ?

নূব—(মুহূর্ত্তবে) হা খোদা ! আমার কপালে এই ছিলো ! নাবৌকুলে জন্ম নিয়ে
সন্তোষ বক্ষা করতে পার্লেম না। হায়, এই জন্তই কি আমার জন্ম
হগেছিলো ! জন্মেই কেন মবে গেলাম না ! তা হলে এত লাঞ্ছনা সহিতে
হতো না ! কি কবি উপায় নাই, এ দুঃখ কাকে জানাব ! এমন সময়
প্রাণপদ স্বামীর সঙ্গে দেখা হলো না ! মা-বাপের মুখও দেখতে পেলাম
না ! প্রতিবেশীবাও আমাদের দেখতে গেলো না ! (দীর্ঘশ্বাস) হা খোদা !
তোব মনে এই ছিল ! জমীদার হয়ে এমন কাজ করে ! ধর্ম্মের দিকে
চাইলে না ! এত কষ্ট কি আর প্রাণে ময়। হায় হায়, এদের দমনকর্তা
কি আর কেউ নেই ! এদের উপরে কি আর হাকিম নেই ! হায় হায়, জাত
গেল, দেশ জুড়ে কলঙ্ক হলো, প্রাণও গেলো, শুণু আমার প্রাণই যে গেল
তা নয়। পেটে যে একটা ছিল তারও গেলো। খাঁ সাহেব ! আপনার
মনে এই ছিল ? এই কল্পন ! খোদা আপনার বিচার করবেন ! শুনেছি যে
মহারানী সকলের উপরে বড়, সাহেবদের উপরেও বড়। আমরা যেমন
তোমার প্রজা, তেমনি তুমিও তার প্রজা। তিনি কি এর বিচার
করবেন না ? প্রজার প্রজা বলে কি আর দয়া হবে না ? মা ! তুমি
বেলাতে থাক, তোমার প্রজার প্রতি এত দোরাওয়া হচ্ছে তুমি কি জানতে
পাচ্ছে না ? কেবল বড় বড় লোকই কি তোমার প্রজা ? আমরা গরীব

বলে কি তুমি আমাদের মা হবে না? মা—আ—মার—আ—মা—সন্ন না,
মা—মা—মা আমি মেয়ে দয়া—কর—তো—পা—য়—(মৃত্যু)

হায়—ওহে, যথার্থ মলো! (নিকটে যাইয়া নাসিকায় হস্ত দিয়া) নিশ্বাস নাই।
মরেছে, না ঐ যে তলপেট নড়ছে? কই আর যে নড়ে না। বুঝি পেটের-
টাণ্ড মলো! (বৃকে হাত দিয়া) এখন উপায়?

(প্রথম মোসাহেবের প্রস্থান)

দ্বি মো—আর উপায়। তখনই তো বলেছিলাম যা করবেন আগেপাছে বিবেচনা
করে করবেন। এখন তো খুনের দায়ে ঠেকতে হলো!

হায়—চূপ চূপ। খন খন কবো না। যা হবার তা হলো, এখন কি করা যায়।
অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে, বসে বসে ভাবলে আর কি হবে। রাত থাকতে
থাকতেই এব একটা উপায় করা চাই।

দ্বি মো—আমার বুদ্ধিস্বদ্ধি কিছুই নাই। আমি একেবারে জ্ঞানশূন্য হয়েছি। যা
আপনি ভাল বোধেন করেন।

হায়—জামাল! তোমার বিবেচনায় কি হয়?

জামা—আপনি যে হুকুম করেন তাই করব। এতে আর আমাদের বিবেচনা কি?

(প্রথম মোসাহেব এবং নিদ্রোস্থিত বেশে সিরাজ আলীর প্রবেশ)

সিরা—আরে পাঞ্জি রে! এমন কাজ কল্লি? একেবারে হাবু খাঁব নাম ডুবালি?
তোর কি কাণ্ডজ্ঞান নাই? চিবকালই কি তোর এইভাবে গেলো! লক্ষ্মী-
ছাড়া আর কি মরবার জায়গা ছিল না? এমন কাজ কি করতে হয়? যত
সোঁয়ার একটাই জুটে এই কাজ করছে। এখন মুখে কথা নাই। তোব
জ্ঞান সর্বনাশ হবে। পূর্বপুরুষের নাম গেল, তুই কি একেবারে পাগল
হয়েছিস? এখন আর কি বলবো? তোরে এ বুদ্ধি কে দিল! (দ্বিতীয়
মোসাহেবের প্রতি) এখন মুখে কথা নাই। পাঞ্জিরা এখন কেউ নেই।
সর্বনাশ কল্লি। লুটে পুটে মজ্জালি! রাগ আর বরদাস্ত হয় না—(দ্বিতীয়
মোসাহেবকে মৃষ্টাঘাত) তোরাই আমার সর্বনাশ কল্লি। তোদের
কুপরাশমর্শতেই হয়েছে।

দ্বি মো—দোহাই আঙ্গার! কোরানের কিবে! আঙ্গনার গা ছুঁয়ে বলতে

পারি, আমি দফায় দফায় মান! করেছে, এমন কাজ করবেন না। তা কি উনি ভুনে, উনি না একজন!

সিরা—জামাল! তোরাই সর্বনাশ কল্লি! তুই কি এই বদমাইশদের দলে মিশে গেছিস?

জামা—কর্তা, আমি কি আর করবো? হুকুম কলে তো আর অটুল করতে পারিনে।

সিবা—আর সকল বেটাবা কোণায়?

জামা—সকলেই পালিয়েছে।

সিরা—(উপবেশন এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত হেঁটমুখে চিন্তা) হায়! এখন কি হবে? উপায়? ঠাচবার উপায় কি? এখন আর কি সেদিন আছে? এই হাতে কত কাণ্ড করেছি, কতজনের ও কণ্ঠ করেছে, সাবেক কাল হলে আর এত ভাবতে হতো না! পাজিরা শোনেও নাই? আমার বাপজী কুকুর দিয়ে মাছ খাইয়েছেন! আর আমবাও কত কি করেছে, এখন যে কেন চুপ করে থাকি তা তো তোরা বুঝবি না।

জামা—তা বলে আর কি হবে? এখন ঠাচবার পথ দেখা যাক।

সিবা—এক কাজ কবা যাক, বাত শেষ হয়ে এলো। আর কোন উপায়ই এখন হয় না। তবে সকলে হাতাহাতি করে ধরে নিয়ে আবু মোল্লার বাড়ির উত্তর দিকে খেজুরবাগানে ফেলে আসা যাক। শেষে নসিবে যা থাকে তাই হবে। ভাব হলো—নেও, নেও উঠ, উঠ, আব দেরি করো না।

দ্বি মো—হুজুর যা বলেন সেই ভাল! চল আর বিলম্ব করে কাজ নেই। রাত ফরসা হয়ে এলো! (নেপথ্যে দুবার কুকুটধ্বনি) ঐ হয়েছে, আবার রাত নেই, ধর ধর—।

সিরা—জামাল ধর, সকলেই যাচ্ছে!

জামা—(কোমরে চাদর জড়াইতে জড়াইতে) তবে আর দেরি করা নয়, ভোর হয়েছে! ঐ সেই প্রাগল বৈরাগী বেটা গান গাচ্ছে। (কামালের প্রতি) কামাল ধর ভাই, একটা মেয়েমানুষকে নে যেতে আবার আর কেউ কেন? আমরা থাকতে বাবুরা হাত দেবেন!

(জামাল কামাল কর্তৃক শব্দেহ-লইয়া গমন। পশ্চাতে পশ্চাতে অধোমুখে সকলের প্রস্থান)

গটাক্ষপণ

(নেপথ্যে গান)

(রাগিণী ললিত—তাল জলদ তেতাল)

চেতরে চেতবে চিত । এই তো দিন ঘনাষে এলো
 সারা নিশি ঘুমাইলে আর কত ঘুমাবে বল ।
 মায়াবিনী এই নিশি, আসলো ঘুমপাড়ানি মাসি
 ভোগ দিয়ে সর্বনাশী, সাব কথাটি ভুলিয়ে দিলো ।
 শিষ্ট যারা নিশিযোগে, রয় কি তাবা নিদ্রাযোগে ?
 মনে বেখে সেই পদযুগে, যোগে মজে জেগেছিল !
 দুষ্টলোকে বেতের বেলা, ঠিক যেন হয় কলির চেলা
 কেউ চুপি কেউ কামেব খেলা, খুন কবে কেউ লুকাইল ।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্তাঙ্ক

আবুমোল্লাব খেজুববাগান

(কনস্টবলদ্বয় নুরুন্নাহাবেব শবের পাঞ্চে দণ্ডায়মান)

প্র কন—বাবু যে এতক্ষণও আসছেন না !

দ্বি কন—উঠতে পাল্লে তো আসবেন !

প্র কন—সে তো আর নতুন নয় ।

দ্বি কন—তাতে কি আর নতুন পুরান আছে ; বেশী মাত্রা হলেই দিন কাবার ।

আবার যে লক্ষ্মী কাঁধে ভর করেছেন তিনি তো—জানই আর কি !

(কাস্তে বগলে তামাক টানিতে টানিতে দুই চাষার প্রবেশ)

প্র চা—এ গাঁয়ে আর বাস্তবিক হয় না । গেল না, ওবে ধরে নিয়ে এই কাণ্ডটা
 করেছে ।—জমীদার বহুত আছে, অনেক জমীদারের নাম তো শুনেছি ।

এরা যেমন বাবা !

দ্বি চা—মামুজি, কি নকমে মাল্লে ?

প্র চা—আমি কি দেখতে গেছি ?

দ্বি চা—বুঝিছি বুঝিছি, ও ব্যাটা বড় শয়তান । বন্দুক হাতে করে ঠিক সাঁজের
 বেলা আমাদের বাড়ির পাছ কানাচে ঘুরে বেড়ায়, ঘুরেই বেড়ায় ! পাছ-

তুয়ের দিয়ে বাড়ির মন্দির আসে, বেটার চালচলন বড় খারাপ। মামুজি, তুমি শোননি, ঐ সেই দহিনপাড়ার জোলা বড় হাকিমত করে বলেছিল। উনি তো তার মেয়েকে দেখে বাড়ির সামনেই ঘোরেন, সে বললো হুজুর! দিনে মুনিব বলে মানবো, নাস্তিবে অজাগায় দেখলে আর হাকিম বলে হাত ক'রো না।

(ইনস্পেক্টরের সহিত আবুমোল্লার প্রবেশ)

ও মামুজি, ঐ সাহেব (পলাইতে উদ্ভত)

ইন—খাড়া বাও, কঁাহা যাতা হায় ?

প্র চা—(হুঁকা ফেলিয়া কবজোড়ে) কর্তা। আমবা কিছু জানিনে।

ইন—(শবেব নিকটে ঘাইয়া) এ মেয়েলোকটি কে ? কি হয়েছে ? এ রকম এখানে পড়ে কেন ?

প্র চা—মবে গেছে, শুনিছি খুন হয়েছে।

আবু—ধর্মাবতার ! আমার সর্কনাশ হয়েছে, আমাব মাথায় বাড়ি হয়েছে। হুজুর ! আমার জাত-কুল-মান সকলি গেল। (সক্রন্দনে) হায় ! আমার কি হবে ?

ইন—(কনস্টবলদেব প্রতি) তোমবা কি অবস্থায় দেখেছো।

প্র কন—এইভাবেই দেখেছি।

ইন—লাশ উন্টাও।

প্র কন—(ঐ রূপ করিয়া) এই তো দাগ জখম দেখছি।

ইন—কোথায় কোথায় দাগ জখম আছে দেখ।

প্র কন—হুজুর, এই পিঠে পাছায় গালে দাগ দেখা যাচ্ছে। আর অধোদেশ ফুলো, আব থান থান রক্ত।

আবু—হায় হায়। আমার অদৃষ্টে এই ছিল ? (কপালে আঘাত করিয়া) হায় ! খোদায় এই করে এই দেখালে !

ইন—দুজন কুলি বোলাও।

প্র কন—ঐ দুই ব্যাটাকেই ডাকি।

ইন—আচ্ছা লে আও ! ডাক্তার সাহেবকে লাশ পাঠাতে হবে।

প্র কন—(দুই চাষাকে ধৃত করল) তোদের লাশ নেঃজেলায় যেতে হবে।

প্র চা—কর্তা আমরা মোসলমান, মরা মানুষ ছুঁতে পারবো না।

দ্বি চা—আমাদের জাত যাবে, আমি পারবো না।

প্র কন—কি পারবিনে, পারতেই হবে (ঘাড়ে ধরিয়া) শালা পারবিনে, উঠাও লাশ উঠাও।

দ্বি চা—না বাবা। মেরেই ফেল আর কেটেই ফেল আমরা পারবো না, আমাদের জাত যাবে। এ কাম আমাদের নয়।

প্র কন—(মুঠাঘাত কবিয়া) নে বাঞ্চত, লাশ নে।

দ্বি চা—এই নিচ্ছি।

[চাষাঘরের লাশ লইয়া প্রস্থান]

ইন—জমিদারের পক্ষের লোক কোথায়?

প্র কন—হজুর, তারা ভয়ে আপনার কাছে আসছে না। গ্রামে আছে—চলুন।

ইন—আচ্ছা চল—

[সকলের প্রস্থান]

পটাক্ষপণ

তৃতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বিলাসপুর।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছারি।

(ম্যাজিস্ট্রেট, কোর্ট ইনস্পেক্টর, কয়েকজন আসামী, আবুমোলা এবং উকীল মোক্তার দর্শকগণ, আরদালী প্রভৃতি উপস্থিত।)

ম্যাজি—হামি আর সাক্ষী চাই নে।

কোর্ট ইন—(নিকটে যাইয়া) আসামীদের পক্ষে আর কয়েকজন সাক্ষী উপস্থিত আছে!

ম্যাজি—নেই, সাবুদ হয় (ফরিয়াদির মোক্তারের প্রতি) টোমুরা কুচ সাওয়াল হয়?

মোক্তা—ধর্মাবতার (গাত্রোথান)

উ কি —(আসামীস পক্ষে) ধর্মাবতার—

ম্যাজি—ও হ'টে পারে না, টুমি আসামীৰ পক্ষে আছে, টোমার বক্তৃতা শেষে হটে পারে! (বাদীর মোক্তারের প্রতি) টোমার আর কি আছে?

মোক্তার—(স্বস্ত্বেৰ চাদৰ বাবে বাৰে বাৰে নাড়িয়া এবং মোচে তা দিয়া) ধৰ্ম্মাবতার! এই মোকদ্দমার বাদি আবুমোল্লা প্রজা। আসামী হায়ওয়ান আলী জমীদার। প্রজা মোল্লাৰ স্ত্রীকে বলপূৰ্ব্বক ধৰিয়া আনা, বলাৎকার কৰিতে থাকা ও তদুপৰি যত্ন হওয়ার প্রমাণ হইয়াছে। আর সেই জমীদার, সেই জমিদার আসামী আব কয়েকজন আসামীকে মৃত্বে কৰিয়া প্রাণভয়ে কোথায় পালিয়েছে তার সন্ধানমাত্র নাই। ইহাতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে আসামীগণ সম্পূর্ণরূপে দোষী ও অপরাধী। ধৰ্ম্মাবতার! খোদাবন্দ! হায়ওয়ান আলী (থুথু ফেলিয়া থুবড়ি) হায়ওয়ান আলী যাঁ জমীদার মপস্থলে প্রজার হস্তাকৰ্ত্তা জমীদার। তাদের আদালত ফৌজদারী জমীদারই নিষ্পত্তি কৰিয়া থাকে—প্রজার পুৰস্কৰ বিবাদ নিষ্পত্তি হ'ক বা না হ'ক আপনি নজরের টাকা হলেই হল! প্রজার শাসনভয়ে মুখে কথা নাই, জমীদার যা বলেন কোন মতেই তার অবাধ্য হইতে পারে না। জমীদারের অজানিতে কোন মতেই প্রজা বিচাৰের প্রার্থনায় আদালত আশ্রয় কৰিলে তখন জমীদার একেবারে অগ্নিমুখি হইয়া তার ভিটেমাটি একেবারে জালিয়ে ছাৰখাৰ কৰে দেন। আর ইহাও অপ্ৰকাশ নয় যে—

ম্যাজি—চুপ, চুপ আসল কথা বল—

মোক্তার—খোদাবন্দ ধৰ্ম্মাবতার! এই মকদ্দমায় জমীদার স্বয়ং আসামী, স্তত্ৰাং প্রমাণ হওয়াই দায়, তবে যে হজুর এতদূর হয়েছে সে কেবল সত্যি ঘটনা বলেই হয়েছে। নতুবা গরীবের সাধি কি যে মকদ্দমা করে। হায়ওয়ান আলী যে চরিত্রের লোক তার প্রমাণ এই দেখুন—(বায় দর্শন) ইতিপূৰ্বে সাহেব জাদা হাকিমের আমলে এক হিন্দু স্ত্রীকে জাবরণে ধরে এনে সতীত্ব হরণ করেন। ঐ প্রকার কত কুলবালার সতীত্ব নাশ করেছেন, ধ্বংস করেছেন, নষ্ট করেছেন, মাথা খেয়েছেন, জাতপাত করেছেন, সে আমি বলতে চাই নে। ধৰ্ম্মাবতার! ওদের নিষ্ঠুরতার বিষয় কত প্রমাণ আছে। প্রধান প্রধান হাকিমের রায়েতে প্রকাশ আছে। (উপবেশন।)

উকীল—ধর্মাবতার ! মোক্তার মহাশয় যে এতক্ষণ ব'কে গেলেন এ মকদ্দমা সম্বন্ধে কি বলেছেন, কিছুই বলেন নাই। জমীদার এমন করে—জমীদার প্রজার প্রতি দোরাআ করে—জমীদার প্রজার সর্বস্ব হরণ করে—সে কথা এ মকদ্দমায় কিছুমাত্র সংশ্রব নাই ; হায়ওয়ান আলী কি করিয়া দোষী হইতে পারে,—তিনি অতি ধনবান, বিশেষতঃ বিচক্ষণ ধর্মপরায়ণ, বয়স এ পর্য্যন্ত ৪০ বৎসর হয় নাই। তার দ্বাবা এমন কাজ হওয়া কখনই সম্ভব হয় না। কেবল মনোবাদ সাধন জন্ত এই মিথ্যা নালীশ উপস্থিত হয়েছে, কোন সাক্ষীতেই এমন স্পষ্ট প্রমাণ দেয় নাই, যে আমাব মক্কেল নূব্বেন্নেহাব আওরতকে জবরাণ বলাংকাব কবেছেন. আব সেই বলাংকাব কবেছেন, আব সেই বলাংকারে তাহাব প্রাণ বিয়োগ হয়েছে, ফবিয়াদী আব মোল্লা বড ফেরেববাজ।

আবু—(গলবস্ত্রে অগ্রসর হইয়া) ধর্মাবতাব ! আমি নিতান্ত গরীব, আমার সাধা কি যে, জমীদারের নামে মিছে মকদ্দমা করি ? হুজুব সে—

ম্যাজি—চুপ চুপ—(কোর্ট সব ইনস্পেক্টরের প্রতি) দারগার রিপোর্ট পড।

কোর্ট ইন—(রিপোর্ট-পাঠ আরম্ভ) ফবিয়াদীর দ্বীর নূব্বেন্নেহাব আওরতের মৃতদেহ দৃষ্টে ও সাক্ষী হামছায়াগণের বাচনিক জোবানবন্দীতে ও তমিজদীন আসামীর স্বীকৃত জওয়াবের মধ্যে ও তাহার সন্ধানে বাদীর বাসস্থান গ্রামের তালুকদার ১ নং আসামী হায়ওয়ান আলী ও তত্ত্ব ভ্রাতা সিরাজ আলী সহিত ঐ গ্রামের আংশিক তালুকদার কাতল মারিয়া নিবাসী লাল বিহারী সাহার জমাজমী লইয়া বিবাদ ও মনবাদ হওয়ায় ছায়েল মজকুর ঐ খাদিগের আশ্রিত লোক থাকিয়া এদানিক তাহাদের অসম্মতিতে সাহাদের অহুগত ও বাগ্ম হওয়ায় হায়ওয়ান আলী অতি লম্পট ও চুষ্ট স্বভাবের মনুষ্য বিশেষ উক্ত মনোবাদে বাদীকে নিষাতন ও স্বীয় কুপ্রবৃত্তির সাধন জন্ত আপন চাকর ও অহুগত ২ হইতে ১৮ নং প্রতিবাদী-গণের সহিত জোটবদ্ধ হইয়া অমুক তারিখে অধিক রাতে ফবিয়াদীর প্রতি বাদী ২ নং আসামী বাটীর নিকটে থাকিয়া ছায়েলের দ্বী প্রস্তাব করার জন্ত ঘর হইতে বাহির হইলে তাহাকে বলপূর্বক ধৃত করিলে ঐ দ্বী সোর করাতে বাদী প্রভৃতি বাহির হইয়া সোর করায় তাহাদিগকে ভয়

প্ৰদৰ্শন দ্বাৰা হটাইয়া স্ত্ৰী মজুকুৰাব মুখাদি বন্ধ কৰিয়া হতাসাঙ্গে শূণ্ণভাবে আপন বাহিৰ বাটৰ পূৰ্ব দ্বাৰি বৈঠকখানা ঘৰেৰ মধ্য লইয়া ও মুখ বন্ধ কৰিয়া বলাৎকাৰ কৰা ও নানা মত অত্যাচাৰ কৰিয়া কষ্ট দিয়া হত্যা—কৰা স্পষ্ট প্ৰমাণ ও প্ৰকাশ পাইলেক যে ২ নং হইতে ১০ নং আসামীগণ ভাৰতবৰ্ষেৰ দণ্ডবিধি আইনেৰ ৩৫২ । ৩৫৪ । ৩০২ । ৩৭৬ ধাৰাব অপৰাধ ক্ৰমে ধৃত হইয়া ইত্যগ্ৰে ফৌজদাৰী আদালতে চালান হইয়াছে ১ নংপ্ৰধান আসামী ও ১১ হইতে ১৮ নং আসামীগণ বাড়ি ঘৰ ছাড়িয়া পলায়ন কৰায় অনেক তলাসে এ যাবত তাহাদিগকে প্ৰাপ্ত না হইয়া স্থানে স্থানে সন্ধানী লোক প্ৰেৰণ কৰত ধৃত কৰাৰ পক্ষে যথোচিত চেষ্টা থাকিয়া (এ) ফাৰাম সহ আবশ্যকায় সাক্ষীগণকে হজুবে পাঠানো হইল। আব সিরাজ আলী মজুকুৰ অপৰাধী দ্বাৰায় বাদীৰ স্ত্ৰীৰ মৃতদেহ বাগানে ফেলিয়া রাখা অৰ্থাৎ দণ্ডবিধি আইনেৰ ২০২ ধাৰাৰ অপৰাধে কৰা প্ৰকাশ ও যে জ্ঞা জামানত থাকাতে তাহাৰ গ্ৰেপ্তাৰি ওয়াৰেন্ট প্ৰচাৰ হওয়াব জ্ঞা কোর্ট ইনস্পেক্টৰ মহাশয় দ্বাৰা প্ৰাৰ্থনা কৰিয়া বিদিতাৰ্থ নিবেদিলেক হজুব মালিক নিবেদন ইতি। সন তাৰিখ মাস।

ম্যাজি—ডাক্তাব সাহেবেৰ মাৰ্টিফিকেট কোথায় ?

কোর্ট ইন—নথিতেই আছে।

ম্যাজি—(নথি উন্টাইয়া দেখেন, কিছু কাল পৰে বায় লিখিতে আৰম্ভ এবং কোর্ট ইনস্পেক্টৰ দ্বাৰা পাঠ)

কোর্ট ইন—ভকুম হইল যে গড়হাজিৰা আসামীগণেৰ নামে ওয়াৰিন কৰিয়া গ্ৰেপ্তাৰ হয়, আৰ হাজিৰা চালানী আসামীগণকে দায়বা সোপর্দ কৰা গেল। সন তাৰিখ মাস।

পটাক্ষপণ

তৃতীয় অঙ্ক

—তৃতীয় গৰ্ভাঙ্ক

ৰিলাসপুৰ জিলাৰ সেদন আদালত

[দায়বা বিচাৰ]

(ভজ্জ, উকিল, ব্যাৰিষ্টাৰ,—আসামী, সাক্ষী, পেঙ্কাব, আৱদালী, জুৰীগণ ও দৰ্শকগণ)

পেঙ্কা—(জজের নিকট গিয়া) হজুর, জুরির সংখ্যা পূর্ণ হয় নাই একজন গর-
হাজির।

জজ—ডেকে আনতে পার।

পেঙ্কা—(দর্শকগণ মধ্যে একজনকে সংকেতে ডাকিল) আপনি এদিকে আসুন।

দর্শ—(নিকটে যাইয়া) বলুন।

পেঙ্কা—আপনি জুরি হতে পারেন?

জজ—আপনি কে আছে?

দর্শ—খোদাবন্দ—আমি—আমি (ষোড় হাত) না না খোদাবন্দ, কিছু কস্তর নাই,
আমি জনপান খাচ্ছি (বস্ত্র হইতে চিড়ে-মুড়কী পতন)

জজ—এই, টোমার জুরি হ'তে হবে।

দর্শ—দোহাই ধর্মাবতার! আমার কোন কস্তর নাই, আমি কিছু ঘাট করি নাই;
আমি কোষ্টা কিস্তে খাচ্ছি। পথে স্তনলেম যে আবুআল্লাহ বোয়ের খুনি
বিচার হচ্ছে। হজুর! তাই আমি দেখতে এয়েছি, ধর্মাবতার! ভয়ে
আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে আমি আর কিছু জানি নে হজুর! দোহাই ধর্ম—

জজ—নেই, নেই হাম টুমকো জুরী করে গা, টোমারা ক্যা নাম? (গাত্রোতান-
পূর্বক শিশ দিয়া তুডি এবং ভঙ্গি করিয়া নৃত্য)

দর্শ—(সক্রন্দনে) হজুব! দেশের মালিক যা মনে করেন তাই করতে পারেন,
কিন্তু আমি কিছুই জানি না।

জজ—(ব্যঙ্গ ভঙ্গীতে) তোমার নাম ক্যা ছায়?

দর্শ—(সরোদনে করষোড়ে) আব্জান বেপারী হজুর। খোদাবন্দ—

জজ—টোম ঐ চেয়ারমে বয়ঠো।

আব—(বেগে পলায়নোত্ত)

জজ—পাকডো—পাকডো। (আরদালী কর্তৃক ধৃত হইয়া চেয়ারে বসন)

আব—(চেয়ারের একপার্শ্বে উপবেশন করিয়া) হজুর! আমি কিছুই জানি না,
সকলকে জিজ্ঞাসা করুন, আমি কিছু জানি না।

জজ—চুপরাও!

আব—এইবারই গেলুম! (নিস্তক)

(বিচার আরম্ভ)

পেঙ্গার—[জজসাহেবের নিকট করষোড়ে] হজুর, ছাপাই সাক্ষী আরও দুজন আছে ।

জজ—লে আও

পেঙ্গা—(আরদালীর প্রতি) জিতু মোল্লা সাক্ষীকে ডাক ।

(আদালত রীতিমত আরদালীর দ্বারা তিনবার ফোকরানো)

[ঢিলে পাজামা, সাদা চাপকান পরা, মাথাগ পাগড়ি, তসবি গলায়, হাতে যষ্টি, বুদ্ধ জিতু মোল্লা প্রবেশ এবং হলফপাঠ]

জিতু—আমার নাম জিতু মোল্লা, বাপের ফেতু মোল্লা, বয়স ৬০।৭০ বৎসর,
মোল্লাকি ব্যবসা ।

জজ—মোল্লাকি কি ?

জিতু—কোরান প'ড়ে আমরা মুরিদকে শোনাই, দুটো আখেরের কথা কই বাতে দীন-দুনিয়ার ভালই হবে ! বিয়ে-সাদীর কলমা পড়াই । মানিকপীরের সিন্নি ফয়তা দেই, আর মুরগী জবাই করি, হজুর এই সকল কাজ আমার—

জজ—(গাত্রোখান করিয়া) টুমি এ মকদ্দমার কি জানে ?

জিতু—আমি আবুমোল্লার কুটুম । যেদিন এই মামলার বাত হয়েছে, আমি সেদিন আবুমোল্লার খলিফা ঘরে বসে সারারাত্তি আল্লা আল্লা ক'রে জেহর করছি, আমি রাতে ঘুম পাড়ি না ।

জজ—টুমি ঘুম পাড়ো না, তবে কি কর ?

জিতু—সারারাত জেগে আল্লার কাছে রোনা পিটনা করি ।

ব্যাবি—নেই, ও বাত নই, টুম কুচ্ গোলমাল শোনা হয় ?

পেঙ্গা—হাকিম জিজ্ঞেস করছেন সে বাজে তুমি কোন গোলমাল শুনেছিল ?

জিতু—সে বাজে কোন গোলমাল হয় নাই, এসকল কেবল মিছে করে আবুমোল্লা এদের বারদিয়েছে ।

ব্যাবি—টুমি মস্কায় গেয়া ?

জিতু—জোনাব ! গেছলাম । আমি চারবার আজ করেছি ।

ব্যাবি—মোল্লার জরু কি করে মরেছে, টুমি তার কিছু জানে ?

জিতু—জানবে না ক্যা ? আবুই মারতে মারতে একেবারে খুন করেছে ।

ব্যাবি—আবু কেও মারা ?

জিতু—ও নাহি কার সঙ্গে কথা কৈল ।

বারি—হায়ওয়ান আলী কেমন লোক আছে—

জিতু—(তসবিতে কপাল চুলকাইয়া মাথা নাড়িয়া) আহা, এমন লোক তুনিয়া
জাহানে আব নাই। বড় দিনদার, বড় দাতা, মক্কায় যাঈবার সময়
তামাবে পঞ্চাশটি টাহা দেয়।

বারি—হায়ওয়ান আলী নুরনেহারকে মাঝিয়াছে ?

জিতু—(দুই গালে হাত দিয়া) তোবা তোবা তোবা ! সে কি এমন কাজ
করতে পারে। তা কখনো হবার নয় !

বারি—আচ্ছা তুমি যাও।

[কলম ছুঁয়া জিতুব প্রস্থান]

[নামাবলি গায়ে, কোপিন এবং বহিবাস পরিধান, সর্কাঙ্গে তিলক ছাপা, হস্তে
গলে তুলসীর মালা, কণ্ঠে কুঁড়াজালী, কক্ষে খুলি, হরিনাম জপ করিতে
কবিতে দ্বিতীয় সাক্ষী হবিদাসেব প্রবেশ এবং পূর্বমত হলফ পাঠ]

হবি—আমার নাম হরিদাস, পিতার নাম ঠাকুরদাস ; বয়স ৪০।৫০ বৎসব। আমি
বৈরাগী, ভিক্ষা করি।

বারি—আবুমোলাব জ্ঞাত কে খন ক'বেছে টুমি কিছু জানে ?

হবি—(মালা টিপিতে টিপিতে) রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ। আমি কিছু জানি না।

বারি—কিছু শুনিয়াছে ?

হবি—শুনেছি হজুর।

বারি—ক্যা শুনা হায় ?

হবি—হরিবোল ! হরিবোল ! শুনেছি আবুমোল্লাই মেবে ফেলেছে। উঃ কি
পাপিষ্ঠ !! হরিবোল হরিবোল !

বারি—আবুমোল্লা কেমন লোক ?

হবি—সে বড় করাববাজ, একদিন আমি—

জজ—তুমি কি ? কেবল কবিয়াছে (উচ্চহাস্য করিয়া পূর্ববৎ তুড়ি ও শিশ দিয়া
নৃত্য এবং ইংবেজী গান করিয়া দর্শকদের প্রতি দৃষ্টি করতঃ হাস্তপূর্বক
উপবেশন)

তুমি—একদিন তুমি কি ?

হবি—হজুর ! একদিন আমি, ভিক্ষে করতে গুদের ঝাড়িতে গেছিলুম। ঠাকি

দিয়ে আমার ঝোলা দেখি ব'লে কেড়ে নিয়ে চালগুলো ঢেলে নিলে ; শেষে
ঝোলাটা পায় প'ড়ে চেয়ে নিলুম । ও বেটা বড় ফেৰেববাজি ! ওর
জ্বালায় গাঁয়ের লোক জ্বলে মল । রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ ।

ব্যাৰি—মোল্লার স্ত্রীৰ চৰিট কেমন ছিল ?

ব্যাৰি—(দুই কানে হাত দিয়া) রাধে গোবিন্দ । আমার মুখ দিয়া সে কথা
বেকাবে না—(দীৰ্ঘনিশ্বাস) মেরে ফেলেছে কি জন্তু—দীনবন্ধু !

ব্যাৰি—এই আসামীরা কেমন লোক ?

হৰি—বড় ভাল মানুষ । আব সেই জমীদার বড়লোক, বড় ধাৰ্মিক । গৰীব
লোকদেব প্রতি তাব ভাৰি দয়া । আমার বৈষ্ণবী যখন খাঁ সাহেবেব
বাড়িতে যান তিনি কাপড়, ঢাকা, পয়সা, চাল দয়া করে দিয়ে থাকেন ।

বা উ—তোমাব বৈষ্ণবীৰ নাম কি ?

হৰি—কৃষ্ণমণি ।

বা উ—ইজুর সেই কৃষ্ণমণি ।

জজ—হাঁ, হাঁ, আমি জানে ।

(ডাক্তার ক্যানিংহাম সাহেবেৰ প্ৰবেশ)

জজ—How are you ?

ডাক্তার—Thanks ! Quite well.

জজ—Please take your seat. How is Mrs. CUNNINGHAM ?
i have not seen her for a long time. (মুদৃষ্ণে) More than
six months.

ডাক্তার—Thanks ! She is in delicate state and this is the
seventh month.

জজ—Oh ; (ঐষং হাস্ত করিতে করিতে অধোবদনে লিখনীতে দস্তাঘাত) Do
you like to go soon ?

ডাক্তার—Yes, she is alone.

জজ—(আসামীৰ ব্যাৰিস্টাৰেৰ প্রতি) DR. CUNNINGHAM is in hurry
and I think it is better to take his deposition first.

ব্যাৰি— Yes, I have no objection.

বা উ—(দণ্ডায়মানপূর্বক) ছজুর হরিদাস সাক্ষীর প্রতি আমার সওয়াল আছে ?

জজ—Wait, wait (ঐযংক্রোধে) Baboo, can't you wait (মৃদুস্বরে) natives ! Let me take DR. CUNINGHAM's deposition first.

(বাদীর উকিল নিঃশব্দে চেয়ারে উপবেশন)

(ডাক্তার সাহেবের হস্তে জজের বাইবেল দান)

ডাক্তার—(বাইবেল চুম্বনপূর্বক) My name is F.B. CUNINGHAM; aged 72 years. I am the G. Surgeon of Bensaff district. I made the port-mortem examination of the body of Nooren-nehari, a healthy good looking woman, aged about twenty years, sent by the officer-in-charge of Dharmoshala police station. No marks of external violence except on the genital profuse discharge of blood from the said part ; the lungs highly congested on digesting away the skin of throat extravasation of blood observed, all other organs found healthy. (ব্রতভাবে) In my opinion she must have died of sanguinous apoplexy of the brain.

জজ—(মৃদুস্বরে) Must be brain disease. (বাদীর উকীলের প্রতি)
টোমার কুছ সওয়াল আছে ?

বা উ—ডাক্তার সাহেব জবানবন্দী দিলেন ইহাতে স্পষ্ট প্রকাশ হচ্ছে যে স্ত্রীলোকটি অধোদেশ হইতে রক্ত নির্গত এবং গলার চর্মের নীচে রক্ত জমা হইয়াছিল
এ কারণে কি ব্রেন ডিজিজে মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা ?

জজ—হাঁ, কেন হবে না ? ডাক্তার সাহেব কহিতেছেন ; হোবে, হোবে ।

বা উ—ছজুর ! ডাক্তার সাহেবকে ঐ সওয়ালটা জিজ্ঞাসা করা উচিত ।

জজ—(বিরক্তি সহকারে মৃদুস্বরে) ছুট ! (ডাক্তার সাহেবের প্রতি) Is it possible that profuse discharge of the blood from the Vagina and extravasation of blood beneath the skin of the throat, produced sanguinous apoplexy of the brain ?

ডাক্তার—(উচ্চহাস্তপূর্বক) হা হা হা ! If fever can produce enlargement of spleen then why not the soft blood will produce sanguineous apoplexy of the brain ?

জজ—আর কিছু সওয়াল আছে ?

বা উ—হজুর, আমরা মেডিক্যাল সার্জেন্স ভাল বুঝি না। আর কোন সওয়াল নাই। (উপবেশন)

জজ—(ব্যারিস্টারের প্রতি) Have you anything to ask Dr. CUNNINGHAM ?

ব্যারি—(সাক্ষ্যে) To whom ? To DR. CUNNINGHAM ?

জজ—Yes.

ব্যারি—Certainly not ; he is perfectly right.

জজ—(ডাক্তারের প্রতি, Then you can go ; give my compliments to Mrs. CUNNINGHAM.

ডাক্তার—Thanks.

[প্রস্থান]

ব্যারি—(হরিদাসের প্রতি) টুমি কোন কোন তীর্থ দেখছ ?

হবি—গয়া, কাশী, পেঁড়ো আর কত তার নামও জানিনে।

জজ—(ঈর্ষ হাস্তপূর্বক) টুমি লেখাপড়া জানে ?

হবি—নাম সই করতে পারি।

জজ—আচ্ছা, দস্তখত কর।

[নাম সই করিয়া হরির প্রস্থান]

জজ—(বাদীব উকীলের প্রতি) বাবু আপনি এইক্ষণে বক্তৃতা করুন।

[পাঁচ মিনিটকাল উকীলের বাজনা বক্তৃতা]

[পনেরো মিনিটকাল ব্যারিস্টারের ইংরেজী বক্তৃতা]

আবু—দোহাই ধর্মাবতার—আমাবু প্রতি বড় অগ্রায় হয়েছে—বড় দোরাঅ্য হয়েছে।

ব্যারি—টুম চোপরাও।

আবু—আমার বাড়িঘর সব গিয়েছে, জাতও গেছে হজুর ; আমার কিছুই নাই ; (ক্রন্দন) আমার সর্বনাশ হয়েছে।

জজ—চূপবাও ।

আবু—দোহাই ধখাবতাব । আমাব প্রতি বড অন্ডায় হয়েছে—আমি নিতান্ত
গরীব ।

জজ—চূপবাও । (কিঞ্চিং পবে জুরীগণেব প্রতি) Is the case guilty or
not ?

জুরি—(যথাস্থানে এক ঐকা হইয়া) Not guilty.

ব্যারি—(হো হো শব্দে হাস্যপূর্ব্বক পুস্তকাদি টেবিল হইতে হস্তেকরণ এবং জজের
একটু খেসামোদ)

জজ—(রায় লিখিতে আরম্ভ, ক্ষণকাল পরে দণ্ডায়মান হইয়া) ডিসমিস্—আসামী-
গণ খালাস । (হাতে তুড়ী দিয়া নৃত্য)

ব্যারি—(হাস্য কবিস্য) সেক্‌হেণ্ড ।

পটাস্কপণ

(নটীর প্রবেশ)

নটি—(স্বগত) হায়, হায় এ কি হলো ? হা ভগবান তুমি কোথায় ? হায় হায়
এ জগতে অর্থ ই সকল দোষের মূল ।

হায়রে পাতকি অর্থ ! তোব লাগি ভবে—

সুধু তোব লাগি ঘটে যত অত্যাহিত !

অবলা অমূল্য বস্ত্র সতীন্দ্র রতন,

হরিল জন্মতি পাপ পাষণ্ড কর্কর

জমীদার ! ধখাসনে হলো না বিচার !

কারে কই মনো দুঃখ কারে বা জানাই

এ বারতা ? শোকসিন্ধু উথলিছে মনে—

কারে বা জানাই ? কেন কেন এ জিজ্ঞাসা ?

দুজন জিজ্ঞাসা-পাত্র সম্মুখে আমার—

জানাইব তাঁরে যিনি সর্ব্ব নেত্রবান্,

সর্ব্বদশী মহেশ্বর, জগত-কারণ,

সর্ব্বময় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বশাস্তা বিড়ু,

জৈলোক্য ঈশ্বর যিনি, পরম ঈশ্বর—
 অন্তঃসত্ত্ব ধর্ম বার সदा আজ্ঞাবহ,
 তাঁরে বিজ্ঞাপিব শোক মনে যত আছে—
 এইভাবে জিজ্ঞাসিব কহ কহ দেব,
 হবে না কি দারিদ্র্যের এ দুঃখ মোচন ?
 রবে না কি অবলার সতীত্ব রতন ?
 আরো বিজ্ঞাপিব শোক কান্দি তাঁর কাছে,
 ঈশ্বর-প্রসাদে যিনি ভারত-ঈশ্বরী,
 যাচিব কেবল ভিক্ষা ডাকি বার বার,
 কর মা কর মা দিনে কর মা নিস্তার ।

সঙ্গীত ।

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা ।
 কাতরে ডাকিমা তোরে শুনমা ভারতেশ্বরী ।
 অবহিত অবিচার আব ঝাঁচিনে মরি মরি ।
 থাক মা সাগর পাবে কভু না হেবি তোমায়ে,
 বক্ষ মা প্রজা কিস্করে, বিনয়ে মিনতি কবি ।
 অবলা সরলা সতী, তাহে ছিল গর্ভবতী,
 সে সতীর এ দুর্গতি, উছ মরি মবি ।
 সবল দুর্বল পরে, হেন অত্যাচার করে ?
 রক্ষ মা দীন প্রজারে, মা তোমার চরণ ধরি ॥
 দয়া মমতা পালিনী, প্রজার দুঃখ বিমোচিনী
 দীন দুঃখ-নাশিনী, মা তুমি শুভঙ্করী ;—
 জননী বলিয়ে ডাকি, শুন সিদ্ধু পারে থাকি,
 করুণা কটাক্ষ রাখি, তার মা ভারতেশ্বরী ।

(নটের প্রবেশ)

নট—প্রিয়ে ! আর দুঃখ করলে কি হবে ? আমাদের কথা কে শুনে ? আর কেইবা
 আমাদের দুঃখে দুঃখিত হয় ? হায় ! চ'খের উপর এমন অগ্নায় হলো ?
 হায় ! হায় ! দিন-দুপুরে ডাকাতি হলো ! দীনহীন প্রজার ধন, মান,

প্রাণ পর্যাস্ত গেল, তার প্রতিশোধ কিছুই হলো না। (ক্ষণকাল চিন্তা) যাক
আমাদের আর সে কথায় কাজ নাই। আমাদের কথায় কেবা কান দেয় ?
নটি—বলেন কি ? আমাদের এই কান্না কি কেউ শুনবে না। গরিবের প্রতি
কি কেউ নজর করবেন না ?

[দীনবেশে ক্রন্দন করিতে করিতে আবুমোল্লাব প্রবেশ]

নট—আবার কি হয়েছে ? উঃ কি ভয়ানক।

আবু—আমার সর্বনাশ তো হয়েইছে—হায়ওয়ান আলী মোকদ্দমা জিতে আমার
বাড়ি ঘর ভেঙ্গে চুরে খানে ওয়ারাণ ক'রে ফেলেছে। আমার আর দাঁড়াবার
লক্ষ নাই। (ক্রন্দন) হায় হায়। আমার ধন মান সকলি গেলো, বিষয়
সম্পত্তি যা কিছু ছিল সকলি লুটে নিয়েছে। আমায় গ্রাম থেকে তাড়িয়ে
দিয়েছে—আমার অন্ন বস্ত্র কিছুই নাই। (ক্রন্দন)

নট—কি নির্দয় !! কি নিষ্ঠুর !!!

নট নটী—(উভয়ের দুঃখিত স্বরে সঙ্গীত)

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

কবে পোহাইবে ভবে এই দুঃখ বিভাবরী।

উপায় না হয় ভেবে নিয়ত ভাবনা করি ॥

কবে দেব দিবাকর, বিকাশিয়ে স্তম্ভকর,

নাশিবেন তম ঘোর, ঘোর অন্ধকার ছবি ?

ওহে বিপদ বারণ, কর বিপদে তারণ,

তম কর নিবারণ নিবেদন কবি :—

তুমি দেব সর্বময়, কাতরে করুণাময়,

নাশ কর দীন ভয়, শ্রীপদ কমল ধরি ॥

॥ যবনিকা পতন ॥

এর উপায় কি ?

(প্রহসন)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম রঙ্গভূমি

(নয়নতারার ঘর, নয়নতারা আসীনা)

নয়ন—(পান সাজিতে সাজিতে) একথানা ঢাকাই শাড়ি দেখিয়ে পাঁচজনাব কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা নিয়েছি। মার বিয়ে হয়েছিল কিনা—জুনি নাই। বাবা কেমন চিনি না, কখনও দেখি নাই; সেই বাবার ঘোড়া চড়া সাধ হয়েছিল বলে, তাতে বেশ দশ টাকা লাভ কবেছি। সোনা-রূপার অলংকার যা আছে, সকলি আমি করেছি। এত করেও ‘হাবা’ কথাটা মায়ের মুখ থেকে সরাতে পারেন্নে না। ফাঁকি দিয়ে আজ কিছু টাকা হাত করে, মাকে দেখিয়ে বলবো যে, মা! দেখ দেখি তারা নাকি কিছু বোঝে না। এখনি এর একটা ফন্দি এঁটে বাখি। (পান সাজা বাখিয়া একটু চিন্তা) দূর কর, আর কি কবব, জামাইয়েব ঢাকাই শাড়িই আমার লক্ষ্মী, এই শাড়ি দেখিয়েই বাজি মাত করবো। খাটানও কল, খাটাতে জানলে আর পট যায় না। আজ বড়দিন, বাবু যে কম করে বড়দিন করবেন, সে তো কথাই নয়। বড়লোক বড় রকমেই বড়দিন করে থাকেন, এখনও যখন দেখছিেন, তখন বোধ হচ্ছে যে, একেবারে তয়ের হয়ে আসছেন। তা আমি আগেই একথানা মলা কাপড় পরে এখানা সামনে ফেলে রাখি। (কাপড় পরিতে গমন)

(অঙ্ক দ্বার দিয়া জগার প্রবেশ)

জগা—ও মা!—বাবু আসছে। কৈ, কোথা গেলে গা। (স্বগত) যাক মরুগগে, যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাক, ফাঁকতালে গোটাকত পান চুরি করি (কয়েকটা পান লইয়া কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে) কৈ গো, ও মাঠাকরুন ! বাবু এসেছেন। ওগো বাবাঠাকুর এসেছেন।

(অঙ্ক কাপড় পরিয়া ঢাকাই শাড়ি হস্তে নয়নতারার প্রবেশ ।)

নয়ন—বাবু কৈ ?

জগা—এই এলেন, বেশি দূরে নয়। আমি দেখেই খবর দিতে এসেছি।

নয়ন—(শাড়ি ভাঁজ কবিত্তে কবিত্তে) আসছে আসুক, তুই বিছানাটা ভাল করে ঝেড়ে তামাক সেজে নিয়ে আয়। আর খবরদার! কাল রাত্রে কথার মুখে আনিসনে, তোর পেটে তো ছাই কিছুই হজম হয় না। তুই একপ্রকার পাগল। (কাপড় সম্মুখে বাঁধিয়া দুঃখিতভাবে উপবেশন) যা বেটা যা, তামাক সেজে আন, ঐ কথা শোনা যাচ্ছে।

(কিঞ্চিৎ পরে বাধাকান্ত এবং মদনবাবুর প্রবেশ)

জগা—ও বাবা—আজ যে মেজেষ্টার সাহেব সেজে এসেছে।

(হুঁকা লইয়া প্রস্থান)

রাধা—বডবো, প্রাতঃপ্রণাম। মুখে কথা নাই যে? মাথা ধরেছে? না পেটে ব্যথা উঠেছে? এ কি? কথাটা কি? লক্ষণ ভাল নয়, যাত্রার ফল বুঝি ফলে যায়। ও মদনবাবু! বড়দিনে, আপনাকে নিমন্ত্রণ কবেছি। বেশ বড়দিন কল্লেম। যে গোল দেখতে পাচ্ছি এত শিগগির মেটবার নয়। আমাব কপাল! আর তোমাব মাথা। দিন বুকেই কল বিগড়েছে! দেখি! বউ, কথা কও। ও বউ, কথা কও।—

মদন—আর বউ কথা কও—মনে ব্যথা না পেলো কি শান্তুড়ী আমার বউ হয়ে ঘাড় গুঁজে বসে আছেন?

রাধা—(নিকটে যাইয়া) কিসের ব্যথা? কোথায় ব্যথা? (নয়নতারার ঘোমটা টানিয়া ফেলিয়া) ও বউ! কথা কও, এক বছর যদি বাঁচি তবে তো আবার বড়দিন পাব? (নয়নতারা চক্ষু বুজিয়া অভিমান) কথা রাখ, চেয়ে দেখ, কেমন সাহেব সেজেছি। তোমার জামাই বড়দিন করে একেবারে গলে পড়ছেন, আমি গলি নাই; কিন্তু টলেছি। মম্মোহন দাদা ঢলিয়েছেন, আর তোমার সন্ন্যাসী দাস পথে পড়ে ধুল খাচ্ছেন। (চিবুক ধরিয়া) তোমার এ কি ভাব?

নয়ন—(হাতে ঝ্যাটকা মারিয়া) গায়ে হাত দিও না। ভালয় ভালয় বলছি, আমাকে বিরক্ত করো না।

মদন—আর কেন, বোঝা গেছে।

বাধা—তুমি ছেলেমানুষ, এ-সকল ভার সহজে বুঝবার সাধ্য নাই। আগে একটু সাধ্যসাধনা করে দেখি। (জাম্বু পাতিয়া ষোড়করে গলধস্তে যাত্রার স্বরে)

মানময়ী—মানে ক্ষমা দে। ২—

আজ মান করিবার দিন নহে ॥

কৈ না, এতে যে কিছুই হলো না। থাক, নেচে গেয়ে বকশিশ নেব, আরও কথা কওয়াব, মদনদাদা আমার সঙ্গী হও তো (নৃত্য করিতে করিতে গীত ও সময় সময় সাহেবী নৃত্য)

—খেমটা।

স্বর - কাহারোয়া জাল বিনে রে।

বড় বাহার দিয়েছ বৌ বড়দিনে বে।

বড়দিনে ওলো বৌ বড়দিনে বে,

বড়দিনে ওলো বৌ বড়দিনে রে।

আমি তো তোমারে বৌ কিছু বলি নাই।

মাথা তুলে কও কথা মনে বাথা পাই ॥

কিসে এত মন-দুঃখ হলো কি অস্থখ।

হাসিমুখে চেয়ে দেখ দেখি চাঁদমুখ ॥

অজানিতে যা করেছি তা গুনিব পাছে।

আগে না হয় সাজা কর, গোলাম হাজির আছে ॥

(রুমাল গলায় জড়িয়ে ষোড়করে দণ্ডায়মান)

(কলিকায় দু' দিতে দিতে জগার প্রবেশ)

নয়ন—(রোবে বাধাকান্তবাবুর দিকে হস্তবৃত্ত জ্ঞাতি নিক্ষেপ) এখানে মরতে এয়েছ কেন ? (পাছ ফিরিয়া মাথায় খোমটা দান)

জগা—বাবা, এখনি যে গায় লাগতো।

(ত্রস্তে প্রশ্নান)

মদন—কেমন বকশিশ !

বাধা—থেমে যাও বাবা, আর একবার, এই পাড়ি দিয়েছি। বড় ঢেউ কাটিয়েছি।

এখন কেবল ইশারিনিটুকু আছে।

মদন—সাবাস যোর বাবা! এই হুনিয়ার জুজানে টিকে গেলে—কত জাহাজ-বজরা পড়ে গেছে। তুমি আশনি সাবাসে আছন।

রাধা—তাই তো বাবা, এইবার সামলাতে পাচ্ছে হয়। (নিকটে বাইয়া) বলি, ও বড়বৌ ! এত কেন ? (সুরের সহিত) পেট যে কেঁপে ওঠে, আর লুচি খাব না।

নয়ন—(ঈষৎ ক্রোধে) আমি আজ কথা বলব না।

রাধা—(সুরের সহিত) এই তো বাবা—বলেছ ?

নয়ন—বলেছি বলেছি, আর বলব না।

রাধা—(সুরের সহিত) এই দুবার হল।

নয়ন—বেশ তো, দুবার কেন তিনবার হলো।

রাধা—তবে বেশ তো, চলুক—বড়দিনে আবার চলুক।

নয়ন—(হুঃখিতভাবে) তোমার বড়দিন, তোমাবই আছে, আমার কি ?

রাধা—তোমার কি ? (চিবুক ধরিয়া) বলি ও ক্ষেপি ! তোমার কি ? জগৎ তোমাব, আমি তোমাব, প্রাণ তোমার, রাধা তোমার, কাস্ত তোমার।

নয়ন—(আড়নয়নে চাহিয়া) থাক, আব বলতে হবে না। জগৎ আমার, তুমি আমাব, তোমার প্রাণ আমার, এত ছেনালি করে আর জালিও না।

রাধা—কেন ? তোমাব জন্তে আমি প্রাণ তো দিয়েই রেখেছি। তার উপরেও যদি কিছু থাকত, তাও না হয় দিতাম। তুমি যা ভাব তা নয়। দেখিয়ে দেও দেই কিনা ?—করি কিনা ?

নয়ন—(মাথার কাপড় ফেলিয়া ঈষদ্বাক্তে) আচ্ছা, এখনি পরীক্ষা হোক, স্বহৃ মুখে বলে চলবে না।

রাধা—আচ্ছা তুমি বল, যদি না পারি শেষে অল্প কথা। না বলতেই মুখের দোষ দিলে। এ মুখ বেদ-মুখ, যা বলব সে বেদবাক্য।

নয়ন—এই কথা। তবে শোন (রাধাকান্তের কানে কানে প্রকাশ।)

রাধা—(বিকৃত মুখে) এতেই এত ? ছি ছি। এত তুচ্ছ কথা !!—ছি ছি, মাটি করেছ, প্রাণ মাটি করেছ, ছি ছি !!!

নয়ন—না না সত্যে বলছি, বড় সৰু করে, এই কাপড়খানা নিয়েছি। বিশখানা কাপড় থেকে এইখানা বেছে বার করেছি। মার কাছে টাকা চাইতেই তো একেবারে খেউ খেউ করে ঝাঁটা হাতে করে উঠলেন। দোকানি বেটা দুবার এসে, শেষ বারে ভারি কড়া কড়া কথা বলে গেছে। .করি কি

ভাই, কাপড়ের মায়াও ছাড়তে পারিনে, টাকাও হাতে নাই। হাতে না থাকলে কে কাকে দেয় ?

রাধা—বড় লজ্জার কথা, তোমার হাতে টাকা নেই বলে আমার দেউলে নাম বের করো না। টাকার জন্তে তোমাকে কড়া কথা বলে গেছে ? নয়নের তারাকে কড়া কথা বলে গেছে ?—রাধাকান্তবাবুর নয়নতারাকে কাপুড়ে বেটা কড়া কথা বলে গেছে ? এ দুঃখ রাখি কোথা ? দিক আমার টাকায়, দিক আমার মায়ায় !! শত দিক আমার চৌদ্দপুরুষে ! সে বেটার বাড়ি কোথা ? কোথাকার সে বেটা ? তুমি যে তার দোকান শুদ্ধ কিনতে পার, তা বোধ হয় সে বেটা জানে না ? ন-ন ! তোমার কমি কিসে ? কাপড়ের দাম কত ?

নয়ন—বেশি নয়, দশ টাকা।

রাধা—ছি ছি ! মরে যাই। গলায় কলসী বেধে উলুবনে ডুবে মরি। দশ টাকার কাপড়ের জন্তে মুখ ভারি ! মদন দাদা ! এ কি আর গায়ে নয় ? এত বড় তার বাপের যোগ্যতা। টাকার জন্তে কড়া কথা বলবে ? (পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া দশ টাকা কাপড়ের দাম, আর পাঁচ টাকা বেটাকে বকশিশ দিও। ক্যা বাৎ হায়। এখন বড়দিন করি।
[উচ্চৈঃস্বরে] ও বেটা বীদরমুখো ?—বাবা জগন্নাথ !

জগা—(নেপথ্যে) আজ্ঞা !

রাধা—ব্রাণ্ডি লাও।

জগা—(নেপথ্যে) জল ?

রাধা—জল খাবে তোর বাবা। শালা ব্রাণ্ডি লাও। (ব্রাণ্ডি লইয়া জগার প্রবেশ)

মদন—আবার ব্রাণ্ডি। অল্প আর কিছু হোক। কেমন খাণ্ডি ?

নয়ন—খাণ্ডির ব্রাণ্ডি না হলো (মাথা নাড়িয়া) হবে না—হবে না। [টাকা উঠাইয়া] বড়দিন,—বড় রকমে হওয়া চাই।

রাধা—মদনবাবু ! আর কত বলব, সময় থাকতে শিখে নেও। যতন করে মনে রেখ। এ-সব কথা বড় কাজে লাগে। বাবা ! ব্রাণ্ডির বাড়ি ব্রাণ্ডি না খেলে কোন কালে মজা হয় না। ওর শাস্ত্রই আছে, ব্রাণ্ডির বাড়ি ব্রাণ্ডি, এয়ারের বাড়ি বিয়ার, শালা বাড়ি শ্যাম্পিন, শিকারে সেরি, আর বোট-

পোট্ট, এই হোল মদ খাওয়ার ব্যবস্থা। বাঁচ আর মর, মাতাল-উন্নতি সভার সভ্য, এখানে উপস্থিত থাকতে কখনই নিয়ম ভঙ্গ করতে পারবে না।

মদন—তবে পালা আরম্ভ করি।

রাধা—ও কথা মুখে এন না, ও রস পচে গেছে। মদ খাওয়ার একটি নূতন নাম বেরিয়েছে। ‘লেখাপড়া করা।’

মদন—বা-বা খাসা নাম বেরিয়েছে। তবে দিন ‘লেখাপড়া করি।’

রাধা—(মৃদু দান) লেখাপড়া কর—কিন্তু ধেবডো না।

মদন—তবে আগে আপনি।

রাধা—তা পারি নে।

মদন—তবে শাওড়ী ?

রাধা—বৌ, নেও লেখাপড়া কর।

নয়ন—না-না আমি লেখাপড়া করতে পারব না।

রাধা—ওরে বাপরে ! তা কি হয়ে থাকে, না পার, চেরা মই কর।

নয়ন—(গ্রাস লইয়া এক সিপ পান এবং নয়নতারা কড়ুক সকলেরই মজ্জপান।)

[সন্ন্যাসী দাসের প্রবেশ]

সন্ন্যাসী—[টলিতে টলিতে] এই তো এসেছি। চেনা পথে কি আর বাবা—সন্ন্যাসী দাস ?

মদন—ওকে এখানে কে আনলে। বাবু ! ও বেটা বদমাইশকে কসে দুই-চার ঘা চাবুক মেরে তাড়িয়ে দিন। শালা চোর পরের খেয়ে নিজে মাতলামি করবে, আর সকলকে ফাঁকি দেবে। আচ্ছা করে চাবকে দিন।

নয়ন—না না, অমন করতে নেই, এর পরে কি আর তাড়াতে আছে, না মারতে আছে ?

রাধা—সন্ন্যাসী দাস, এ কি ? খবর কি ? এখানে কেন ?

সন্ন্যাসী—এই তো বাবা, সীমা আর বেশি দিন নাই। উঠেছি ভবের ধূলাখেলা মিটে গেছে।

মদন—আপনি যত শীঘ্র যান, ততই দেশের মঙ্গল। গায়ে কাঁদা লেগেছে কেন ?

পিরানটা ছিড়লে কি করে ? খুব মজার লোক দেখছি।

সন্ন্যাসী—ওয়ে ছোঁড়া ! মাছ ধবতে গেলেই গায়ে কাঁদা লাগে । হেস না, সীমা দেখ । [টলিয়া পড়িতে উত্তত ।] এই তো ।

মদন—দেখ, গায়ে অমনি পড় না ।

সন্ন্যাসী—আমি অমনি বন্ধ মাতাল কিনা ? আমার হুঁশ জ্ঞান নেই কিনা ? ছোঁড়া-দের পাকামু দেখে আর বরদাস্ত হয় না । রাস্তায় পড়ে ধুলাখেলা করেছি । এস একবার, এস বড়দিন ।—যৌশু-জন্মের জন্মদিন এস না—যৌশু-জন্মের কোলাকোলি করি । সকল কোলাকোলির মজা নেওয়া চাই । বিজয় দশমীর কোলাকোলি, ঈদেব নমাজের পর কোলাকোলি, আজ যৌশু-জন্মের কোলাকোলি । মদন ! চট না, ফেটে চোঁচির হয়ো না, এস, খ্রীষ্টানের মজাও দেখ । আজিকার কোলাকোলিতে কি স্থখ পাও, তাও দেখ ।
[মদনবাবুকে জড়িয়ে ধরেন]

মদন—তুই বেটা নিতাস্তই চাষা । [জোরে ছাড়াইয়া পদাঘাত]

সন্ন্যাসী—[চিত হইয়া পড়িয়া] এ বাজি ভাল নয়, ফেব বাজি [উঠিতেই মুখ ঘুঁসিয়া পতন]

নয়ন—সন্ন্যাসী দাস, এ কি ? মাতলামি কববে রাস্তায় যাও ।

সন্ন্যাসী—বাস্ বাবা—

বাবা মল মদ খেয়ে খুট এল ঘরে ।

‘রোজে’ নিয়ে রোজ রোজ কত মজা করে ॥

কত মদ খেতে পারে সন্ন্যাসী গোঁসাঁই ।

মাসীমার কথা শুনে লাজে মরে যাই ॥

নয়ন—সন্ন্যাসী দাস ! এক গ্লাস খাবে ?

সন্ন্যাসী—দেবেই ত । মাসী এতদিন পবে কি মনে পড়েছে ?

বেটা বল কেটা তোর মাসী ।

মাসী মাসী বলে বেটা গলায় দিলি ফাঁসি ॥

[নয়নতারার হস্ত হইতে মত্ত লইয়া পান] এ কি পাকা মাল বে ?

কোথা পেলো বাবা ? মাসীমা ! কোথা পেলো ? খুব খাঁটি আসল । ভেল-

ভেজাল জলের কারকার নাই । নম্বার ‘এক্সা’ ।

মদন—আমরা কি চাকা যে কাঁচা মাল খাই ।

সন্ধ্যা—আমিও চাষার নন্দন নয়, জানিস ? জাতি কৈবর্ত বামুনের ঝাঁক মারি। আমি কি কম লোকের সন্তান। আমার বাবার বাবা, যে-টাঁই মাছ ধরত, ঠাকুরমার মুখে শুনেছি, তা কেউ চক্ষেও দেখেনি। বাবা, রাজারহাট চেন ? সেই রাজারহাটের দক্ষিণে রানীরহাট, ঠিক বিবিরহাটের পাশেই কপীরহাট, সেই আমার পিতামহের জন্ম-মাটি, নামটাই কি যেমন তেমন—নাম হুম্মান দাস। সন্ধ্যাসী দাস আসল নাম নয়।

মদন—এতকাল শুনলেম সন্ধ্যাসী দাস, বেটা আজ বলছে হুম্মান দাস।

সন্ধ্যা—কথাই শোন, রাগ কর কেন ? যে সন্ধ্যাসী সেই হুম্মান। ভিন্ন কি রে বেটা ? শোন, আমার জন্মকাহিনী শোন। আমি সন্ধ্যাসীর আশীর্বাদি ছেলে—তারকেশ্বরের মোহন্ত তখন হয় নাই, তা হলে মোহন্তের আশীর্বাদেই হতেম। আমি হতেই মা'ব বেঁজ নাম, বাবার ঝাঁটকুড়ো নাম, কা'ব' কার' আইবড নাম ঘুচে গেছে। তাইতে কেউ কেউ আহ্লাদ করে আমায় ঝাঁটকুড়োর নন্দন বলেও ডেকে থাকে। এই ঝাঁটকুড়োর নন্দন আগুনে পুড়বে না, জলে ডুববে না। বল, এখন ডুবে দেখাই। মা গঙ্গা পতিতপাবনী মা। একবার ডুব দেই। [ভূমে পতন]

রাধা—যে যা না পারে সৈতে যে না পাবে, সে তা কেন খায় ?

মদন—ও কি নিজে খেয়েছে ? আকর্ষণে টেনে নিয়েছে এই সকল তিন ঢুকে ছটাকে মাতালেই তো মদের সর্বনাশ করে ভদ্রলোকের ঘর থেকে তাড়ালে। এ দশা দেখলে কি আর মদের নাম শুনেতে ইচ্ছা করে। ছি, ছি !

নয়ন—যাক, তা আব তুমি কি বলবে। সকলেরই ঐ দশা। ধরে রাখবার লোক থাকলেই ভদ্রলোক, না থাকলেই মাতাল। তা যা হক। আমি একে রোজের বাড়িতে রেখে আসি।

রাধা—তুমি এই অন্ধকারে কোথা যাবে ? জগাকে ডেকে দিই আর না হয় আমি যাই। তুমি বাড়িতে থাক !

নয়ন—না তা হয় না, পুরুষ মাতালকে পুরুষে ঠাণ্ডা রাখতে পারে না। তুমি রাস্তায় গেলে একাকার হবে। আমি কি পাগল যে, সন্ধ্যাসী দাসের সঙ্গে

রাত্রে তোমাকে যেতে দিই। [সন্ন্যাসী দাসকে উঠাইতে অনেক চেষ্টা]
এ কি ? ও যে আর উঠে না।

মদন—ওর কেবল চালাকি। তামাসা দেখবেন। [সন্ন্যাসীর পায়ে চাদর ঝাঁষিয়া]
এইভাবে টেনে নিন।

রাধা—[টানিতে আরম্ভ]

সন্ন্যাসী—কুইক, বি কুইক, জলদি চালাও।

[বাধাকাস্তের সন্ন্যাসী দাসকে লইয়া প্রস্থান]

মদন—মাতাল কি আব কথায় জন্ম হয়। এখন বেটা গিয়ে পথে আচ্ছা গোল
বাধাবে।

নয়ন—আমরা তো ঘবে আছি। তাতে আর ভয় কি ? জামাই সেদিন বড়
চালাকি করে গেছে।

মদন—তুমিই আজ কম কি কল্লে, কাপড় দিয়েছি পূজার সময়। দোকানী কড়া
কথা বলে আজ। সাজিয়ে ছিলে তো মন্দ নয়। তোমায় চেনা ভার।

নয়ন—তুমি কি ? বাছা তুমি ত কম নও, যার খাও তারই গুণ গাও, দেখ তো
তোমাব অসাধ্য কি আছে ?

মদন—খাণ্ডি ! বাবু তো কিছু টের পান নেই।

নয়ন—পেলেই কি ! আমি তো ঘরের মাগ নই যে ভয় করে ডরিয়ে চলব।
এত কি ? আসে লক্ষ্মী, যার বালাই। আমি ওর জন্তে একেবারে পাগল
কিনা ? সরে এস। (মদনবাবুর জাহ্নতে মস্তক রাখিয়া শয়ন) জগা, ও
জগা ! খুঁমিয়েছিস ?

জগা—(নেপথ্য) না।—

নয়ন—বাবু এলে কেসে উঠিস। (মদনের প্রতি) জামাই। অনেকদিন গান
শুনিনে।

মদন—তা বলি কিন্তু—

নয়ন—যদি তাড়াতে পারি। নানা আঙ্গ মাপ করবে, ওর মাগকে দেখাবে বলেছে,
আজ ওদের বাড়ি যেতে হবে।

মদন—বাবুর জী বড় ভাল মানুষ।

নয়ন—ভাল মন্দে কান্ন নেই, দেখতে পেলেই হল। তুমি গান কর।

মদন—(নয়নতারার মুখের দিকে মাথা নওয়াইয়া মুখের নিকটে হস্ত নাড়িয়া গান)

কাওয়ালি ।

(স্বাশুড়ি গো) মন-দুঃখ মনে রহিল ।

আশা না পূরিতে বুঝি প্রেমবাসা ভাঙ্গিল ॥

পিরিতি কাননে, ভ্রমিব গোপনে ।

পাবে না সন্ধান কেউ, জানিব না স্বপনে ।

মরি মরি এ কি দায়, মন যেন ডেকে কয়,

আর কি ভাবিছ । প্রেমে বিবহ ঘটিল ॥

নয়ন—(মদনবাবু বৃকে সাহসসূচক চপেটাঘাত করিয়া) ভয় নাই । ধৈর্য ধর ।

(জগার প্রবেশ)

জগা—বাবু আসছে ।

নয়ন—(তাড়াতাড়ি উঠিয়া) এখন সরে বস ।

(রাধাকান্তবাবুর প্রবেশ ও জগার প্রস্থান)

রাধা—বড় শীত (কাঁপিতে কাঁপিতে) আজ বড় শীত । বেটা রাস্তায় বড় জ্বালাতন করে মেরেছে । শেষ না পেরে কাঁধে করে নিতে হয়েছিল । একা হলে পার-তুম না, হঠাৎ গাঙ্গুলী ডাক্তার সঙ্গে দেখা হল, সে আর আমি একত্রে কাঁধে করে নিয়ে একেবারে আড্ডায় ফেলে দিয়েছি, শালা কাঁধের উপরে ছবার বমি করে আমার গায়েব কোটি নষ্ট করে ফেলেছে । (কোট খুলিতে খুলিতে) বো ! এক গ্রাস ঢাল ।

নয়ন—এত কাঁপনি উঠেছে কেন ? (রাধাকান্তের হস্তে মৃদু দান)

রাধা—(মস্তশান করিয়া) বাঁচা গেল, সাতখানা লেপ গায়ে দাও, যেখানে কাঁক পাবে সেইখানেই শীত সঁদবে । আগুন জ্বলে দাও, গায়েব উপরকার চামই গরম হবে । মা স্তরেররী পেটে পড়লে অন্ধরে বাহিরে, ভিজরে উপরে যেন একেবারে বেলাতী কঙ্গলে মোড়ান হয় । বো ! আর এক গ্রাস ।

নয়ন—এত ভাল নয়, পায়ে দড়ি পড়বে । (মস্তশান)

রাধা—গলায় দড়ি পড়লে ছাড়ব না বাবা (মৃদু লইয়া পান) বউ ! তবে আজ রাত্রেই দেখাশুনা হলে যাক । কেন আর অদেখা থাকে ।

নয়ন—আমি তোমার বাড়ি গিয়ে কি ঝেঁটা খাব। তোমার গিন্নী, আমার নামে কুকুর পোষেন। দেখলে কি আব আস্ত রাখবেন। ঝেঁটার বাড়িতে তোমার, আমার হাড় চুর করে দেবেন।

রাধা—চুর করতে আর হয় না, যদি হয়, তবে চুর হবে, না বৌ। সে বড় খাসা লোক, গেলেই দেখবে।

নয়ন—চল, এক যাত্রায় দুই ফল হবে। বাড়ি দেখাও হবে, ঘরেব গিন্নীও। কিন্তু ভাই-জামাইকে সঙ্গে নিতে হবে।

রাধা—চল দাদা! আমার বাড়ি, তোমাব বাড়ি, আমার ঘর তোমার ঘর।

নয়ন—ও কথাটা আর বাকি রাখলেন কেন? তোমার বউ, আমার ভালবাসা, তোমার ভালবাসা।

রাধা—বাধা হান্ কি। চল দাদা।

মদন—যে আজ্ঞা, আমি হাজিৰ।

নয়ন—তবে যাত্রা করে নিই। [নয়নতারা-কর্তৃক সকলেব মত্তপান]

রাধা—তবলাটা নিই, গিল্লিকে এয়ারকি দেখাব। বড় বৌ। নাচবে তো।

নয়ন—অত বসিকতা ক'র না। মাগকে আব নাচ দেখিয়ে কাজ নেই, শেষে বেঁধে রাখা দায় হবে। আমার জালাতেই দিনরাত মাথা দিয়ে আগুন উঠছে। আবাব তার চোক কান ফুটিয়ে, আব কাজ নেই। এই আছ ভাল। সে ভদ্রলোকের মেয়ে, তাই তো টের পাও না, আমাব মত হলে তোমাব প্রাণ থাকত না।

রাধা—যাক, মদের বোতল আর গ্লাসটা নিতে হবে। (মদের গ্লাস লইয়া) সকলেই আবার যাত্রা করি। (বাধাকাস্ত-কর্তৃক সকলেই মত্তপান)

(নয়নতারা-কর্তৃক গান)

স্তব—আড়খেমটা।

আজ আমি মালক্ষেতে ফাই—

[আজ] প্রেম যাচিবারে ফাই। দেখি হারি কি হারাই,

যা থাকে কপালে হবে, তাতে ক্ষতি নাই ॥

আমার নয়নতারা, আমার নয়নতারা,

বেলেছে যে এত দিন, [আমি] দেখিব তাহাই !!

ভালবাসা জানা যাবে, কপটতা না রহিবে,
প্রণয়ও পরীক্ষা হবে, (আজ) দেখিবে জামাই ॥

সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় বঙ্গভূমি ।

রাধাকান্তবাবুর বাড়ি, মুক্তকেশীর শয়নঘর ।

(মুক্তকেশী এবং রাইমণি আসীনা)

রাই—তুমি হয়ে এত সয়ে থাক । আমি হলে এত দিন যা মনে হত, তাই করতেন
কা'র মুখের দিকে চাইতেম না । কয়েদিব মত ছুবেলা ছুটা খাব, আব
মনের আগুনে গুমরে মরব, একটি কথাও বলতে পাব না । বল তো এত
কার প্রাণে সয় ? আজকাল ঘবেব বৌ হলেই যে চিবকাল মনের আগুনে
জলেপুড়ে মরতে হবে, এত আব বিধাতা কপালে লিখে দেন নাই ?

মুক্ত—বিধাতা যে লিখে দেন নাই, তাই বা কি কবে বুঝতে পারি, শতকের মধ্যে
যখন একটাও খুঁজে পাইনে, তখন আর অদৃষ্টের দোষ না দিয়ে কার দোষ
দেব !

রাই—শুধু অদৃষ্টের দোষ দিলে হবে না, তোমার দোষ আছে ! তুমি কি করে সয়ে
থাক, আমি তা ভেবে উঠতে পারি না । এত কি করে চোখে দেখে সওয়া
যায় ।

মুক্ত—[মলিন মুখে] সৈ । আমার মনেব কড়া তো তোমার কাছে কিছুই চাপা
নাই । যখন যেভাবে রয়েছি তুমি সকলেই জান । আজকাল যে দুঃখে দিন-
রাত যাচ্ছে, তা না জানতে পাচ্ছ এমন নয় । এ কি হল ? এখন আর প্রাণে
সয় না । আগে মাসান্তবে দুই-একদিন দেখা পেতাম, কোন কোন দিনে
হাসি তামাসা করে দুই-একটা কথা বলতেন । আমি ভাবতেম যে আমার—
আমারই আছে, সময় সময় মুখখানা দেখলেই আমার হল, সাধও মিটলো ।
যেমন চেয়েছি, তেমনি বিধি দিয়েছেন । স্মৃথই কি আর দুঃখই কি ? এখন
এমন হয়েছে, দেখাশুনার নাম নেই । আমি যে একজন তাঁর বাড়িতে আছি,
আমায় যে কখনও বিয়ে করেছিলেন, (ক্রন্দন) এ তাঁর মনে আছে কিনা
সন্দেহ । চিরকাল আইবড় থাকতেম সেও ভাল ছিল, বিধবা হয়ে ঘরে বই-
তেম, তাতেও দুঃখ হত না, থেকে—নেই, আমার আমার নয়, আমি যার,

সে পরের। আমি দিনরাত কাঁদি। সে মনেও করে না, এ দুঃখ আর করে বলি।

রাই—তুমি আগে হাত খাট করে ঢিল দিয়ে ঠেকেছ, মনে মনে জানতে আমিই সকল, আমি ভালবাসা। সময় সময় হেসে দুটো কথা বলতেন তাত্তেই আহ্লাদে গলে পড়তে। সৈ! পুরুষের মন পাওয়া ভার, তাদের চাতুরী আমাদের বুঝবার সাধ্য নাই। এ তো কথাই আছে, “নূতনে পোড়ে বন, পুরাতনে জ্বালাতন”। এর পর তুমি যেমন হাবা, একালে আব একটি জোড়া পাওয়া ভার। এখন কলি কাল, সোজা কথায় চলে না, হাবা মেয়ে হলে ভাতার জন্ম থাকে না; নরম গরম দুই চাই। কখনও ভয় দেখাতে হয়, ভরসাও দিতে হয়। আমি তো অনেক দিন থেকেই দেখে আসছি যদি কোন দিন রাগ করে মুখখানি ভার কবে বসে থাক, বাবু এসে ছুট কথা বলতেই জ্বল হয়ে গেলে, হাসি দেখে অমনি হেসে ফেলে সকল কথাই ভুলে বসলে, এতে চাই আর কি হবে ?

মুক্ত—সৈ, মনের কথা বলি! মনে ঝাঁচ কবি যে, আজ একখানা ক’বব, আবার ভাবি, যে আজ না হয় কাল করব, এত ভাবতে হঠাৎ একদিন তাঁর মুখখানি নজরে পড়লো সকলেই ভুলে যাই। হাসিমুখে ছুট কথা শুনলে, আর আগের ভাব কিছুই মনে থাকে না।

রাই—তা বুঝেছি। অমন করেই তো তোমার মাথা তুমি খেয়েছ। বানরকে নাই দিলে মাথায়, তা জান।

মুক্ত—ছি, সৈ। স্বামী তাকে—

রাই—তা যাই বল, মনমোহিনীর কথা শোন নাট, আজকাল স্বামী বলে পূজা কল্লে চলে না, সে কালও নাই, তেমন স্বামীও নাই। এখনকার মদখোর আর বেশাখোর স্বামী যে বানব হতেও বাড়া। তুমি যদি ছুবেলা দু-ঘা কসে জুতো মারতে তাহলে এক করে মাথায় চড়ত না। মেয়ে বলি মনমোহিনী! যেমন বিষ তেমনি রোজা। একদিন কার বাড়িতে গিয়েছিল, এই কথা শুনে বসিকবাবুকে তো আচ্ছা করে বিষঝাড়া ঝেড়ে, সেই মাগীকে মা বলিয়ে ছেড়ে দিলে। চন্দ্রদাদা নেতার ঘরে বসে ইয়ার নিয়ে মজা করছিলেন, কুমুদিনী সেই রাতে বাড়ি হতে গোপনে বেরিয়ে নেতার ঘরের

কানাচি দাঁড়িয়ে বড় বড় করে বলতে লাগল ; চন্দ্রবাবু ? আমার স্বামী, আমি স্ত্রী, আপনি গোপনে এখানে লুকচুরি খেলছেন, আমি চলেম । চন্দ্রবাবু শুনে একেবারে কুমুদিনীর পা ধরে কতরকমে সেধে বাড়ি নিয়ে গেলেন । আর কখনো কা'র নাম করেন না ।

মুক্ত—(কাতর স্বরে) যা হবার তা হয়েছে । সৈ ! এখন এর উপায় কি ? কত লোকের কাছে কত কথা শুনি । পাড়ার ছেলে মেয়ে আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে আর কত বলে । কেউ বলে দুইজন মদ খেয়ে পাগলের মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুবে বেড়ায় । লজ্জা তো নাই, মান অপমান বলেও ভয় নাই । আবার শুনি যে, একদিন দুজনে মাঝামাঝি করে যা না বলতে পারে, তাও বলাবলি কবেছে ।

রাই—কি বলেছে, মা বাবা বলাবলি করেছে, এই তো ? ও কথা ত মাতালের আসল বোল । ও কথায় কিছুই গোল নাই । ভালবাসার ডাকই ঐ ।

মুক্ত—মিছে নয়, আবার শুনি যে কিছুই না । যেমন তেমন রয়েছে । ছি ! ছি । কি ঘৃণা ।

(নেপথ্যে)

জিতা রাও বাবা বৈতরণী পার হই, দেখে যেও, বাবা ! অঁধারেতে পা সাবধান, দেখে যেও । “দেখে যেও সোনার যাদু, (আমি) যাচ্ছি তোমার আঁচল ধরে । অঁধারেতে পা সরে না মাথার কিরে যাবে ফিরে ॥” ধিরে যাও—এ ব্রজরাই ধিরে যাও ।

মুক্ত—এ যে বাবুব গলার আগুয়াজ । এ কি । বাড়ির মধ্যে আসছেন তবু যে গান থামচে না ।

রাই—বুঝি বেশি করে খেয়েছেন, আজ বড়দিন, দু তিন বোতল খেয়ে ঢুলতে ঢুলতে গলাবাজি কবে আসছেন, কথায় বেঠিক হচ্ছে, যা মুখে আসছে তাই বলছেন ! এই সময় আমি একটু আড়ালে যাই । সৈ ! মাতাল হলে মন বড় সাদা হয় । এই রকমে যে গান করতে করতে তোমার কাছে আসছেন, অবিশি মনে পড়েছে, অবিশি কিছু মনে হয়েছে । আমার মাথা খাও, আজ ছেড না, একটু ধল্লিই মনের কথা শুনতে পাবে । ঐ আসছেন, আড়ালে গিয়ে বসি ।

(প্রস্থান)

[বোতল বগলে, গ্লাস হস্তে মাতাল অবস্থায় নয়নতারা এবং মদনবাবুর সহিত বাধাকান্তের প্রবেশ]

বাধা—[নয়নতারার প্রতি] প্রিয়ে ! এই বিবিসাহেবের ঘর, ঐ আমার ঘরের লক্ষ্মী । মদনদাদা । ঐ আমার অঙ্কলক্ষ্মী, ঐ আমার মাথার মণি, ঐ আমার জাত-কুলমানরক্ষাকাবিণী, ঐ আমার মুখপানে চাহিনী, (যাত্রার সুরে) ঐ বসে আছেন ! তোরা দেখ দেখ, দেখ একবার, চেয়ে দেখ । (হস্ত দ্বারা দর্শন) ঐ গগনের চাঁদ আমার ঘরে, একবার চেয়ে দেখ ।

মুক্ত—পোড়া অদৃষ্টে আর কি আছে ? পরমেশ্বর । এই দেখালে ? (পলাইতে উদ্যত)

বাধা—[বোতল গ্লাস বাথিয়া মুক্তকেশীকে ধাবণ] ভয় পেয়েছ ? গাঁ কাঁপছে যে ? ভয় নাই, ভয় নাই । চক্ষে জল পড়েছে ? ছি ছি ! আমায় লজ্জা দিলে ? ছি লক্ষ্মী ! আমাব এয়াবে মজলিসে মাটি কল্লে । আমি এমন বসিক, এমন চতুর বাবা, আমার ঘরের গিন্নী ভয়থেক ? মাহুস দেখে, কেঁপে কেঁদে ফেললে ? ছি ছি ! চেয়ে দেখ, দেখ তোমার জোড়া মিলিয়ে এনেছি । কেঁঠোকুব মেয়েমানুষেবে হাতী সাজিয়ে, ঘোড়া সাজিয়ে, মজা কবে চড়ে বেড়াতেন, আমি হাতী ঘোড়া করব না, তোমাদের যুড়ি হেঁকে বেলাতী চক্রে ঘুবব, এইটি বড় সাধ আছে । (মুক্তকেশী বহু ধবিয়া উভয়ে উপবেশন) আমাব কোলে বস, না না আমার মাথায় বস, মান কবেছ ? সাজা কব, যা ইচ্ছে সাজা কব, মান ভাঙ্গুক । একটু মদ খাও দেখি, [গ্লাস লইয়া মুখের নিকট ধাবণ] সব বাগ মাটি হবে । তুমি জান না ? এতে রাগ মাটি হয় । দ্বেষ, হিংসা মন থেকে দু'শ হাত সবে যায়, একবার খাও দেখি ?

নয়ন—কিবে ডেকবা পোড়ারমুখ ! এই দেখাতে আমায় এখানে নিয়ে এসেছিস ? আমি যাই, জামাই চল, আমার মাথা খাও, চল, [মদনবাবুর গায়ে ধাক্কা দিয়ে] চল, এখানে আর থাকব না ।

বাধা—তুই বাবা ঘরে যা । আমি এই ঘবে থাকি ।

নয়ন—(ক্রন্দন করিতে করিতে) তোর মনে এই ছিল, আমায় বাড়িতে এনে এত অপমান করলি, আমি এ প্রাণ রাখব না, আমি যাই, (যাইতে উদ্যত)

এবং মদনবাবু কর্তৃক ধারণ) জামাই, আমায় ধ'র না। আমি আজ গলায় দড়ি দেব। ও বেহায়া পাঞ্জি মাগ নিয়ে মজা করুক। তুমি ছাড়, গলায় দড়ি দেব।

রাধা—(ত্রস্তে মুক্তকেশীকে ছাড়িয়া নয়নতারাকে ধারণ) তুমি যেখানে যাবে আমিও সেখানে যাব।

নয়ন—(রাধাকান্তকে পদাঘাত কবিয়া) তুই তোঁর মাগকে নিয়ে থাক। আমি তোঁব মুখ দেখবো না—আমি কখনও তোঁর মুখ দেখবো না।

রাধা—(ঘোড়াকরে) মাপ কর, আমি আব কখনও এ ঘরে আসব না, মুক্তকেশী'ব মুখ আব দেখব না। আমায় মাপ কর।

মুক্ত—জাত গেল। লোকে এ কথা শুনে মুখে চুনকালি দেবে। তুমি যেখানে ছিলে, সেইখানে থাকাই ভাল ছিল। এভাবে কেন আমার বাড়িতে সর্বনাশ করতে এয়েছ? আর ঐ ভদ্রসন্তানকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে কি এই দেখালে! আব গোল ক'ব না, যেখান হতে এয়েছ, সেইখানে চলে যাও।

নয়ন—দেখ পাঞ্জি! কোন মুখে এখানে রয়েছিস। দূর দূর করে শেয়াল-কুকুরে'ব মতো তোকে তাড়াচ্ছে, তবু তোঁব লজ্জা হচ্ছে না?

রাধা—কার সাধ্য আমাদের তাড়াতে পারে। যে বলবে আমি তাঁর মাথা ভাঙব। (তাড়াতাড়ি গ্লাস লইয়া) এই বোতলে'ব বাড়িতে মাথা ভাঙব।

[সজোরে মুক্তকেশীর দিকে গ্লাস নিক্ষেপ, গ্লাস মৃত্তিকায় পতন ও ভগ্ন এবং কঁাদিতে কঁাদিতে] আমি মদ খাব কিসে? আমার গ্লাস ভেঙে গেল, অ্যা আমাব গ্লাস দে। দে—দে—

নয়ন—ভাল চাও, তবে বাড়ি চল, না হয় জুতিয়ে মাথা ভাঙব।

মদন—(নয়নতারাব প্রতি) তুই বেটি ভারী পাঞ্জি। ভদ্রলোকের বাড়ি এসে—এ কি? যা, তোঁব বাবাকে নিয়ে যা ইচ্ছে কর, আমি বাড়ি যাই।

নয়ন—ও দিকে যোগাড় হ'ল নাকি? আমিই পাঞ্জি! বেশ বললে।

রাধা—মদনবাবু! একটু দাঁড়াও, তোমায় মারে কে? আমি আজ ঘর থেকে যাব না। মুক্তকেশীকে তাড়িয়ে নয়নতারাকে এই পালঙ্কে শুইয়ে—তুমি আমি খাড়া পাহারা দেব।

নয়ন—তোর আর ভালবাসা দেখাতে হবে না, তুই চল ।

রাধা—আচ্ছা, আমায় একটু ছেড়ে দেও, আমি এ ঘর থেকে মুক্তকেশী হারাম-জাদিকে তাড়িয়ে দিই ।

নয়ন—যা বলতে হয়, এখান থেকেই বল, কাছে যেতে দেব না । মারতে গিয়ে কাছে দাঁড়ালেও আমার গা জ্বালা করে ।

রাধা—তা আমি বেশ বুঝি, আমায় ছেড়ে দাও, দেখ তোমার মনের দুঃখ এমনি মেটাচ্ছি । ছেড়ে দাও, আমায় ছেড়ে দাও । (ছোরে ঘাইতে উত্তত ও নয়নতারা পশ্চাৎ হইতে পিরান এবং পিবান ছিড়িলে পরিধেয় ধারণ)

নয়ন—আবার যেতে চাও ? চল আব থাকতে পারব না । (গমনোত্তত)

মুক্ত—(নিকটে যাইয়া) দেখ, তোমাব দুখানি পাশ ধরি, একটু দাঁড়িয়ে হত-ভাগিনীৰ দুটি কথা শুনে যাও ।

রাধা—তোব কি কথা শুনবো বে প্রাণ ! তুই গাইতে জানিস নে, নাচতে জানিস নে, এমন বদবসিকের কথা বাধাকান্ত শুনতে পাবে না ।

মুক্ত—তা হক, আমি শ্রী, আমাব একটি কথা শুনে যাও (চরণ ধরিতে উত্তত) অভাগিনীৰ দুঃখের কথা শুনে যাও ।

রাধা—(সজোবে পদাঘাত কবিয়া) এই শুনি ।

[মদনবাবুর প্রস্থান]

নয়ন—জামাই ! দাঁড়াও, আমরাও আসছি, আব দুই-এক ঘা দেখে গেলে না ?

মুক্ত—এমন কবে এদেব সামনে অপমান করলে ?

রাধা—আমায় আর শেখাতে হবে না । নয়নতারা ছেড়ে দেয় না বলে বেঁচে গেলি । যদি বাঁচি তবে কাল এসে—

[উভয়ের প্রস্থান]

মুক্ত—বে কপাল ! (ক্রন্দন)

(বাইমণির প্রবেশ)

রাই—[বস্ত্রাঞ্চল দ্বাৰা মুক্তকেশীর মুখ মুছাইয়া] তোমার দোষে তুমি কাঁদবে, এর উপায় কি ? সে পোড়াকপালি দু'শভাতারী এত কথা বলে গেল, তুমি তো একটি কথাও বললে না ।

মুক্ত—আমাব কি বলবার সাধ্য আছে ? ভাবলেম কি হল কি, হল কি ? ও সাত-

জনের মন যোগায়, কতরকমের কথা গুর পেটে আছে, নিত্য নূতন কথা গুর মুখে, এক কথা কয়ে কি দু'শ কথা গুনবো। (ক্রন্দন করিতে করিতে)
সই! এক ঘরের মেয়ে বলে, মা-বাপের কাছে বড় আদবে ছিলাম। ছোটবেলায় কত আবদার করেছি, কত জিনিসপত্র ভেঙ্গেচুরে ছাই কবেছি, কেউ আমায় দূর কথাটি বলে নাই। বলতে পারে নাই। স্তূথে থাকব আশাতেই বড়লোকের ঘরে বিয়ে হয়েছিল, অদেষ্টেব গুণে তার ফল তো চক্ষেই দেখলে? বিধাতা যার বিমুখ তার হাতে সোনার টাকা তুলে দিলেও অদেষ্টগুণে তামা হয়, ভাল কথা বললেও মন্দ হয়ে পড়ে। যা কপালে ছিল হয়ে গেল, এখন যাতে ভাল হয়, যাতে পোড়ারমুখের মুখ আর না দেখতে হয়, তারই সোজা পথ দেখিয়ে দাও। আজ বেতে এই হল, আবাব কাল তাকে এই মুখ দেখাব? আর কি আশায় থাকব? দোবে দোরে যদি ভিক্ষে কবে খাই, সেও আমাব ভাল, এখন এব উপায় কি? যদি না পার, যদি উপায় না বলতে পার, তবে যাতে লোকালয়ে অব মুখ দেখাতে না হয়, তারই উপায় করে দাও। অব যদি মুখ দেখাতেই হয়, তবে যাতে গুর মুখে চুনকালি পড়ে, দশজনে দেখে হাসে, না হয় তাবই উপায় কবে দাও। স্বামী বলে যে তাব মুখপানে চেয়ে থাকবো, তাব কুলে খোঁটা হবে বলে যে কুল মজাতে পিছে হাটবো, তা মনেও কর না। জাত, কুল, মান, ধর্মের দিকে আর তাকাব না। কাব জন্তে? যে আমাব হল না, আমি তাব হব কেন?

রাই—এখন পথে এস, যদি মন বেঁধে সাহসে ভর কবে দাঁড়াতে পার, তবে আর ভাবনা কি?

মুক্ত—কেন দাঁড়াব না? এতদিন তো দেখলেম, মেয়ে-পবানে যা সয় না, তা সয়েও মন যুগিয়ে চল্লম, দেখি কি হয়? আমার দায়, তার গায়েই বাধল না। তবে আর কেন? পেটের সন্তানসন্ততি নাই যে, তারা লজ্জা পাবে। তবে মা-বাপেব যেমন কাজ তেমন ফলভোগ করবেন, আমাব কি?.

রাই—এত উতাল্লা হচ্ছে কেন? মন যখন ভেঙ্গে গেছে, তখন এর উপায় করে দিচ্ছি। আজ রাতে আর কি হবে? আজ আমি বাড়ি যাই, কাল সকালে এসে যা হয় বলে দেব। আজকাব রাতটে কোন গতিকে সয়ে থাকতে হচ্ছে।

মুক্ত—সই ! তুমিও আজ ফেলে যাবে ? আমার মাথা খাও, আজ এইখানে থাক । দুই সযে একত্র স্তয়ে ‘এর উপায় কি ?’ আজই স্তনব । কাল আসবে বলে গেছে, আজই স্থির করা চাই ।

রাই—আচ্ছা, তবে চল ।

[উভয়ের প্রস্থান]

পটাস্কপ

ততীয় বঙ্গভূমি

নয়নতাবাব শয়নঘর

(বাধাকান্ত এবং মদনবাবু আসীন)

মদন—ও কথা আব স্তনি না । একেবারে অধঃপাতে গেছেন । কাল রাত্রি যা করেছেন, তা বোধহয় কেউ কবতে পারে না ।

বাধা—(বায়ঁয় টোকা দিতে দিতে ঐষদ্ধাস্ত্রে) মুক্তকেশী কিছু ঘুঘঘাস দিয়েছে ? না গোপনে যেতে বলেছে ? বাবা ! শান্তুড়ীর কথা যে একেবারে ভুলে গেলে ?

মদন—আপনি যদি এভাবে কথাব উত্তর করেন, তবে চূপ কল্লেম ।

বাধা—তোমাব মতো নিমকহাবাম তো দুটি দেখা যায় না । যার খাও, যার নামে তরে যাও, যার ঘবে বসে দু’দণ্ড আমোদ কর, যে তোমায় এত ভালবাসে, এখনও যার ঘরে বসে বয়েছ, তারই নিন্দা তোমাব মুখে ! তোমাব চক্ষে মুক্তকেশীকে ভাল লেগে থাকে, স্বচ্ছন্দে ঘরে নিয়ে এসো । না হয় ঘরে যাও । কেউ রোখবাব নাই, খোলা মহল দেদাব লোট !

মদন—আর কি বলবেন ? সকল দিকেই দেখতে হয় । চিরকালটা মদ থেয়ে রাঁড়ের বাড়ি পড়ে থাকবেন, ঘরের কথা মুখে আনবেন না । ছি ছি ! কেউ কি মদ খায় না, না বেস্তা রাখে না ?

বাধা—রাখে বই কি, বল ?

মদন—আমরা আর কি বলতে পারি । সাধবী সতী স্ত্রীকে অনায়াসে ছেড়ে দিলেন, নয়নতারা বারোজনের মন যোগায়, তার মাথাটা ছাড়তে পাল্লেন না ?

বাধা—আমি তো আর হাবা ছেলে নই যে ঐ কথায় পড়ে যাব । আমি ছেড়ে দেই আর তুমি গিয়ে দখল কর ।

মদন—আপনি বলতে পারেন। বলুন তো, বেঙ্গা কার বাবা-কেলৈ বিশ্বাসের ধন।

হাজার ভালবাসেন, দিনবাত পায়ের ধূলা মাথায় করে ঝাডেন, সোনার টাকা দিয়ে প্রতিদিন পূজা করেন, তবু ফাঁক পেলে উপরিলাভ হাত করবেই করবে।

রাধা—সকলে নয়।

মদন—থুঁজলে পাওয়া ভার। আপনি জানেন আপনার নয়নতারা আপনাকেই জানে?

রাধা—[কিষ্কিৎ রাগতভাবে বায়ঁ। রাখিয়া] জানি বই কি? আমি দিকি করে বলতে পারি কারও ঘরের মাগও নয়নতারার মত সতী নয়। আগে বাই করুক, এখন সে বেঙ্গা নাই।

মদন—যাক, আপনার সঙ্গে আমি ঝগড়া করতে আসি নাই। যা ইচ্ছা করুন, দয়া করে দুই ঘাস খেতে দিবেন বস্।

রাধা—এখন সোজা পথে এসো, বাজে কথার দরকার কি? [সম্মুখস্থ বোতল হইতে ঘাসে মদ ঢালিতে উত্তত] না এতে কিছুই নাই, ভগবান ভাব, দেব বড়বউ কি করে আসেন।

মদন—শান্তুড়ী যে নিজেই।—

রাধা—দশটা বাজলে দোকানী বেটারা কি আর পুরুষের হাতে মদ দেয়? জগা ছবার ফিরে এসেছে বলে তিনি নিজেই রেগে গেছেন। আমি সঙ্গে যেতে চাইলাম, তা বললে যে আর তোমার গিয়ে কাজ নেই।

মদন—এই তো ঠাকুর চাতুরী বুঝিতে পার নাই।

শতজন মন তারা কথায় যোগায়।

একমন পরিতোষ করিছ কোথায়?

একজন আলে তারা কখনই থাকে না।

একের অভাব হলে কিছুই ভাবে না।

এ-কেবল তোমার নয় ও নয়নতারা।

কতজনে বলে মোর নয়নের তারা।

কার তারা কে বলিবে, তারা কার নয়।

কেবল অর্থের সনে তারার প্রণয় ॥

নেপথ্য—[মলের শব্দ করিয়া] এমন লোকের হাতেও পড়েছি, এত করে মন যোগাই তবু মন পাইনে।

রাধা—[মদনবাবুর প্রতি] এখন তো আর সম্মুখে নাই—শোন, অগোচরে কি বলে। মন থেকে খাঁটি করে না বেবোলে কি আর অসাক্ষাতে বলছে ?

(বোতল হস্তে নয়নতারার প্রবেশ)

নয়ন—এই নেও (বোতল রাখিয়া) পথে আসতে বড় ভয় পেয়েছি। মেঘে এমন অন্ধকার হয়েছে যে কোলেব মানুষ চক্ষে দেখা যায় না। দুই-এক ফোঁটা জল পড়ে আবও জ্বালাতন কবেছে। সে জগা সঙ্গে গিয়েছিল সে বেটা আমা হতে ভয়খেক। মেঘের ডাক ও বিদ্যুতের চকমকি দেখে জড়িয়ে ধরে।

রাধা—বড়বউ, আমাব জ্ঞান বড়ই কষ্ট পেয়েছ। আমি এ কথা আজীবন ভুলব না, বস, তোমার মাথার জল মুছিয়ে দি।

নয়ন—(মুখ বাঁকা কবিয়া) থাক, আপনার আর আদর করে কাজ নেই। আমিই মুছি। (অঞ্চল দিয়া মাথা মোছন)

রাধা—[নয়নতারার প্রতি] দেখ, তোমার জামাই আজ তোমার যে নিন্দে কবেছে, তা শুনে মরা মানুষেরও রাগ হয়! মুক্তকেশীকে কাল তোমাব কথায় মেরেছি, তাইতে আমি তো আর মানুষের মধ্যেই নেই। আর তোমার নামে একেবারে দশ ফোঁটা।

নয়ন—ওদের কথা মুখে আনতে নেই, অমন নিমকহারামদের কথা শুনেতে আছে ? ওরা যে পাতে খায় সেই পাতই ফুটো করে। বাবা ! ওদের খুরে নমস্কার (ঘোড়করে নমস্কার)

মদন—শান্তি ! তুমিও যে পাগল হলে। আমি নিন্দে করব ? আমি বার-বিলাসিনীদের দুই-একটি কথা বলেছি। তুমি তো আর তা নও ? শান্তি ! আমার মাথা খাও, বাবু, কথায় কান দিও না। (আপন হাতে ঢেলে) এঁটো করে একটু দেও, খেয়ে বাড়ি যাই।

রাধা—যাবে কোথায় ? ভয় পেয়েছ ? বড়বউর এককথাতেই দশ হাত সরে গেলে ? [মদ ঢালিয়া] খাও—লক্ষী আমার। ঢোকে ঢোকে গেলো।

নয়ন—আপনি কেন দিচ্ছেন ! আমি এঁটো করে হাতে দিচ্ছি। ও যা বলেছে তাই করি, জামাই আমার মানিক-অঙ্গুরী। যখন যার তখনই তার। মন

হ'ল স্বর্গেই তুললেন আবার মন হ'ল দশ হাত মাটিতেই রসিয়ে দিলেন ।
পাগল মন । [মদ এঁটো করিয়া মদনবাবুর হস্তে দান] বিস্তি কাবার করে
তো জামাই । আমাব এঁটো যে থাকে, তার জন্তে স্বর্গের সিঁড়ি দিনরাত
খোলা থাকবে । (বেহালার এক দুই তিন সুরেব সহিত, জামাই আমার
মাথা খাও, খাও মাথা খাও, খাও, দুই হস্ত উত্তোলন করিয়া নৃত্যসম্বন্ধে
ভঙ্গি সহিত)

মদন—এক অঙ্গ বাকি থাকলো তাতেই যা হোক । শান্তডী, আমাব হাতে ঢালো,
নেই ।

নয়ন—ছুঁয়ে দিয়েছি ।

মদন—ছুলে কি হয় ? যাক, আবও দিন, আছে, [মগপান] একটা গান মনে
হয়েছে, বলবো ?

নয়ন—নিয়ম ভাঙ্গ কেন ? জান তিনেতেই সব । তিন বার হোক ।

রাধা—তবে চালাই—(মদ ঢালিয়া পান)

নয়ন—আপন হাত জগন্নাথ : আমি শালা কি চোব ? (মদ ঢালিয়া পান)

মদন—[ত্রস্তে বোতল গ্রাস লইয়া] এবারে আমি [মদ ঢালিয়া পান]

রাধা—[ত্রস্তে বোতল গ্রাস লইয়া] নিয়মরক্ষা তো হয়েছে । ফের বড়বউ
[মদ ঢালিয়া নয়নতারার হস্তে দান]

নয়ন—বন্দীগী ! [মুসলমানি ধবনে মাথা নওয়াইয়া সেলাম করিয়া মগপান]

মদন—[ত্রস্তে গ্রাস লইয়া] ফের বাজি বড়বাবু ! [মগ ঢালিয়া বাধাকান্তবাবুর
হস্তে দান]

রাধা—জিতা বাও বাবা ! গুড হেলথ বড়বউ । [মগপান]

নয়ন—আমি বুঝি ফাঁক যাব ? [ত্রস্তে বোতল গ্রাস লইয়া] ফের লাগ জামাই
(মদ ঢালিয়া মদনবাবুর হস্তে দান)

মদন—অল রাইট, ঘণ্টা মাব (মগপান) গাড়ি উড়েছে ।

নয়ন—মদও উড়েছে [বোতলে ফুঁ দিয়ে দূরে নিক্ষেপ]

রাধা—এখন আব কি ?

নয়ন—যা ইচ্ছে ।

মদন—আপনাদেবই হোক ।

নয়ন—তাতে কম পাবে না, জামাই, বাজাও তো (গানারম্ভ)

পিলু-জং

নয়নেরই অন্তরোধে যারে প্রাণ শুপিলাম (আমি)
সে আমার হলো না কেন ? ঐ খেদে মরিলাম
অন্ত আশা ছেড়ে দিয়ে তারি প্রেমে মজিলাম ।
তবু সে চাহে না আমায় একি দায়ে ঠেকিলাম ।
প্রেমজ্বরা লোকেরই মুখে এতদিন যা শুনিলাম ।
সাধেরই পিবিতে মজে স্বচক্ষে তা দেখিলাম ॥

মদন—(তালের সহিত) বাবা বেশ । বেশ ভেলকি । বাঃ শান্তুডী ! মনেব কথাই
থলে বলেছ ।

বাধা—[গুন গুন করিয়া গান কবিতে চেষ্টা]

মদন—হুঁ হুঁ করলে চলে না । তানা নানা কব, যা কব আর হবে না । এব উত্তর
নাই বাবা ।

বাধা—মনে হয়, আবাব হয় না ।

মদন—তা বোঝা গেছে । বলুন আমি উত্তর কবি ।

নয়ন—আজ উত্তবে কাজ নেই । একটা কথা শোন (কানে কানে প্রকাশ)

মদন—হাজিবি আছি ।

নয়ন—ভুলো না । আমার মাথা খাও, এসো ।

বাধা—বড়বউ, আমাব কানে একটা কথা বল । (নিকটে যাইয়া) আমার কানে
একটা মন্ত্র দেও ।

নয়ন—যে মন্ত্র দিয়েছি তাই তো আগে সেধে ওঠ । যত কথা আজই জানা যাবে ।

মদন—(গাত্রোত্থান করিয়া) গুডনাইট টু অল্ । আর থাকতে পারি না । এত
রাত হয়েছে আজ আর কথা নেই । গিন্নি কাঁটা হাতে কবেই আছেন ।
ক ঘা যে খেতে হবে তা গিন্নীই হাত, আর আমার কপাল । (নৃত্য
করিতে কবিতে গান)

খেমট!

কি বলে দাঁড়াব তাহারই কাছে (ওলো মই)

ঘড়িতে ঢং ঢং বাজিয়া গেছে

দশে দশ কাঁটার বাড়ি

বাইরে যাই গভাগড়ি,

না জানি ভাগ্যে

আজি কি যেন আছে (ওলো সই) ।

[প্রস্থান

নয়ন—(ক্ষণকাল পর) আর কথা কি ? রাত তো আর কম হয় নাই ?

রাধা—কথা আব কি ? (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কবিয়া) যাই ।

নয়ন—না পার খুলে বল । তুমি যে তার মায়া ছাড়তে পারবে না, তা আমার বেশ জানা আছে ।

রাধা—একেবারে প্রাণে মারতে ।—

নয়ন—(ক্রোধে) তবে আমি মরি । তোমাব মুক্তকেশী বেঁচে থাক । তোমার ভালবাসা বেঁচে থাক । আমি তার পরানের কাল হয়েছি, তাইতে তোমারও চক্ষেব শূল হয়েছি । আর কাজ নেই, আমি গলায় ছুরি দিয়ে মরব । (ত্রস্তে হাতবাক্স হইতে ছুরি লইয়া গলাস্পর্শ) এই ছুরি । তুমি—

রাধা—(ব্যস্তে নয়নতাবার হাত ধবিয়া) ছি ছি. এ কি ? তুমি কি আমার সর্বনাশ করবে ?

নয়ন—হাত ছাড়, আমি যা বলেছি তাই করবো ।

রাধা—ছুরি ছাড় ।

নয়ন—আবার তোব কথায় ভুলবো ? কাল এককথা আজ এক কথা ? পাজি ! আমি তোঁর মুখ আর দেখবো না । [দুই পা সজোরে আছড়াইয়া ঈষৎ ক্রন্দন-স্বরে] আমি এ প্রাণ আব বাথবো না [ছুরির উলটা পিঠে গলা কাটিতে উত্তত] এখন মরি, সব মিটে যাক ।

রাধা—তুমি কি পাগল হয়েছ ? (কাঁপিতে কাঁপিতে) ছুরি ছাড় । আমি সত্যি সত্যি বলছি এই ছুরি দিয়ে মুক্তকেশীর গলা কাটব (ছুরি কাড়িয়া লইয়া) তোমাব অসাধ্য তো কিছুই নাই । সর্বনাশ ! কি সর্বনেশে বাগ !

নয়ন—[কান্দিতে কান্দিতে] ছুরি নিলে কি হবে ? আমি আজই গলায় দড়ি দিয়ে মরব । এখন বুঝি অন্তরে যা লেগেছে ? (কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধ) যাও, তোমার মুক্তকেশীকেও মেরে কাজ নেই, আমার বাড়িতে এসেও আর দরকার নেই । আমি—

রাধা—আমি ধর্মতঃ বলছি, এই তোমার, গা ছুয়ে বলছি, মুক্তকেশীকে আজ খুন করব । নিশ্চয়ই খুন করব । যদি তুমি দেখতে চাও রক্তস্রব ছুরি এনে তোমায় দেখাব । তোমার পায়ে ধরি, কেন্দো না । (পদধারণ)

নয়ন—(পদাঘাত করিয়া কিঞ্চিৎ জ্বরে কান্দিতে কান্দিতে) তোর কথা আবার শুনব ? আমি এ প্রাণ রাখব না ।

রাধা—আমি চললেম, মুক্তকেশীকে খুন করতে এখনই চললেম । যা বলেছি তাই করবো । মুক্তকেশীকে খুন করব (গাত্রোত্থান) মারব, খুন করবো । মুক্তকেশীকে খুন করবো তাতে আমার কি ?—(পদচারণ করিতে করিতে) সে বেঁচে থাকলে আমার প্রাণকে হারাবো, নয়নতারাকে হারাবো । কপালে যাই থাক চললেম । (ছুরি লইয়া বেগে প্রস্থান)

নয়ন—[শয্যা হইতে উঠিয়া দুই-তিন পদ অগ্রসর, একটু উচ্চৈঃস্বরে] দেখ ! মিছে-মিছি ঘরে ফিরে এলে, আর আমায় জ্বীয়াস্ত পাবে না । (ঘরের জিনিসপত্র শৃঙ্খলা করিয়া রাখিতে রাখিতে স্বগত) মুক্তকেশী গেলেই এদিকের পথ খুলাশা হয় । আর যাবে কোথা ? নয়নতারা ঝাঁটা মারবে আর দুহাতে লুটবে । ওর যা যা আছে সকলই হাত কবব । মুক্তকেশীর ভাল ভাল অলঙ্কার আছে শুনেছি, সেগুলো তো কালকেই হাত করব । এখন একটু আড কবে বসে যা ইচ্ছা তাই করতে পারব । এখনও কি আমি হাবা আছি ? মা'র চেয়ে ঝি যে দু'হাত বেড়ে গেল, তবু মার কান্দনি গেল না । যারে পান তারেই বলেন, আমার নয়নতারা বড় হাবা (উচ্চৈঃস্বরে) মা ! ও মা ! ঘুমিয়েছি নাকি ? আমি একা একা বসে থাকতে পারিনে, আমার ভয় করে ।

নেপথ্য—এদিকে আর না ? দেখ না কে যেন ডাকছে !

নয়ন—আমি যেতে পারিনে । যে ডাকে সে কি পথ চেনে না ?

দ্বিতীয়বার নেপথ্য—তোর আর নবাবি দেখে বাঁচিনে । সে পথ চিহ্নক আর না চিহ্নক, আমি ডাকছি তুই উঠতে পাললিনে ?

নয়ন—কোন বেটা নবাবপুত্র এসেছে যে এগিয়ে না আনলে আর আসতে পারেন না । আমি যেন ঘরের মাগ হয়ে পড়েছি । [জ্বোরে পদনিক্ষেপ করিতে করিতে গমন] নেপথ্য—পথ ভুলেছেন নাকি ? মাপ করবেন । [নগেন্দ্র-বাবুর পরিধেয় ধরিয়া নয়নতারার পুনঃপ্রবেশ]

নয়ন—রঙ্গরসভরা এই তারারঙ্গভূমি ।

মন খুলে বোসে দৃশ মজা কর তুমি ॥

(নগেন্দ্রবাবুকে সাদরে বসাইয়া উপবেশন)

নগে—বলিহাবি যাই, কবিতা বলতেও শিখেছ ?

নয়ন—চিরকালই কি সমান থাকে ?

নগে—ভাল আছ তো তুমি ?

নয়ন—এতদিন পরে ‘তুমি’ ডাক শুনলেম সেও ভাল । সই, বন্ধু, ভালবাসা, বসকে, জননী, দিদি, শাশুড়ী, বড়বউ, আবাব কেউ আদর করে নূতন যৌবন দেখেও বুড়ি বলে ভালবাসার ডাক ডাকে, তুমি সেই নূতন ডাক ‘তুমি’ কথা বেব করে যে কত মজা কবেছ তা আর বলতে পারি না । যে শুনে সেই বলে লোকটা তো ভাবি রসিক । কতজনে দেখতে চায় ।

নগে—দেখালেই পার ।

নয়ন—পাই কোথা । যখন মন চায় তখন পাই কোথা ? আপনি হলেন বিচারকর্তা হাকিম, আপনাব বার পাওয়াও সোজা কথা নয় । এতদিন পবে যে মনে পড়েছে, সেও ভাল ।

নগে—এতদিন পবে কি ? গেছে নিবাবেও তো এসেছি, ‘তুমি’ যে বাধাকান্ড-বাবু পেয়েছ, তাতে কি আব কা’ব দখল পাবাব কথা আছে ?

নয়ন—ও পোড়ামুখোর কথা বলবেন না, মুখে আনবেন না । ওব নাম শুনলে আমার গায়ে আগুন জ্বলে । দিন দুই এসেছিল, তাতেই কি একেবারে তাব বাধা হয়ে পড়েছি, না তাব পিরীতে মজেছি ! ঝাঁটাতেক, না নথিখোর আমার বাড়ি বই আব চক্ষে দেখে না । ‘তুমি’ কি বলব, আজ ক’দিন হ’ল খডমপেটা করে একেবারে দূব করে তাড়িয়ে দিয়েছি, আব আসবে না । আমিও বাড়ি ঢুকতে দেব না ।

নগে—দেখা যাবে, ক’দিন ?—

নয়ন—আব নয় । যাক, ও কথাই আর কাজ নেই । আজকাল দেখতে পাইনে কেন ? আমরা নাচতে জানিনে, গাইতে জানিনে, দেখতেও ভাল নয়, তাই বলে কি আর দেখা দিতে নেই । কালো বলে স্খা করে কি আর দু’দণ্ড কাছে বসতে নাই ?

নগে—দেখ ভাই, পরের চাকুরি কবি, চারদিক নজর রেখে চলতে হয় । তোমার বাড়িতে আসতে কি আমার ওজর আছে ? এত কাজ ! দিনরাত খাটি তবু অবসর পাইনে ।

নয়ন—কবে বা ভেকেই পাঠালেন ? তোমরা হুগলি কলেজের পড়ো, তোমাদের চালাকি আর বদমাইশি কি অন্ত আছে ?

নগে—হুগলি কলেজের দোষ দিও না। বড় কষ্টেব চাকুরি ! ঘোড়ায় চড়তে জানি না তিন ক্রোশ পথ এক দোমে হেঁটেছি। সীতরিয়ে গঙ্গা পার হয়েছে, উল্টে উল্টে বাজি করেছে, দশ-বাব হাত উপরে বাতুরঝোলা ঝুলেছি। চাপড়ে খোয়েটেব কত বকুনি খেয়েছি। ওব দাডিনাডা দেখলেই আমার গা কাঁপত। এখন বলতে হাসি পায়, দুঃখ ও হয়। টামসন ডাক্তারে কত কি ধরে, পরীক্ষা কবে ভাল শরীর বলে সার্টিফিকেট দিয়েছে। এত কাণ্ডকারখানাব পর হুজুব ক্যাম্পেল বাহাদুর দয়া কবে সব-ডিপুটি খেতাব দিয়ে চাকুরি দিয়েচেন।

নয়ন—বেশ হয়েছে। ‘তুমি’ যে এখন খেতে পায় না তার উপায় কি ? চেলের দব বেড়েছে, এতে আর বাচবাব ভরসা নাই। এক পেট হলে ভিক্ষা করেই চালাতে পারতেন।

নগে—ভয় কি ? রাধাকান্তবাবুব এত টাকা খাবে কে ?

নয়ন—আপনি বললে নাচার। যাকে দেখতে পারবিনে, যাকে ভালবাসিনে, যার নামে দু’শ খেঙ্গরা, তারই কথা !

নগে—না, আর বলব না—আজ আমার বাসাঘ চল।

নয়ন—এত ভাগগী হবে !

নেপথ্যে—শান্তুড়ী ! ও শান্তুড়ী ! ধুমিয়েছ ?

নগে—কে ডাকে ?

নয়ন—কি জানি।

নগে—বেশ, শান্তুড়ী বলে ডাকছে, চেন না ?

নয়ন—আসলেই নেই, তার আবার শান্তুড়ী।

দ্বিতীয়বার নেপথ্যে—শান্তুড়ী ! জেগে আছ কি ?

নয়ন—শুধু শান্তুড়ী বললে চলবে না, নাম বল।

তৃতীয়বার নেপথ্যে—নাম বলতে লজ্জা করে।

নয়ন—তবে জামাই ! সোজা পথ দেখ। শশুরঘরে।

নগে—তোমার জানা লোক হয়, আর আমাকেও যদি না চেনে, তবে ভেকে আন।

নয়ন—দুই গুণ একত্রে পাওয়া বড় দায়। দেখি—(দোরের নিকট যাইয়া হাশু

করিতে করিতে) বেশ ! বেশ ! জামাই যে ! আরে কবে এলে ? এস এস,

বাবা এস । মেয়ে ভাল আছে তো ?

(মদমবাবুর সহিত নয়নতারার প্রবেশ এবং নগেন্দ্রবাবুর কাপড় দিয়া

নিজ মুখ আবরণ)

মদন—(নয়নতারার প্রতি ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা)

নয়ন—(কানে কানে প্রকাশ)

মদন—আর ঢাকবেন না, চিনেচি । তাঁদের আলো কি কাপড়ে ঢাকা পড়ে ? আজ ধরা পড়েছেন । এ তো মিডিল সার্ভিস ক্লাস নয় যে নোবলিটির সার্টিফিকট না দিলে ঢোকবার জো নাই । এ কলিকাতার জাতঘর । তাতেও রবিবার আর সকাল-বিকাল আছে । হজুর, এ হাৰ্ডার স্টেশন বললেও হয়, ময়ূবপঙ্খী বললেও হয় । পয়সা দিলে আব কথা নেই ।

নগে—(কাপড় ফেলিয়া হাসিতে হাসিতে) আমি আজ আপনাকেই দেখতে এসেছি । আপনাব ধন্যজ্ঞান, জিতেন্দ্রিয় মরকাত্তার ধ্যান, তারই পবীক্ষা করতে এসেছি ।

মদন—হজুর ! তবে ঠকেছি ।

নয়ন—জগা—ও জগা ! তামাক সেজে আন । আর সেখানে গিয়েছিলে ?

নেপথ্যে—না—

মদন—শান্তুভী ! আজ যে ভারি আংবামুখো দেখতে পাচ্ছি—মার ধর হেন তান সাত সতেব, এ আবাব কি ?

নয়ন—চুপ কর, ব'ক না ।

(তামাক লইয়া জগার প্রবেশ)

জগা—এদেব চক্ষে তো আজ ঘুম নেই । রাত ফরসা হয়ে এল, তবু ঘুমায় না ।

খাটতে খাটতে প্রাণটা গেল ! [কলিকায় হুঁ দিয়ে নয়নতারার হস্তে হুঁকা দান]

মদন—কি জগন্নাথ ! মুখে যে থৈ ফুটচে । পেটে ভাত গিয়েছে তো ?

জগা—নেও, তোমার আর সে কথা শুধিয়ে কাজ নেই । (নগেন্দ্রবাবুর প্রতি) বাবুমশাই, একখানা কাপড় দিতে হবে । শীতে আর বাঁচিনে । কাঁপিতে কাঁপিতে মরে গেলুম বাবুমশাই ।

মদন—তোর বড়বাবু দেবে ?

জগা—আর দিয়ে কাজ নেই। আপনারা দিলে দশ জায়গায় দেখাব।

নগে—দশ জায়গায় দেখিয়ে আর কাজ নাই। আচ্ছা, পাবে।

জগা—(গড হুইয়া প্রণাম করিয়া প্রস্থান)

নগে—(নয়নতারার প্রতি) এখন আর কি—যাই।

নয়ন—যে আজ্ঞা—

নগে—(গাত্ৰোত্থান করিয়া মদনবাবু প্রতী) মহাশয়, কিছু মনে কববেন না,
চললেম।

মদন—আপনি মহৎ ব্যক্তি। আমাদের হাকিম, —নমস্কার।

নগে—[যাইতে যাইতে] নমস্কার নমস্কার।

[প্রস্থান]

নয়ন—জামাই ব'সো, আমি আসচি।

মদন—কোথায় ?

নয়ন—এই আসছি, তুমি একটু ব'সো, আমি আসচি—মাথা খাও, যেও না।

[প্রস্থান]

মদন—একবার ঝ্যাটা খেয়ে এসেছি, আবার কোথা যাব ? (স্বগত) বাবু লোভে
পড়ে এত টাকা দিয়েও নয়নতারার মন পান নেই। শক্তের কাছে কিছুই
নয়। জগা, ও জগা ! তামাক আন।

নেপথ্যে—যাও মশাই। জগাকে আর ভুগিও না।

মদন—শুনে যা না। কথা না শুনিস তোর মায়েব কাছে বলে দেব।

(জগার প্রবেশ)

জগা—মা কি আর আজ আসবে যে ব'লে দেবে ?

মদন—সে যে এখনি আসবে ব'লে গেল ?

জগা—তুমিও যেমন পাগল। আসবে বলে গেছে সেই কথায় ভুলে রয়েছ। আমাকে
বলে গেছে, বড়বাবু এলে বালিস যে তোমারই খোঁজে বেরিয়েছে।

মদন—ডিপুটিবাবুর বাসায় গেছে ?

জগা—আমি ডিপুটিবাবু চিনি; ঐ যে দাড়িমুখ হাকিম—তারই হাত ধক্কে
বাড়ি থেকে বেরিয়েছে—তার সঙ্গে গেছে কিনা জানি না।

মদন—(গালে হাত দিয়া নিস্কর)

জগা—ভাব কি ? সে আজ আর আসবে না।

মদন—কি পাঞ্জি ! এদের একটি কথায় বিশ্বাস নাই। আমি কত দেশ পুড়িয়ে এলেম। আমাকেও দেখি জ্বল কললে, আর কখনও না, এই নাকে কানে—আব কখন না—আব না—(রাগ-ভাবে প্রস্থান)

জগা—বয়ে গেলো, নয়নতারা তো আব বাঁচবে না ? তাব—(প্রদীপ নির্বাপন কবিয়া প্রস্থান)

চতুর্থ রক্তভূমি

বাধাকাস্তবাবু বাডি, মুক্তকেশী শয়নঘর।

(মুক্তকেশী ও অপবিচিত্র একজন পুরুষ আমীন)

পুরু—তাতে আব কি হবে ?

মুক্ত—আব কি হবে ? যা কপালে ছিল তাই হলো। এব বাডা আব কি হবে ?

পুরু—বাবু এই পালঙ্কে শুতেন ?

মুক্ত—মনে হয় না ?

পুরু—(হাসিতে হাসিতে শয়নবে চেষ্টা) তবে সকলই নূতন। হলো ভাল। এস, তুমিও শোও। (শয়ন)

মুক্ত—(পালঙ্কের পাশে বসিয়া অধোবদনে চিন্তা)

পুরু—যা কবতে হবে তাতে আবার ভাবনা কি ? দেখছ না, রাত অনেক হয়েছে। শোও।

মুক্ত—(শয়ন কবিতে কবিতে) কপালে যা ছিল তাতো হলো দেখি ! (পুরুষের বাম-পার্শ্বে শয়ন এবং কিছুকাল পরে ছুরি-হস্তে বাধাকাস্তব প্রবেশ)

বাধা—(দোরের দাঁড়াইয়া চুপে চুপে স্বগত) ঘুমিয়েছে, না জেগে আছে ? [মস্তক উত্তোলন করিয়া দৃষ্টি] কৈ কোন মাড়া-শব্দ তো পাই না। জাগাব ? নয়ন-তারার মন যোগাতে ঘরের স্ত্রীকে—না—পারব না। (একটু অগ্রসর) নয়নতারার কথায় মারতে ইচ্ছে হয়েছিল, এখন এমন হলো কেন ? কি করি [চিন্তা] দূর দূর, ফিরে যাই ! [প্রস্থান এবং ক্ষণকাল পরে পুনঃপ্রবেশ] নয়নতারাকে তো আর পাব না। কিছু না করে শুধু শুধু ফিরে গেলে প্রাণের তারাকে তো আর পাব না ? কে জানবে ? কেই বা বিশ্বাস কববে ?

মারবো—একেবাবেই কাজ নিকেশ করবো। মারবই—এক দিক তো ফবসা করে দেই। একবাব মুখখানা দেখে নেই। জন্মেব মতো মুখখানা দেখে নেই। চিবভুঃখিনীর মুখখানা দেখে নেই। দেখব ? মুখ দেখে যদি মায়া হয় ? না, তা হবে না, মন বেঁধে একবাব বই—তুবাব তাকাব না। [নিঃশব্দে অগ্রসর] এ কি ? পুরুষ ! মুক্তকেশীব বিছানায় পুরুষ। এ কি উপপতি ! মুক্তকেশীব উপপতি ! আব ত সহ্য হয় না। আমার স্ত্রী ভ্রষ্টা—আমার স্ত্রী উপপতি নিয়ে শুয়ে, আমার বিছানায় শুয়ে ! কি কবি ! এ জালা, এ আগুন কিসে নিবারণ কবি। যা অদৃষ্টে থাকে, তুটোকেই কাটব। এ প্রাণ থাকে আব যায়, দুজনকেই মারবো। [ঘোষভাবে চতুর্দিকে দৃষ্টি] কি আমি—এ কি আব চক্ষে দেখা যায়। [হস্তস্থিত ছুরিকার দিকে দৃষ্টি করিয়া] এ ছুরিতে হবে না। তুটো মাথা একেবারে কাটবে না। পাঁঠাকাটা দাখানা নিয়ে আসি। (ছবি ফেলিয়া প্রস্থান, ক্ষণকাল পরে দুই হাতে দা উত্তোলন করিয়া ক্রোধাক্তে প্রবেশ এবং উচ্চস্ববে) মুক্তকেশী ! এই বুঝি তোব সতীপনা ? ও বে ! (দা'ব আঘাত করিতে উত্তত এবং মুক্তকেশী ও পুরুষ ত্রস্তে শয্যা হইতে দুই পাশ্বে দুইজন দণ্ডায়মান)

উভয়ে—কব কি ? (বাধাকাস্তেব হস্তধারণ)

পুরু—(বাধাকাস্তেব হস্ত হইতে দা কাড়িয়া লইয়া বোঝে) কি, এত কেন ? ভাল চাও সরে যাও, প্রাণ বাঁচাতে চাও—দুদিন কাল যদি নয়নতাবাব মন যোগাতে চাও তবে সবে যাও—

বাধা—তুই কে বে বেটা ! জানিসনে এ কার ঘব ? তোব এত বড় মাথা ! আমার ঘবে—

মুক্ত—কেন ? তোমাব কি ?

বাধা—(কাঁপিতে কাঁপিতে) হারামজাদি ! আবাব মুখ বাড়িয়ে কথা বলছিস। লোকের কাছে, আমার কাছে মিছেমিছি সতীপনা দেখিয়ে গোপনে গোপনে এই কাজ ? ও বে হারামজাদি ! তোব এই কাজ ?

মুক্ত—তাতে তোমার কি ?

বাধা—আবার কথা ? কি বলব চৈটিয়ে ঠকেছি, বাগে পাগল হয়ে সব নষ্ট কবেছি, তা নইলে এতক্ষণ দুজনেই ঘরের বাড়ি দেখতে পোঁতি। তোব অসাধ্য কি আছে বল তো ? এই তো খালি ঘর পেয়ে উপপতি নিয়ে মজা করিস। আর দেশবন্ধু লোকের কাছে আমার নিন্দে করে বেড়াস। আজ কি হয় ? ক'দিন

লুকাবি। আমি তোকে খুন কববো। তোর ভালবাসার বাবাকেও খুন করবো। যাবি কোথা? (পুরুষ-প্রতি আক্রোশে) শালা! তুমি খালি ঘব পেয়ে আমার সর্বনাশ করেছে। তোর মাথা কাটব। বাঞ্চং গুরুথেক নেড়ে! আমার সর্বনাশ কললি। (ক্রোধে দাঁড়ি ধরিতে অগ্রসর)

পুরু—সাবধান! দা দেখেছ? তোমার মাথা কাটবো। বেহায়া! বের। আমার ঘব থেকে শীঘ্র বের। আব জায়গা পাও নাই, এখানে মাতলামি করতে এসেছ? বের বেটা—‘খালি ঘব, খালি ঘব’ কবে বেটা তোলপাড় লাগিয়েছে। খালি ঘব কব কেন? একা ফেলে যাও কেন? বেটা নচ্ছার বের। যা, তোব নয়নতাবাব ঘবে যা। এ ঘবে কেন? আমি ইচ্ছে ক’বে আসি নাই, টাকা দিয়ে নিয়ে এয়েছে। টাকা পেলে পবের ঘবে আসতে দোস কি?

বাধা—(মুক্তকেশীকে মাঝিতে উত্তত; পুরুষকর্তৃক বাধা) টাকা দিয়ে উপপতি এনে আমার ঘবে—

মুক্ত—কেন? এত কেন? তুমি টাকা দিয়ে বেষ্ঠা এনে আমার ঘবে—আমি পাবিনে? একবারে দেখেই সজে না। খুন কবতে চাচ্ছ। তুজনের মাথাটি কাটিতে চাচ্ছ। আমি যে চিবকাল দেখেছি, আমার মনে কিছুই হয় না? কিছুই বেদনা লাগে না? বেশ কবেছি, এতে তোমার কি? বাগই বা কেন? কাটাকাটি মাঝামাঝি বা কেন?

বাধা—তোব যে ভাবি সাহস! ধবা পবলি, তবু তোব কথাব বাঁধুনি গেল না। তবু তোব জোরের কথা গেল না। বল তো, তাকে এত সাহস কে দিয়েছে?

মুক্ত—কাকেও দিতে হয় না। কেউ শেখায় না। ভুগে ভুগে আপনিই শিখেছি। তুমিই তো এর গোড়া। তবে আবাব এত কেন? যেমন দেখিয়েছ তেমনই দেখ। দেখলে কি গা-জালা কবে?

বাধা—তুই কি একেবাবে লজ্জার মাথা খেয়ে বসেচিস, এতদিন তো তোর মুখে একটি কথাও শুনতে পাঠ নাই। হাতে হাতে ধরা পবলি, তবু তোর লজ্জা হয় না। তোব কি মরণ নাই?

মুক্ত—তোমার মরণ নেই? কথা বাড়ালেই বাড়ে। শুনালেই শুনতে হয়, দেখালেই দেখতে হয়। আর গোল কর না, সোজা পথ আছে, চলে যাও। বেষ্ঠার জন্তে সব মজা। আবাব কাল রাত্রে যা করেছো, তার উপরে কথা?

ধিক তোমার জীবনে ! দিক তোমার মুখে । তুমি আগে করেছ, আমি না হয় পাছে কবেছি, আর পাছেই বা কি ? সহিতে না পেয়ে তোমার জালা— তোমার দৌবাগ্নি সহিতে না পেবে মুখ ফুটে কান্দলেম, হাত-পা-বললেম, কিছুই হলো না, কি কবি ! শেষে আব কোন উপায় না পেয়ে এই উপায় কবেছি । এখন তুমি তোমার মতো থাক, আমি আমার মতো থাকি ।

[পুরুষের গায়ে ধাক্কা দিয়া] চল ।

বাধা—তুই কি হাতে হাতে প্রতিশোধ নিবি ? আমি যা কবেছি তুইও তাই কবি ?

মুক্ত—কেন কবব না ? তুমি আমি ভিন্ন কি ? আমার শরীর বুদ্ধি বক্তমাংসেব নয় ?

বাধা—এই কি তাব প্রতিশোধ ?

মুক্ত—এক বকম অনেক দিন সয়ে, অন্তবে যা খেয়ে এই কবেছি । প্রতিশোধ নেই নাই । প্রতিফলও দেখাও নাই, এখনও অনেক বাকি ।

বাধা—এব উপবে কি আরও আছে ?

মুক্ত—আছে বৈ কি ? হয়েছে কি ? একদিনেই এত ! অনেক আছে, ক্রমে দেখ—

বাধা—আরও দেখাবি ?

মুক্ত—দেখাবো ।

বাধা—আমি আজ বেচে যদি কিছু না পাবি, কাল তোকে দেখাবো ।

মুক্ত—তুমিও দেখবে । আরও কতজনে দেখবে, কত কানেও শুনবে । ভালই তো !

বাধা—(মাটিতে বসিয়া অধোবদনে মাথায় হাত দিয়া চিন্তা)

মুক্ত—(পুরুষের কানে কানে প্রকাশ)

পুরু—ব্যস্ত কেন ? দেখ না । কেবল ঐষ ধবেছে—

বাধা—(মাথা হেঁট করিয়া কাতরস্ববে) হা ! আমি কি কবতে এসে, কি দেখলেম । যা কখনও ভাবি নাই তাই হলো । যা কখনও মনে কবি নাই, তাই দেখতে হলো ! নয়নতারা গোপনে জানতে পেবে কি কৌশলে আমার দেখতে পাঠিয়েছিল ? আমি কবেছি তাইতে করেছে । মন্দ কথা নয় । পাপে প্রায়শ্চিত্ত আছে । স্বথাস্তে দুঃখ আছে । তবে আর কেন ? বুঝেছি । (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ) আমার দোষ ? যথার্থ আমারই দোষ ।

আমার দোষে এই হলো ? কি বলে মুক্তকেশীকে দোষী করব, সে পথে তো আমিই কাঁটা দিয়েছি। আমি নয়নতাবার প্রণয়-কাঁদে পড়ে সাধারণের একমাত্র লক্ষ্য হয়েছি। হায হায় ! আমার সর্বনাশ আমিই কবেছি, আপন পায়ে আপনি কুড়ল মেবেছি। (মুক্তকেশী পুরুষের সহিত ইঙ্গিতে কথা-বার্তা) কাকে কি বলবো—আপন মাথা আপনিই খেয়েছি ; আপন স্ত্রীকে যতনে রাখলে কখনই এমন হতো না। এত তাক্সলা, এত অগ্নায়, এত ঘৃণা না করলে কখনই এত হতো না। বাধাকান্তের চক্ষু এতো দেখতো না। আমাবই দোষ, আমাবি—আমিই মূল। আব ভুংখ কি ? বেশ হয়েছে। মুক্তকেশী বেশ কবেছে। (কান্দিতে কান্দিতে) আমি বেশাব মায়ায় না ভুললে মুক্তকেশী কখনই আমাব ভুলতো না। আমি একদিন ভুলেও যদি তাব স্ত্রের পথে দাঁড়াতেম, তবে কি আব সে এ-পথে দাঁড়ায় ? আমি যদি তাব মনেব ভুংখ বুঝতে পেতেম তবে কি সে এ-পথে দাঁড়ায় ? আমি যদি তোকে ভালবাসতেম, হায় ! ভাল মুখে যদি দুটো কথাও বলতেম, তবে কি—[ক্রন্দন]

মুক্ত—(পুরুষের প্রতি) আব কেন ?

পুরু—একটু বাকি আছে।

রাধা—[কান্দিতে কান্দিতে] আর সহ হয় না। ভগবান ! এই দেখালে ?

মুক্ত—কেমন ? লেগেছে ?

রাধা—(কান্দিতে কান্দিতে) আব বলো না, তোমার পায় ধবি আর আমায় কিছু বলো না। আমি বেশ বুঝেছি, বক্তৃতাংসেব শরীব, সকলের পক্ষেই সমান। আর ঘা দিতে হবে না।

মুক্ত—চিরকাল কেঁদেছি। এখন তোমার পালা।

রাধা—[ক্রন্দন করিতে করিতে] আমি মিনতি করে বলছি আব ঘা দিও না, আর দৃষ্টে মের না। আব বলো না। আমাব এখন যেমন হয়েছে, তোমারও তেমনি হয়েছিল। তা আমি বেশ বুঝেছি। তাইতে কি এমন করে জাত-কুল মজাতে হয় ? বল তো কি কবে মানুষের মধ্যে মুখ দেখাব। এক কথা কি আর ছাপা থাকবে ? শুনতে কি আর বাকী থাকবে ? হয় কাল, নয় দু-দিন পরে একেবারে ঢাকে-ঢোলে কাঠি বেজে উঠবে। কতজনে মুখের

উপরে কত প্রকারে বাড়িয়ে বলবে, তা তো এ প্রাণে সইবে না। পরের মুখে এ কথা শুনলে আমার মুখখানা কেমন হবে বল তো? মেয়ে-প্রাণে সকলি সয়। হাজার হলে কেহ কিছু বলে না। তোর সকলি বিপরীত।

মুক্ত—না হবে কেন? আমি চিরকালটা তোমাব পায়ে ধরে কত মিনতি করে বলেছি। এত কব না। বোঝাব কথায় ঘবের স্ত্রীকে পা দিয়ে ঠেলে ফেলো না। দেখ, অনেকেই কবে, অনেকেই সযে থাকে, এমনতর কেউ নয়, এত কেউ নয়, স্বামী বই স্ত্রীর আব কে আছে? স্বখে, দুঃখে, বিপদে, সম্পদে আব কে আছে? এত কব না, পায়ে ধবে বলছি। এখনও সাবধান হও, তোমাবই মন্দ হবে। অন্তরে যা লাগে?

বাধা—বেশ লাগে। আমি কেন, অনেকেরই লাগে। আগে ভুগিয়েছি, এখন ভুগছি। আমাব আব কোন কথা নাট। তোমাব যা ইচ্ছা তাই কর। দা-খানা আমার হাতে দেও, আমি এ প্রাণ আর বাখব না। এ মুখ আব মান্তব্যকে দেখাব না। কোন মুখে আব কোন কথাও আব শুনতে হবে না। মুক্তকেশী, তোমার পায় ধরি, দা-খানা আমায় দেও, [কান্দিতে কান্দিতে] আমি যা বলি তাই কব। আমাব অন্তরের জ্বালা মিটিয়ে দেও। আব আমাব সহ হয় না। আমি নয়নতাবাব কথায় তোমায় কাটিতে এমেছিলাম। তোমার মুখখানি দেখব বলে এগিয়ে দেখেই আমাব দিকবিদিক কিছুই জ্ঞান থাকল না, আমি কোথায় গিয়েছি, কি করেছি, কিছুই বুঝতে পাচ্চিনে। আমার এ কি হলো? তুমি দা-খানা দেও, দেখ, তোমার সম্মুখেই আমি আব্রহত্যা করছি। তোমাব প্রত্যয় না হয় তোমার উপপতিকে বলে একচোটে আমার মাথা দুইখণ্ড কবে সকল জ্বালা মিটিয়ে দেও। প্রতিশোধ হোক। আজই প্রতিশোধ হোক। দেখ, আমাব মরণেই তোমাদের মঙ্গল ও স্বথের কারণ।

মুক্ত—(কান্দিতে কান্দিতে) আব সহ হয় না, আর থাকতে পারিনে। আমার অপরাধ হয়েছে। মাপ কব, মেয়েমানুষ মেয়েবুদ্ধি বলে মাপ কর। আজ তোমার মনে যে ভাব হয়েছে, আমি চিরকাল এইভাবে দুঃখের আগুনে জলে পুড়ে থাক হয়েছে। সময়ে কত কথা মনে হয়েছে, কত কাজে মন গিয়েছে। গলায় দড়ি দিয়ে মরবো—তাও কতদিন মনে করেছি। বিষ খেয়ে মরবো, তারও যোগাড় করেছি। সময় সময় তোমার মুখখানি দেখব সেই

আশাতে আবাব সকলই ভুলে গেছি। কপালগুণে একুপোড়াকপালের গুণে কখনও ফিবেও চাইলে না। কি কবি, ভেবে আর কোন উপায় না পেয়ে এই উপায় কবেছি। [ক্রন্দন কবিতা কবিতা চরণধাবণ] অপবাধ হয়েছে, আমি তোমাব দাসী, আমায ক্ষমা কব।

রাধা—[দুঃখিতস্ববে] তোমাব অপবাধ কি? যা কববাব তা তো করেই বসেছো। যা হবার তা তো হয়েই গেছে। পুরুষেব প্রাণে এ কখনই সহ্য হয় না, রক্তমাংসেব শরীব, আর স্বামীর চক্ষু এ দেখে কখনই স্থিৰ থাকতে পাবে না। আমায মেবে ফেলো। তামাব মুখ তোমরা দেখ না। আমিও আব দেখতে চাইনে।

মুক্ত—আমি উপপতি কবেছি, তা বলে তুমি আমাকে অসতী মনে কর না। আমি এমন কুকাঙ্গ কবে যে তোমাব সৰ্কনাশ করেছি তা তুমি মনেব এক কোণেও ঠাই দিও না। আমাব মনের ভাব তোমাব মন দিয়ে জানাতেই আমি এই করেছি।

রাধা—পা ছাড়। আমি বিনয় কবে বলছি, পা ছাড়। আমি আজ বাত্রেই যা হয় একখানা কবব। এ কি সামান্য কথা! [ক্রন্দন] আমি বাধাকান্ত, আমাব স্ত্রী ভ্রষ্টা—

পুরু—এখন বুঝেছেন। হাতে-পাতে ধবেছেন, স্থিৰ কবেছেন মুক্তকেশী ভ্রষ্টা।— স্ত্রী ভ্রষ্টা হয়েছে, অন্তবে যা লেগেছে, জীবনে ঘৃণা ধবেছে। তাইতে প্রাণ-ত্যাগ কবতেও প্রস্তুত হয়েছেন। এতদিনে এ বুদ্ধি—এ ঘৃণা কোথা ছিল? যা হউক, আপনি আপনাব স্ত্রীব সতীত্ব বিষয়ে প্রমাণ পেলে বোধহয় প্রাণ ধড়েই বাখবেন? আমি উপপতি নই, মুক্তকেশী আমাব ভগ্নী; আপনি সাক্ষী-সতীব প্রতি কোনরূপ দোষাবোপ কববেন না।

রাধা—এর আবার প্রমাণ? যাক আমাব স্ত্রীতেও কাজ নাই, এ বাড়ি ঘরদোরেও কাজ নাই, আমার যা মনে—(মুক্তকেশীকে ছাড়িয়া বেগে যাঠিতে উদ্ভূত)

মুক্ত—ও সহ—

পুরু—তাই তো, এখন যে আর কিছুতেই হয় না। এত বললেম যে মুক্তকেশী আমার ভগ্নী, আমার যা—তবু তাঁর প্রত্যয় হলো না। ভাল কথা। দেখ, মুক্তকেশী সতী কি অসতী!—হজুর, আর ভাববেন না—আমি

পুরুষ নই, আপনাবই চির-ভালবাসার রাইমনি (কৃত্রিম পরিধান পরিত্যাগ ইত্যাদি) । সইয়ের দুঃখ সইতে না পেরেই এই উপায় কবেছি ।

রাধা—(সচকিতে) সই—সই—এ কি ! মুক্তকেশী, এ কি ?

মুক্ত—(নিস্তব্ধ)

রাই—(ঈষৎ ঘোমটা দিয়া) আর কি ? মনে মনে যে সইয়ের মনের ভাব বুঝেছেন সেই ভাল !

রাধা—না জেনেই এতদূর হয়েছে । আব নয়, সই, আর নয় । আমার ঘাড়ের ভূত আজ নেমে গেছে ।

রাই—ও সই । এখন আর কথা কি ? ওভাবে বসে বইলে কেন ? শিখেছো তো, ও সই ! শিখেছ তো, ‘এর উপায় কি ?’ আজকার মতো পান্না শেষ করে চল ঘুমই গো ।

[সকলের প্রস্থান]

যবনিকা পতন

উদাসীন পথিকের মনের কথা

প্রথম স্তব

প্রথম তরঙ্গ

নীলকুঠি

কুষ্টিয়ার বর্তমান রেলওয়ে স্টেশনের উত্তরসীমা গোবীনদী, পূর্বসীমা কালীগঙ্গা। কালীগঙ্গা গোবীর দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে ছুটিয়া ক্রমে দক্ষিণদিক বহিয়া কুমারনদে মিশিয়াছে। কালীগঙ্গার বাম তীরে শালঘব মধ্যায় নীলকুঠি। বেলওয়ে স্টেশন হইতে সাত মাইল ব্যবধান। বর্ষাকাল—নীল কাজ আবশ্য, দিবাবাত্র লোকজনের কোলাহল।

বেলা প্রায় চটা। কুলিবা বোঝা বোঝা ‘নীল শিটি’ মাথায় কবিয়া হউজের বাহিবে ফেলিতেছে, নীলপচা ভূগন্ধময় জল, নাক-মুখ বহিয়া বৃকে-পিঠে পড়িতেছে। অল্প পরিসর পরিবেশখানি ভিজিয়া পায়ের পর্যন্ত নীলরঙে বাঁড়ি। যাইতেছে। ছোট হউজেব কুলীরা ব’ঠে হস্তে চক্রাকাবে দাঁড়াইয়া তালে তালে নীলপচা জল মাই (মছন) কবিতোছে। জাঁতষবে জালানি মাল জাঁত হইতেছে। আপিস দালানে আমলাগণ আপন আপন কার্যে বসিয়া কাগজ কলমে মনের সহিত কথা-বার্তা কহিতেছে। মে: টি. আই. কেনী শয়নকক্ষেই আছেন। দ্বিতল হইতে নামেন নাই। প্রতিদিন ৭টার সময় নিচে নামিয়া ডিহি দেখিতে গমন করেন, আজ চটা বাজিয়া যায়, নিচে আসিতেছেন না। কেফাতুল্যা দরওয়ান সিঁড়ির সম্মুখে পায়চারি করিয়া খাড়া পাহা বা দিতেছে। রাম ইয়াদ পঁাড়ে জমাদাব ঢাল-তব-বার বাঁধা, দাঁড়ি দুই ফাঁক করা—কপালে রক্তচন্দনের ফোটা, আমীন, তাগাদগীব, কোড়াবরদারসহ বারান্দার সম্মুখে মনিবেব আগমন অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। নীলমণি মাজত লালবনাতেব কুঁতি পরিয়া, মাথায় লালপাগড়ি বান্ধিয়া অঙ্কুশ হস্তে প্যারীজান হস্তীর ঘাড়ের উপর বসিয়া সিঁড়ির দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। প্যারীজান শুঁড় দোলাইয়া কর্ণ নাড়িয়া পুচ্ছ হেলাইয়া বিরক্তিকর কীট-পতঙ্গসকল শরীর হইতে তাড়াইতেছে। জয়চাঁদ সহিস স্নেতবর্ণ অয়লাবের বাগডোর ধরিয়া খাড়া রহিয়াছে। সময় সময় চামরদ্বারা ঘোটকবরের গাত্র

হইতে মক্ষিকা তাড়াইতেছে। তত্রাচ খবগতি ‘অয়লার’ পুচ্ছগুচ্ছ অনবরত নাড়িয়া হ্রেষারবে সকলেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবিত্তেছে। বেহারাগণ পালকি মাটিতে রাখিয়া ‘বেলা হইল’, ‘আজ রোজে মারা পড়িল’, ‘সাহেবের বুদ্ধি নাই’ বলে কার যেন পিতৃমাতৃশ্রদ্ধ করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে সময় যাইতেছে। সকলেই দোঁখল কেফাতুল্যা পায়চাবি রাখিয়া সেলাম বাজাইবাব জ্ঞানমতাবে দাঁড়াইল। দব-ওয়ানজীব ভাবে সকলেই বুঝিল যে সাহেব নিচে নামিতেছে, সকলেরই পূর্ব্ণভাব পবিবর্তন। নূতন ভাব নম্র ও সতক। বেহাবাগণেব মুখ বন্ধ, বেশীব ভাগ পালকি ঘাড়ে, কাম বাজাইতে খাড়া—প্রস্তুত। টি. আই. কেনী পাঠিপ টানিতে টানিতে বেতহস্তে নীচে নামিলেন। শশবাস্তে সকলেই ঘাড় নোয়াইয়া দস্তবমত সেলাম বাজাইল। সামান্য চাকবেব সেলামেব প্রত্যুত্তব, প্রায়ই নাই, ইংরেজ আবও কড়া মেজাজ, সেদিক লক্ষ্য না থাকিবাবই কথা। জগচাঁদ সহিসেব দিকে বেত উঠাইয়া বলিলেন, গোবা লাও। জগচাঁদ বোড়া লইয়া নিকটে আসিল। কেনী অশ্বে আবোহণ কবিলেন। আবাব ‘বন্দুক’ শব্দ উচ্চারণ কবিত্তেই পীববকস শিকাবী তাড়াতাড়ি বন্দুক তোজাদান লইয়া সাহেবেব পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। আমীন, তাগাদগীব, কোড়াববদাব চাকবি বাঁচাইতে উর্দ্ধ্বাসে দৌড়িতে লাগিল।

নীলমণি মাছত চাই বাং কবিয়া পাবীজানকে পিলখানায় লইয়া গেল। বেহারাগণ আজিকাব মত রক্ষা পাইল। কিন্তু সন্দাব বেহাবা মধু বলিতে লাগিল, “দেখ তো ভাই, বেটাব বুদ্ধি! কথাটা আগে বললেই হইত। আজ ঘোড়ায় চড়িয়া ডিহি দেখিতে যাইব, হাতী-পালকিব দবকাব নাই।” মনিবেব বুদ্ধি-বিবেচনায় সাতপ্রকাব ক্রটি দেখাইয়া আপিস ঘরের বারান্দায় পালকি রাখিয়া মধু সদলে বাসায় চলিয়া গেল।

টি. আই. কেনীব মনেব কথা আগে কেহ জানিতে পাবিত না। কোনদিকে নীল দেখিতে যাইবেন, সে কথা কাহাবও জানিবাব সাধ্য ছিল না। কুঠির চতুর্দিকেই নীলজমি। যে দিকে তাঁহার ইচ্ছা হইত, সেই দিকেই তিনি যাইতেন। আমীন, খালাসীরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিত। একদিন যেদিকে যাইতেন, পরদিন আর সেদিকে যাইতেন না—একথা সকলেই জানিত। আজ তিনদিন ক্রমাগত উত্তরদিকেই যাইতেছেন। কুঠির উত্তরদিকেই দমদমা গ্রাম। টি. আই. কেনী দমদমা গ্রামের মধ্যে যাইয়া পথ ভুলিয়া অন্য পথে যান। তাঁহার বহুকালেক্ত

চেনা পথ কেন যে ভুল হয়, তিনিই জানেন। ঘুরিয়া ঘুরিয়া একটি গৃহস্থের কুঁড়ে-ঘরের দিকে লক্ষ্য করেন। গ্রামাপথ। গ্রামালোক সাহেব দেখিলেই ভয় পায়। সাহেব বাহিব হইয়াছে শুনিলে যে যেখানে থাকে সে সেখানেই। গাছের আড়ালে কি পথের ধারে লুকায়—ঝাড়-জঙ্গলে মাথা দেয়, একেবারে সবিয়া যাঠিতে না পারিলে কঁপিতে কঁপিতে সেলাম বাজাইয়া জোবপায়ে সবিয়া পড়ে। গ্রামা স্ত্রীলোকেরা সাহেবের নাম শুনিলেই ঘরের দোর ঝাঁটিয়া কেহ মাচাব নীচে, কেহ ঘরের আড়ালে থাকিয়া বিলা নী রূপ দেখিয়া চক্ষু জুড়ায়। কেনী একদিনে এক পথে কখনই যাওয়া-আসা করিতেন না। আজ তিনদিন হতে তাঁহার সে নিয়ম ভঙ্গ হইয়াছে। প্রতি-দিনই দমদমা গ্রামেব মধ্য দিয়া যাওয়া-আসা করেন। একজন দুখী প্রজাব বাড়ির নিকট বিনাপবাধে ঘোড়ার উপর চাবুক মৈ করেন।—কিন্তু অশ্বের বাগডোরে গতিবোধ সংকেত। অশ্বালবের মহা বিপদ। পিছাড়া, সিকপা যতবকমেব বজ্জাতি সে জানিত তাহা বাধ্য হইয়া করিতে বাধ্য হইত। খবের খট খট, চাবুকের পটাপট বিলাতী কঠের ছটপাট শব্দ শুনিয়া অনেকেই সাহেবের ঘোড়ার কাণ্ডকারখানা ছুপনি পাতিয়া দেখিত। কেনীও সাদা চক্ষুও চাবিকিকে অনববত ঘুরিয়া কি যেন দেখিত।—চক্ষু যাহাকে দেখিতে চাহে, তাহাকে দেখিতে পায় না। প্রথমদিন যেখানে ঘোড়া দাড়াইয়াছিল, আজও সেইস্থানে দাঁড়াইল। সিকপা, পিছাড়া ঝাড়া, কিছুই বাকী বহিল না। পীরবকস প্রভৃতি যাহাবা কিছু পিছনে পড়িয়াছিল তাহারা আসিয়া জুটিল। ঘোড়া আব সোজাভাবে চলে না। অনেক গৃহস্থের পরিবার ঘরের বেড়া ছিদ্র করিয়া ঘোড়া দেখিতে লাগিল। কেনী বাহাদুরও আড়নয়নে চক্ষের কাজ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি যে মুখ দেখিবার জন্ত নিরপরাধ দেহহাজাব টাকা দামের ঘোড়াটা নষ্ট করিতে উত্তত, আজ সে মুখ তাঁহার পাপচক্ষে পড়িল না। সাহেব অশ্ব হইতে নামিয়া স্নেহবশে অশ্বগাত্রে হাত বুলাইয়া অনেক দেলাসা দিলেন। কিন্তু সে সময় তাহার চক্ষুর কার্য ভুলে নাই। সেই চক্ষু, সেই দর্শন, সেই আশা। ঘোড়া সহিসেব হস্তে অর্পিত হইল। পীরবকসের নিকট হইতে বন্দুক লইয়া কেনী জিজ্ঞাসা করিলেন, “বন্দুক ভবা আছে?”

পীরবকস ঘোড়হাতে বলিল, “হজুব! আমি ভরিয়া আনিয়াছি।”

কেনী বন্দুক লইয়া একটি গ্রাম্য ময়নাপাখির প্রতি লক্ষ্য করিলেন। সকলেই বলিল, “হজুর! ও পোষাপাখি। হজুরের চাকর জকি গাড়োওয়ানের ময়নাপাখি, পোষ মানিয়াছে, বুলিও ধরিয়াছে।”

কেনী বলিলেন, “জকি গাড়োয়ান কে?”

একে বলিতে দশজনে বলিয়া উঠিল, “হজুরেরই চাকর—গরুর গাড়ীর কাজ করে। হজুরের বহুদিনেব চাকর, এ বাড়ি-ঘরদোর সকলি হজুরের, হজুরই সকলেব মালিক।”

সাহেব অগ্ৰদিকে ফিরিয়া একটি ফাঁকা আওয়াজ কবিলেন। ময়না জকির ঘরেব মধ্যে পলাইল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা হাউ মাউ কবিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কেনী পৌবকসের হস্তে বন্দুক দিয়া অগ্নে আবোহণ কবিলেন। অগ্ন শান্তভাবে চলিতে লাগিল। নীলজমি দেখা আজিকার মত এই পর্যাস্ত শেষ হইল। কিন্তু অকারণে দুই-তিনজন কলীকে চাবুক সহি কবিয়া কুঠির দিকে ফিবিলেন। আপিস ঘরের সম্মুখে আসিয়া হরনাথ শ্রী মিশ্রী (নায়েব), শঙ্কুচরণ সাংগাল (দেওয়ান) প্রভৃতিকে কটু কথায় কয়েকটি কথা কহিয়া গরমভাবে বলিলেন, “যাহা যাহা বলিয়াছিলাম, তাহাব কি করিয়াছ? সাঁওতাব মৌবসাহেবেব নিকট পত্র লিখা হইয়াছে?”

হবনাথ বলিলেন—

“ধর্ম্মাবতাব! কোন বিষয়ে ক্রটি নাই। পত্র লিখা হইয়াছে, কেবল হজুরেব সহি বাকি।”

কেনী অগ্ন হইতে না নামিতেই তিন-চারিজন আমলা ব্যাস্তসহকারে ঘোড়া ধবিলেন। “কৈ! সে পত্র কৈ?”

সাংগাল মহাশয় পত্র হাতে কবিয়াই দাঁড়াইয়াছিলেন। আপিস ঘরের সম্মুখেই পত্র সহি হইল, তখনি সাঁওতায় লোক বওনা হইল।

কেনী বলিলেন—

“জকি গাড়োয়ানেব বাড়িতে একটি পোষাপাখি আছে, আমি সেই পাখিটা চাই।”

এইকথা বলিয়াই বাসঘরের দিকে যাইতে লাগিলেন। কিছুদূর যাইয়া পুনরায় ফিরিয়া বলিলেন, “জকি যে দাম চাহে, সেই দামই দিব। সকের জিনিস জবরাণে লইব না। তোমরাও জবরদস্তি করিয়া আনিও না।”

এই কয়েকটি কথা যেন হৃদয় হইতে কহিয়া চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় তরঙ্গ

মীরসাহেব কে ?

শালঘর মণ্ডায় কুটির উত্তরে সাঁওতা গ্রাম। শ্রোতস্বতী গোবিন্দীব পশ্চিমকূলে।—কুঠি হইতে ছুট ক্রোশ ব্যবধান। সাঁওতার বিখ্যাত জমিদার মীরসাহেব। টি. আই. কেনী চিন্তা উচ্চ, আশাও উচ্চ। তাঁহার পূর্ববর্তী কুঠিখালগণ সাঁওতার জমিদারের সহিত ক্রমাগত বিবাদ-বিসম্বাদ করিয়া চিবকাল পবাস্ত হইয়াছেন। কেনী সেইসকল ইতিবৃত্ত শুনিয়া পূর্ব হইতেই মীরসাহেবের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। পবস্পৰ বিসম্বাদ করিবেন না—কোন প্রকারে কেহ কাঁহাবও মন্দ চেষ্টায় যাতিবেন না—আপদ-বিপদে সকলেই সকলের সাহায্য করিবেন, যোগ দিবেন। কোনদিন কোন কার্যে কেহ কাঁহাকে শত্রুভাবে দেখিবেন না। সর্বদা পিরিত, প্রণমে, আপন বিষয়-বিভবের কার্য চালাইবেন—উভয়েই এই স্থিরপ্রতিজ্ঞা।

এই কেনী সহিত বন্ধুত্ব স্থাপ্য হওয়ায় ও অঞ্চলের সমুদায় নীলকরের সহিত মীরসাহেবের বনিবনাও হইয়াছিল। টি. আই. কেনী আজ যে কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, মীরসাহেবের সহিত পবামর্শ আঁটিয়া অগ্রসর হইবেন, এই তাঁহার ইচ্ছা। তাহাতেই পত্রলেখা।

মীরসাহেব কে ? এখানেই পবিচয় দিয়া বাখি। কাবণ অনেক সময় ইঁহার সহিত পাঠকগণের দেখা হইবে।

মীরসাহেব মোসলমান সমাজের সমুজ্জল রত্ন। তাঁহার বংশমর্যাদা ভাবত-বিখ্যাত। যদিও তিনি ভাবত রাজ্যের প্রান্তসীমা বঙ্গে বাস করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার পূর্বপুরুষ, পবিত্রধাম বেংগদাদ শরিফের মহা মাননীয় এবং গনণীয়, সৈয়দ-বংশসম্বৃত, প্রভু সৈয়দ সাদুল্লাহ বংশধর। সেই তাপসশ্রেষ্ঠ প্রভু সৈয়দ সাদুল্লাহ বেংগদাদ শরিফ হইতে ভাবতে ক্রমে বঙ্গরাজ্যে, পরিশেষে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত শ্রোতস্বতী চন্দনানদীর তীরে সেকাড়া গ্রামে অবস্থিতি করেন। সহচর, অহুচর, পরিষদ, মধ্যশ্রেণীর নানা শ্রেণীর ব্যবসায়ী, এমন কি রাজক, নবশুদ্ধ পর্যন্ত তাঁহার সমভিব্যাহারে বেংগদাদ হইতে ভারতে আসিয়াছিল। তাঁহার আগমনের কাবণ ও অবস্থিতি বিষয়ে পর পর ঘটনাবলীর ইতিবৃত্তসহ মীরসাহেবের সাঁওতা-বাস পর্যন্ত বিবরণ ‘আমার জীবনী’ নামক গ্রন্থে লিখিত হইবে।

এক্ষেণে মৌবসাহেবেব উপস্থিতি কাৰ্য্যবিবৰণই লেখকের লেখনীর আবশ্যকীয় উপকৰণ ।

মৌবসাহেব গৌরবর্ণ, স্থূলকায়, চক্ষু বিম্বলাবিত, ললাট বিশাল, মষ্টভাষী, সরলশ্রুতি এবং ঘোর আমোদী। পবিবাব-মধ্যে মাতৃহীন এক পুত্র, পিতৃহীনা এক ভ্রাতৃপুত্রী, দুই ভগ্নী এবং দাসদাসী ইত্যাদি। পুত্রের নাম আসগর আলী, বয়স আট বৎসব। মৌবসাহেবেব জ্যেষ্ঠভ্রাতা (শুকবননেসাব পিতা) জীবিতকালে তিনিই সংসাবেব কৰ্ত্তা ছিলেন, এক্ষণে মৌবসাহেবকে সেই সংসারেব ভালমন্দ যাবতীয় ভাব বহন কবিতে হইয়াছে। জ্যেষ্ঠভ্রাতার মৃত্যুৰ পর শুকবন-নেসাব বিবাহ দেওয়া ই মৌবসাহেবেব কতব্য কাৰ্য্য মধ্যে অগ্রে প্রধান কাৰ্য্য বলিয়া পবিগণিত হইয়াছিল। তিনি যে বিবাহ সার্য্যস্ত কৰিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে তাহাব আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলেই নাবাজ। বিবাহের পূৰ্বে মৌবসাহেবেব অতি-নিকট সম্বন্ধীয় ভ্রাতা মৌব আলী আসগর খান বাহাজুব বলিয়াছিলেন যে, ভাই, গট্টাব হজবত (প্রভু)-দিগেব সহিত কোন নূতন সম্বন্ধ কাঁও না। তাহাদের হৃদয় নাই, সমাজেব ভগ্ন নাই, লোকনিন্দাব দিকে দৃষ্টি নাই, তাহারা মহাপাপকেও অতি তুচ্ছ মনে কবে। আমি বাব বার নিষেধ কবিতেছি, সা গোলামেব সহিত শুকবনেব বিবাহ দিও না—কখনই দিও না—পবিণামে মনস্তাপ পাইবে, সৰ্কস্ব হাবাইবে—পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইবে। সাবধান! কখনই তাহাদের কথাব ভুলিও না। তুমি জান না যে, তাহারা আপন সহোদবে সহোদবে কিনা কৰিতেছে! সমাজ হাসাইতেছে। ফরিদপুৰ অঞ্চল ডুৰাইতেছে। এ সকল কথা স্মৰণ রাখিও। কখনই সেই মুৰ্খ, নিরক্ষৰ সা গোলামেব সহিত পিতৃহীনা কন্যাব বিবাহ দিও না।

বিধিৰ নিৰ্কৰ্ম্ম থগাইতে কাহাব সাধ্য! শতসহস্র প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও শুকবন-নেসাব বিবাহ সা গোলামের সহিত হইয়াছিল। বিবাহেব পর জামায়েব হস্তে জমিদারি কাৰ্য্যভার দিয়া মৌবসাহেব আমাদের সঙ্গ কিছু বেশী কৰিয়াছিলেন। সময় সময় জামাতাকে বলিতেন, দেখ বাপু! আমার কেহই নাই, কেবলমাত্র একটি পুত্র, তাহারও জীবনে সংশয়, সৰ্কদাই পীড়িত। তোমবাই আমার বল, তোমরাই আমার সকল। আপন কাৰ্য্য-কৰ্ম্ম দেখিয়া শুনিয়া কৰিবে। সংসারেব ঝগ্গাট আর আমার ভাল বোধ হয় না, জ্ঞাপুত্র-বিয়োগে আমার মন সৰ্কদাই

অস্থির থাকে। অনেক কার্যো ও ভ্রম জন্মে। এক্ষণ বিষয়াদি রক্ষা করা না করা, সকলই তোমার ইচ্ছা। দু সন্ধ্যা দুমুট খেতে পেনেই আমি স্থখী হইব।

স্না গোলাম দেখিতে গৌরবর্ণ, মুখ চোখা, মাথায় কৌকড়া চুল, চক্ষু দুটি নিতান্ত ক্ষুদ্র, ক্র কুণ্ঠিত। শীঘ্র শীঘ্র কথা, অস্পষ্ট কথা, বিশেষ মনোযোগ করিয়া না শুনিলে সে কথা অনেকেই বুঝিতে পারিত না। সময়ে সময়ে তিনি অনেক শিষ্টাচার কবিতা বিশেষ ঐক্যেব সহিত সংসাবেব কাজকর্ম চালাইতে লাগিলেন। দিন দিন জমিদারি উন্নতি, সংসাবেব উন্নতি, অবস্থাব উন্নতি, বাড়িঘরের উন্নতি, চারিদিকে উন্নতি। উন্নতিব শ্রোতলহবী, প্রবাহতবঙ্গ ক্রমে ক্রমে বহিতে লাগিল—ক্রমে ছুটিতে লাগিল।

মীরসাহেব অধিক বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাইতেন। নিদ্রা হইতে উঠিয়া এসিয়া আছেন, শালযব মধুয়াপ কৃষ্টিব রামদয়াল সিং সেলাম বাজাইয়া একখানি পত্র দিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। মীরসাহেব বাংলা ভাষা স্বচ্ছন্দে পড়িতে পারিতেন, লিখিতে জানিতেন না। মনে মনে পত্র পড়িয়া রামদয়ালকে বলিলেন, সাহেবকে আমাব সেলাম বল। সন্ধ্যাব পূর্বেই পত্রের উত্তর যাইবে। রামদয়াল পুনরায় সেলাম বাজাইয়া নাগবা জুতাভোড়া যাহা দালানের সিঁড়িব নীচে রাখিয়া আসিয়াছিল, পায দিয়া লাঠি ঘাড়ে কবিতা চলিয়া গেল।

মীরসাহেব বলিতে লাগিলেন, সুন্দরপুবেব সহিত কাজিয়া কবা বড় সহজ কথা নহে। সাহেব আজ পর্য্যন্ত প্যাবীসুন্দরবীকে চিনিতে পাবেন নাই। তা—যা হ'ক, দেবীপ্রসাদ কাছারিতে আসিয়াছেন কিনা? মাংগন খানসামা দৌড়িয়া কাছারিঘর হইতে প্রধান কার্য্যকাবক দেবীপ্রসাদকে ডাকিয়া আনিল। কেনীব পত্র চোবে ঠাকুরের হস্তে দিয়া মীরসাহেব বলিলেন, ইহার যাহা বিহিত হয় কব। আর সেইসঙ্গে ইহার উত্তর লিখিয়া দেও।

দেবীপ্রসাদ পত্র পাঠ কবিতা একটু চিন্তার পর বলিলেন, সাহেব যখন চাহিয়াছেন, দেওয়াই উচিত, কিন্তু এত লাঠিঘাল একদিনে তো জুটিবে না। মীরসাহেব বলিলেন, না জুটিলে উপায় কি! যত পাব। যখন সাহায্য চাহিয়াছেন, তখন দিতেই হইবে। দেবীপ্রসাদ বলিলেন, নিজের হাত-পা যাহারা, তাহাদের এ কাজে দিতে পারি না, সুন্দরপুবেব ঘর কম নহে। পরিণামে যে কি হইবে, তাহা ঈশ্বরই জানেন। সাহেব এত দিন দুর্ব্বলকেই নির্যাতন করিয়াছেন, সবলের গায়

তো হাত দেন নাই—এই প্রথম। যাক সে কথায় আমাদের কাজ নাই। এতদিন পরে মহিষ আব বাঘিনীতে বাবিল। ভালই হইল। হয় কেনীব সর্বস্বান্ত, নয় প্যারীসুন্দরীব সর্বনাশ। এই বলিয়া মারসাহেব উঠিয়া গেলেন। দেবীপ্রসাদও পত্রহস্তে পূর্বনির্দিষ্ট কাছাবিঘবে আসিয়া বাব দিলেন। চিঠিগত্র, লোক যেখানে যেখানে পাঠান আবশুক, পাঠাইয়া স্নান আহাব কবিতে বাড়ি চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় তবঙ্গ

প্যারীসুন্দরী

সুন্দরপুরেব জমিদার প্যারীসুন্দরী। প্রধান কার্যাকাবক বামলোচন। সে সময়েব চলতি বাঙ্গলা ভাষায় বামলোচন খুব পাকা। জমিদারি ফন্দি-ফেবেবেও দেশবিখ্যাত। সকলেই জানে যে বামলোচন একজন বিখ্যাত মামলাবাজ।

কেনীর অত্যাচাবে ছোট ছোট তালুকদার, জোতদার, নানাশ্রেণীর ব্যবসাদার, মহাজন প্রভৃতি নাজেহাল হইয়া পৈতৃক গ্রাম, বাড়ি-ঘর ছাড়িয়া নানা স্থানে নানা লোকের আশ্রয় লইতেছে—জাতি, ধন, মান, প্রাণ কোশলে বাঁচাইতেছে। কেনী এ পর্যন্ত সুন্দরপুরেব কোন প্রজাব গায়ে হাত দেন নাই, কোনরূপ অত্যাচার কবেন নাই, ইহাতেই বামলোচন নির্ভাবনায় জমিদারি চালাইতেছেন। প্যারী-সুন্দরীও ঈশ্ববে ধন্যবাদ দিয়া নির্ভাবনায় আছেন।

একদিন প্রায় একশত প্রজা কাঁদিতে কাঁদিতে সুন্দরপুর উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের একমাত্র বল-ভবসা, আশ্রয়দাত্রী ও বক্ষাকত্রী যাহাকে জানিত তাঁহার নিকট বলিতে লাগিল, “মা! রক্ষা কর। এতদিন বাঁচাইয়াছ, এখন বাঁচাও। দুঃস্থ বাঘের মুখ হইতে তোমার গরীব প্রজার প্রাণ বাঁচাও। আগামীকলা আমাদের বুনারী ধান ভাঙ্গিয়া সাহেব নীলবুনানী কবিবে—বহুতর লাঠিয়াল সংগ্রহ করিয়াছে। মা! আমাদের রক্ষা কর। দুঃস্থ জালেমেব হস্ত হইতে তোমার গরীব প্রজাদিগকে রক্ষা কর। এতদিন ছিলাম ভাল, এখন মারা পড়িলাম। আর বাঁচিবার পথ নাই। সংবৎসর আশা কবিয়া চাষ করিয়াছি, পেটে না খাইয়া ঘরের ধান মাঠে ফেলিয়াছি, স্ত্রী-পুত্র লইয়া খাইয়া প্রাণ বাঁচাইব, আপনাব বাজস্ব আদায় করিব আশাতেই সাধের অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া ঐ ধানখেতের দিকে চাহিয়া একটু স্থির রহিয়াছি। মা! আমাদের সেই বোনা ধান ভাঙ্গিয়া সাহেব যদি নীল-

বুনানী করে, তবে আমবা একেবাবে মাবা পডিব—ছেলেমেয়েসমেত মাৰা পডিব। মা! তুমি মুখ তুলিয়া না চাহিলে আমাদের মুখেব প্রতি একেবাব নজর করে এমন লোক জগতে আব কেহই নাই। মা! তুমিই আমাদের রক্ষাকর্তা। মা! তোমাব এই অধম সন্তানদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা কব। দুবস্ত জালেমের হাত হইতে বাঁচাও।”

প্যারীসুন্দরী প্রজাদিগেব কাতব উক্তি শ্রবণ কবিয়া ব্যথিত হইলেন। তিনি বামলোচনকে ডাকিয়া বলিলেন, “আমাব প্রজাব প্রতি অত্যাচাব যাহা শুনিতে বাকি ছিল, আমি বাঁচিয়া থাকিতে ভাগ্যক্রমে তাহাই শুনিতে হইল। আমি থাকিতে আমাব প্রজাব প্রতি নীলকব ইংরেজ দেবায়্যা কবিবে? আমি বাঁচিয়া থাকিতে আমাব প্রজাব বুনানী বান ভাঙ্গিয়া কেনী নীল বুনিবে, ইহা আমাব প্রাণে কখনই সস্তা হইবে না। প্রজাদিগেব দুববস্থা আমি এই নাবাঁ-চক্ষে কখনই দেখিতে পাবিব না। যে উপায়ে হটুক, প্রজা রক্ষা কবিতেই হইবে। লোক-জন, টাকা, সন্দাব, লাঙ্গিবাঁল যাংহাতে হয়, তাহাব দ্বাবা প্রজাব পন, মান, প্রাণ জালেমেব হস্ত হইতে বাঁচাইতে হইবে। পান ভাঙ্গিয়া যাংহাতে নীলবুনানী কবিতে না পাবে তাহাব বিশেষ উপায় কবিতে হইবে। আপন প্রজাকেই যদি দুবস্ত নব-বাস্ত্র হইতে রক্ষা কবিতে না পাবিলাম—শ্বেচ্ছ পাপাত্মাব কঠিন হস্ত হইতে রক্ষা করিতে না পাবিলাম—তবে এ বিষয়-বিভব, টাকা এবং জমিদারিতে প্রয়োজন কি? এখনি এ-সকল প্রজার সাহায্যার্থ লোক পাঠাও। যদি যথার্থই সাহেবেব পক্ষীয় লোকেবা এইসকল প্রজাব পান ভাঙ্গিয়া নীলবুনানী কবিতে আইসে, দ্বিতীয় আদেশেব অপেক্ষা নাই—যেপ্রকাবে হয় তাহাদিগকে তাড়াইয়া—শাস্তি দিয়া তাড়াইয়া প্রজা রক্ষা কবিবে। পান ভাঙ্গিয়া নীলবুনানী করিলে কি আব প্রজা বাঁচিলে? কি লজ্জাব কথা! কি ঘৃণাব কথা! কোথায় বেলাত, আব কোথায় এদেশ। একটিমাত্র ইংরেজ (কেনী) আসিয়া এদেশ উচ্ছিন্ন করিল। একেবাবে ছারখার করিয়া ফেলিল! কৃষি-প্রজাব জমিজমা কাড়িয়া লইয়া নীলবুনানী কবিল। কত তালুকদাবেব তালুক, কত জোতদাবেব জোত জবরাণে লিখিয়া লইল। কাহাবও যথাসর্ব্বশ্ব লুটিয়া লইয়া একেবারে পথের কাঙ্গাল করিয়া ছাড়িয়া দিল। হায় হায়! কি দুঃখ! যাহারা চিরকাল দুখে-ভাতে, স্তম্ভ-স্বচ্ছন্দে, আপন আপন পবিবার লইয়া সংসার-ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছে, কত অতিথি-সেবায়, দেবতা-পূজায়, দীনদুঃখীর সাহায্য করিয়া কত লোকেব উপকার

করিয়াছে, কত অনাহারীর আহার দিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছে, এক্ষণে তাহাঁরাই একটি পয়সার জন্তে লালায়িত ! তাহাদের পেটে অন্ন নাই, গায়ে বস্ত্র নাই, থাকিবার স্থান নাই । হায় ! হায় ! তাহাদের মা, ভগ্নী, স্ত্রী, মাসী, পিসীর উদরের দিকে চাহিলে কাহার না চক্ষু জলে ডুবিয়া যায় ? সে জীর্ণশীর্ণ শরীরে শত গ্রন্থিযুক্ত পরিধেয়ের প্রতি দৃষ্টি পড়িলে কাহার না অন্তরে ব্যথা লাগে ? সে দুঃখ কি আর মাহুষে চক্ষে দেখিতে পারে ? ঐ কেনীর দৌরাভ্যা সহ্য করিতে না পারিয়া কত ভদ্রসন্তান, কত নিরীহ লোক পৈতৃক বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া কোথায় কোথায় কোন দেশে চলিয়া গিয়া জাতি, কুল, মান রক্ষা করিতেছে । যাহারা পৈতৃক ভিটার মায়া-মমতা একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, তাহারা যথাসর্বস্ব দিয়াও রক্ষা পায় নাই । নীল কাটা, হউজ মাই, নোকাব গুণ টানান এইসকল কাণ্ডে তাহাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া যাইতেছে । ইহাব পর আবার সময় সময় হাত-পা বান্ধিয়া গাছে লটকাইয়া চাবুকে পিঠের ছাল তুলিতেছে ! উহ ! কি ভয়ানক নরব্যাস্ত্র ! কি করিব, আমি দেশের রাজা নহি, সকলে আমার অধীন প্রজা নহে, এদেশের সকল জমিদারি প্যারীসুন্দরীর নহে । কি করিব, এদেশের আর কাহারও কিছু রাখিবে না । ও বেলাতী কুকুর এদেশের সকলকেই দংশন করিবে ! সে বিধে সকলেই জর্জরীভূত হইবে । প্রথমেই ঐ স্নেহের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া না দিলে শেষে আমার জমিদারি পর্য্যন্ত গ্রাস করিয়া ভস্মীভূত করিবে । আমাকে যে কিরূপ বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে, তাহা ঈশ্বরই জানেন । শেষে কি সুন্দরপুরের ঘরের মান ডুবিবে ! হায় ! হায় ! শেষে কি কেনীর হস্তে সুন্দরপুরের ঘর মাটি হইবে ?

রামলোচন বলিলেন—“কেনীর সাধ্য কি যে আমাদের প্রজার উপর অত্যাচার করে । যে উপায়ে হয় আমি তাঁহাকে দূরস্ত করিব । কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুকদারের বিষয়-সম্পত্তি বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া তাঁহার মেজাজ গরমী চড়িয়াছে । আপনার আশীর্ব্বাদ থাকিলে যে উপায়ে হয় তাঁহাকে এমন শিক্ষা দিয়া দিব যে আর কখনও সুন্দরপুরের নাম স্বপ্নেও মুখে না আনেন—মনে না করেন । আর বাঙ্গালী হইলেই যে শেয়াল-কুকুর হয় তাহাও না ভাবেন ।” এই বলিয়া রামলোচন বিদায় হইয়া আপন কর্তব্য কাণ্ডে চলিয়া গেলেন ।

রাত্রি এক প্রহর পর্য্যন্ত রামলোচন লাঠিয়াল ঘোগাড় করিয়া প্রজাগণের

সাহায্যে নিযুক্ত করিলেন। এবং একজন সাহসী কর্মচারীকে তাহাদের অধিনায়ক করিয়া প্রজাগণকে সঙ্গে দিয়া তখনই স্বন্দরপুর হইতে ঘটনাস্থানে পাঠাইয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন রাত্রি প্রভাত না হইতে হইতে ভারলেব (গ্রাম) কাছারি পহুঁছবে এবং তথা হইতে যত লোক পাও সঙ্গে লইয়া সেই ধানব জমিতে যাইয়া থাকিবে। প্রাণ থাকিতে সাহেবের লাঠিয়ালকে আমার এলাকায় পা দিতে দিবে না। যেখানে যাহাকে পাও মারিবে। ধরিয়া আনিতে পারিলে ত কথাই নাই।

একে একে সকলেই বামলোচনেব আশীর্বাদ লইয়া স্বন্দরপুর হইতে বিদায় হইল।

চতুর্থ তরঙ্গ

বান্গালী যুদ্ধ

বান্গালী যুদ্ধে ডাক ভাঙ্গা একপ্রকার উৎসাহস্ফূর্ত বান্জন্য এবং দূতব কার্য্য করে। ডাকের উত্তর-প্রত্যুত্তরেই ক্ষমতা, বল, লোকসংখ্যা সকলই বোঝা যায়। অনেক সময় এরূপ ঘটনা থাকে যে, কেবল ডাক ভাঙ্গার উত্তর-প্রত্যুত্তরেই নিস্তেজ পক্ষ হটিয়া যায়। আর অগ্রসর হয় না। রাত্রি প্রভাত হওয়ার পূর্বেই প্যারীসুন্দরীর সন্দারগণ নিদ্রিষ্ট স্থানে 'মার মার' শব্দে আসিয়া পড়িল। আসিয়া যাহা দেখিল তাহাতে একেবারে ভগ্নহৃদয়ে হতাশ হইয়া—নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। কারণ সাহেবের লাঠিয়ালগণ বিরোধী ভূমিতে পূর্বেই আসিয়াছিল। কেবল প্রভাতের প্রতীক্ষায় ছিল মাত্র। উভয় পক্ষের মশালের আলো দেখিয়া উভয় পক্ষ ডাক ভাঙ্গিয়া উত্তর-প্রত্যুত্তরেই বুঝ-সমুজ হইয়া গেল। উভয় পক্ষ জানিল যে কোন পক্ষই কম নহে। প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালেরা স্থির করিল যে, রাত্রে লাঠালাঠি, মারামারি করা বুদ্ধির কার্য্য নহে। কে কোথা হইতে কাহাকে মারিবে, কে মরিবে, কে বাঁচিবে, কে রক্ষা করিবে, কে দেখিবে, একটু অপেক্ষা করিয়া পূর্বদিক ফরসার সহিত আমরাও ওদিকে কবসা করিয়া দিব।

মামায়ী নিশা পরস্পর বিবাদ-বাধাইয়া দিবার জন্তই বোধহয় শীঘ্র শীঘ্র প্রস্থান করিলেন। দুই দলে স্পষ্ট দেখাশুনা হইল। ছেড়ছাড় মিষ্টি গালি-গালাজ চলিল। প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালেবা সজোরে ডাক ভাঙ্গিয়া ক্রমশঃই অগ্রসর হইতে লাগিল। ইহারা মনে করিয়াছিল যে, যে জমির ধান ভাঙ্গিয়া সাহেব নীল-

বুনানি করিবেন, সে জমি পিছে ফেলিয়া নিদ্বিষ্ট সীমায় দাঁড়াইয়া বুনানি ধান রক্ষা করিবে। সাহেবের লাঠিয়ালদিগকে আর সে জমির দিকে আসিতেই দিবে না। সে আশা বিফল হইল। কারণ সাহেবের লাঠিয়ালেরা পূর্বেই ধানখেত পাছে করিয়া আপন আপন আয়ত্ত ও স্ববিধা মত আনি (বুহ) ভাঙ্গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে প্রভাতবায়ু বহিয়া পূর্বদিক পরিষ্কার করিয়া দিল। মশালের আলো মলিন হইয়া মুখে ছাই মাখিয়া নিবিয়া গেল। পুনরায় উভয় দলেব কথা চলিল। ক্রমে গালাগালি, শেষে লাঠালাঠির উপক্রম। ওদিকে কেনীর পক্ষ হইতে শতাধিক লোক লাঙ্গল-গরু জুড়িয়া ধান ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। প্যারীসুন্দরীর কার্য্যকারক, যিনি হুকুম দেহেন্দা হইয়া আসিয়াছিলেন, ঘোড়া টপকাইয়া এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে দৈবাৎ সাহেবের সন্দারদিগের পিছনে বহুতর গরু ও লাঙ্গল দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, “ভাইসকল! আর দাঁড়াইয়া কি কর ওদিকে দকাবফা। ঐ দেখ, ধান ভাঙ্গিয়া নীল বুনিতেছে। আমবা যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহা হইল না। সর্ব্বনাশ হইল! সুন্দরপুর গিয়া কি জবাব দিব?”

প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালেরা বিকট চীৎকার করিয়া কেনীর লাঠিয়ালের প্রতি আক্রমণ করিল। বিপক্ষদলও বিশেষ শিক্ষিত—কিছুতেই হেলিল না। আনি ভাঙ্গিল না—একপাও নড়িল না। লাঠি-উডসড়কি অবিরত চলিতে লাগিল। কেনীর লাঠিয়ালেবা কেবল আত্মরক্ষা করিতেছে, একপদও অগ্রসর হইতেছে না। কার্য্যসিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত (ধান ভাঙ্গিয়া নীল-বুনানি) আক্রমণের নামও মুখে আনিবেন না, ইহাই তাহাদের স্থির-সংকল্প।

এদিকে সূর্য্যদেবের আগমন সহিত টি. আই. কেনী বৃহদাকার খেতবর্ণ অশ্বে আরোহণ করিয়া ত্বরিতবেগে আপন লাঠিয়ালদিগের পৃষ্ঠপোষক হইলেন। দেখিতে দেখিতে ধান ভাঙ্গিয়া নীল-বুনানি শেষ হইয়া গেল।

সাহেব গভীরস্বরে বলিলেন, “আর দেখ কি, লাগাও!”

স্বয়ং মনিবের হুকুম। পাঁচশত লাঠিয়াল একত্রে সেই বিকট চীৎকারে, মাঝে মাঝে ঝ-ঝ শব্দ করিয়া মনিবের সাহস ও উৎসাহবাক্যে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। কেনী লাঠিয়ালদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালেরা সাহেবকে স্পষ্টভাবে দেখিতেছে। অশ্ব উচ্চ, কেনীর শরীর উচ্চ,

সকলের মাথার উপর মাথা—সে মাথার উপরে আরো উচ্চ টুপি। সকলেই দেখিতেছে যে, আজ কেনী স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে রহিয়াছেন। প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়াল-গণমধ্যে সড়কিওয়াল সর্দার অনেক ছিল। একজন সড়কিওয়াল সর্দার টি. আই. কেনীর মস্তক লক্ষ্য করিয়া উড়সড়কি এমন কৌশলে নিক্ষেপ করিল যে, সাহেবের টুপি সড়কির আঘাতে মাটিতে পড়িয়া গেল। মাথায় আঘাত লাগিল না। সাহেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দুই-তিনজন প্রধান প্রধান লাঠিয়ালেব পৃষ্ঠে চাবুক সহ করিয়া কারয়া বলিতে লাগিলেন, “ড্যাম শুয়াব, কেবল ডাক ভাঙ্গিতে জান, পায়তারা করিতে জান, লাঠি ভাঁজিতে জান, মারিতে জান না? লাগাও, তাড়াও, মার শুয়ার লোককো—”

লাঠিয়ালেরা হুকুমের জোরে চাবুকের জ্বালায় বিপক্ষ দল প্রতি সজোরে লাঠি-সড়কি মারিতে আরম্ভ করিল, এবং ক্রমশই অগ্রসব—প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালেরা আঘাতিত হইতেছে, কিন্তু পৃষ্ঠ দেখাইতেছে না, দৌড়িয়া পলাইতেছে না। ক্রমে পিছে হঠিয়া আত্মরক্ষা করিতে কবিতো যাইতেছে। দুই-তিনটি লোক পিছে হঠিয়া যাইতে যাইতে দৈবাৎ উচ্চনিচু স্থানে যেই পড়িয়াছে, অমনি সাহেবের লাঠিয়াল সড়কিধারা আঘাত করিয়া বিক্ষিয়া ফেলিল, আর উঠিতে দিল না। মাহুঘের রক্তের ধারা ছুটিল। কেহ উঠিয়া বসিতেই পড়িয়া গেল। কেহ মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল। বক্তমাথা সড়কির দিকে দৃষ্টি করিয়া প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালগণ ঢাল, সড়কি, লাঠি ফেলিয়া উর্দ্ধস্থানে পলাইতে আবস্ত করিল। যে যেদিক স্থবিধা বুঝিল, সে সেইদিকেই যথাসাধ্য দৌড়িল। হুকুম দেহেন্দা মহাশয় কোন সময় চম্পট দিয়াছিলেন, তাহা কেহই দেখিতে পায় নাই।

টি. আই. কেনীর উৎসাহে তাঁহার লাঠিয়ালগণ অর্ধকোশ পর্য্যন্ত বিপক্ষ-গণকে তাড়াইয়া লইয়া চলিল। শেষে তাহারা একেবারে দল ভাঙ্গা হইয়া কাডে-জঙ্গলে এবং সম্মুখে গ্রামের মধ্যে গিয়া প্রাণ বাঁচাইল। টি. আই. কেনী সদর্পে বলিতে লাগিলেন—“আর আগে বাড়িও না। এক্ষণে প্যারীসুন্দরীর প্রজাগণের বাড়ি-ঘর যাহা সম্মুখে পাও ভাঙ্গিয়া ফেল। জিনিষপত্র লুটিয়া লও।”

আদেশমাত্র লুঠ আরম্ভ হইল। খালা, ঘটি, বাটি এবং রুঘক-স্ত্রীদের গায়ের রূপার অলঙ্কার সর্দারগণ টানিয়া ছিঁড়িয়া খসাইতে আরম্ভ করিল। পাষণ্ডেরা স্ত্রীলোকদিগের পরনের কাপড় পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইয়া কেহ শাজায়, কেহ মাথায়

বান্ধিয়া বাহাছরি দেখাইতে লাগিল। গরুসকল তাড়াইয়া কুঠির দিকে লইয়া চলিল। ঘরের অগ্ন্যাগ্ন জিনিসপত্র যাহাই স্থবিধা পাইল লইল, অবশিষ্ট ভান্ধিয়া চুরমার করিয়া শেষে ভাঙ্গাঘরে, ভালঘরে আগুন লাগাইয়া টি. আই. কেনী লাঠিয়ালগণসহ কুঠির দিকে ফিরিলেন।

প্যারীসুন্দরীর প্রজার সর্বপ্রকারে সর্বনাশ!—বিনাশ—একেবারে রসাতল। মাথা ভান্ধিয়া কারা।—স্ত্রীলোকেরা ঝাড়ে-জঙ্গলে প্রাণের ভয়ে, জাতের ভয়ে লুকাইয়া বাড়িপোড়া আগুন—জলপোরা চক্ষে দেখিয়া মৃত্যুযাতনা ভোগ কবিত্তে লাগিল। সাহেব সদলে কুঠিতে আসিয়াই লাঠিয়ালগণকে বকশিশ দিয়া খুসি কবিলেন। লুটেব মাল কাঁসা, পিতল, বস্তাদি লাঠিয়ালগণের বাড়িতে গেল। সোনাকুপা সাহেবেব আলমারিতে উঠিল। গরুসকলের গায়ে তখনি T. I. K. মার্ক বসাইয়া কুঠিব গরুর সামিল হইল। সময়ে এ সংবাদ সকলেই শুনিলেন। হায়! হায়! ভিন্ন আব উপায় কি!

টি. আই. কেনী পত্রদ্বারা মীবসাহেবকে এ শুভ সংবাদ জ্ঞানাইলেন। মীর-সাহেব প্যারীসুন্দরীর প্রজাগণের দুর্বস্থার কথা শুনিয়া মহা দুঃখিত হইলেন। কি কবিবেন দায়ে পড়িয়া কেনীর সহিত বন্ধুত্ব। নিজেব সম্পত্তি, মান, সম্মান রক্ষা কবাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। জানিত পক্ষে কেনীর অপকাব করিবেন না, এইটিই তাঁহার স্থির সঙ্কল্প। বোধহয় কেনী পত্রের উত্তর, সন্তোষ এবং হরিষের কথা পুরিয়া দিয়াছিলেন।

প্যারীসুন্দরীর প্রজাদিগের দুর্বস্থাব কথা শুনিতে কাহারও বাকি থাকিল না। অগ্ন্যাগ্ন জমিদার, তালুকদার, মধ্যশ্রেণীব জোতদার, প্রজা। সকলেই ভয়ে ভীত, ব্যস্ত—অস্থির। কখন কাহার ভাগ্যে কি হয়, এই ভাবনাতেই সকলে

কেনী ক্রমে ক্রমে নিকটবর্তী জোতদার, তালুকদারদিগকে পত্রদ্বারা, কাহাকে লাঠিয়ালদ্বারা আনিয়া তপহাদের পৈতৃক ভূ-সম্পত্তি আপন স্থবিধা মত কবালা, পণ্ডনী এবং মিরাস স্বত্ব দলিল লিখাইয়া লইতে লাগিলেন। চির-দখলী পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তি লিখিয়া দিতে যিনি একটু ওজর-আপত্তি করিলেন, তিনিই সিরাজদ্দৌলার অন্ধকূপসম গুদামজাত হইলেন। কষ্টের একশেষ। বাধ্য হইয়া

সে কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া কেনীর মনোমত দলিল লিখিয়া দিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। অমাত্যবিক কয়েদ হইতে খালাস পাইলেন।

সে সময় কুষ্টিয়া অঞ্চলে কেনীই রাজা, কেনীই প্রায় হর্ত্তাকর্ত্তার মালিক। যা করে—কেনী। শালঘর মধুয়ার কুঠির দিন দিন উন্নতি। নীলের উন্নতি, রেশমের উন্নতি, চতুদ্দিকে কেনীর নাম। কেনীর নামে পুরুষের পীলে কাঁপে, গভিনীর গর্ভ-পাত হয়! ছোট ছোট ছেলেরা কেনীর নামে ভয় পায়। কেনীর দৌরাড্যা আগুনে দেশের লোক জলিয়া পুড়িয়া থাক হইতে লাগিল। কুঠির নাম শুনিলেই হৃদয় কাঁপে। কুঠির সীমা-মধ্যে পা ধরিতে অনেকেরই প্রাণ কাঁপিয়া—অঙ্গ শিহবিয়া উঠে—মুখ শুকাইয়া যায়। কুঠির সম্মুখে কালীগঙ্গা। কালীগঙ্গার পশ্চিমপার দিয়া লোকজনের গতিবিধি ভিন্ন, কুঠির পার—পূর্ব পার দিয়া কেহই যাইতে সাহসী হয় না। নিকটবর্ত্তী জমিদার, তালুকদার, সকলেই কুঠিব চটকা (বৃক্ষ বিশেষ) তলায় পড়িয়া আপন আপন পীব-পয়গম্বর বা ইষ্টদেবতার নাম করিয়া থাকেন। কার ভালে কি হয় কে জানে! বিনা তলবে আপিস ঘবে কাহারও যাইবার অনুমতি নাই। কার সাধ্য সে আজ্ঞা লঙ্ঘন কবে? বা বিপর্যয় ঘটায়? ঘরাও বিবাদ, প্রজায় প্রজায় মারামারি, স্বত্বাঙ্গের বিচাব, খত পত্র তমঃস্কক ইত্যাদি যাবতীয় নালিশ সে সময় কেনী গ্রহণ করিতেন।—পরে শুনিয়াছি যে, কেনীব অনারারি মাজিষ্টারের ক্ষমতা ছিল।

কুষ্টিয়ায় মহকুমা হয় নাই। জেলাও পদ্মার পার। জমিদার কেনী—বিচারকর্ত্তা কেনী—মহারাজ্ঞও কেনী। রাখেন তিনি, মারেন তিনি। যার আগে থেকেই কেনীর পংয়ে মুজা চড়াইয়াছিলেন, তাঁহারা একটু আছেন ভাল। বিশ্বাস ছিল যে, বিচার না করিয়া আব গুদামে পুরবে না।

এ গুদাম—বড় ভয়ানক বন্দিখানা। সরকারী গুদামে পেট পুরিয়া না ইউক, কয়েদী ছুবেলা দুমুঠো ভাতের মুখ দেখিতে পায়। এ গুদামে তা নয়, এ বন্দি-খানার সে কথা নয়, ইহার ভিন্ন ভাব—অল্প কারবার—বড় ভয়ানক স্থান! সেখানে শুইবার বিছানা নাই, বালিশ-কাঁথা-কস্বলের নাম নাই। ভাতের মুখ দেখিবার ভাগ্যই নাই। আহারের ব্যবস্থা ধান।—ধান বাছ, চাল বাহির কর, জলে মিগিয়ে গিলে ফেল।

পঞ্চম তরঙ্গ

আবার

রামলোচন একখানি পত্র প্যারীসুন্দরীর নিকট দিয়া বলিলেন, পত্র পড়ে দেখুন।

প্যারীসুন্দরী পত্র পাঠ করিয়া ক্ষণকাল নীববে চিন্তা করিলেন। ভাবে বোধ হইল, যেন কোন বিশেষ গুপ্ত কথা পত্রে লিখা। ক্ষণকাল পরে বলিলেন, এবারেও যদি গতবারের মত হয়, তবে আর—কাজ নাই,—অপমান অপেক্ষা মৃত্যুই ভাল।—

রামলোচন বলিলেন, “চেষ্টাস ক্রটি নাই। জয়পবাজয় ভগবানের হাত—দেখি। এবারেও দেখি।”

প্যারীসুন্দরী বলিলেন, “দেখিতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু খুব সাবধান—খুব সতর্কে, এবাবে খুব সতর্কভাবে কাণ্ড কবিবে। ঐ স্নেচ্ছ ইংবেজ বোটা (কেনী) কোন দেশ হইতে এদেশে আসিয়া, দেশের লোকের সাহায্যে আমাদিগকে এত কষ্ট দিতেছে। প্রজাব হৃদিশার কথা শুনিয়া আমার হৃদয় ফাটনা যাইতেছে। হায়! হায়! একটি শ্বেতবাস্কসে আমার জমিদারি পর্য্যন্ত গ্রাস করিতে বসিয়াছে।—স্নেচ্ছ বোটা দর্প করিয়া বলিয়াছে যে, প্যারীসুন্দরীকে যে আমার নিকট ধরিয়া আনিবে হাজাব টাকা পুঙ্খার পাইবে। আমি ভাল কবিয়া বিলাতী সাবানে তাহার গায়েব মলা দূব করিয়া যাতে বাঙ্গালীর গন্ধ শরীর হইতে একেবারে সরে যায় তার উপায় করিব। গাউন পরাইয়া দিছি মেম সাজাইয়া কুঠিতে বাখিব। কি ঘৃণা! কর্ণ! তুমি বধিব হও, বধির হও।”

রামলোচন বলিলেন, “হুজুর! যত শুনা যায় তত নয়। আবার পব মুখে পরের কথা কিছু বেশি পরিমাণেই কানে আসে। ও সকল কথায় কান দিবেন না। শত্রুর মুখ—আব পাগলের জিহ্বা, এ দুই-ই সমান। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।—বাজে কথা বলাব জগু বাজে মুখ আছে। শুনিবার জগুও বিস্তর কান রহিয়াছে। আমবা কাজের কথা শুনিব। এবং যাহা মনে আছে করিব। ও সকল হাওয়াই কথায় কখনই কান দিব না।”

প্যারীসুন্দরী বলিলেন, “বাজে কথায় কান না দেওয়াই ভাল, কিন্তু কেনীর মেমকে যে হাতে আনিয়া দিবে, এই হাজ্জাব টাকাব তোড়া তাহাঁব জন্তে ধরা রহিল,—ইহাব পব—মনেব মত তাহাকে সন্তুষ্ট করিব। আজীবন তাহার চাকুরি বজায় থাকিবে। মৃত্যুর পবেও তাব বংশাবলী সুন্দরপুত্রের ঘর হইতে বিশেষ বৃত্তি পাইবে।”

রামলোচন বলিলেন, “এ উতলার কার্য্য নহে। সকল দিক বক্ষা কবিয়া, মান, সম্মান, এবং প্রাণ বাঁচাইয়া এইসকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। রোষবশে সাংঘাতিক কোন কার্য্য কবিতে অগ্রসর হওয়া মাহুষেব কার্য্য নহে। আগে আত্মরক্ষা, শেষে যাহা ইচ্ছা। ইহার অত্থায় নিত্য নূতন বিপদ ঘটাবাবই বেশী সম্ভাবনা। এই তো সেদিন তাডাতাড়ি করিয়া অপ্রস্তুত হইতে হইল। পূর্ক হইতে আয়োজন কবিয়া আগাগোড়া ঠাট্টিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে কিছুতেই ঠকিতাম না। সাহেবেব লোকেবা কি সুন্দর কৌশলে কার্য্যসিদ্ধি করিয়া চলিয়া গেল। বিবেচনার ক্রটিতেই সরকারী চাকব ১০।১২ জন অনর্থক জখমী হইল। যদিও তাহারা প্রাণে মরিবে না কিন্তু আশঙ্কা অনেক।”

প্যারীসুন্দরী বলিলেন, “আমি যে কিছু না বুঝি তাহা নহে। কিন্তু এত অপমান, এত লাঞ্ছনা, প্রজ্জার প্রতি দোবাত্যা ইহা আমাব প্রাণে কখনই সহিবে না। যাহা হইবার হইয়াছে। গত কথায় আর ফল কি? এবারে কত লাঠিয়াল সংগ্রহ করিয়াছ? এবাব তোমাকে স্বয়ং যাইতে হইবে। কুঠি পর্য্যন্ত নিজে না যাও, আমার কাছারি বাড়িতে থাকিবে। ইংরেজ দেখিলেই তোমরা যে কেন এত ভয় কর, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। সেও মাহুষ, তোমরাও মাহুষ। তোমাদেরও দুই হাত দুই পা, তাহাদেরও তাহাঁই। কোন হাড় কি শিরা তোমাদের শরীর অপেক্ষা তাহাদের বেশি নাই, অঙ্গপ্রত্যঙ্গেরও কোন প্রভেদ নাই, আছে কেবল রঙের প্রভেদ। আর একটু প্রভেদ আছে। তোমরা নীলকর কুঠিয়ালদের ত্রায় পরিশ্রমী নও, বুদ্ধি-মানও নও। কেনীর ত্রায় মিথ্যাবাদীও নও, নির্দয়, নির্ভর, প্রবঞ্চকও নও। অত স্বার্থপরও নও। আমি শুনিয়াছিলাম যে টি. আই. কেনী বিলাতের ভদ্র-বংশীয়। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, সেসকল কথারই কথা। এখন দেখিতেছি

কেনী চামার অপেক্ষাও অধম, মেথর অপেক্ষাও নীচ। ঐ কুটিবই একজন সাহেবকে সাঁওতার বড় মীরসাহেব কি কবিতাছিলেন মনে আছে? আজ যে মীর-সাহেব কেনীর আজ্ঞাবহ, সেই মীরের জ্যেষ্ঠভ্রাতা যে কীত্তি করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, চিরকাল এদেশে সাধারণের মনে সে-কথা আঁকা থাকিবে। তাঁহার ক্ষমতাকে সহস্র ধন্যবাদ। যে নীলকরকে দেখিলে তোমরা দশহাত সরিয়া পড়, দুইহাত সেলাম বাজাইতে বাজাইতে পিছে হটিয়া হাঁপ ছাড়, দেবতাব ন্যায় পূজা কর, যম হইতেও ভয় কর। সত্য কথা বলিব তাহাতে আব দোষ কি? নিন্দাবই-বা কথা কি? সাহেব দেখিলে সকলেরই যেন গা কাঁপিয়া ওঠে। সে গিড়িমিড়ি কথা কানে গেলে মহামহিম মহাশয়েরও প্রাণ উড়িয়া যায়। সেই নীলকরকে ধবিয়া তিনি যেক্রপ শাস্তি কবিতাছিলেন, তাহা এদেশের সকলেই জানে। বড় মীর ঐ শালঘব মদ্যায় কুটিব একজন কুটিয়াল সাহেবকে ধবিয়া, দিনে দুপুবে তাহার একটি কান কাটিয়া লইয়াছিলেন। প্রজাব প্রতি অত্যাচার করাতেই না তাহাব বাগ—সাহেবেরও শাস্তি। আমি কি বলিব। আর কি কবিব। সমুদায় কার্য্য পরেব হস্তে। শুবু মুখেব কথায় কি হয়? যা হউক, আমি আবাব বলিতেছি কেনীর মেমকে তোমাব নিকট চাই।”

রামলোচন বলিলেন, “জুজুব। আমাব নিজেব কার্য্য নহে। যাহা করিব সকলই পরের হস্তে, আমি যোগাড়ের ক্রটি করি নাই। কখনও কবিব না। টাকা খবচ করিতেও আপনাব হুকুমের অপেক্ষায় থাকি নাই, থাকিবও না—দেখি, এবাবে ঈশ্বর কি করেন।” এই বলিয়া রামলোচন প্যাবীন্দ্রবীর নিকট হইতে বিদায় হইলেন।

ষষ্ঠ তরঙ্গ

মিসেস কেনী

যে সময়ের কথা, সে সময় কুটিয়ার মহকুমা বসে নাই। কেনীর জমিদারির কতক অংশ পাবনার সামিল, কতক মাগুরা যশোহরের অধীন। বিশেষ কোন আবশ্যকীয় কার্য্যোপলক্ষে কেনীকে স্বয়ং যশোহরে যাঁতে হইয়াছিল। যখন সংবাদ পাইয়াছেন, তখনই বেহারার ডাক বসাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। রাত্রে সংবাদ রাত্রেই যাওয়া—অনেকেই তাঁহার যশোহর গমনের খবর পায় নাই।

প্যারীসুন্দরীর গুপ্তচর সন্ধান করিয়া সুন্দরপুরে যে সংবাদ দিয়াছে, তাহা ঠিক হয় নাই। কারণ কুঠির লোকেই কেনীর সংবাদ ঠিক জানে না। • অনেকেই জানে, সাহেব কুঠিতেই আছেন। কেনী কুঠি হইতে বাহির হইলেন, মেমসাহেব পিয়ানোয় হাত দিয়া অনেক বাত্রি পর্য্যন্ত পিয়ানোর স্ববে স্বর মিলাইয়া গান করিলেন। ক্লাস্তবোধেই হউক, কি নিশির স্তব্ধতায় বিশেষ কোন কথা মনে উঠিয়াই হউক, হৃদয় বিচলিত হইয়া মিহিস্তর বন্ধ হইল। পিয়ানোর বাজনাও থামিয়া গেল। হৃদয়ে যে চিন্তাব লহরীই খেলিতে থাকুক, তাহা মুখে ফুটিল না। মনের কোন কথা মুখে আনিলেন না, কিন্তু ভাবে বোধ হইল যেন তিনি কি ভাবিতেন। তাঁহার পূর্ব অবস্থাব কথা—ইংলণ্ডেব কথা? তাঁহার ভাগ্যের কথা? ভাবিতেছিলেন কেনীকে বিবাহ করিয়া ভালই কবিয়াছেন। ইংলণ্ডে থাকিলে এত সুখ ভাগ্যে কখনই ঘটিত না। নৃত্য, গীত, আহাব, বিবাহ, আমোদ, বাজ-প্রাসাদে রাজভোগ, ইহা কখনই তাঁহার স্তন্দব ললাটে জুটিত না। হয় জুতা সেলায়ের স্ত্রতাব যোগাড়, না-হয় কাপড় ইস্তিবিব সবঞ্জাম ছুবন্ত, নয় দোকান ঘবে বিকিকিনি, কি অগা কোনকপ ব্যবসা অবলম্বন কবিয়া শবীব খাটাইয়া জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতে হইত। ভারতে আসিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। সুখের সীমা পর্য্যন্ত (বোধহয় তাহার মতে) উপভোগ করিতেছেন। ঈশ্বরের ধন্যবাদ দিয়া যেন তিনি চেয়ার হইতে উঠিলেন। শয়নকুঠিরিতে গিয়া রাত্রিবাস মোলায়েম (রেশমী) কাপড় পবিয়া পালঙ্কে শয়ন করিলেন। পাখা চলিতে লাগিল। বোধহয় ভাগ্যফল আলোচনা কবিতে করিতে ঘুমে মাতিয়া পড়িলেন।

পাখিদের প্রভাতী গানেই প্রতিদিন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইত। নিশি-শেষে আজ নূতন প্রকাবের শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ কবিল। হো! হো! মার! মার! লাঠির ঠাকঠক, লোকেব গররা—এই নূতন প্রকাব শব্দে তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। শয্যা হইতে চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, প্রভাত হইয়াছে। প্রভাতবায়ু জানালার খডখড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার রেশমী বসন-সহিত ক্রীড়া করিতেছে। দোলিত পাখাব ঝালব মুহু মুহু নডিতেছে। মিসেস কেনী এইসকল ভাব, আধ-নিম্নলিত আঁখিতে, আধ আধ ভাবে দেখিয়া প্রাভাতিক সময়ের স্বাভাবিক মোহমস্ত্রে আবার নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। কিন্তু নিদ্রার আবেশ বেশিক্ষণ রহিল না। ভীষণ রবে, লাঠিয়ালগণের ছলংকার এবং মার মার শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। প্রাণ ছর ছর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। একি কাণ্ড? কি

ব্যাপার? মহা গোলযোগ। পালঙ্ক হইতে ত্রস্তে উঠিয়া তাডাতাড়ি গবাক্ষ-
দ্বারে মুখ দিয়া দেখিলেন যে, তাঁহাব শয়নঘরের চতুর্পার্শ্বে এবং কুঠির চারি-
দিকে বহুতর লাঠিয়াল। কুঠির হাতায়, এবং প্রবেশদ্বারে, ঢাল-সড়কি-
বল্লমধারী সাবি সাবি লাঠিয়ালগণ যমদূতের ন্যায় দণ্ডায়মান, সকলেই অপবিচিত।
কুঠির কাঠকেও দেখিতে পাইলেন না। দেখিবার মধ্যে দেখিলেন প্রবেশদ্বার
হইতে কুঠির লোকদিগকে মারিয়া তাড়াইতেছে। তাহাবা আঙ্গিনায় আসিতে
যতই চেষ্টা করিতেছে, ততই লাঠির আঘাতে আঘাতিত হইতেছে। বহু চেষ্টাতেও
আঙ্গিনায় প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। মহা বিপদ! একি! এবা কারা? কি
জন্ত আসিয়াছে—কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তাডাতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া
সিঁড়ির দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। গবাক্ষে মুখ দিয়া বলিতে লাগিলেন, “সাহেব
কুঠিতে নাই।”

লাঠিয়ালদিগের মধ্য হইতে একজন বলিল, “আমরা সাহেবকে চাই না।
তোমাকে চাই। প্যারীসুন্দরীর হুকুম, তোমাকে সুন্দরপুর যাইতে হইবে। কথায়
না যাও—লইয়া যাইব।”

মিসেস কেনী বলিলেন, “বাপ্‌সকল! তোমরা আমাকে লইয়া কি
করিবে? আমি তোমাদের কিছুই কবি না, আমাকে বাঁচাও!”

সাদামুখের কথা শুনিতে কাহাব ভাগ্য! আজ মিসেস কেনী বিপদে
পড়িয়া লাঠিয়ালদিগের সহিত কথা কহিতেছেন, কিন্তু কার ভাগ্য সে মুখের কথা
শুনিতে পায়? যাহাহউক, মিসেস কেনী তিন-চারটি কথা কহিয়াই কার্য-
উদ্ধাব করিলেন। ঈশ্বরের জয় না আছে কোথায়? তাহাতে আবার বিলাতী
মুখ! যার তুলনা ভারতে নাই। লাঠিয়ালগণের এত উৎসাহ এত জোরের কথা
—মিসেস কেনীর ঐ একটি কথায় কোথায় যে সরিয়া গেল তাহার সম্মান হইল না।
—যে মুখ তুলিয়া তাকাইল সে তাকাইয়া রহিল। যে কানে শুনিল সে কান
পাতিয়াই রহিল। মিসেস কেনী সাহসে নির্ভর করিয়া একতোড়া টাকা উপর
হইতে নীচে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিলেন। অর্ণের কান্দাল বাঙ্গালী। টাকার মুখ
দেখিয়াই গলিয়া পড়িল। যে কার্যে আসিয়াছিল, তাহা মন হইতে একেবারে
সরিয়া গেল। সড়কি, ঢাল, লাঠি, তরবার মাটিতে ফেলিয়া তাডাতাড়ি টাকা

কুড়াইতে লাগিল। যে যত পাবিল লইল, কেহ কোমরে গুঁজিল, কেহ কাপড়ে বান্ধিল। টাকার লোভে শেষে আপসে আপসে সংগ্রাম বাধিল। মিসেস কেনী নিক্ষিপ্ত টাকা সমৃদ্ধ কুড়াইয়া লইয়া শেষে বলবানেরা দুর্বল এবং ক্ষীণকায় ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে আরম্ভ করিল। কেহ সাহায্য কবিল, কেহ-বা সে সাহায্যে বাধা দিতে অগ্রসর হইল।

মিসেস কেনী এই স্ত্রযোগ দেখিয়া আব একতোড়া ঐ কুকুরকাণ্ড-মধ্যে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিলেন। সে সময়ে আপসে আপসে প্রকাতভাবে মারামারি বাধিয়া গেল। কোথায় সড়কি, কোথায় লাঠি, কোথায় কি পড়িয়া রহিল সে-দিকে কাহাবও লক্ষ্য থাকিল না। টাকা লইয়া কাড়াকাড়িতেই মাতিয়া গেল। আপসে আপসে মারামারি, টানাটানি, হেঁচড়াহেঁচডি আবস্ত করিয়া কেনীব লাঠি-য়ালগণের অনেক স্ত্রবিধা কবিয়া দিল। বিপক্ষ দলেব লাঠি-সড়কি হাতে লইয়া অর্থলোভী নিমকহাবামদিগকে ধবিবাব আশয়ে কুঠিব লাঠিয়ালেবা ‘মার মান’ শব্দে আমিয়া পড়িল। টাকাব এমনি লোভ—টাকা এমনি জিনিষ যে তখনও সেদিকে কাহাবও দৃষ্টি নাই। রূপাব চাকিতে চক্ষু ধাঁধা লাগিয়াছে। আত্মহারা, জ্ঞান-হারা হইয়া সকলেই ভ্রমে—মহাভ্রমে পড়িয়াছে। কুঠির লাঠিয়ালগণেব লাঠি পিঠে পড়িতেছে, মাজা দমিয়া যাইতেছে, কেহ মাটিতে গড়িয়া পড়িতেছে, চক্ষু তুলিয়া ফিরিয়া দেখিয়াই চম্পট। দৌড়িয়া পথে অপথে পলায়ন। যাহাবা প্যারীসুন্দরীব নির্দিষ্ট বেতনভোগী তাহাবাই কেবল রামলোচনের নিকটে ভারলেব কাছাবিতে কবিয়া গেল। বিদেশী সর্দাবেরা আপন আপন স্ত্রবিধামত আপন আপন পথ খুঁজিয়া লইল। ভকম দেহেন্দা দলপতি মহোদয়েব সহিত কাহারও সাক্ষাৎ হইল না।

মিসেস কেনী নীচে নামিয়া বাস্ক, আলমারি যাহা পূর্বে হইতে জরাজীর্ণ ছিল, নিজেব চাকবদ্বাবা ভাঙ্গিতে লাগিলেন। ফুলের টব, পাপোস, চেয়াব ইত্যাদি ছিন্নভিন্ন কবিয়া কতক ঘরের বাহিবে, কতক সিঁড়ির নীচে, কতক ভগ্ন, কতক স্থানভ্রষ্ট করিলেন। এবং তখনই জেলায় ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পত্র লিখিয়া রায়রূপ সিংহকে আশ্বারোহণে জেলায় পাঠাইয়া দিলেন। শত্ৰু সান্ণালকে ডাকিয়া কুঠিতে চড়াও, মালামাল লুট, বাস্ক, আলমারি ভাঙ্গিয়া নগদ টাকা অপহরণ—দিনে ডাকাইতি, এইসকল বিষয় বিস্তারিতরূপে লিখিয়া মীরসাহেবের নিকটেও পত্র পাঠাইলেন।

হরনাথ মিশ্র প্রধান কার্যকাবক বাসাবাড়িতে থাকিয়াই কুঠির সমুদয় অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। এখন আর গোলযোগ নাই দেখিয়া মেমসাহেবের নিকট আসিয়া বলিলেন, “হুজুর! আর একটি কার্য করিতে হইবে, গোপনে বলিব।”

মিসেস কেনী বলিলেন, “তুমি যাহা ভাল জ্ঞান কর, আমার নিকট আর জিজ্ঞাসা করিও না।”

হরনাথ তখন আপিস ঘরে যাইয়া কি মন্তব্য করিলেন তিনিই জানেন। এক ঘণ্টার পব একপ্রকার হৃদয়বিদারক শব্দ শুনা গেল। বাবা গো—মলেম গো—আমি কিছুই জানি না—হা থোদা—

সপ্তম তরঙ্গ

ঘরজামাই

এক গাছের বাকল অণু গাছে লাগে না। কলমের চারাও একেবারে খাটি উতরে না। আর একটি কথা, শত বৎসরও যদি কোন গাছের উপর ভিন্ন গাছ জীবিত থাকিয়া ভালপালা ছাড়ে, তত্রাচ তাহার নাম পরগাছা। জামাই পরগাছা, জামাই কলমের চারা এবং ব্যবহারে বাকল। হাজার ঘস মাজ, মিশিবার নহে। মিশিবে না। স্থূল কথা জামাই জেতেই বিশ্বাস নাই, তারপর আবার ভাইঝি-জামাই। খুড়-ভাইপোয়ে প্রায়ই কাটাকাটি, মারামারি, খুনাখুনি। পরিশেষে—শ্রদ্ধ আদালত পর্যন্ত গড়ায়। পবিণামে উভয়ে প্রায় এক ক্ষুরে মাথা মূড়িয়া পরের অগ্নে উদরপূরণ, কেহ অণু কোন নীচ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করা ভিন্ন আর কোনই ভাল ফল দেখা যায় না। এক রক্ত, এক গোত্র, এক বংশ, তাতেই এই দশা—পরগোত্র, পরপুত্র জামাই, তাহার সঙ্গে এক কায়, এক প্রাণ, দুইয়ে এক হওয়া বড়ই কঠিন কথা। যাহাদের শরীর এক রক্তে গঠিত, তাহাদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ থাকা স্বস্তেও রক্তের গুণ না থাকিয়া যায় না। পাষণ্ড হইলেও সময়ে নরম হয়, কালে স্নেহ, ভক্তি, প্রণয় এবং প্রেমভাব—সে কলুষিত পাপময় অন্তরেও দেখা যায়, জামাই পরের সন্তান, পররক্তে গঠিত, স্তূতরাং মনের ভাব ভিন্ন, স্বভাব ভিন্ন, হৃদয় ভিন্ন। সে বসে থাকিবার নয়। থাকিবে কেন, সে খন্ডরকে পিতৃতুল্য মানিবে কেন? সে খুড়-শন্ডরকে শন্ডরের স্থানে বরণ করিবে কেন? তার কার্য-উদ্ধারই ভক্তি, তার স্বার্থসাধনই শ্রদ্ধা,

অভিষ্টসাধন করাই প্রেম। তার সকলই কৃত্রিম। মীরসাহেব আপন বিপদ আপনি ডাকিয়া আনিয়াছেন। আপন মন্দ আপনি ঘটাইয়াছেন। আপন পায়ে আপনিই কুঠারাঘাত করিয়াছেন। রে সংসার! রে লোভ! তোর অসাধ্য কিছুই নাই। রে অর্থ! বে জমিদারি! তোবা না ঘটাতে পাবিস এ জগতে এমন কোন কু-কার্য্যই নাই। মায়া, মমতা, স্নেহ, দয়া, ধর্ম, সকলই স্বার্থের নিকট পরাস্ত। তোদের নিকট জিয়ন্তে বলি। মীরসাহেবের দেবীপ্রসাদ প্রধান কার্য্যকারক। সা গোলামের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। কালের ধর্ম! সময় সময় তাঁহাদের উভয়ে অনেক কথা, অনেক আলাপ হইয়া থাকে। কোন কোন দিন আবশ্যক মতে নিকটস্থ আমবাগানে, কি বকুলতলায় বসিয়া গোপনে কথাবার্তা হয়। প্রথম সূত্রপাত, পবে অনেক কথা, দিন দিন বহু কথা, বহু যোগাড়, গোপনে গোপনে বহু মন্তব্য, বহু কার্য্য সাধন হইতেছে ও হইয়াছে। এখনও অনেক বাকি, সীমা পর্য্যন্ত যাইতে বহু বিলম্ব। তাই কথা ফোটে নাই, কেহ জানিতে পারে নাই। মীরসাহেবেরও কানে ওঠে নাই।

রাত্র দুই প্রহর। দেবীপ্রসাদের বৈঠকখানাতেই আজ বৈঠক। দেবী-প্রসাদ ছোট একখানি জলচৌকির উপর। সা গোলাম বড়গোছের একটি মোড়ায় বসিয়া উভয়ে কথাবার্তা কহিতেছেন। ঘরের এক কোণে মিটমিট করিয়া প্রদীপ জলিতেছে। সে সময় কেবোসিন তেলের চলতি হয় নাই। দিশি তৈল, দিশি প্রদীপ, দীপগাছাও মাটির।

দেবীপ্রসাদ বলিলেন : মীর এব্রাহিম হোসেনের ‘অছিয়তনামায়’ যাহা যাহা লিখা আছে তাহা তো অগ্রথা কবিত্তে পারিবেন না। আমার বেশ মনে আছে, দুই ভ্রাতারই জমিদারিতে সমান অংশ। সাঁওতাল বসতবাটিতেও তুল্যাংশ। কনিষ্ঠপুত্রকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। কারণ অতিশৈশবকালেই মীরসাহেব-মাতৃহারা হন বলিয়া পদমদীর বাড়ি তাঁহাকে বেশির ভাগ দিয়া গিয়াছেন। সে বাড়ি এ বাড়ির ন্যায় পাকা নহে। সামান্য একখানি ঘর, আর চতুর্দিকে প্রাচীর। বেশীভাগ পুষ্করিণী ও একটি আমবাগান মাত্র। মীর এব্রাহিম হোসেন আপনার শিশুবকে রাজী করিয়া, কতাদ্বয়কে বলিয়া পদমদীর বাড়ি-বিষয় মীর সাহেবকে অতিরিক্তরূপে দিয়া গিয়াছেন। একথা সকলেই জানে, অছিয়তনামাতেও স্পষ্টভাবে লিখা রহিয়াছে।

সা গোলাম বলিলেন : একথা অসম্ভব—অসম্ভব ! বাড়ি যেমনই হউক পৃথক হওয়ার কারণ কি ? নির্দিষ্ট করিয়া যখন লিখা, তখন কি আর কথা আছে ! না, উহাতে কোন গোল উপস্থিত হইতে পারে ? ঘব থাক, পুষ্করিণী থাক, প্রাচীর থাক, বাগান থাক, হাজাব থাক সে বাড়িব সকলি তাঁহাব। আর এই সাঁওতার বাড়িতে যাই থাক, সকলি আমাব খণ্ডবেব। দালানকোঠা আছে বলিয়াই কি ভাগ দিতে হইবে ?

দেবীপ্রসাদ বলিলেন : দেওয়াই তো কথা—বিষয়সম্পত্তি-জমিদারি সকলি এখানে, পদমণ্ডী পৈতৃক স্থান বটে, কিন্তু ধরিতে গেলে সকলই এখানে। সে কেবল নামমাত্র বাড়ি। আমি বেশ জানি, যাহার ভাগে যে গ্রাম পড়িয়াছে, বুদ্ধ মীরসাহেব যাহাকে যাহা দিয়াছেন, তাহা তিনি অছিয়তনামায় নির্দিষ্টরূপে লিখিয়া দিয়াছেন। কেবল এই বাড়ি, আর এ বাড়ির মোতালকের অস্থাবর সম্পত্তি একজমালিতে বাখিয়া গিয়াছেন। অছিয়তনামা এবং অত্মাত্ম দলিল মীরসাহেবের নিকট আছে, তাহা দেখিলেই আপনাব মনের ধান্দা ছুটিয়া যাইবে।

সা গোলাম বলিলেন : অত্মাত্ম দলিল-দস্তাবেজ যে বাঞ্ছে আছে সে বাঞ্ছে অছিয়তনামা নাই। আমি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছি। আপনি যে স্থানে থাকার কথা বলিয়াছিলেন, সেখানেও নাই—আমি সন্ধান করিয়াছি। যেখানে আছে, তাহা জানিতেও পারিয়াছি। আমাদের সংসারে তাঁহার পক্ষে এখন একটি প্রাণিও নাই। মনে মনে সকলেই ফাঁক। দু-হাত ফাঁক। ফাঁক পেলে কেহই ছাড়িবে না। দু-একটি দাসী মাত্র তাঁহার স্বপক্ষে আছে। কিন্তু তাহাদেব কোন ক্ষমতানাই। আমাদেরই সকল, আমরাই কর্তা, আমরাই মালিক। আমি ইচ্ছা করিলে এই রাত্রেই একেবারে নিষ্কণ্টক হইতে পারি। নির্বিবাদে স্বীয় সম্পত্তি লইয়া স্থখে থাকিতে পারি, কিন্তু—

দেবীপ্রসাদ বলিলেন : সে কি কথা ! ওসকল কথা কখনই মনে স্থান দিবেন না। মুখেও আনিবেন না। লোকের কুপরাশর্মে কখনই ভুলিবেন না। কোনরূপ অমাত্মনৈতিক কার্যে অগ্রসর হইবেন না। যাহা সহজে হইবে তাহার জন্ত এত ব্যস্ত কি ? নথের আঁচড়ে ছিঁড়িয়া যাইবে, তাহার জন্ত কামান পাতিবার দরকার কি ?

সা গোলাম হাসিতে হাসিতে বলিলেন : ও কিছু নয়, ও কথাটা আমি তামাশা করে বলছি। বিবেচনা করুন, অছিয়তনামা যদি কোন কৌশলে হস্তগত করিতে পারি—তাহাতে যাহা লিখা আছে, তাহার কি আর অগ্ৰথা হইতে পারে না ?

দেবীপ্রসাদ বলিলেন : তাই বা কি করিয়া হইবে ? এখন অত্যাচার করিতে পারে এমন সাধ্য কাব ?

সা গোলাম বলিলেন : কেন সে তো কোম্পানীর ঘরে জানিতে হয় নাই, কোন হাকিমের নিকটও আজ পর্য্যন্ত উপস্থিত করিয়া কোনরূপ সহি করান হয় নাই। ঘরাও দলিল, ঘরাও লিখাপড়া। তাতে আছে কি ? আপনারই তো পিতার হাতের লেখা। আপনার হাতের লেখা হইলে ক্ষতি কি ? যেসকল সাক্ষী আছে, তাহাদের দ্বারা সাক্ষী-শ্রেণীতে নাম লেখাইতে কতক্ষণের কাজ ?

দেবীপ্রসাদ বলিলেন : মীর এব্রাহিম হোসেনের দস্তখতের কি হইবে ?

সা গোলাম বলিলেন : সে ভাবনা ভাবিতে হইবে না। সে ভার আমার প্রতি।

দেবীপ্রসাদ বলিলেন : ভার আপনার প্রতিই থাক, গড়িয়া উঠিতে পারিলে হয়। ইহাব জ্ঞান সময় চাই—গোপন চাই, ছদ্মবেশী হওয়া চাই কপটতা শিক্ষা করা চাই—বিশেষ পরিশ্রম এবং উত্তোষী হওয়া চাই।

সা গোলাম বলিলেন : সে আপনাকে বলিতে হইবে না, বহুকাল হইতে শিক্ষা আছে। আমি না পারি জগতে এমন কোন কার্য নাই। সংসার চালাইতে আমি ভাল জানি—সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য করিতে আমার বেশী সময় আবশ্যক করে না। ধর্মভয় আমার অতি কম।

দেবীপ্রসাদ বলিলেন : ভালই তো, ভয় যত কম থাকে ততই ভাল। কিন্তু ধর্মভয় একটু থাকিলে যেন ভাল হয়। যাহাই বলুন আর যাহাই ককুন, কিন্তু অছিয়তনামা আগে হস্তগত করিতে না পারিলে আর কোন আশা নাই। আপনি বলেন সন্ধান করিয়াছেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না। অছিয়তনামার বিষয় মীরসাহেব ভিন্ন অত্কেহই জানেন না। জানিবার সম্ভাবনাও নাই।

সা গোলাম বলিলেন : সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিত থাকুন, সন্ধান করিতে আমি কম করি নাই। শীঘ্রই সফল হইব—কোন চিন্তা করিবেন না।

দেবীপ্রসাদের বাটির পূর্বদিকে বড় রাস্তা। গ্রামের, ভিন্ন গ্রামের ও অন্ত স্থানের লোকজন ঐ পথে চলাচল করে “চৌকিদার চৌকিদার” বলিয়া একটি লোক ডাক ছাড়িয়া উঠিল।

সে সময় চৌকিদারের চাকুরি বড়ই জম্মত ছিল। নামমাত্র চৌকিদার। চৌকিদারকে পেটের অন্ন জোটাইতে সাবাদিন পরের দ্বায়ে মজুরী করিতে হইত। নিতান্ত হীনাবস্থার লোক না হইলে চৌকিদারি কাৰ্য্য কেহ স্বীকার করিত না। বৎসরান্তে কেহ এককাঠা ধান, কেহ একজোড়া নারিকেল, দুই-একমুঠো পাট, দু-একসের কলাই চৌকিদারের বেতনস্বরূপ দিত। বড় বড় ঘরে বার্ষিক বরাদ্দ চারি আনা, বড় বেশি হইলেও আট আনার উর্দ্ধ ছিল না। ছেলেমেয়ের বিবাহে লোকে কিছু পয়সা, দু-একখানা কাপড় চৌকিদারকে দিত মাত্র। মাসিক বরাদ্দে প্রায় কেহই বেতন দিত না। চৌকিদারও বেতন বলিয়া কোন দাবি করিত না। চৌকি পাহাৰাও সেইপ্রকার—যেমন দান তেমন দক্ষিণা—যেমন বেতন তেমন কাজ। কিন্তু থানার দারোগা, জমাদার, বরকন্দাজের হাত হইতে বাঁচাও ছিল না। প্রতিকথায় মার, প্রতিকথায় গালাগালি, এইসকল ব্যবহারে নীচজ্ঞেয় লোক ভিন্ন ভাল লোকে এখনও চৌকিদারি করে না। সাবাদিন হাডভাক্স খাটুনি খাটিয়া চৌকিদার বিতোরে ঘুমাইয়াছে। “চৌকিদার, চৌকিদার।” অনেকক্ষণ ভাকাভাকি হাঁকাহাঁকিতেও চৌকিদার হাজির হইল না।

এত বাত্রে চৌকিদারের ডাক কেন? কে ডাকে? দেবীপ্রসাদ দুই-একপায়ে দেউড়ি পর্যন্ত আসিলেন। রাস্তার নিকট আসিয়া জানিতে পারিলেন যে, আগন্তুক পাবনাব বরকন্দাজ। মাজিষ্ট্রেটসাহেব শালঘর মধুয়ার কুঠিতে যাইবেন। পথে পথে মশাল, মশালটির যোগাড় করিয়া, শালঘর মধুয়া বাগুয়াই বরকন্দাজের এখন কর্তব্য কাৰ্য্য।

দেবীপ্রসাদ মাজিষ্ট্রেটসাহেবের নাম শুনিয়াই তাড়াতাড়ি আসিলেন। সা গোলামকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া বরকন্দাজ ও তাহার সঙ্গী, লোকজনসহ মনিবরাডিতে আসিলেন। সঙ্গর দেউড়িতে তাহাদিগকে বসিবার স্থান দিয়া মাজিষ্ট্রেটসাহেবের শালঘর মধুয়ার কুঠিতে গমনসংবাদ মীরসাহেবের নিকট বলিতে অগ্রসর হইলেন। বৈঠকখানার বারান্দায় উঠিলেন, কিন্তু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন না। কারণ সেসময় মজলিস জমিয়া গিয়াছে। মীরসাহেব স্বয়ং শেতার বাজাইতেছেন, গোশাল ঢোলক বাজাইতেছে। দেওয়ান নব্বীসাহেব বৃত্তা করিতেছে। মহকমের প্রায় সকলেই মনের আনন্দে আনন্দসাগরে হাবুডুবু খাইয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছেন। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেবীপ্রসাদের পা উঠিল না। ডাকিলেই না শুনে কে?

বাজেলোক পাঠাইয়া খবর দিতেও সাহস হইল না। আমোদে বাধা দেয় কার সাধ্য ?

দেবীপ্রসাদ বারান্দায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। সা গোলাম দেবীপ্রসাদের সঙ্গে সঙ্গে বাটিতে আসিয়া, বৈঠকখানাঘরের দিকে যাইলেন না। মীরসাহেবের বিখাসী খানসামা বিনোদের সহিত গোপনে গোপনে কি কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। এদিকে আমোদের ঢেউ খেলিতেছে। হাসির গরবা, গানের তান, বাজনার বোলে হুলস্থূল ব্যাপার বাড়িয়া গিয়াছে। হঠাৎ সেতারের তার ছিঁড়িল, সঙ্গে সঙ্গেই যেন নর্ভকীর পায়ের নূপুর খসিয়া পড়িল। লয় বিহনে, বে-লয়ে, তাল কাটিয়া বাজনা বন্ধ হইল। বসীরুদ্দিন মোসাহেবও গায়ক—তিনিও বাঁচিলেন। অজেকক্ষণ পর্য্যন্ত গলাবাজি করিয়াছেন, বাহিবে আসিবার নিতান্তই দবকার হইয়াছে। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া আবশ্যকীয় কায্য সমাধা করিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেই হঠাৎ দেবীপ্রসাদকে দেখিয়া খতমত খাইয়া দাঁড়াইলেন। দেবীপ্রসাদ বসীরুদ্দিনের হস্ত ধরিয়া একটু দূরে লইয়া গিয়া চুপি চুপি মাজিষ্ট্রেটসাহেবের শালঘর মধুয়ার কুঠিতে গমনবিষয় বলিয়া দিলেন। বসীরুদ্দিন উঠিতে পড়িতে মীরসাহেবের নিকট যাইয়া চুপি চুপি সকল কথা শুনাইলেন। মীরসাহেব আমোদে ভঙ্গ দিয়া তখনি বাহিবে আসিলেন। মশাল, তৈল, মশালটি সংগ্রহ করিয়া দিতে দেবীপ্রসাদকে আদেশ করিলেন। এবং তখনি জানমামুদ, কদম্ব, ফটিক, চাকরান, জমিভোগী বেহারাদিগের বাটিতে লোক ছুটিল। কারণ মাজিষ্ট্রেটসাহেবের কুঠিতে পঁছছিবার পূর্বেই মীরসাহেব কুঠিতে যাইয়া মিসেস কেনীর সহিত সাক্ষাৎ করা উচিত মনে করিলেন।

বসীরুদ্দিন দেবীপ্রসাদকে ছুইচক্ষে দেখিতে পারিতেন না। কারণ আমোদে-আহ্লাদে, মনোমত কার্য্যে বাধা দিতে দেবীপ্রসাদের হস্তই অগ্রে প্রসারিত হইত। বসীরুদ্দিন মীরসাহেবের প্রধান মোসাহেব। নাচিতেন, গান করিতেন, পাশা খেলিতেন। সং সাজিয়া রঙ মাখাইয়া—ঢং দেখাইতেও—লজ্জা বোধ করিতেন না। এবং ইচ্ছা করিয়া নর্ভকীদের মুখের মিষ্টি মিষ্টি বোল শুনিয়া সৌভাগ্য মনে করিতেন। তিনি যে একজন মহারসিক একথা তাঁহার মনে দৃঢ়বিশ্বাস ছিল। আর ছিল যে, কমলপদের কোমল আঘাতে শরীর পাবিত্র না করিলে রসিকের পরীক্ষা হয় না, রসিকনামও জঁকিয়া উঠে না। যেমন আগুনে নু পুড়িলে সোনার

আদর বাড়ে না, তেমনি কামিনী-কোমলপদের আঘাত সহ্য না করিলেও রসিক-
নামের সার্থকতা হয় না।—বোধহয় এই অপকথাটা বসীরুদ্দিনের হৃদয়ে সর্বদা
জাগিত। তাই তিনি ঐ সকল কোমল পদের আঘাত সহ্য করিতেন—শরীর
পবিত্র করিতেন। পূর্বপুরুষের নামেও কিছু শুনিতেন।

আরও একটি আশা ছিল। মীরসাহেবের অল্পগ্রহ আর হৃদৃষ্টি—
বিষয়াদির কার্যেও মীরসাহেব তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করেন, ইহাও তাঁহার অন্তরে
অন্য একটি আশা। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে শেষ আশাটি কখনও পূর্ণ হয় নাই।
বিষয়াদি কার্যে দেবীপ্রসাদের কথাই বলবৎ থাকিত। এই দুঃখে বসীরুদ্দিন সর্বদাই
চিন্তিত ও দুঃখিত থাকিতেন। সময় সময় সে দুঃখের কাহিনী মীরসাহেবের নিকট
স্পষ্টভাবে বলিতেও ক্রটি করিতেন না। মীরসাহেব কিন্তু সে কথায় কান দিতেন
না। যাক সে কথা। এখনকার কথা এই যে, এত আমোদ মুহূর্তমধ্যেই বন্ধ
হইল। এক দেবীপ্রসাদ আসিয়া নাচ, গান, বাজনা মাটি করিয়া দিল। এই কথাটা
বসীরুদ্দিনের শিরায় শিবায় বসিয়া গেল।

মীরসাহেবের গমনের আয়োজন, পালকি-বেহারা সমুদায় প্রস্তুত—হাসি,
তামাশা, রসিকতা, রগড়ের কথা আব কাহারও মুখে নাই। সেতারের তার
ছিঁড়িয়াই রহিল। নর্তকীর পায়েব নুপুং ফরাসের উপরে যেখানে খসিয়া পড়িয়া-
ছিল, সেইস্থানেই পড়িয়া রহিল। বসীরুদ্দিন বারান্দায় আসিয়া মুহূ-মুহু স্বরে
বলিতে লাগিল, “এখন না যাইয়া প্রাতে গেলেও হইতে পারিত।” মীরসাহেব
সে কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। তিনি প্রস্তুত হইয়া পালকিতে উঠিলেন।
বৈঠকখানাঘরের দ্বার বন্ধ হইল।

স। গোলাম বিনোদ খানসামার সহিত চুপি চুপি কি কথা কহিয়া তাঁহার
বসিবার কুঠরিতে বসিয়া আছেন। চঞ্চল ভাব। রাত্রি প্রায় একটা—কি চিন্তা
করিতে করিতে একবার বাটির মধ্যে তাঁহার শয়নকুঠরিতে গিয়া আবার ফিরিয়া
আসিলেন। আবার বাটির মধ্যে গিয়া সমুদয় স্থান অতিসাবধানে বেড়াইয়া
দেখিয়া আসিলেন। সকলেই নিদ্রিত, কাহারও সাড়া-শব্দ পাইলেন না। আজিই
সময়, আজিই অবসর, এই উপযুক্ত সময়। মনে মনে স্থির করিয়া এক-পায়ে দু-পায়ে
মীরসাহেবের তোশাখানার দিকে চলিলেন। তাঁহার একপা চলাফেরা নূতন নহে।
আরও কয়েকদিন নিশীথ সময়ে মীরসাহেবের তোশাখানার দিকে পা ধরিয়াছেন।
চুপে চুপে বাড়ির অনেক ঘর খুঁজিয়াছেন।

মাক্জন ও বিনোদ দুজনেই তোশাখানার জমাদার। মাক্জন মীরসাহেবের বিশ্বাসী এক প্রধান চাকর। বিনোদ মাক্জনের সাহায্যকারী। ঢুলা মিয়া (জামাই-বাবু) অর্থাৎ সা গোলাম পূর্ব হইতেই ঐ তোশাখানার কোথায় কি আছে বিনোদের সাহায্যে সকলি জানিয়াছিলেন। কোন দ্বার খোলা থাকে, কোন জানালা বন্ধ, কোন দিকে বাস্ক, কোন পার্শ্বে আলমারি-সিন্ধুক সকলি তাঁহার জানা ছিল। জামাইবাবু সংসারের সমুদয় ভার গ্রহণ করিয়াছেন। মীরসাহেবের আদেশ ও অনুগ্রহেই তাঁহার ঐ অধিকার।

মাক্জন মীরসাহেবের বিশ্বাসী তাহা জামাইবাবু বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। মাক্জনও বিশ্বাসের গৌরব দেখাইতে অনেক গুপ্তকথা, যাহা কেহ জানিত না, তাহার কিছু কিছু জামাইবাবুর নিকট প্রকাশ করিয়া বিশেষ বিশ্বাসী হইয়াছে। সা গোলামের বিশ্বাস, মাক্জন যাহা বলে সে-সমুদয়ই সত্য। মাক্জন গাঁজাখোর—কিন্তু সরল।

সা গোলাম বিনোদের সাহায্যে তোশাখানার দরজা খোলা পাইলেন। সাহসের উপর নির্ভর করিয়া চোরের প্রপিতামহের ছায় অতিসাবধানে পা ফেলিয়া তোশাখানার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিনোদের অনুগ্রহে তোশাখানা অন্ধকার। বাতিটি ইচ্ছা করিয়াই নিবাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ঘোর অন্ধকার, কিছুই দেখিবার সাধ্য নাই! কেবল অন্ধমান আর হাতের আল্লাজ এই দুইটির উপর নির্ভর করিয়াই জামাইবাবু অন্ধকার ঘর-মধ্যে আপন অভিষ্ট সাধনের জন্য হামাগুড়ি দিয়া বাইতে লাগিলেন। মাক্জন কিছুই জানে না। বিনোদকেও আসল কথা বলেন নাই। কেবলমাত্র এই বলিয়াছিলেন যে, নিশীথ-সময়ে কোন গুপ্ত-স্থানে আমোদ-আহ্লাদ করিতে যাইব, তুমি তোশাখানার দ্বার খুলিয়া রাখিও। আমি তোমাকে খুব গোপনে জাগাইয়া লইয়া যাইব।

বিনোদ জানিলেও মা'র নাই—পূর্ব মন্তব্যই তখন আশ্রয়। মাক্জন জাগিলেও নীত্র উঠিবে না। কারণ সে নেশায় ভোর। সা গোলাম গড়াইয়া হামাগুড়ি দিয়া নিশ্চিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন। যে জিনিসের জন্য তাঁহার এত পরিশ্রম, এত চেষ্টা—সহাপাপকেও তুচ্ছ-জ্ঞান করিয়াছেন, সে জিনিসটি হস্তগত হইল। অদ্বিতীয়তান্না যে বাক্সে আছে সম্বন্ধে জানিয়াছিলেন সে বাক্সটি হস্তগত হইল। বিশেষ সাবধানে হাতবাক্সটি বগলে চাপিলেন। মাক্জন টের পাইল যে, কে ঘেন ঘরের মধ্যে আসিয়া কি লইয়া গেল। নেশার ঘোঁরে উঠিতে ইচ্ছা হইল।

না। চকু বুজিয়াই 'দূর দূর' কবিতা আবার নীরব হইল। পূর্ববৎ নিবাস চক্ষিতে লাগিল।

জামাইবাবু হাতবাক্সটি লইয়া তখনই নিজের বড় বাসে বস্ক করিলেন। পাখিরা প্রভাতী গাইয়া উঠিল। শুকতারা মলিনভাবে নিজ গম্যপথে মিটিমিটি চাহিয়া বাইতে লাগিল, জামাইবাবু শয্যায় শুইয়া নাক ডাকাইতে আরম্ভ করিল।

অষ্টম তরঙ্গ

তদারক

পাবনা রাজশাহী জেলাব অন্তর্গত। সময়ে সময়ে রাজশাহীর জজ দাওয়ার মোকদ্দমাব বিচার কবিতো পাবনার আসিয়া থাকেন। কালেক্টরী মুন্সেফী সকলি আছে, স্তত্রাং জেলা বলিয়াই অভিহিত। পাবনা হইতে শালঘর মধুরায় আসিতে হইলে পদ্মা পার হইয়া আসিতে হয়।

পদ্মা পাড়ি দিয়া দক্ষিণপারে আসিলেই কুষ্টিয়ার থানা। পার্থক্য! বর্তমান কুষ্টিয়া বে-স্থানে স্থাপিত সে স্থানের যথার্থ নাম কুষ্টিয়া নহে। পুরাতন রেলওয়ে ষ্টেশনের উত্তরদিকে কুষ্টিয়া গ্রাম আজি পর্যন্ত বর্তমান আছে। এইক্ষণ তাহার নাম পুরাতন কুষ্টিয়া। কুষ্টিয়ার থানা—পুরাতন কুষ্টিয়া হইতে উঠিয়া গোবরীনদীর দক্ষিণপার আসিলে, সে থানার নামও কুষ্টিয়া এবং সেই নামেই মহকুমা ইত্যাদি ও রেলওয়ে ষ্টেশনের নাম হইয়াছে। এইক্ষণে বে-স্থানে কুষ্টিয়ার থানা বর্তমান, সে-স্থানের নাম 'মজুমপুর'। এইপ্রকারে বাহাদুরখালী, একপাড়া গ্রাম লইয়া কুষ্টিয়া। যে সময়ের ঘটনা, সে-সময় কুষ্টিয়ার মহকুমা হয় নাই, রেলওয়ে ষ্টেশন হয় নাই। বর্তমান থানারও সৃষ্টি হয় নাই। সেই পুরাতন কুষ্টিয়াতেই থানা—সে থানাতেও শালঘর মধুরায় লুটের এজাহার পড়িয়াছে। অত্ৰ লোকে এজাহার দিলে দারোগা-সাহেব সে লোকটিকে বাহা করিয়া বিদায় দিতে হয় করিতেন। কুষ্টির এজাহার না লইয়া উপায় নাই। মেমসাহেবের প্রেরিত লোকের এজাহার। বিশেষ দুর্দান্ত প্রতাপাশ্রিত টি. আই. কেনীর কুঠিলুট। এ এজাহার না লইলে কি রক্ষা আছে? লাঞ্চার প্রত্যাশা না থাকিলেও বাধ্য হইয়া এজাহার লইতে হইয়াছে।

পালান্দায় কেবল নিজ নাম লিখি করিতে জানেন। তাই দলবীষবাবুকে লিখি লইয়া-পাঁচজন ব্যবসায়ীজনই মাজেরদারবুলে উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু যেরূপ

সাহেবের আদেশ হয় নাই বলিয়া তদারকে প্রবৃত্ত হন নাই। রীতিমত খোরাকি পাইতেছেন। থাকিবার স্থানও ভালই জুটিয়াছে। আহাৰাদি করিয়া বিহীনায় শুইয়া পড়িয়াছেন। অহুসন্ধানে জানিয়াছেন মাজিষ্ট্রেটসাহেব স্বয়ং তদন্তে আসিবেন।

সূৰ্য্যোদয়ের সহিত স্থানীয় মাজিষ্ট্রেটসাহেব বাহাদুর সদর দারোগা (পারনাব) ও সদরের বরকন্দাজগণকে সঙ্গে করিয়া শালঘর মধ্যায় দেখা দিলেন। প্রথমে মিসেস কেনীর সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া মোকদ্দমা তদন্তে প্রবৃত্ত হইলেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব আবও একবার কুঠিতে আসিয়া মিসেস কেনীর নিমন্ত্ৰণ রক্ষা করিয়া গিয়াছিলেন। সময় সময় চিঠিপত্র পাইতেন এবং লিখিতেন।

প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালেরা কুঠি আক্রমণ করিয়াছে, অনেক সাক্ষী জবানবন্দি দিলেন। সাহেবপক্ষের দুইজন লোককে যে সাংঘাতিকরূপে আঘাত করিয়াছে, তাহারও বিশেষ প্রমাণ পাইলেন। জখমীদ্বয়কে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের সম্মুখে বাঁশের চাক্ষিতে শোয়াইয়া আনা হইল। সড়কিয় আঘাতে একজনের বক্ষভেদ, লাঠির আঘাতে অপরের মাথাফাটা, তখনও নাক ও মুখ ভাসিয়া রক্ত পড়িতেছে। কথা কহিবার শক্তি নাই।—বোধ হয় বাঁচিবে না। বাঁচিবার ভরসা একেবারে নাই বলিলেও হয়।

মাজিষ্ট্রেটসাহেব বলিলেন, কুঠির লোক হইতে অধিক বিশ্বাস্য প্রমাণ এই দুইজন লোক। কুঠির সহিত ইহাদের কোন সংশ্রব নাই। সাঁওতার জমিদারের লোক। আপন জমিদারের পত্র লইয়া সাহেবের নিকট আসিয়াছিল। সাহেব কুঠিতে না থাকায় পত্রের উত্তর পায় নাই। বাধ্য হইয়া ইহারা আপিস ঘরের বারান্দায় রাখে শুইয়াছিল। প্রান্তের ঘটনাসমুদয় প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে। প্যারী-সুন্দরীর লোক যে যে প্রকার এই দুই ব্যক্তিকে সাংঘাতিকরূপে জখম করিয়াছে, তাহাও ইহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছে। ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ, ইহারাই মূল সাক্ষী।

উভয় জখমীকে পাবনার ডাক্তারখানায় ডাক্তারসাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিবার আদেশ করিয়া সাহেব থানার কামরায় চলিয়া গেলেন। মোকদ্দমা তদন্ত শেষ হইল। আপিস ঘরে কুঠির প্রধান নায়েব হরনাথ শ্রী মিশ্রী এবং অত্যাগত আমলাগণ বসিয়া মোকদ্দমার প্রমাণ, সাক্ষীর জবানবন্দি বিষয় আলোচনা করিতেছেন। পাবনার মোক্তার চাঁদ অধিকারীর নিকট পত্র লিখিতেছেন। সাহেব কুঠিতে নাই, আপিস ঘরেই তামাক চলিতেছে। কত ভুললোক নায়েবমজলিশের মুখের একট

কথার জন্ত লালায়িত হইয়া বসিয়া আছেন। কেহ কাগজে মোড়ক করিয়া কিছু কিছু প্রণামী বাম পার্শ্বে রাখিয়া দিতেছে—নায়েবমহাশয় বেরেয়া। কথায়, কার্যে, হাসি-তামাশায় সকল দিকেই আছেন। প্যাবৌস্‌ন্দরীর প্রসঙ্গেও হাসি-তামাশা চলিতেছে। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আরদালী সঙ্গীয় বেহারা এবং লোকজনের আহ্বারের বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইতেছে। ইতিমধ্যে একটি গ্রীলোক ‘আমার বাবা কোথায়, ওরে আমার বাবা কই?’ বলিয়া উচ্চস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে কাহারও বাধা না মানিয়া আপিস ঘরের নায়েবমহাশয়ের সম্মুখে মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। বলিতে লাগিল, “আমার বাবা সন্ধ্যার সময় বাড়ি হইতে আহাব করিয়া আসিয়াছে। নায়েবমহাশয়! আমার বাবা কই? এই একমাস হয় নাই, তিনকুড়ি টাকা খরচ করিয়া বাবার বিবাহ দিয়াছি। (উচ্চস্বরে) ওরে আল্লা! ও খোদা! একি করিলে। ওরে এমন ডাকাত কখনই দেখি নাই। দিনে-দুপুরে ডাকাতি। সাহেবের চাকর হইয়া স্থখে থাকিবে, গায়ে কাঁটার আঁচড়টি লাগিবে না, তাহার ফল বুঝি এই হইল? আপনারা আমার ছেলেকে কি করিলেন? আমার ছেলে কই নায়েব মহাশয়? আপনারা দুখানি পায় ধরিয়া বলিতেছি, আমাব কালু কোথায়? দোহাই তোমাদের পিতামাতার, আমার কালুকে একবার দেখাও।”

হরনাথ শ্রী মিশ্রী মাছুষ কিন্তু গঠিত পাষাণে। কুঠিয়াল নরব্যাঘ্র, তার চাকরের মনে মায়া-মমতা থাকা সম্ভবতই অসম্ভব। কিন্তু সে সময় সে কঠিন প্রাণও গলিয়া গেল। কালুর মাতার ক্রন্দনে সে নীরস, নির্দয় হৃদয়েও দয়ার সঞ্চার হইল। মায়া-বশে সে বিকট চক্ষেও জল ঝরিল। জিহ্বায় জড়তা আসিল। মুখে কথাটি নাই। যার মুখে সর্বদা কথা, মেজাজ গরম, নজর গরম—কালুর মাতার কথা কয়েকটিতে একেবারে বিপরীত ভাব ধারণ করিল। কি বলিবেন, কি করিবেন, কি বলিয়া তাহার কথার উত্তর দিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। ক্ষণকাল পরে বহু কষ্টে বলিলেন, “চুপ কর, চুপ কর, কুঠিতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব আছেন। গোল কর না। তোমার কালু ভালই আছে। কোন চিন্তা নাই। তার কিছু হয় নাই। কে বলেছে? মিছে কথা—ও সকলি মিছে কথা।”

কালুর মা হরনাথের পদতলে মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, “ওরে বাবা! আমার ঐ একটি ছেলে। বড় দুঃখে ওকে বড় করয়েছি। জিজ্ঞাসা করে

—নিজ পেটে না খেয়ে বাবাকে খাওয়াইয়ে মাতুষ কবিছি। ওর বয়স যখন সাড়ে চার বছর সেই সময় ওর বাপ মারা গেছে। আরে আল্লা! সে কথা না আমার মনে গাঁথা আছে। হায়! হায়! এখনও কলছে ফেটে যায়, এই সাহেবই তার হাত-পা টানা দিয়ে গাছে বেঁধে মার দিয়েছিলেন। তাতেই সারা! যে বিছানায় পলো, আর উঠে বসলো না। আর ধানের ভাত মুখে গেল না। পেট দিয়ে থানা থানা রক্ত পড়ে মাসখানেক ভুগে ভুগে যেখানকার লোক সেইখানে চলে গেল। দুটো মুখের কথা করে দেলসা দেয়, এমন লোক দুনিয়ায় আমার কেউ ছিল না। এখনও নাই। খেয়ে না খেয়ে কালুকে মাতুষ কবেছিলাম। বাবা আমার! কাল রেতে ভাত খেয়ে সাহেবের কামবায় পাখা টানতে এসেছিল। বোঁজ বোঁজ বেলো উঠলে বাড়ি যায়, আজ দুদিনের মধ্যে তার খোঁজ-খবর নাই। লোকে যা বলছে তা মুখে আনতে পারি না। তোমরা আমাকে খুন কর।”

হরনাথের তখন মেজাজ একটু গরম হইল। বলিলেন, “চুপ কব, চুপ কব! প্যারীসন্দরী ব লাটিয়ালেরা যে কালুকে জখমী করেছে তাকি তুই ভিনিস নাই? মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাকে পাবনার ডাক্তারখানায় আবাম হবার জ্ঞান পাটিয়ে দিবে-ছেন। আরাম হলেই ফিবে আসবে।” যে কদিন কালু বাটিতে না আসতে পারে, সে কদিন তোমার খাবার কোন কষ্ট হবে না। এই চারিটি টাকা দিচ্ছি, পেট চালাওগে। ফুর্দাইলে আবার আসিও।”

কালুর মাতা কঁাদিতে কঁাদিতে বলিল, “নায়েবমহাশয়! আমি তোমার টাকা চাহি না। আমি আমার বাবাকে পাবনায় দেখিতে চললুম।” এই বলিয়া কালুর মাতা টাকা ফেলিয়া উচ্চস্ববে কঁাদিতে কঁাদিতে আপিস ঘর হইতে বাহির হইল।

নায়েবমহাশয় চৈত সিং আর দুই-তিনজন লোককে তখনি আদেশ করিলেন হাবামজাদিকে ধরিয়া উহাব বাটিতে লইয়া যাও। কিছুতেই বাটি ছাড়িয়া অস্ত্র কোন স্থানে যাইতে না পারবে। খুব সাবধানে রাখবে। খুব সাবধান! শীঘ্র যাও।”

হুকুম পাওয়ামাত্র বমদুত্তরা পুত্রহারা! মায়েব প্রাণে নূতন বকমের বস্ত্রপা দিতে লাগি ঘাড়ে করিয়া অমনি ছুটিল।

বাসীর কঁাদিবার কেহ ছিল না। বোঁড়শী মাজ। সেক্ষাপন কুঁড়েরে

একা বসে কি ভাবিতেছে, ঈশ্বর জানেন। ভিন্ন গ্রামের মেয়ে বর হইতে বাহির হওয়া তাহার সাজে না। সে আর কুঠিতে গেল না। বাঁসী সাহেবের শয়নঘরের পাহারাদার ছিল। কালু ও বাঁসীব ভাগে বাহা বটিয়াছে তাহা পাঠক বুঝিতেই পারিয়াছেন। হায় বে সংসার! হায় রে শক্রতা! শত্রুতাসাধনে লোকে না পাবে এমন কোন কাষাই নাই। ধন্য সংসার!

নবম তরঙ্গ

কালু ও বাঁসী

মোকদ্দমা সাজাইবার জন্য একজন পাহারাওয়াল এবং পাংখাবরদারকে সাংঘাতিকরূপে আঘাত করা হইয়াছে। কালু সিঁড়ির নীচে দাঁড়াইয়াছিল, কুড়ন সর্দার হরনাথের হুকুমে কালুর পিছন হঠাতে বিনা অপরাধে তুখিনীর সন্তানকে সড়কি মারিয়া বুক পার করিয়া দিয়াছে। বাঁসী সমস্ত রাত্রি জাগিয়া গুদামঘরে গিয়া ঘুমাইয়াছিল। শয়ন অবস্থাতেই ঐ পাখণ্ড কুড়ন হরনাথের আক্রমণ বাঁসীর মাথায় লাঠির আঘাত করিয়া মাথা ফাটাইয়া দিয়াছে। গুদামঘরের মধ্যে হঠাৎ আতঁনাদ এবং চাঁৎকারের কারণও তাহাই।

মাজিষ্ট্রেটসাহেব আসামীদিগের নামে গ্রেপ্তারী পরোওয়ানা বাহির করিয়া দুই থানার দারোগা মোতাইন করিলেন। কোনসময় কুঠি ছাড়িয়া পাবনাভিমুখী হইলেন, তাহা কথকের মনে নাই। তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব পাবনায় চলিয়া গেলে মৌরসাহেব মেমসাহেবের সহিত দেখা করিয়া বাটিতে আসিয়াছিলেন, ইহা বেশ মনে আছে।

এদিকে টি. আই. কেনী যশোহর হইতে সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্বে কুঠিতে আসিয়া সমুদয় বিবরণ শুনিলেন। তাঁহারও ইচ্ছা যে, প্যারীসুন্দরীর বাটি লুট করেন। কিন্তু অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আপাততঃ ক্ষান্ত দিলেন। সাহসও হইল না। কারণ বেপায়া। সুন্দরপুরের নিকটে সাহেবের জমিদারি নাই। লোকজন সংগ্রহ করিয়া রাখারও কোন স্বযোগ স্থান নাই। সাতপাঁচ ভাবিয়া মোকদ্দমার যোগাড়ই ভালরূপ করিবেন, ইহাই স্থির করিয়া প্রমাণ ইত্যাদি ও আর তদ্বিষয় বাহা থাকি ছিল, তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আরও আদেশ করিলেন, “প্যারীসুন্দরীর চাকর কি প্রজা বাহাকে কে যে স্থানে পাও, ধকিয়! আমার মিকট হাজির করিলেই উপযুক্ত পুরস্কার পাইবে।”

দেশময় লুটের কথা—খনের কথা—সত্য কথা—নানা কথা—নানা লোক
নানা প্রকার, প্রকাশে গোপনে বলাবলি করিতে লাগিল। চারিদিকে জলুস্থল
ব্যাপাব—তুমুল কাণ্ড!

দশম তরঙ্গ

আক্ষপ

রামলোচনের মুখে কথা নাই। লজ্জা রাখিবারও আর স্থান নাই। নিজে
দলপতি হইয়া অপ্রস্তুত—শুধু অপ্রস্তুতের একশেষ। সঙ্গে সঙ্গে অর্থের বিনাশ—
অথবা অর্থের শ্রাদ্ধ এবং শতমুখে নিন্দা। প্যারীসুন্দরীর নিকটে রামলোচন সকল
কথা খুলিয়া বলেন নাই। সত্যমিথ্যা একত্রে, ভেলআসলে ‘আমেজ’ করিয়া
যুদ্ধের কথা শেষ করিয়াছেন।—“সন্ধানী লোকে মিথ্যা সংবাদ দিয়াছিল। মেম-
সাহেব কি সাহেব কেহই কুঠিতে ছিলেন না। অনর্থক যাইয়া ফিরিয়া আসিয়া-
ছেন। কিন্তু সাহেব মোকদ্দমা সাজাইতে ক্রটি করেন নাই। কুঠির উপর পর্য্যন্ত
যখন চড়াও করা হইয়াছে তখন সাহেব অল্পে ছাড়িবেন না। কোনরূপ মিথ্যা
ফাঁদে ভাল করিয়া আটকাইবার চেষ্টা করিবেন। কথা ক্রমেই বাড়িয়া গিয়াছে,
সকলেই শুনিয়াছে, প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালেরা সাহেবের কুঠি লুট করিয়া লইয়া
গিয়াছে। ১০।১২টি লোক জখমী, তিনটি খুন!”

প্যারীসুন্দরী এই কথা শুনিয়া একটুকুও ভীত হইলেন না। ক্ষণকালের
জন্তও ভাবিলেন না। রামলোচনকে স্পষ্টভাবে বলিলেন, “বেশ হইয়াছে। আমার
লাঠিয়াল কুঠি লুট করিয়াছে, দশজনের মুখে একথা শুনিয়াও আমার স্ত্রুথ বোধ
হইতেছে। আমি বাঙ্গালীর মেয়ে, সাহেবের কুঠি লুটিয়া আনিয়াছি, ইহা অপেক্ষা
স্ত্রুথের বিষয় আর কি আছে! সাহেবের পক্ষে ১০-১২টি জখম, তিনটি
খুন! চিন্তা কি, মোকদ্দমার পথে চলিলে প্যারীসুন্দরী কখনই হটিবে না। সদর
নেজামত পর্য্যন্ত মোকদ্দমা চালাইবে। এতদিনে জানিলাম—কেনীর ক্ষমতাবল
সকলি বুঝিলাম।—আমি বাহা ভাবিয়াছিলাম তাহা নহে। তোমরা ক্ষণকালের
জন্তও অন্তরে ভয়কে স্থান দিও না। একবার—দুবার—না হয় তিনবার—চেষ্টার
অসাধ্য কি আছে? আবার চেষ্টা। এখন তোমাদের কার্য্য মোকদ্দমার বোগাড়।
অন্তদিকে আবার লাঠিয়ালসংগ্রহ। দেখি কয়বার কাঁক যায়। একদিন হাতে
পাইবই পাইব। আরও একটি কথা আমি তোমাকে বলি, যে ব্যক্তি যেকোন

কৌশলে কেনীর মাথা আমার নিকট আনিয়া দিবে, এই হাজার টাকার তোড়া আমি তাহার জুতা বাঁধিয়া রাখিলাম। এই আমার প্রতিজ্ঞা, আমার জমিদারি, বাড়ি, ঘর, নগদ টাকা, আসবাবপত্র যাঁহা আছে, সমুদায় কেনীর কল্যাণে রাখিলাম। ঐশ্বর্য্যসাধী করিয়া বলিতেছি স্বন্দরপুরের সমুদয় সম্পত্তি কেনীর জুতা রহিল। অত্যাচারের কথা কহিয়া মুষ্টিভিক্ষায় জীবনযাত্রা নির্বাহ করিব। দ্বারে দ্বারে কেনীর অত্যাচারের কথা কহিয়া বেড়াইব। যে ঈশ্বর জগতের মুখ দেখাইবার পূর্বেই আহারের সংস্থান করিয়া মায়ের বুকে বাঁধিয়া দিয়াছেন, সেই ঈশ্বরের নাম করিয়া প্যারীস্বন্দরী যাহাব দ্বারে দাঁড়াইবে, সেইখানেই সমাদরে স্থান পাইবে। হরপ্ত নীলকরের হস্ত হইতে প্রজাকে বক্ষা করিতে জীবন যায় সেও আমার পণ। আমি আমার জীবনের জুতা একটুকুও ভাবি না। দেশের দুর্দশা, নিরীহ প্রজার দুর্ব্বাসার কথা শুনিয়া আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে। মোকদ্দমার জুতা তোমরা ভাবিও না। যতপ্রকারের তদবির হইতে পারে তাহা কব।”

রামলোচন বলিলেন, “আমার বোধ হইতেছে শীঘ্রই ধানাদার দারোগা, জমাদার, আসামী ধরিবাব জুতা মফস্বলে গ্রামে গ্রামে আসিবে।”

প্যারীস্বন্দরী বলিলেন, তাহাতে ভয় কি? যত টাকা লাগে দারোগাকে দেও, আর এই বলিয়া কৈফিয়ত দেওয়াইয়া দেও যে, আসামীর নামের কোন লোক আমার বাটিতে নাই, আমার সরকাবে নাই। স্বন্দরপুরগ্রামে নাই। আমার এলাকার মধ্যে নাই। আমবা কখনও সে নামের কথা শুনি নাই। সাহসে কম হইবে না। রামানন্দবাবু উপার্জিত ঐশ্বর্য্য, জমিদারি সকলি আজ কেনীর জুতা তাঁহারই কত্তা প্যারীস্বন্দরী রাখিয়া দিল। আর তাঁহারাও পৈতৃক জমিদারি নহে। ইহাও ইংরেজের অল্পগ্রহেই হইয়াছিল। তাহারাও ইংরেজ, কেনীও ইংরেজ, একপ্রাণী বটে—তবে মাছুষ আর শূকর। এক ঝাড়ের বাঁশ—কেহ হাড়ীর কাঁটা, কেহ পূজার ফুলের সাজি। কত ইংরেজ কত কার্য্যে এদেশে আসিতেছেন, কই কেনীর মত নয়-রাক্ষস তো একটিও দেখি না। অনেককে দেবতা বলিয়া পূজা করিতে ইচ্ছা করে। কুমারখালির ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ব্রেণমের কুঠির কল্যাণেই পিতার এত ঐশ্বর্য্য, এত জমিদারি। ইংরেজ বাহাদুরের শুভদৃষ্টিতেই স্বন্দরপুরের স্বরূপ স্ফুটিল। ঐশ্বর্য্য কেনীর কল্যাণে সকলি মাটি হইবে। একেবারে সারা হইবে। তোমরা আমার আদেশ মত কেহই কার্য্য করিতে পার না, ইহাই আমার মনের দুঃখ। একজন—দৌরাভ্যাকারী ইংরেজকে জব্দ করিতে পারিলে না, ভালরূপ

শিক্ষা দিতে পারিলে না। ছি! ছি! বড় লজ্জার কথা। বড় স্বপ্নার কথা! দেশ তো এদেশে আমরাই সকল, আমাদেরই দেশ, আমাদেরই লোকজন লইয়া একা কেনী। আমাদের উপর এত অত্যাচার, এত দৌরাণ্ডা, এত জুলুম করিতেছে। তোমরা শতমহত্ব লোক একত্র হইয়াও দুইবারে কিছুই করিতে পারিলে না। নিশ্চয় জানিলাম তোমাদের মাথায় কিছুই নাই। কিছুই নাই—খালি হাড় আর পচা মজ্জা। কি করি মনের দুঃখ মনেই রহিয়া গেল। আমি স্ত্রীলোক—! কেনীর দৌরাণ্ডা না টিকিতে পারিয়া এদেশের অনেকেই তাহার সহিত যোগ দিয়াছে, সত্য সত্যই কি তাহারা যোগ দিয়াছে? মনেও করো না—সেকথা কখনই মনে করো না। সে যোগ দায়ে পড়িয়া সে প্রণয় না পারিয়া, সে ভালবাসা, সে আত্মগত্যা—অপমানের ভয় প্রাণের ভয়, স্ত্রী-পরিবারের প্রতি অত্যাচারের ভয়, ভাবিয়া। যাহা মনে জাগে, তাহা তাদের মনেও জাগে। তাহারা কি কেনীর কুটুম্ব না আত্মীয়, না দেশেব লোক? তাহাদের নিকটে যাওয়া-আসা করা চাই। ষথাসাধ্য গোপনে গোপনে তাহাদের সত্হায়া, তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হওয়া চাই। যাহাতে সকলের মন এক হয়, তাহার উপায় করা চাই। প্রকাশে যাহাই করুক, হিন্দু-মুসলমানকে এক ভাবা চাই। শত্রুতা বিনাশ করিতে একতা শিক্ষা করা চাই। একতাই সকল অস্ত্রের প্রধান অস্ত্র। জাতিভেদে হিংসা, জাতিভেদে ঘৃণা দেশের মঙ্গলের জন্য একেবারে অস্ত্র হইতে চিবকালের জন্য অস্ত্র করা চাই। সকলের একপ্রাণ—একদেহ হইয়া কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করা চাই। একভাবে, একমতে বুদ্ধি চালনা করা চাই। আমি যতদূর জানিতে পারিয়াছি, যাহারা কেনীর পক্ষে আছে তাহারা মনের সহিত আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে না। কেনীর মন যোগাইতে ইচ্ছা করিবে মাত্র। চেষ্টা করিলে, বিপদকালে সকলেই সকলের উপকার করিতে পারে। অর্থবল আর বাহুবলই যে বল তাহা নহে। শত্রু দমন করিতে হইলে, অস্ত্র বলেরও আবশ্যক। চেষ্টা করিলে সকলেই সকলের কিছু না কিছু উপকার করিতেই পারে। আমি অর্থের বল চাই না। বহুবলেরও তত দরকার করিতেছে না। ঈশ্বর আমাকে এ দুই বল বা দিয়াছেন কেনীর জন্য উহাই যথেষ্ট। যে বলের অভাব লেই বলের অধেষণ কর। যদি পাও, সাহায্য চাও—সাহায্য লও। আর কেনী যে বলে বলীয়ান, তার অত্মকরণ কর। দেখি, কেনী বায় কোথা? একা কেনী—আমিবার দিন একখানি বেঁত, আর একটি টুপি লইয়া আসিয়াছিল, তা লোকের কাছে গল্পও করে যে: আমরা বেঁত-টুপি দার। যদি কনাই থাকতে পারি:

বাহা লইয়া আসিয়াছিলাম তাহাই লইয়া ঘাইব। দেখ তো কেমন সাহস! আর কেমন ভাল হওয়ার চেষ্টা। তোমাদের কি ওরূপ সাহস আছে, না উৎসাহ আছে? তোমাদের সকলি মুখে, কাজে কিছুই নাই। কেবলই হইহই। কাব্য বুঝিয়া, কাব্যের গুরুত্ব বুঝিয়া চলিবে না, বুঝিয়া করিবে না। আচ্ছা, যাহা বল তাহা করিতে পারিলেও মুখের গোরব বজায় থাকে। কথার মূল্য বাড়ে। ফাঁকা আওয়াজ আর ফাঁকা কথা দুই সমান। কেবল বাক্য ক্ষয়, আর মাথা ক্ষয়। তোমরা বোঝ আর না বোঝ, পার আর না পার, মুখের জোব কিছুতেই কমে না। বাকি রহিল মাথা—সে মাথা একেবারে নাই বলিলেও হয়, কারণ প্রায়ই ঠিক থাকে না। বাহাইউক, আর বেশি বলতে ইচ্ছা করি না। মনে ভেবে রেখ, খুব দৃঢ় বিশ্বাস করে স্থির করে রেখ যে, সকলেরই শেষ আছে। আমি যদি এই জ্বালামের হাত থেকে আমার প্রজা রক্ষা করিতে না পারি তাতে দুঃখ নাই, কারণ কালে কেনীর ধ্বংস আছেই আছে। আমার দুঃখ এই যে, আমি যেসকল ঘটনা চক্ষে দেখিতে পারিব না। দয়ার হাতবিস্তার—নিষ্কয়ের হাতসঙ্কোচ। যেদিন কেনীর সময় পূর্ণ হইবে, সেদিন সামান্য বলে, সামান্য কারণে কেনী মহা-অস্থির হইয়া উঠিবে।

কথা শেষ হয় নাই, এমন সময় খবর আসিল যে, দারোগা, জমাদার, বর-কন্দাজ, চৌকিদারের প্রায় চারিশত লোক আসিতেছে।

পারীশ্রম্ভরী বলিলেন, তাহারা কোম্পানীর লোক, তাহাদিগকে খুব আদর কর। কি জন্তে আসিয়াছে শোন। যদি সেই কারণেই আসিয়া থাকে, তবে এই-রূপে সেসব আলাপ কিছু না করে—আগে আহারের যোগাড়, জলখাবার যোগাড়, বাসার যোগাড় বিশ্রাম উপযোগী স্থানের যোগাড় করিয়া দেও, পরে অস্ত্র যোগাড়। কিছুতেই যেন তাহাদের সমাদর, আদরের, যত্নের ক্রটি না হয়। সেলাম বাজাইয়া রামলোচন ত্রস্তে চলিয়া গেলেন।

একাদশ তরঙ্গ

দলিলের বাস্তব

পাঠক! জামাইবাবুর সেই বাস্তব চূড়ির কথাটা একবার মনে করুন। তিনি অস্ত্র কোন মূল্যবান জিনিস না লইয়া সামান্য একটা বাস্তব, অত পম্প্রসমে অস্ত্র যোগাড়ে হস্তগত করার কাণ্ড কি? তাহা বোধহয় বুঝিডেই পারিয়াছেন। সন্দানী বিনোদ ঐ বাস্তব অস্ত্রতনামা—

বিনোদ বলিয়াছে, আমি জানি ঐ আলমারির নিকটে হাতবাক্সটির মধ্যেই অছিয়তনামা আছে। আমি মীরসাহেবকে রাখিতে দেখিয়াছি। আমি অছিয়তনামা চিনি। বিনোদ মীরসাহেবের বিশ্বাসী, মীরসাহেবের অনেক গুপ্ত-কথা জানে, সুতরাং অছিয়তনামার সন্ধানও যথার্থ। জামাইবাবু বিনোদকে একেবারে বড়লোক করিবেন—কোরান ছুঁইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। ইহার পরেও শতক দেড়শত বিনোদের বাড়ি গিয়াছে। তাহার পরেও বিনোদের কত তোষামোদ, কত খাতির। বাক্সটি খুব সাবধানে রাখিয়া দিয়াছেন। সুযোগ পান নাই বলিয়া খুলিয়া দেখিতে পারেন নাই। একদিন খুলিবার জন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন, চাবি নাই। “অন্ত্র অন্ত্র চাবি দিয়াও দেখিয়াছেন, খোলে না। তালার কলটি পর্যন্ত ঘোরে না। ভাঙ্গিতেও সাহস হয়না। বাক্স ভাঙ্গার কথা প্রকাশ হইলে যদি ঐ বাক্সের তালাস হয়—না পাওয়া গেলেই সন্দেহ হইবে যে, জামাইবাবুই এ কীর্তি করিয়াছেন। বাক্স ভাঙ্গার কারণ কি? রাত্রে বাক্স ভাঙ্গার আবশ্যক কি? নানা ভাবনার পর স্থির করিয়াছেন যে হাতে পাইয়াছি কাজ উদ্ধার হইয়াছে। যে দিন সুবিধা আর সুযোগ পাইব, সেইদিন আবার খুলিবার চেষ্টা করিয়া দেখিব। নিতান্ত পক্ষে না খোলে ভাঙ্গিব। দেখি কি হয়। কিছুদিন চাপিয়া যাই। এমন সুন্দর বাক্সটি ভাঙ্গিতেও মনে কষ্ট হয়। ভাবি স্বার্থে অথবা ব্যাঘাত, ভয়, কলঙ্ক, অপবাদ, লজ্জা এই কয়েকটি বিষয় ভাবিয়া বাক্স খুলিবার কি ভাঙ্গিবার চেষ্টা আর করিলেন না। মনে মনে আরও স্থির করিলেন যে মূল দলিলত হাতে আসিল, এখন অন্ত্র অন্ত্র দলিল হাতে করা চাই।

সকলের সম্মুখে মীরসাহেব জামাইবাবুকে একদিন বলিলেন, চিরকাল শালঘর মধুয়ার কুঠির মালিক সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ ছিল, ঈশ্বর ইচ্ছায় “কেনী” এখন অল্পগ্রহই করেন। এদিকে বিষয়াদিতেও আর কোন গোলাযোগ দেখি না। এই সময় আমি একবার সেরাজগঞ্জ হইয়া আসি। অনেকদিন যাইনা। একবার গিয়ে দেখিতে হয়। এ বাটির কাজ সকলি আপনি দেখিবেন। বাপু! আমার আর কোন আশা নাই। সকলি তোমাদের, আমার আর কিছুই ভাল বোধ হয়না। তোমাদের কাজকর্ম তোমরা দেখে শুনে কর। আমি নিশ্চিন্তভাবে বসে বসে ছুটো ঝেতে পেলেই হল। তোমাদের ঘর সংসার তোমরা দেখে শুনে রক্ষা কর।

দেবীপ্রসাদ বলিলেন, জ্ঞী, পরিবার বিহীন গৃহী বড়ই অসুখী। ঘরের লক্ষ্মীই ঘরপী। যদি তাহাতেই অনিচ্ছা, তবে একেবারে সর্বভোগী হয়ে “ককিরী” গ্রহণকরাই ভাল। গৃহী অথচ কিছুই নাই। হুজুর! এর অর্থ আমরা বুঝতে পারিনা।

মীরসাহেব বলিলেন, আবার! —জেনেগুনে আবার! যে নূতন সংসারী তার কাছেই সংসার সুখের। ভুক্ত ভোগীর নিকট অন্য প্রকার। সে ফাঁদে আবার পড়িব। .সংসারে সুখ নাই। যদি বলেন আমার বংশলোপ হইবে, জ্ঞী, পুত্র, কণ্ঠা, কিছুই নাই। তাহাতে দুঃখ কি? কতলোকের সন্তান জন্মিবে, বংশরক্ষা করিবে। আমার নাইবা হইল। আমি জ্ঞী, পরিবার এবং দুনিয়ার সুখ দুঃখ ভাল কবিয়া ভোগ করিয়াছি। সন্তানের সাধ, বিষয় সম্পত্তির সাধ সকলি মিটাইয়াছি। আমোদ আশ্বাদের সাধ মিটাইতেও কম করি নাই। আর কেন? অনেক হইয়াছে। বয়সের সঙ্গে শরীরের অবস্থা বয়সের সংসারীর অনেক কার্যে যোগ আছে।

দেবীপ্রসাদ বলিলেন, আপনি যদি বয়সের কথা পাড়েন, তবে ত, আমরা মারা গিয়াছি। বড় মীরসাহেব আমার ছোট ছিলেন। বয়সে কি করে?

মীরসাহেব বলিলেন, বয়সে কিছু না করুক। আমি আর ও ফাঁদে পা দিতে ইচ্ছা করি না। আমার গায়ে বাতাস লাগিয়াছে। সর্বস্ব গিয়া একটি মাত্র ছিল তাহাও যখন গেল, আর আশা কি? সকলি ঈশ্বরের রূপ। এখন আছি ভাল। দয়াময়ের দয়ায় এখন আছি ভাল।

কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময় কেনীর চাকর কলিমসদ্দার আসিয়া, সেলাম বাজাইয়া বলিল,—

হুজুর! —সাহেব! —এই ডিহীতে নীল দেখিতে আসিয়াছিলেন, হুজুরের আমবাগানের নিকট, হাতীর উপরে আছেন, কি কথা আছে—সেলাম দিয়াছেন।

মীরসাহেব যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থাতেই বাগানের নিকট গিয়া, কেনীর সহিত সাক্ষাত করিলেন। অনেকেই দূরে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের সাক্ষাতদৃষ্ট দেখিতে লাগিল। কথাবার্তা স্পষ্ট ভাবে হইলেও দূরত্ব হেতু কেহ স্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারিল না। কেবল সময় সময় কেনীর মুখে চক্ষে, বাগের চিহ্ন দেখা—আম

প্যারীসুন্দরীর নাম কানে শোনা।—শেষের কথাটা বোধহয়, স্পষ্টভাবেই সকলের কানে গেল। “বেত আর টুপী—আবার উহা লইয়াই জাহাজে চড়িবে।”

অনেকে অনেক অর্থ ঘটাইলেন। প্রায় একঘণ্টা কাল উভয়ের আলাপ হইল। কেনী যাইবার সময়ে, আব কয়েকটি কথা চুপি চুপি মীরসাহেবকে কহিয়া হাতিতে উঠিলেন। হাতিতে উঠিতে উঠিতে আবার বলিলেন, “ভুলিবেন না, ফের বলিতেছি, ভুলিবেন না।” পুনরায় উভয় উভয়কে সেলাম দিয়া কেনী দক্ষিণমুখী হইলেন। মীরসাহেব উত্তরমুখি হইয়া বাড়ির দিকে আসিতে লাগিলেন। গুপ্ত দর্শকগণ মীরসাহেবকে আসিতে দেখিয়া আমবাগান হইতে, নানা পথে ছুটিয়া মীরসাহেবের অগ্রেই বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিয়া আপন আপন স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন।

মীর সাহেবও ধীরে ধীরে আসিয়া আপন ঘরে প্রবেশ করিলেন। মজলিস আবার জমাট বান্ধিয়া গেল। কথা চলিতে লাগিল।

মীর সাহেব বলিলেন, ধন্য বাঙ্গালীর মেয়ে। সাবাস সাবাস! সাহেবকে একেবারে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। সাহেব এতদিন সকলকে যেরূপ জ্বালাতন করিয়াছেন, তাহার প্রতিশোধ বুঝি প্যারীসুন্দরীর হাতে হয়। প্যারীসুন্দরী সাহেবের ধনে প্রাণে সারা করিতে স্থির হইয়া বসিয়াছে! আবার কুঠি লুট করিবে। কেনীর মাথা কাটিয়া লইয়া যাইবে। মেমসাহেবকে ধরিয়া লইয়া গিয়া দাসী বানাইবে, প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। সাহেব না কি এই সকল কথা, তাঁহার কোন বিশ্বাসী লোকের নিকট শুনিয়াছেন। শুনিয়া মহা ব্যস্ত হইরাছেন। ব্যস্ত হইবারই কথা। হাজার লোক সংগ্রহ করিয়া কুঠিরক্ষা, আত্মরক্ষা, মেমসাহেবকে রক্ষা করিবার উপায় করিয়াছেন। ধন্য—প্যারীসুন্দরী! এতবড় মোকদ্দমা মাথার উপরে, তার উপবেশ এত সাহস! এত জেদ! এতদূর চেষ্টা।

অনেক কথাবার্তার পর সময় বুঝিয়া দেবীপ্রসাদ বলিলেন, হজুর! থাকের নকসটা দেখা নিতামতই আবশ্যক হইতেছে। কি কৃষ্ণনেই যে, আশ্রাদ আশ্রীয় নহিত স্বর্গীয় বৃদ্ধ মীরসাহেবের বিবাদ বাধিয়াছিল। আজ পর্যন্ত সমানভাবে চলিতেছে। দুই পুরুষ যায়। তবু বিবাদের শেষ হইল না। কত পুরুষ যে এই

বিবাদ থাকিবে ঈশ্বর জানেন। আবার এই সম্মুখের চর লইয়া বিবাদ উপস্থিত, নকসাতাঁব নিতান্তই দরকার হইয়াছে।

“থাকের নকসা কেন? আমি অনেকদিন হইতে ভাবিয়া স্থির করিয়াছি, বিষয়াদিব যাবতীয় দলিল এক ফিবিস্তি করিয়া “তুলা মিয়াকৈ” বুঝাইয়া দিব। যাহাদেব কাজ তাহারা দেখে শুনে করুক। আমি আব ও ঝঙ্কাটে থাকিতে ইচ্ছা করি না। আজ সমুদায় দলিল বুঝাইয়া দেও।”

জামাইবাবু শব্দবের কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন! অন্তরে আঘাত লাগিল। এ অত্যাঘাত নহে, এ ভ্রুংখের আঘাত নহে, ভক্তির সহিত প্রেমের আঘাতও নহে। এ প্লানি! এ আত্ম-প্লানির বিষম আঘাত।

যাহাব সর্বনাশ কবিত্তে তিনি বন্ধপরিবর হইয়া কাষাক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, যাতাব প্রাণ পর্যন্ত বিনাশ করিবাব কথা সময় সময় অতিগোপনে মুখে আনিতেছেন, অস্ত্রে খন, কি ঔষধে, নিজে কি অপবেব দ্বাবা, এ চিন্তাও মস্তকে আনয়ন করিয়াছেন, যাহাব মুখ দেখিতে চক্ষু নাবাজ। তাহার এই ভাব? এমন সবল ভাব এমন প্রেমপূর্ণ—পবিত্র ভাব? কি ভালবাসাব কথা! “যাহাদেব কাজ তাহাবা করুক।” সা গোলাম অস্থির হইলেন। মনে সেই একপ্রকার নূতন ভাবেব দেখা দিল। কিন্তু সে ক্ষণস্থায়ী শক্তিছটা—একটি কথায়, কোথায় সবিয়া গিয়া, ভগেব সঞ্চাব হইল, হৃদয় কাঁপিয়া গেল, অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, বুক শুকাইয়া দূর দূর কবিত্তে লাগিল কথাটা কি? কথা আব কিছু নহে, মীরসাহেব মাস্তনকে দলিলেব বাঝ আনিতে আদেশ করিয়াছেন, সমুদায় দলিল এখনই জামাইবাবুকে বুঝাইয়া দিবেন।

কোন কোন পাঠক জিজ্ঞাসা কবিত্তে পারেন যে, ও কথায় অঙ্গ শিহরিবে কেন? ভয়েবই বা সঞ্চাব হইবে কেন? জামাইবাবু, তো একপ্রকার শুভ সংবাদ, মস্তলের কথা—আনন্দেব কথা। তাহা নহে, পাঠক। তাহা নহে, আনন্দেব কথা নহে, সম্পূর্ণ নিবানন্দ। মহা-সঙ্কট! এবং বিষম ভয়। এখনও বুঝিতে পারেন নাই? জামাইবাবুব মুখশ্রী, বিশ্রী হইয়া ধূলা উড়িবাব কারণ এখনও বুঝিতে পারেন নাই! “তাহাব সেই চুরি কবা বাঝ।” সেই বাঝটিই যদি দলিলেব বাঝ হয়, ঐ নিশীথ সময়ে তোষাখানাব মধ্যে হামাগুড়ি পাড়িয়া যাওয়া চুবি করা বাঝটি যদি দলিলেব বাঝ বলিয়া চিহ্নিত থাকে, তবে তো এখনই মহা-গোলযোগ উপস্থিত

হইবে, ধরা পড়িলেও পড়িতে পাবে। এই কারণে জামাইবাবু—চাবিদিক অন্ধকাব দেখিতে লাগিলেন। মনে মনে কত পীৰ, কত ককিব, দববেশদিগের দবগায় নজর, সত্যপীৰের সিন্নি, মানিকপীৰের খাজা, বডপীৰের মলিলা, মুস্কিল আসানেব রোজা, কত কি মানত কবিলেন।

কিছুক্ষণ পরে মাস্তান দলিলেব বাক্স আনিয়া মীবসাহেবেব সম্মুখে বাখিয়া দিল। জামাইবাবু বাঁচিলেন, নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন, গা দিয়া ঘাম ছুটিল, চিন্তা-বিকার ছাড়িয়া গেল, বক্ষা পাইলেন, ধবা পড়িলেন না। কেহ কিছু জানিতেও পাবিল না। সে বাক্সের কোন কথাই উঠিল না। দলিলেব বাক্স তবে অল্প বাক্স, তাহা স্বচক্ষেই দেখিতেছেন। আব চিন্তা কি ?

মীবসাহেব বাক্স খুলিয়া থাকেব নকসাটা দেবীপ্রসাদেব হাতে দিয়া, বাক্সসমেত দলিল জামাইবাবুর সম্মুখে বাখিয়া দিলেন। এবং বলিলেন—

আপনি সমুদায় দেখিয়া আপন হাতে বাখিয়া দিন। জমিদারী সংক্রান্ত সমুদায় দলিল, ঐ বাক্সে আছে।

বিনা পবিশ্রমে, বিনা যত্নে, বিনা কষ্টে. এবং অনায়াসে, জামাইবাবুব মনেব আশা পূর্ণ হইল। মীবসাহেবেব সরল ভাব, প্রেমপূর্ণ পবিত্র ভাব, সা গোলামেব পাপময় চিব-কলুসিত, হিংসাপূর্ণ অন্তবেব তুষ্ট-তুবাশাও সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ কবিয়া দিল।

মীবসাহেব উঠিয়া যাঠিবাব সময়, দেবীপ্রসাদকে ডাকিয়া একটু গোপন-ভাবে চুপে চুপে বলিলেন, এখনই ৮০/৯০ জন লাটিয়াল যোগাড় কবিয়া, ষত শীঘ্র হয়, শালঘর মধুযাব কুঠিতে পাঠাইয়া দেও। বিশেষ দবকাব—সাহেবেবও বিশেষ অল্পবোধ।

দ্বাদশ তবঙ্গ

বিলাতী বুদ্ধি

উভয়পক্ষেবই গুপ্ত সন্ধানী, চর অচ্যুতব, খবুবে,—সকলি আছে। স্বন্দর-পুরের খবর কুঠিতে আসিতেছে, কুঠির খবর স্বন্দরপুরে যাইতেছে। সাধাবণের মনে বিশ্বাস, যে প্যারীসুন্দরী কিছুতেই কেনীকে ছাড়িবেন না। হাজ্জার টাকা! কথার কথা—কেনীর মাথার মূল্য এখন হাজ্জার টাকা। যে ঐ মাথা স্বন্দরপুরে

লইয়া দিতে পারিবে, সেই ঐ টাকা পাইবে। মেমসাহেবকে চান—চাকরানীর জন্ত। শাড়ী পরাইয়া, হাতে বালা দিয়া মনেব মত জ্বক করিবেন, দেশের লোককে দেখাইবেন। কিন্তু কেনীও কম পাত্র নহে, সেও প্যারীসুন্দরীকে কুঠিতে লইয়া যাইবাব যোগাড়ে আছে। কি কাণ্ড! ভয়ানক ব্যাপার। কার ভাগ্যে কি আছে কে বলিতে পারে? —আপন কথাই আপন মুখে প্রায়-লোকের ঠিক থাকে না। —বিশেষ বাঙ্গালী। পবেব কথাগ, কত কথাই যে, বাতাসেব আগে আগে দৌড়িয়া যাইতে থাকে তাহাব নীমা করা কঠিন।

বেলা প্রায় দুই প্রহর চাবটা। মিসেস কেনী এবং কেনী, উভয়ে দ্বিতল গৃহের উপরেব হলে, আজ বড়ই মিশামিশ, ঘেঁষাঘেঁষি। সম্মুখে শ্বেতপ্রস্তবের গোলাকার ক্ষুদ্র টেবিল—টেবিলেব উপর টমলটপূর্ণ একসাত্রাণ্ড। সোড়াওয়াটােব মিশ্রিত, এখনও গ্লাসেব নিয়ভাগ হইতে বৃদবৃদ উঠিতেছে, একসাব বড় ক্রমশই ফিকা হইতেছে।

কেনী, পাচারি কবিয়া বেড়াইতেছেন। দুই-তিনপাক ফিবিয়া একটু ত্রাণ্ড মুখে দিতেছেন। কিন্তু মস্তক চিন্তাব কায়া ভুলে নাই। —কেনীব মস্তক এইক্ষণ বিশেষ একটি চিন্তায় বহিয়াছে। অবশই কোন কায়া উদ্ধাবেন জহই চিন্তাদেবীকে স্মরণ কবা হইয়াছে। ত্রাণ্ডিব ঢোকে ঢোকে, মনগত ভাবেব, উদয় হইতে শেষ পর্যন্ত ক্রমে কেনী, চিন্তা কবিশ্য তাহার দোষগুণ সমালোচনাব জহেই মস্তিষ্কের সহিত কায়া-বিবরণেব আলোচনা হইতেছে। মনেব একাগ্রতা, চিন্তাব বেগবৃদ্ধি, ভালমন্দ বিচাব, পবিণাম এই সকল বিষয় বিশেষরূপে আলোচনাব জহই বোধহয় অল্পমাত্রায়, ত্রাণ্ডি সেবনে মন দিয়াছেন। কাবণ ত্রাণ্ডি যে মস্তকে যাঁহা পায়, তাহাই বুদ্ধি করে।

মিসেস কেনীও কিছু গবমেই আছেন। অল্প টেবিলে, শেবির বোতল খোলা রহিয়াছে। —পিয়ানোর সহিত স্তব মিলাইয়া, স্বামী-সোহাগিনী, গান ধরিয়াছেন, আবশ্যক-মত শেবির স্বাদ লইয়া রমনীহৃদয় প্রফুল্ল করিতেছেন। স্বামী-স্ত্রী এককক্ষে—আনন্দময়ী মদিবা সম্মুখে। স্ত্রী-কণ্ঠে গীত। হস্তে বাজ্যন্ত্র। সুরনজিত, এবং স্তম্ভজিত দ্বিতলগৃহ। স্বথ-সেব্য-সামগ্রী, খাছাদি প্রচুব—ভাণ্ডার পূর্ণ। —স্বথের একশেষ। কিন্তু এ স্বথ-সময়ে বিলাতী দম্পতীব বদনমণ্ডল প্রফুল্লতার বিশেষ চিহ্ন দেখা যাইতেছে না। উভয়েই আমোদপ্রমোদে, মনেব

স্বথে আছেন বটে—কিন্তু আন্তরিক নহে। —ভাবে বোধ হইল যেন উভয়েরই দুরন্ত শত্রু সময়, প্রয়োজন ও কার্যগতিকে, নিতান্ত আবশ্যকীয় ও প্রয়োজনীয়, মূল্যবান সময়কেও লোকে শত্রু মনে কবে, ইহা মিথ্যা নহে। সেই অমূল্য সময়, এইক্ষেণে ইহাদেব পক্ষে নিতান্তই বিষম ও কষ্টকর বোধ হইতেছে। কারণ আছে!

মেঃ কেনীর চিন্তা অগ্রপ্রকাবের। চারিদিকে শত্রু, চারিদিকে গোলযোগ। যশোহর, মাগুরায়, পাবনায়, এই তিন জেলা মাথিয়া মোকদ্দমা। আদালত কোজদাবী। নড়ালেব বামরতন বায়, নলভাঙ্গাব বাজা, পাংশার ভৈরববাবু, আরও কত জমিদার, তালুকদার—সহিত কত গোলযোগ। সকলের উপর স্বন্দরপুর। মেমসাহেবকে লইয়া শাডী পবাইবে। বড় শক্ত কথা। আবাব নিজের মাথার কথাটাও কম নহে। কোনদিক রক্ষা কবিবেন।

মেমসাহেবের বিশ্বস্ত খানসামা হস্তে আসিয়া হাতযোড কবিয়া বলিল—
“ভ্জুর! পাবনাব লোক কিবিয়া আসিয়াছে।”

মেমসাহেব পিয়ানো জেলিয়া মহাবাস্তে বাজা-আসন হইতে উঠিলেন। তাড়াতাড়ি নাচে যাওয়া পাবনাব পত্র লইলেন। নীচেবতলাতেই পত্রের লেপাফা খোলা হইল। এক লেপাফায় ছোট বড় দুইখানি কাগজ, ছোট কাগজ-খানা পাকেট পুরিয়া পত্র-হস্তে কেনীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

কেনী টমলট খালি কবিয়া পুনবায় ব্রাণ্ডি ঢালিতেছেন। পাবনাব পত্রের কথা শুনিয়া ব্যস্ততা-প্রযুক্ত ব্রাণ্ডিতে সোড়া গুয়াটাব না মিশাইয়াই যত পারিলেন পান করিয়া, মিসেস কেনীব বামস্বন্ধে বামহস্ত বাথিয়া পত্রখানির আগা গোড়া দুই তিনবার মনে মনে পাঠ করিলেন। মুখে কথঞ্চিত হরিষের লক্ষণ দেখা দিল। বোধহয় কোন স্তবহব।

সোনাউল্লা খানসামা সিংহাসী ও চতুৰ। সময়ে রাগী ও ধীর। স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই বিশ্বাসী, কেনী সোনাউল্লাকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া চুপে চুপে কি কি বলিয়া দিলেন। কেনী যেদিন বেশিমানায় ব্রাণ্ডি চড়াইতেন, সেদিন বিষয়াদির কাজ আফিসে গিয়া কবিতেন না। এমন কি উপবতলা হইতে কিছুতেই নীচে নামিতেন না। যদি কথা প্রকাশ হইত যে সাহেব আজ ব্রাণ্ডির বোতল খুলিয়াছেন, তবে কুঠিসমেত নীবব। কাহার মুখে উচ্চকথাটি বাহির হইত না। ভয়ে সকলের প্রাণ কাঁপিত। কেনীর আদেশ ছিল যে আমোদের সময় কোন

আমলা তাঁহার সম্মুখে না যায়। মেমসাহেবের পিয়ানোর আওয়াজ, আর গলার মিহি-স্বর শুনিয়াই কার্য্যকারকগণ বুকিয়াছিলেন যে, আজ আমোদের দিন। আমাদেরও ছুটি। কেহ দাবায়, কেহ পাশার খালে বসিলেন। কেহ অগ্ন আমোদে মন দিলেন।

ক্রমে দিনযাপি অন্ত—সম্পূর্ণ অন্ত। ঘোর সন্ধ্যা। কোথাও লণ্ঠন জ্বলিল, কোথাও প্রদীপ দেখা দিল। কোথায় কোথায় মোমবাতি শোভা পাইল, ঝাড়ে, দেয়ালে, বৈঠকি সেজে, লণ্ঠনে নিজে পুড়িয়া আমোদে গলিয়া পড়িতে লাগিল।

সোনাউল্লা সাহেবেব কয়েকজোড়া কাপড় তুলিয়া চিকনী, ব্রাস, গ্রাস, অল্প পরিমাণ কিছু খাত পুবিয়া একটি পোর্টম্যান সাহেবেব সম্মুখে বাথিয়া দিল।

আহারের টেবিল নাজান হইয়াছে। কেনী তাডাতাড়ি আহাবে বসিলেন। মিসেস কেনী টেবিলে বসিলেন, কিন্তু আহাব করিলেন না। কেনী সামান্য কিছু মুখে ফেলিয়া টেবিল হইতে উঠিলেন। সোনাউল্লা-মুখেব দিকে তাকাইতেই সোনাউল্লা ষোডহাতে বলিল—

“খোদাবন্দ। পালকি বেহাবা হাজিব।” কেনী দেশলাই জ্বলাইয়া পাইপ মুখে ধরিলেন, এবং বলিলেন, সব ঠিক ?

সোনাউল্লা পূর্ববৎ বলিল—খোদাবন্দ ! সকলি ঠিক।

কেনী মৃদুস্ববে কয়েকটি কথা মেমসাহেবকে বলিয়া সোনাউল্লাকে বলিলেন দেখ, বাবুরচিকে গিয়ে বল, ভাল ভাল খান। তৈয়াব করিতে। আব যা যা করতে হবে মেমসাহেবের কাছে শুনবে। এই বলিয়াই মেমসাহেবের হাত ধরিয়া নীচে নামিলেন। সিঁড়ির নিকটে পালকি, পালকিতে উঠিবার সময় কাহাকে কোন কথা বলিতে অবসব পাইলেন না। কাবণ, জ্বর-মুখে গাঢ়ভাবে চুশন করিতেই অগ্ন কথা তুলিয়া গেলেন। চুশনেব স্বাদ লইয়া পালকির দবওয়াজা বন্ধ হইল। বেহারাগণ নিঃশব্দে কুঠির পশ্চাৎ দ্বার হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণমুখে চলিল।

কিছু দূর গেলেই মশাল, মশালচি, লোকজন সকলি সঙ্গে হইল। পালকি দক্ষিণদিকেই চলিল। কুঠিতে সোনাউল্লা এবং মেমসাহেব ভিন্ন, কেনীর গমন সংবাদ কেহই জানিতে পারিল না। জানিবার কথাও নহে।

মেমসাহেব উপরে আসিয়াই জাঁকালভাবে খানার টেবিল সাজাইতে আদেশ করিলেন। রুপার চামচ ইত্যাদি বাহির করিয়া দিলেন। সমুদায় ঝাড়ে

বাতি জ্বালান হইল। বাহিরের কাজকর্ম সমুদায় ঠিক করিয়া ড্রেসিংরুমে প্রবেশ করিলেন। মনেবমত সাজশয্যায় অঙ্গ-সাজাটয়া ড্রেসিংরুম হইতে বাহির হইলেন। সে সময়ের ভাবই ভিন্ন - কপ ভিন্ন। বৃহদাকাব আবশির সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজেব পবিচ্ছদ-সাজেব নিজেই ভালমন্দ বিচার করিতে লাগিলেন। কোনখানে টানিয়া দিলেন। দুই একটি চুল যাহা বেকেতাভাবে কপালের কি ভাব উপব উড়িয়া পড়িয়াছিল, তাহা হস্তদ্বাবা সোজা করিলেন। মাথা হইতে পা পর্যন্ত হেলিয়াতুলিয়া, বাকা হইয়া, পাস ফিবিয়া দেখিয়া “অল বাইট” বলিয়া জানালার দিকে মুখদিয়া ইজিচেয়াবে পা ছুড়াইয়া দিলেন। মুহূর্তকাল অতীত হইলেই দেখিতে পাইলেন যে একথানা পালকি আব জন পঞ্চাশ লোক নানাবকম পোষাক পবা, ক্রমে আফিস-দালান বাগদিকে বাগিয়া একেবাবে তাঁহাব দ্বিতল বাসঘবেব সিঁড়ির নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। এবং পালকিব দ্বার খুলিয়া গেল।

মিসেস কেনী আগ্রহেব সহিত ও! মিষ্টার! মহানন্দে ত্রস্তপদে সিঁড়িব নীচে আসিয়া আগন্তুক ইংরেজেব হাত ধরিলেন। যথারীতি অভিবাদানাদি কবিয়া উপবে আসিলেন। পর্দা সরাইয়া দ্বার অব্যবহিত করিলেন। দস্তুরমত পাখা চলিতে লাগিল।

মিসেস কেনী পুনরাব তাডতাডি নীচে গিয়ে সাহেবেব লোকজনকে বিশেষ আদব কবিয়া নীচেবতালায় স্থান দিলেন। তাহাদের আহাবাদিব জ্ঞাত সোনা-উল্লাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া উপবে আসিলেন।

পাঠক! আগন্তুক নূতন লোক নহেন। আপনাদের পূর্ব-পরিচিত ম্যাজি-ষ্ট্রেট। সঙ্গেব লোকজন ইহাবাও নিবর্ণক আসে নাই। উহাদের মধ্যে দাবোগা, নায়েব দাবোগা, ববকন্দাজ—সকলি আছেন। কিন্তু সকলেই ছদ্মবেশী। মেমসাহেব, সাহেবকে বসাইয়া ঐ কক্ষেব নিম্নকুঠবিতে দাবোগা, জমাদাব এবং ববকন্দাজদিগকে যথোপযুক্ত স্থান নির্ণয় কবিয়া দিলেন। কুঠিব অগ্ন অগ্ন চাকব, আমলা প্রভৃতি কেহই এ নিম্নকুঠেব জানিতে পারেন নাই।

উভয়পক্ষের গোয়েন্দাই চতুর্ব। কে কোন সময়ে কোন সন্ধান লইতেছে, কি কৌশলে কি বেশে আসিয়া খবর জানিয়া যাইতেছে, সাবধান সতর্কে, বিশেষ সতর্কে থাকিয়াও কোনপক্ষই তাহা জানিতে পারিতেছেন না। কুঠির খবর দিন

দিন স্তম্ভবপুবে যাইতেছে। —স্তম্ভবপুবেব গুপ্তচর সংবাদ দিয়াছে যে, কেনী আজ কুঠিতেই আছেন। আমোদে মাতিয়া আছেন। ত্রাণ্ডি-পানিতে মাতয়ারা—বিভোব। মেমসাহেব পিয়ানো বাজাইতেছেন। হাসি-তামাসা খুব চলিতেছে—ইত্যাদি—

মিসেস কেনী আজ যে অভিনয় ভার গ্রহণ কবিয়াছেন, রুতকাষী হওয়া বড়ই কঠিন। তবে ভরসা এই যে, স্বয়ং-নেতৃত্ব—সোনাউল্লা সাহায্যকারী—আগন্তুক পাবনাব দল প্রকাশে সাহায্যকারী না হইলেও শাস্তিরক্ষক, বিচারক। এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ, পবিদর্শক।

সোনাউল্লা মেমসাহেবের নিকট বলিল “হুজুর! মীবসাহেব তাহার নিতান্ত বিদ্বাসী লোকদ্বাবা এই পত্র পাঠাইয়াছেন সে আপনাব সহিত দেখা কবিতে চাহে। পত্রের লিখা ছাড়া আবও কি কথা আছে।”

মিসেস কেনী অতিব্রস্তে নীচে আসিয়া গোপালকে দেখিয়াই চিনিলেন। বলিলেন, “গোপাল! খবর কি?”

গোপাল সেলাম বাজাইয়া বলিল—“হুজুর! একশত আসিয়াছে। আব সমুদায় ঠিক। আফিসঘবে ইহাদেব স্থান দিলে ভাল হয়।”

মিসেস কেনী আফিসঘবের দ্বাবদানকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন। গোপাল এবং গোপালের সঙ্গিরা আফিসঘবের স্থান পাইল।

মিসেস কেনী মণাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট বসিয়া খোস-গল্প কবিতেছেন। আবাব সোনাউল্লা আসিয়া কবযোড়ে বলিল—“হুজুর! সান্ত্বাল মহাশয় সাহেবের নিকট বিশেষ কি কথা বলিতে চান।”

মিসেস কেনী বলিলেন—“তুমি গিযে দেওয়ানজীকে বল, আজ সাহেবের শরীর অস্তথ।”

সোনাউল্লা চলিয়া গেল, মুহূর্ত্তপবেই ফিবিয়া আসিয়া বলিল—“হুজুর! বড় জরবী খবর—তিনি বলিলেন—“যদি সাহেবের শরীর অস্তথ হইয়া থাকে তবে মেমসাহেবের নিকটেই বলিতে হইবে। বড়ই জরবী কথা।”

মিসেস কেনী উঠিলেন এবং সিঁড়ির নিকটে আসিয়া শব্দ সান্ত্বালকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“কি কথা?”

সান্ত্বাল মহাশয় বলিতে লাগিলেন—“হুজুর! এখনই খবর পাইলাম যে,

প্যারীস্কন্দরীর লাঠিয়াল স্কন্দরপুর হইতে রওয়ানা হইয়াছে। ঢাল, স্কডকি, লাঠি ইত্যাদি গাড়ী বোঝাই করিয়া আনিতেছে। বহুতর লাঠিয়াল একত্রে আসিতেছে। সাহেবেব সঙ্গে দেখা হইল না। কোন পরামর্শও কবিত্তে পারিলাম না। দিন-বুঝিয়াই সাহেবেব শরীর অসুস্থ হইয়াছে, এখন উপায় কি?

মিসেস কেনী বলিলেন—“কুটিতেও আমাব অনেক লোক আছে, ভয় কি।”

শম্ভু বলিলেন,—“ভজুর! কুটিতে যে লোক আছে, তাহাদের দ্বারা কুটি রক্ষা হইতে পারে না। প্যাবীস্কন্দবী এবাবে বিশেষ যোগাড করিয়াছে। আর একটি কথা, তাহারা শুধু কুটি লুটপাট কবিয়া যাঠবে না, তাহাদের মনেব ভাব ভাল নহে।”

মিসেস কেনী বলিলেন—“আব কি কবিবে? আমাকে স্কন্দরপুরে লইয়া যাঠবে। যে লোক আছে, তাহাতে যদি তোমাদের সাহস না হয়, আবও লোক সংগ্রহ কব। টাকায় কিনা হয়। দুই টাকাব জায়গায় চারি টাকা খবচ করলে এই বাত্রেই কত লোক জুটিয়া যাঠবে। যত পাব সংগ্রহ কব আমাব ভক্তম।”

শম্ভু বলিলেন—“এত বাত্রে লোক পাওয়াই তো কঠিন কথা।”

মিসেস কেনী বলিলেন—“তবে সাহেবকে কি বলিতে আসিয়াছ? কোথা পাঠবে? সে কি কথা? কুটিব চাবিদিকে আমাবই প্রজ্ঞা—তাহাদিগকে বেশী কবিয়া টাকা দেও, অবশ্যই আসবে। যত লোক পাব, আনিয়া কুটিব চাবিদিকে খাড়া কবিয়া দেও। রাত্ত-প্রভাত না হওয়া পর্যন্ত খাড়া পাহাশ দিবে।”

শম্ভু সাংগাল সেলাম বাজাইয়া বিদায় লইলেন। মিসেস কেনী নিজকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে সাংগাল মহাশয় বাসাবাড়িতে যাঠিয়া প্রধান কার্য্যকাবক হবনাথ মিস্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া লোক সংগ্রহেব জন্ত লোক মোতাঠন করিলেন। লুকুম পাইলে কি আর রক্ষা আছে? “ঝাকডা চুল” লাঠিয়ালেরা দুহাতে সেলাম ঠুকিয়া নিশীথ সময়ে গ্রামে গ্রামে লোক সংগ্রহ করিতে ছুটিল।

উপস্থিত বিপদে আবশ্যকমতে সাহায্য করিবে এই আশ্রয়েই মিসেস কেনী নিকটস্থ প্রজ্ঞাদিগকে আনিতে আদেশ ও রাত্রি-জাগরণে কষ্ট হইবে বলিয়া দিগুণ পারিশ্রমিক দিতে আদেশ করিয়াছেন।

স্বার্থ-ই অনর্থের মূল, স্বার্থ-ই দুর্দশার সোপান, জগতে স্বার্থ-ই পতনের মূল কারণ—প্যারীসুন্দরী বলিয়াছেন, দেশেব লোকই দেশেব শত্রু, দেশেব অনিষ্ট-কারী। কেনী বিলাত হইতে লোকজন সঙ্গে কবিয়া এদেশে আসেন নাই। দেশেব লোকদিয়াই স্বদেশীয়েব সর্বস্বান্ত কবিতেন। রাত্র জাগবনে প্রজার কষ্ট হইবে, দেদিকেও মিসেস কেনীব লক্ষ্য ছিল। থাকিয়া কি হইবে? কাষাকর্জা বাঙ্গালী—অধীন চাকরগণ বাঙ্গালী, কিন্তু স্বার্থের দাস। দ্বিগুণ পাবিশ্রমিক দিয়া লোক সংগ্রহ কবাব আদেশ! এখন দেশের লোকেব হাতে পড়িয়া নিরীহ প্রজাকুলের কি প্রকাবে দুর্দশা ঘটে—দেখন।

লোক সংগ্রহকাবীবা সেলাম কৃষ্টিয়া নিকটস্থ গ্রামে গ্রামে প্রবেশ কবিল। দেওয়ানেব লুকম কার সাধ্য আর বাত্রে ঘবে থাকিতে পাবে? নিদ্রাত্যাগ করিয়া, শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিতে হইল। যে উঠিতে বিলম্ব কবিল, কি শব্দেব অস্বস্ত—অস্বস্ত হেতু কৃষ্টিব পাহাৰায় যাঠিতে নাবাজ হইল, তাহাব ভাগ্যে যাহা ছিল তাহা হইল। যন্ত্রণাব দায়ে, প্রাণেব ভয়ে, অপমানেব ত্রাসে অনেকেই দেওয়ানজীব প্রেবিত লাঠিয়ারেব সঙ্গি হইল। যাহাবা দুই চাবি আনা প্রণামী দিতে সমর্থ হইল, তাহাবা আব আসিল না। যাহাদেব পয়সা দিবার শক্তি নাই, বাধা হইয়া যাঠিতে প্রস্তুত হইল। কৃষ্টি বক্ষার্থে চলিল কাহাবা? যাহাদেব পেটে অন্ন নাই, সংসাবে কষ্টেব সীমা নাই। কোথায় যাঠিতে হইবে, কি কাষা কবিতেন হইবে, কেন টানিয়া লয়, কেনই বা বিনাপরাধে লাথি, কিল, চড মাবে, সেকথা জিজ্ঞাসা কবিবাব সাধ্য নাই। অনেকেই সাবাদিন নৌলজমিব কাবকিদ কবিয়া বাড়ি আসিয়াছে। নিজেব জমি উপযুক্ত সময়ে চাষ আবাদেব ক্ষমতা নাই। সময় বহিয়া যাউক, বোদ্রে পুড়িয়া যাউক, জলে ডুবিয়া যাউক “জো” সরিয়া যাউক, কার সাধ্য নৌলজমি ফেলিয়া ধানেব আবাদ করিতে পাবে। আগে নৌল পাছে ধান। কৃষকের জীবন উপায় শস্ত্র বপনোপযোগী জমি প্রস্তুত কবিতেন বিন্ন, বুনিতেন বাধা, কব দিতেও অক্ষম। কাজেই খাবাব সংস্থান অনেকেবই নাই।

বাড়ি আসিয়া কেহ আধপেট! আহাৰ কবিয়াই কুহকিনী-নিশার কুহকে পড়িয়া মাতিয়াছে। কেহ অনাহাবেই মাটিতে শুইয়া পড়িয়াছে। অল্প পরিমাণ ক্ষুধা নিবারণ জন্ত একমুঠো অন্নও অনেকেব ভাগ্যে ঘটে নাই। যাহা ছিল, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলি দিনেরবেলা নিরন্তর থাকিয়া সন্ধ্যার পূর্বেই মায়ের অঞ্চল

ধবীয়া কান্দিয়াছে। মাঘের প্রাণ। যাহা ঘবে ছিল, তাহাই সিদ্ধ-পোড়া করিয়া প্রাণ হইতে প্রিয়তব সন্তান-সন্ততিগণের মুখে শুধু চুনভাত দিয়া তাহাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়াছে। হাড়িতে আর অন্ন নাই। থাকিলে ছেলেমেয়েরাই আর কিছু খাইতে পাবিত। কি কবে সজল-নয়নে কৃষকপত্নী হাড়ি-আঁচড়া পোড়া ভাতগুলি যতনে স্বামীব জন্ত রাখিয়া দিয়া স্বামীগত প্রাণাপত্তী কেবল ঈশ্বরের নাম করিয়া বহিয়াছে। স্বামী সাবাদিন নীলকুঠির কাজ করিয়া বাটি আসিয়াছে, ছেলেমেয়ে দিনে খেতে পায় নাই। —সন্ধ্যাবেলাও ভরপেট হয় নাই। স্ত্রীর মুখে খবব শুনিয়া আব সে পোড়াভাতও মুখে দিতে সাধ্য হয় নাই। ঈশ্বর ভবসা। —মহা জনেব বাড়িতে গিয়া দ্বিগুণ তৃগুণ লাভ-স্বীকাৰে ধান কর্জ কবিয়া আনিবেন তাহাবও সময় নাই। বাত্র-প্রভাত হইতে না হইতেই আমিন, খালাসী আসিয়া ধবীয়া লইয়া যায়। নীলজমিব কাবকিত, চাষ ইত্যাদিতে নিযুক্ত কবে। তবে কিছু প্রণামী দিতে পাবিলে সে, যমদূতগণেব হাত হইতে বক্ষা পাইতে পাবে। তাহাই বা কোথায় পাইবে? পেটে পাথর বান্ধিয়া থাকাই অভ্যাস। দিবসে তু-এক পয়সাব জলপানই পূর্ণ আহাৰ—পরিশ্রমেব ইতি নাই—নিদ্রাদেবী ছাড়িবেন কেন? বিছানা থাক বা না থাক, বালিশে মাথা পড়ুক বা না পড়ুক, ঘুমেব ঘোবে সকলেই কাতর। তাহার উপর এই দৌবান্ধা। যাহাবা দুই-একআনা দিতে পাবিল, তাহাবা কিল. লাগি খাইয়া রক্ষা পাইল। যাহাদেব দিবার শক্তি হইল না, তাহারা কুঠি পাহাবা দিতে চলিল। হাঁয় বে বঙ্গ! হায় রে নীলকর! হায় বে স্বদেশীয়!

মিসেস কেনী পূৰ্বেই সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, প্যাবীসুন্দরীর লাঠিয়ালের বাত্র-প্রভাত হইতেই কুঠি আক্রমণ করিবে। কৌশলে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবেন, তাইতে স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেটকে গোপনে আনিয়া রাখা। আরও একটুকু সূক্ষ্ম কথা আছে যে, কেনীব মাথা কাটিয়া সুন্দবপুর লইয়া যাইবে। ভ্রমে যদি ম্যাজিষ্ট্রেটেব মাথাটা কাটা যায়, তবে কেনীব মনস্কামনা শীঘ্রই সিদ্ধি হয়। প্যাবী-সুন্দরীব সর্বসম্ভ, কেনীব জয় জয় আনন্দ। কুঠি ছাড়িয়া গুপ্তভাবে যাওয়ার কারণও তাহাই।

মিসেস কেনী সাহসে নির্ভর করিয়া ভিন্ন কক্ষে জাগিয়া আছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ভিন্ন কক্ষে নিদ্রিত। স্বঃ ম্যাজিষ্ট্রেট—শাস্তিরক্ষকগণ-সহ রক্ষার জন্ত

উপস্থিত, কঠিন লোকজন ও সতর্কিত, বিপদের আশঙ্কা নাই বলিলেই হয়। কিন্তু মন অস্থির, মহাঅস্থির! আজ বাত্রে নিদ্রার সহিত তাহার দেখা নাই। কি জানি কি হয়। বিপদ সম্ভাবনায় অবশ্যই অধিক ভয়, ঘটনাচক্রে কোথায় লইয়া ফেলে, কি ঘটে কি হয় সমুদায় ভবিষ্যৎ গর্ভে নিহিত। কাজেই অস্থির—কাজেই চঞ্চল।—কাজেই চিন্তা, কাজেই আকুল।

উষাদূত-কুকুট বাত্রে শেষ হওয়ার সংবাদ ঘোষণা করিল। পাখিরা এখনও বাসা ছাড়ে নাই। পাখা ঝাড়া দিয়া ডালে বসে নাই। প্রভাতী গানেও জগৎ মাতায় নাই। দস্যমেষের সত্যনাম ঘোষণা করে নাই। পাখা ঝাড়া দিয়া কেবল ডাকিতেছে। মিসেস কেনী গোবগেব ডাকের দিকেই মন দিয়াছেন; এক ডাক, ক্রমে তিন-চারি ডাক শুনিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আবও একপ্রকার শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। এরূপ শব্দ আব একদিন তিনি শুনিয়াছিলেন। সেই ডাক, সেই ভীষণ বব। শরীয় বোমাঞ্চিত হইল, হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। শব্দ ক্রমেই নিকটবর্তী, ক্রমেই বেশী আতঙ্ক। ব্যস্তভাবে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবেব কক্ষের দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবও অর্দ্ধ-নিদ্রিত ভাবে ছিলেন। মিসেস কেনীও গলার স্বর শুনিয়া পালঙ্ক হইতে লাফাইয়া উঠিলেন। দ্বাব খুলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“বাপাব কি?”

পাঠক! এইস্থানে লিখক ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে। অস্বাভাবিক দোষের পোষকতা। হেতু লিখক দোষী, তাহাতেই ক্ষমা প্রার্থনা। মিসেস কেনী এবং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব উভয়ে বিলাতী, সম্মুখে বিপদ আশঙ্কা, মিসেস কেনী ভয়ে ভীতা ও আশঙ্কিতা। এ অবস্থায় জাতীয় ভাষাতেই কথাবলা যুক্তি সঙ্গত। আপনাদের অস্তবিধা ও শ্রুতিকণ্ঠের হইবে বলিয়া বাঙ্গলা ভাষাতেই সে কথার ভাবার্থ আপনাদিগকে শুনাইতে হইল।

মিসেস কেনী বলিলেন—“শুনিতেন না?”

ম্যাজিষ্ট্রেট—“কৈ আমি তো কিছুই শুনিতে পাইতেছি না।”

মিসেস—“ঐ শুনুন, বিপক্ষদল নিকটবর্তী! বাঙ্গালী বিক্রমের ঐ শব্দ! প্যারোস্ফেরীর লাঠিয়ালগণ এরূপ শব্দ করিয়াই আসিয়া থাকে। সেদিনও আসিয়াছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট—“কোন চিন্তা নাই। আপনি নিশ্চিতভাবে আপন কামরায়

থাকুন। আমি নীচে যাইতেছি। গভর্ণমেন্টের বাজ্য—আমি ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের পক্ষের লোক। আমি থাকিতে আপনাব কোন ভাবনা নাই। আপনি নির্ভয়ে উপরে থাকুন। আমি নীচে চলিলাম।”

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাড়াতাড়ি আপন পরিচ্ছদ লইয়া জোবপায়ে নীচে নামিলেন। প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালেরা বিষম বিক্রমে কালীগঙ্গার পশ্চিমপারে আসিয়াই পুনরায় ডাক ভাঙ্গিল। দারোগা, জমাদার সকলেই আপন আপন পোষাক লইয়া সাহেবেব আদেশে কোমর বান্ধিলেন, কিন্তু ঘবেব বাহিব হইলেন না। কুঠির-হাতায় প্রবেশ করিলেই গ্রেপ্তার করিবেন, ইহাই তাঁহাদের ইচ্ছা,—ঘটিলও তাহাই।

এখনও রাত্র-প্রভাত হয় নাই, উষা দেখা দেয় নাই—তাবাদল লইয়া তারা-পতি এখনও স্ব-স্থানে চলিয়া যান নাই। একে একে যাইতেছেন—এখনও সম্পূর্ণ-রূপে চক্ষের আড়াল হন নাই। আবার সেই হো হো শব্দ। সেই ঝ ঝ শব্দ! সেই হৃদয়-কম্পিত, দেহ-কম্পিত শব্দ—ভীষণ বর মেঘসাহেবেব কণে প্রবেশ করিল। পশ্চিমেও ঐ শব্দ দক্ষিণেও ঐ।

বামলোচন এবাবে বিশেষ যোগাড করিয়াছেন। কুঠির পশ্চিম এবং দক্ষিণ উভয়দিক হইতে কুঠি আক্রমণের যোগাড। মিসেস কেনী, দুইদিকে দুইপ্রকার শব্দ শুনিয়া আরও ভীত হইলেন। নিমকহালাল চাকর সোনাউল্লাহ চক্ষে নিদ্রা নাই। কি হইল? —একি ব্যাপার? সাহেব কুঠিতে নাই, একি কাণ্ড। এই সকল ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে মহা-অস্থির। একবার নীচে একবার উপরে যাইতেছে। ক্রমে কুঠির নেগাহবান সদ্দাবগণও জাগিয়া উঠিল—চাল, মডকি, লাঠি লইয়া সকলেই খাড়া হইল।

সোনাউল্লাহ স্ট্রিডের নিকটে মেঘসাহেবকে পাঠিয়া বলিল, “ভজুব। মীর-সাহেবেব চাকর গোপাল সদ্দাব ভজুরে সেলাম দিতে চায়।”

বোধহয় পাঠকগণের মনে নাই—মনে করিয়া দিতেছি। মীরসাহেব আমবাগানের নিকট কেনীব সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়া যে লাঠিয়াল জোটাইতে আদেশ করিয়াছিলেন—সেই আদেশেই সদ্দারগোপাল একশত লাঠিয়াল সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছে। আফিসঘরে স্থান পাইয়াছে।

মিসেস কেনী বলিলেন—“গোপাল। তুমি আমার এই ঘর রক্ষা কর।

কৃষ্টির লাঠিয়ালেবা কৃষ্টি রক্ষা করিবে। প্যারীসুন্দরীবা লাঠিয়ালের সম্মুখীন হইয়া লাঠি মাঝিবে—তুমি আমাকে রক্ষা কর।’

পুনর্বার দক্ষিণদিকে পূর্ববৎ শব্দ হইল—গোপাল বলিল—জুঝুর! প্যারী-সুন্দরীবা লোক পশ্চিম এবং দক্ষিণ এই দুইদিক হইতে নিশ্চয়ই আসিতেছে। দক্ষিণদিকে কোন বাধা নাই। পশ্চিমে নদী—বেশী জল—অধিক পবিমাণ পবিসর না হইলেও নদী—কিন্তু দক্ষিণে খোলা মাঠ, পুষ্করও তাহাই। পূর্বদিকে তত আশঙ্কা নাই। কারণ দক্ষিণদিক হইতেই পূর্বদিকে যাওয়ার পথ। এখন দক্ষিণ-দিক না ঠেকাইলে কৃষ্টি রক্ষা করা বড়ই কঠিন হইবে। পশ্চিমে নদী—জল কম হইলেও তব্ধা এদিক হইতে “ক্রন্দন” আসিতে যত বিলম্ব হইবে, দক্ষিণদিক হইতে আসিতে তত বিলম্ব হইবে না। আমি দক্ষিণদিকেই চলিলাম। জুঝুর! আর বিলম্ব করিতে পারি না।—এই পর্য্যন্ত বলিয়া গোপাল মেমসাহেবকে আবার সেলাম বাজাইয়া বেগে ছুটিল।

কৃষ্টির নিযুক্তি লাঠিয়ালেরাও ডাক ভাঙ্গিয়া কৃষ্টির পশ্চিম দিকে দ্বিতল গৃহের পশ্চিমদিকে ‘আনি’ বাধিয়া দাড়াইল। কত লোক কৃষ্টির উত্তর সীমায় প্রবেশ দ্বাৰে ঢাল, তববাব বাধিয়া থাড়া হইল। এখনও সম্পূর্ণরূপে প্রভাত হয় নাই। গোপাল সন্দের আপন বেবাদবীদিগকে বলিল “দক্ষিণে এত আলো কিম্বে?”

সকলেই দেখিল অনেকের হাতেই মশাল। মশালের আলোতে আরও দেখা গেল, সড়কিবা অগ্রভাগেবা চাকচিক্য, লাঠির দীঘতা, কোমববাঙ্কা, মুখপাট্টা বাঙ্কা, বাঙ্কালার যোধ, অগণ্য লাঠিয়াল দেখিতে দেখিতে বিকট চিৎকার করিতে করিতে ক্রমেই অগ্রসর হইতেছে।

কালীগঙ্গাব পশ্চিম পারেও এরূপ আলো, ঐ প্রকার বিকট রব,—মাঝে মাঝে ভয়ানক চীৎকার,—দেখিতে দেখিতে কালীগঙ্গাব পশ্চিমতট আলোক-মালায় পরিশোভিত হইল—জলে-স্থলে জলন্ত মশালের শিখা অধো-উর্দ্ধভাবে প্রভাত বায়ুর প্রতিঘাতে হেলিতে ছলিতে লাগিল। চমৎকার দৃশ্য! সে স্তূদৃশ্য বেশীক্ষণ থাকিল না। উষাদেবী পূর্বাঙ্গ হইতে দুহাতে অন্ধকার সরাইয়া চারিদিক পরিষ্কার করিয়া দিলেন। প্যারীসুন্দরীবা লাঠিয়ালেরা ‘মার মার’ শব্দে গঙ্গাজলে

ঝাঁপ দিয়া বীরত্বের শেষ, সাহসের শেষ, কাষের শেষ দেখাইয়া মহাতেজে কুঠি অভিমুখে আসিতে লাগিল।

কুঠির সকলেই জাগিয়াছে। —মুচ্ছুদ্বী, দেওয়ান, নায়েব, পেখকার, ইত্যাদি আমলাগণ, লাঠিয়ালগণেব হু-হুঙ্কাবে ভীষণ চীৎকারে জাগিয়াছেন, কুঠিব লাঠিয়ালেরাও প্রস্তুত হইয়া উত্তরদিকে প্রবেশদ্বাবে বীরদর্পে দণ্ডায়মান হইল। প্রায় শতাধিক লাঠিয়াল নদীৰ পূর্বপারে দাঁড়াইয়া জলন্ত শত্রুদলের আগমনে বাধা দিতে লাগিল।

প্যারীসুন্দরীর কড়া-ত্কুম। কাষা উদ্ধাব কবিতে পারিলে বিশেষ পুরস্কাব আছে। তাহারপর এক হাজাব টাকা অতিরিক্ত। যে সেইকাঙ্ক্ষ পারিবে, তাহার ভাগ্যেই হাজাব—সে হাজাব কাহাব ভাগো আছে তাহা কেহই জানে না। কিন্তু আশা আছে আমি পাইব।

বে টাকা! তোর অসাম্য কিছুই নাই। পবেব জন্ত, পরেব প্রয়োজনীয় মাথার জন্ত জলে ঝাঁপ, সম্মুখ-শত্রুর অস্ত্রের মুখে বক্ষবিস্তার, লাঠিবতলে মস্তকদান। রে টাকা! তোর জন্তই কেনীর বিলাত পবিত্রাগ। তোর জন্তই নীলের ব্যবসা। জমিদাবেব পতন। তোর জন্তই নিবীহ বক্ষেব প্রজাব প্রতি অত্যাচার—পিশাচি! তোর জন্ত আজ এই বাঙ্গালী বুদ্ধ। পরিনামকল ভবিষ্যৎ গর্ভে। জয়-পরাজয় অবশ্যই হইবে। পরাজয় পক্ষেও তুমি। জয় পক্ষেও তুমি তোমাবই জয়, জগতে তোমারই জয়!

প্যারীসুন্দরীর পক্ষেব লোকেবা পূর্বেই দ্বিধ পরামর্শ ছিল যে, পশ্চিম-দক্ষিণ উভয়দিক হইতেই কুঠি আক্রমণ কবিলে। কবিলও তাহাই।

দক্ষিণদিকে গোপাল—গোপালের দলেব সহিত খুব চলিতেছে। স্বয়ং গোপাল সুশিক্ষিত। সঙ্গিরাও বাচ্চা বাচ্চা। সহজে পরাস্ত হইবার নহে। লাঠি, সড়কি সমানভাবে চলিতেছে। প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালেরা—একপাও অগ্রে বাড়িতে পারিতেছে না। যেখানে বাধা সেইখানেই দণ্ডায়মান।

এদিকে অর্থাৎ পশ্চিমদিকে ভিন্নপ্রকাব কাণ্ড। একদল জলে ঝাঁপাইয়া ভিজা কাপড়ে ভাস্কায় উঠিতে অগ্রসর হইতেছে। অপরপক্ষে উপর হইতে লাঠি-দ্বারা আঘাত করিবার চেষ্টা করিতেছে। একশত লোকে কি করিলে? দক্ষিণে ফিরাইতে ফিরাইতে বামদিক হইতে অসংখ্য শত্রুদল কেনীর লাঠিয়ালদিগকে

ঘিরিয়া ফেলিল। এখন তাহাদের প্রাণ যায়। আব কতক্ষণ—মাথা-ভাঙ্গা, পা-ভাঙ্গা, মাজা-ভাঙ্গা, হাত-ভাঙ্গা, হইয়া পিঠ দেখাইল। লাঠি, মডকি ফেলিয়া কেনীর দ্বিতল শয়নকক্ষের দিকে ছুটিল। —ছুটিল তো ত্রাসে একেবাবেই ছুটিল। কে কোন্ পথে কোথায় পানাইল তাহাব খবর আব কে করে? কিন্তু সেসময় সন্ধান করিলে বাবুরচিহ্নানায়, ঘোড়ার আস্তাবলে, নীল হাউজেব মধ্যে, জাঁতঘরের জাঁতের নীচে অবশ্যই অনেককে পাওয়া যাইত। দেওয়ানজীর আদেশে আবাব বেশী পরিমাণ লাঠিয়াল, কুঠিব পশ্চিমে কালিগঙ্গা-তীবে ডাকে-ইাকে বিক্রমে উপস্থিত হইয়া প্যারীসুন্দরীব লাঠিয়াল প্রতি লাঠি ঝাড়িতে লাগিল। জল হইতে তাহারা আর ভাঙ্গায় না উঠিতে পাবে। কুঠি আক্রমণ করা দুবে থাকুক কুঠিব সীমায় পা ধরিতে না পাবে, তাহাবই চেষ্টা করিতে লাগিল।

কার সাধ্য আজ প্যারীসুন্দরীব লাঠিয়ালগণকে বাধা দেয়? কার সাধ্য তাহাদের সম্মুখে দাঁডায়? কালীগঙ্গাজলে—লাঠিয়াল পূর্বতীবে কেনীব লাঠিয়াল—পশ্চিমতীবে প্যারীসুন্দরীব লাঠিয়াল, ক্রমাগত আসিয়া জুটিতেছে। আব ডাক ভাঙ্গিয়া ‘আলী আলী’ শব্দ কবিতে কবিতে জল পড়িতেছে। কয়েকজনকে কণ হাতে বাধা দিবে? মাথা কাটিল, জলে ডুবিল, হাবুডুবু খাইয়া আবাব উঠিল। একদিক এইরূপ চলিতে লাগিল, কিন্তু বামদিক হইতে জল সীতরাইয়া ‘মার মার’ শব্দে লাঠিয়ালগণ কেনীর লাঠিয়ালদিগকে ঘিবিয়া লাঠিবাজির প্রতিশোধ আবস্ত কবিল। কুঠির দক্ষিণদিকে ও খুব গোল। —পূর্বেই বলা হইয়াছে প্যারীসুন্দরীর কতক লাঠিয়াল দক্ষিণদিক হইতে আসিয়া পশ্চিম, পূর্ব এই দুইদিক হইতে একে বারে আক্রমণ কবিবে ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মীরসাহেব প্রেবিত লাঠিয়ালগণ দক্ষিণ-দিক রক্ষা করিতেছে, গোপাল স্বয়ং লাঠি ধবিয়াছে।

নদীতীবে এখন আব লাঠির ঠকাঠক শব্দ হইতেছে না। —কাবণ কুঠির লাঠিয়ালগণ বেগোছ দেখিয়া পিঠটান দিয়াছে। —আব কোন বাধা নাই। প্যারী-সুন্দরীব কতক লাঠিয়াল ‘মার মার’ শব্দে কেনীর শয়নঘরের সম্মুখে আসিয়া কেনীর নাম ধবিয়া বেজায় গালাগালি দিতে আবস্ত করিল।

আয়, নামিয়া আয়! দালানের মাঝে কপাট দিয়া কেন? পুরুষ-বাচ্চা হও—বাহিরে এসো। দেখি একবার তোমাকে। আর তুমি মনে করো না যে দালানের কপাট এঁটে বাঁচতে পারবে। পঞ্চাশ-তোড়া টাকা ছড়াইয়া দিলেও,

‘আজ খালি হাতে যাব লোক নাই। তোমার মাথা হাতে হাতে সুন্দরপুর যাইবে। বাহির হও, শীঘ্র বাহির হও।’

মিসেস কেনী ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নানাপ্রকার সাস্তুনা বাক্য বুঝাইয়া শেষে বলিলেন, আপনার কোন চিন্তা নাই।—এ লাঠিয়ালেরা আব একটু অগ্রসর হইলেই পাকড়াও করিব। আপনি ব্যস্ত হইবেন না।

মুখে কথ্য মুখে থাকিতে থাকিতে লাঠিয়ালেবা লাঠি ভাঁজাইতে ভাঁজাইতে একেবারে সিঁড়ির নিকটে আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে উত্তোষ করিল। এমন সময় লালপাগড়িধার কয়েকজন লোক বাহিরে আসিয়া ‘পাকড়ো পাকড়ো’ শব্দ করিয়া ছুটাছুটি আবহু করিল।

লাঠিয়ালেব চক্ষে লালপাগড়ি বড়ই মাঝখুক অস্ত, বড়ই ভয়ের কাবণ। —নামডাকেব লাঠিয়াল হইলেও লালপাগড়ির নিকট মাথা হেঁট।

লালপাগড়ি দেখিয়া প্যারীসুন্দরীবা লাঠিয়ালগণ খতমত খাইয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া যাহা দেখিল তাহাতে পূর্বভাব অনেক পরিবর্তন হইল। স্পষ্ট বলিতে লাগিল। যা থাকে কপালে হইবে আগে ধব বেটাকে। এই কথা বলিয়াই আবার যেন কি মনে হইল। —পিছে হটিল। ক্রমেই পিছে হটিতে লাগিল। একজন বলিতে দশজন বলিয়া উঠিল। ও তো কেনী সাহেব নহে? আমি বেশ চিনিতে পারিয়াছি, কখনই ও কেনী নহে।

সন্দেহটা শীঘ্রই মিটিয়া গেল। কাবণ লালপাগড়িওয়াল সেপাই সাহেবরা ‘পাকড়ো পাকড়ো’ বলিয়া বেগে ছুটিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও স্বীয়দলের পৃষ্ঠ-পোষক হইয়া শু বোল ‘পাকড়ো’, দারোগা, জলদি পাকড়ো, লোককো হাতকৌড়ি লাগাও—

লাঠিয়ালেবা বলিতে লাগিল। “আজ মাঝা গিয়াছি। ধরা পড়িলাম। এতদিনের পবে মাঝা পড়িলাম। আর দেখ কি, ও কেনী নহে! আমি ভাল করিয়া চিনি, ইনিই সেই ম্যাজিস্ট্রেট—”

ইহারাও ‘পাকড়ো পাকড়ো’ করিয়া ছুটিয়াছেন, কিন্তু একজনকেও পাকড়াতে পাচ্ছেন না। পিছে হটিয়াই নদীতীর পর্যন্ত চলিয়া গেল। লালপাগড়িধার সেপাই সাহেবেরা মুখে ‘পাকড়ো পাকড়ো’ করিতেছেন, পাকড়া করিবার জন্ত হাত বাড়াইয়া দিতেছেন কিন্তু তাহাদের লাঠির নিকট যাইতে সাহসী হইতেছেন না।

তাগড়া লাঠিয়ালেরা লাঠি ভাঁজিতে ভাঁজিতে জলে নামিল—সেপাই সাহেবেরা কাপড় কসিতে কসিতে ‘ডিক্সি লাও ডিক্সি লাও’ বলিয়া টেঁচাইতে টেঁচাইতে তাহার নদী পার হইয়া কালীগঙ্গার পশ্চিমতীরে যাইয়া উঠিল। কেহ পলাইল না। পিঠ দেখাইয়া দৌড়িল না। সকলেই দাঁড়াইল এবং সাহেবকে বলিতে লগিল। হুজুর! আপনি রাজা—আপনি দেশের বাদশা। আমরা তাবেদার, চাকর, গোলাম, নফর—দয়া করে আমাদিগকে মাপ করিবেন। হুজুরের সহিত আমাদের কোন কথা নাই। —

ঘোড়াহাতে লাঠিয়ালগণ এইরূপ বলিতে লাগিল। মাজিস্ট্রেট সাহেব এবং দারোগা জমাদার নদীপারের নৌকার উপর থাকিয়াই ঐ সেই কথা—সেই বুলি—নৌকা পশ্চিমতীরে লাগিল। মাজিস্ট্রেট সাহেব ঘোড়া সহিত পার হইয়াছেন। ঘোড়ায় উঠিয়াই দারোগা মাহাম্মদ বক্সকে বলিলেন—“কি কর তোমরা কর কি? একজনকেও ধরিতে পারিলে না?”

লাঠিয়ালেরা ঐরূপ কাকুতি-মিনতি করিতে করিতে ক্রমে পিছে হটিতেছে। ইহা বাও অগ্রসব হইতেছেন।

মাজিস্ট্রেট সাহেব ঘোড়া উঠাইয়া যাইতেই মাহাম্মদ বক্স দারোগা বলিল—“হুজুর! লাঠিয়াল গ্রেফতার করিতে আপনি যাইবেন না। আমরা উপস্থিত থাকিতে আগে হুজুরের যাওয়া ভাল দেখায় না। তবে যে বেটা দৌড় দিবে, তাহার পাছে পাছে ঘোড়া উঠাইবেন।”

মাজিস্ট্রেট সাহেব মহাবিরক্ত হইয়া দারোগাকে গালাগালি দিয়া বলিলেন, এত বরকন্দাজ, এত চোঁকিদার, কেনীব এত লোকজন থাকিতে উহাদের একগাছা সডকি, কি একখানা লাঠি ধরিতে পারিলে না? লাঠিয়াল গ্রেফতার করা তোমার কাজ নহে।

লাঠিয়ালদল হইতে একজন হাতযোড় করিয়া গলায় কাপড় বান্ধিয়া বলিতে লাগিল—“ধর্ম্মাবতার! আজ ফিরিয়া যাউন। দারোগা সাহেবকেও ফিরিয়া যাইতে আদেশ করুন। দোহাই ধর্ম্মাবতার! ফিরিয়া যাউন, একজনকেও ধরিতে পারিবেন না। আর আগে বাড়িবেন না। কেনীর কপালের ভারি জোর! হুজুরের সাহায্যে আজ ঝাঁচিয়াছে! হুজুর না থাকিলে এতক্ষণ তাহার মাথা স্তম্ভরপুর নিশ্চয়ই যাইত। ধর্ম্মাবতার! বোড়হস্তে বলিতেছি আজ ফিরিয়া যাউন।

আমরা বড়ই কষ্ট পাইতেছি। দারোগাসহ আজিকার মত ফিরিয়া যাউন আমরাও ফিরিয়া বাইতেছি।

সাহেব গুলিলেন না। বেশীর ভাগ, ডাম, গুয়ার, ডাকু ইত্যাদি বলিষ্কা গালাগালি দিলেন এবং মাহাম্মদ বক্সকেও যাহা বলিবার তাহা বলিলেন। জমাদার বরকন্দাজ কেহই বাকি রহিল না।

মাহাম্মদ বক্স নিরুপায় হইয়া ত্রস্তপদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। জমাদার, বরকন্দাজ, চৌকিদারগণও ‘ধব ধব’ রব করিতে করিতে দারোগা সাহেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল—সাহেবও ত্রস্তপদে ঘোড়া চালাইলেন।

প্যারীশ্রন্দরীর লাঠিয়াল পুনরায় বলিতে লাগিল, “ধম্মাবতার! আপনি রাজা আমরা প্রজা, আমাদিগকে নষ্ট করিবেন না। আজ ছাড়িয়া দিন। যোড়-হাতে গলায় কাপড় লইয়া বলিতেছি, আজ ফিরিয়া যাউন। আর আমাদিগেব সঙ্গে সঙ্গে আসিবেন না। কিছুতেই আমাদিগকে ধরিতে পারিবেন না। আপনি সমস্ত দিন এ-প্রকারে সঙ্গে সঙ্গে আসিলেও ধরিতে পারিবেন না।

মাজিষ্ট্রেট সাহেব সে কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। আর একটু ত্রস্ত হইয়া একেবারে লাঠিয়ালদিগকে ধরিবার উপক্রম করিলেন।

লাঠিয়ালগণ মধ্য হইতে উচ্চৈশ্বরে ডাক ভাঙ্গিয়া তখনি আনি বান্ধিয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল। “ভাই সকল! আর দেখ কি? বাঁচিবার আশা তো নাই। হাতে অস্ত্র থাকিতে রাখালের হাতে ধরা পড়িব, বড়ই দুঃখের কথা! সাহেব কিছুতেই যখন গুলিতেছেন না, আমাদেব কথা মানিতেছেন না। এত মিনতি, এত কাকুতি করিয়া বলিলাম, কিছুতেই যখন তাহার মত ফিরিল না, তখন জীলোকের ছায় কান্দাকাটি করিয়া মরি কেন? ধব দারোগা! ধব জমাদার বরকন্দাজ—নে মাথা, নে ঐ বেটার মাথা—একে একে দেখাইয়া দেই। আয় আমাদিগকে ধরিয়া নিয়ে যা। দেখি তোদের বুকের পাটা—দেখি তোদের বুকের সাহস। আয় বেটা! কেনীর গোলাম। হারামখোর আয়! ধব দেখি কাকে ধরিবি। আয়!”

মাজিষ্ট্রেট সাহেব ক্রোধে অধীর হইয়া মাহাম্মদ বক্সকে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন। “পাকড়ো পাকড়ো, পাকড়ো ডাকু লোককে পাকড়ো।”

মাহাম্মদ বক্স সাহেবের আজ্ঞায় একটু অগ্রসর হইলেনই মাজিষ্ট্রেট সাহেব

দেখিলেন যে, একজন লাঠিয়াল ঢাল মাথায় করিয়া ‘স্বি স্বি’ শব্দ করিতে করিতে আসিয়া মাহাম্মদ বক্সের বক্ষে সড়কি মারিয়া পিঠ পার করিয়া দিল। পলক ফেলিতে ফেলিতে আট গাছি সড়কি মাহাম্মদ বক্সের বুক, পেট পার হইয়া রক্ত মুখে বাহির হইল। অল্প দিকে আর একটি বরকন্দাজের মাথা লাঠির আঘাতে ফাটিয়া গেল। সাহেব সকলেব পাছে, কিন্তু চক্ষু সকলেব অগ্রে-চারিদিকে ঘুরিতেছে। নজর পড়িল—তিন, চারগাছা সড়কি তাঁহার মস্তক, বক্ষ লক্ষ্য করিয়া উঠিতেছে। সাহেব, মাহাম্মদ বক্সের অবস্থা দেখিয়াই একপ্রকার চৈতন্য হারাইয়াছেন। কোনদিকে কোন পথে যাইবেন, পথ খুঁজিয়া পাইতেছেন না। লাঠিয়ালের হস্তে প্রাণ যাইবে সেই ভাবনাই অধিক। সম্মুখে আর একজন বরকন্দাজ পড়িয়া গেল। সাহেব অশ্রুকে সজোরে কশাঘাত করিয়া চম্পট দিলেন না—প্রস্থানও করিলেন না রণে ভঙ্গ দিয়া পালাইলেন না। আত্মরক্ষা করিলেন। চক্ষের পলকে বাতাসের আগে আগে উড়িয়া বহুদূর আসিয়া পড়িলেন। জমাদার, বরকন্দাজ এবং চৌকিদারেরা লাঠিয়ালদিগের হাতে পায়ে ধরিয়া তাহার্য্যও আত্মরক্ষা করিল। কিন্তু মাহাম্মদ বক্সের মৃতদেহ লাঠিয়ালেরা ফেলিয়া গেল না। প্রায় পঞ্চাশ গাছা সড়কির আগায় গাঁথিয়া ডাক ভাঙিতে ভাঙিতে ‘মার মার’ শব্দে চলিয়া গেল। যেখান হইতে আসিয়াছিল সেইখানে চলিয়া গেল। দারোগার লাস লইয়া চলিয়া গেল।

মাহাম্মদ বক্সের মৃতদেহ প্যারীশুন্দরীর ভারলের কাছারিতে লইয়া গেলে, কার্য্যকারক মহাশয় ভীত হইলেন না। সাহসের উপর নির্ভর করিয়া কর্তব্যকাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু মুখে বলিলেন—‘সর্ব্বনাশ দারোগাখুন! বড় ভয়ানক কথা।’

লাঠিয়ালেরা বলিল, “দারোগাখুন সহজ কথা! যে বিপাকে পড়িয়াছিলাম যে ক্ষীণে আমরাদিককে আজ আপনি ফেলিয়াছেন, আর একটু থাকিলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবকেই এই অবস্থায় দেখিতে পাইতেন। কি করি প্রাণের দায় মহাদায়! বাহা হইবার হইয়াছে, এখন বাহাতে আমরা বাঁচি তাহার উপায় করুন। মাজিষ্ট্রেটকেও তাড়াইয়াছি। দারোগার দশা সাহেব স্বচক্ষেই দেখিয়াছেন। বাঁচিবার আশা যে আর নাই তাহা বুঝিয়াই আপাততঃ রক্ষার এক উপায় করিয়া আসিয়াছি মাত্র। আমরা বিদায় হইলাম। আর আমাদের দেখা পাইবেন না। এখন আপনাদের রক্ষার পথ আপনারা দেখুন। আমরা বিদায়। যদি প্রাণে বাঁচি হস্তুরে হাজির।

হইব। নতুবা এই শেষ দেখা—শেষ বিদায়। আমরা চলিলাম। এই কথা বলিয়াই লাঠিয়ালেরা ঢাল, সড়কি ফেলিয়া তখন চলিয়া গেল। কাছারি আঙ্গিনায় দারোগার মৃতদেহ পড়িয়া রহিল।

কাথাকারক মহাশয় কি করিবেন, কোথাকাব খুন কোথায় আনিয়া পড়িল। কাহার ঘাড়ে চাপিল। যাহারা খুন করিল তাহারা তো চম্পট। তাহাদের বাড়ি কোথা? কি নাম কাহারও জানা নাই। সকলেই অচেনা।

মাহাম্মদ বক্সের শরীর সহস্রথণ্ডে খাণ্ডিত হইয়া চাপাটগাছি বিলের মধ্যে নিষ্কিপ্ত হইল। প্রকাণ্ড বিল—কোথায় কোন মাছ বা কচ্ছপের উদরে গিয়া পড়িল, কে বলিতে পারে? কাল মাহাম্মদ বক্স পানেন—আজ মৎস্য-কচ্ছপের উদরে।

মাজিষ্ট্রেট সাহেব কুঠিতে আসিয়াই শুইয়া পড়িয়াছেন। নিদ্রার-কোলে অচেতন হন নাই। ভাবটা অচেতনেও। মনে মনে নানাচিন্তা, মাহাম্মদ বক্সের পরিণাম দশা—পরাধীনতার প্রত্যক্ষ প্রতিফল। চাকুবাব দ্বায়ে প্রাণ বিয়োগ—কি উপায়ে অপরাধীগণকে ধৃত করিয়া শাস্তি দিবেন, বোধহয় এই সকল চিন্তাই চক্ষু বুজিয়া করিতে ছিলেন। কিছুক্ষণ পবে জমাদার, বরকন্দাজ প্রভৃতি সঙ্গিয় লোকজন আসিয়া জুটিল—সাহেব সংবাদ পাইয়া শয্যা হইতে উঠিলেন। এবং জমাদারকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। “মাহাম্মদ বক্সের লাস কি হইল?”

জমাদার উত্তর করিল—ধম্মাবতার! লাস শূণ্ণে শূণ্ণে যে কোথায় লইয়া গেল, তাহার কোন সন্ধানই করিতে পারি নাই। নিজের প্রাণ লইয়াই পালাইয়াছি। লাসের শেষ অবস্থা কিছুই জানিতে পারি নাই।

মাজিষ্ট্রেট সাহেব একটু চিন্তা কবিয়া কুঠি হেঁফাজতে জমাদার বরকন্দাজ প্রভৃতিকে মতাইন বাখিয়া, তখন জিলায় যাইতে প্রস্তুত হইলেন। না—তখনই চলিয়া গেলেন।

ত্রয়োদশ তরঙ্গ

হাত বাজ

যাহার জগু চিন্তা—দিনরাত চিন্তা, কত কৌশল, কত পরিশ্রম করিয়া—ছিলেন, অধিকন্তু আরও শ্রম চেষ্টা করিতে প্রস্তুত ছিলেন, তাহা আর কিছুই করিতে হইল না। নিকটকে, সমুদায় দলিল-দস্তাবেজ সা গোলাজ্ঞের হস্তগত হইল।

খুসির সীমা নাই। অছিয়তনামা যে বাস্তব ছিল, সে বাস্তবটিও চুরি করিয়াছেন। কিন্তু স্বযোগ ও সময়ভাবে বাস্তবটি খুলিয়া দেখিতে পারেন নাই। এখন কি প্রকারে যথার্থ অছিয়তনামার লিখিত সঠিক ও নির্দিষ্ট অংশ বদলাইয়া ভাল অছিয়তনামা প্রস্তুত করিবেন, এই চিন্তাই সা গোলামের মাথায় ঘুরিতে লাগিল। রাত্রে দেবীপ্রসাদের বাটিতে যাইবেন। অছিয়তনামার বাস্তবটিও সঙ্গে করিয়া লইয়া দেবীপ্রসাদের সম্মুখে খুলিয়া অছিয়তনামা হইতে কোন কোন কথা পরিবর্তন করিয়া কি কি কথা বসাইতে হইবে তাহার পরামর্শ যুক্তি অণুই করিবেন। অছিয়তনামা ত্বরন্ত না হওয়া পর্যন্ত যেভাবে আছেন সেই ভাবেই থাকিবেন। কার্য্য সিদ্ধি হইলে নিজমুঠে ধারণ করিবেন, ইহাও মনে মনে স্থির করিয়াছেন।

ক্রমে সন্ধ্যা-ক্রমেই ঘোর অন্ধকার—রজনী সমাগত। কাহাকে হাসাইতে কাহাকে কান্দাইতে রজনী সমাগত। সংসারী মাত্রই সংসারের কার্য্য হইতে অবসর লইয়া বিশ্রাম, আরাম, ঈশ্বরে মন-নিবেশ করিলেন। মৌবসাহেবও সেতার, তবলা এবং প্রিয় মোসাহেব বসীরুদ্দিনকে লইয়া গান বাজ, হাসি-তামাসায় মন দিলেন। সা গোলাম আহা করিয়া সকালে সকালেই নিদ্রাভান করিয়া শয়ন গৃহে গমন করিলেন। বাড়ির অন্তরালক ক্রমে আহালাদ করিয়া আপন আপন নির্দিষ্ট বিশ্রামস্থানে চলিয়া গেলে—সা গোলাম উঠিলেন, এবং তাহার স্ত্রীকে বলিলেন যে, “আমি বিশেষ আবশ্যক জ্ঞাত বাহিবে যাইতেছি। আসিতে বিলম্ব হইবে।”

সা গোলামের স্ত্রী পূর্ব হইতেই স্বামীকে চরিত্র বিশেষরূপে জানিতেন। কোন উত্তর করিলেন না।

সা গোলাম বিশেষ গোপনে বাড়ি হইতে বাহির হইলেন। চুরি করা হাত বাস্তবটিও সঙ্গে লইলেন। বাড়ির বাহির হইতেই হাঁচি, টিকটিকি সকলি পড়িয়া গেল। কিন্তু তিনি সেদিকে দৃকপাতও করিলেন না। মাথায় চাদর জড়াইয়া, বাস্তব বগলে দাঁবিয়া দেবীপ্রসাদের বাটিতে উপস্থিত হইলেন।

দেবীপ্রসাদের চবিত্র ভাল ছিল না। সে সময় কেন অতি বৃদ্ধারস্বাভেও নিশাচরের গায় বাহির হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। সময়ে অনেক স্থানে ‘প্রহারেণ ধনঞ্জয়’ সঙ্করিতে হইয়াছিল, তত্রাচ স্বভাবের পরিবর্তন হয় নাই। দেবী—দিকি মাঝগোজ করিয়া বাহির হইতেছেন, এমন সময় সা গোলামকে দেখিয়া মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইলেন। এবং মায়া জানাইয়া ভালবাসা দেখাইয়া বলিলেন—

“আপনি কি পাগল হইয়াছেন? একা একা এতদ্বাঞ্জে বাটির বাহির হইতে আপনার কিছুমাত্র ভয় নাই? আপনার পায় পায় শব্দে, সর্বদা সাবধান সতর্কে থাকি চাই। রাত-দুপুর সময় একা, কি আশ্চর্য্য!”

স। গোলাম বলিলেন—“কি করি যে বোঝা মাথায় করিয়াছি, ভালয় ভালয় নামাইতে পারিলে হয়। কিছুতেই মনের শাস্তি নাই!”

দেবীপ্রসাদ বলিলেন—“নূতন আর কি কথা আছে যে, এতদ্বাঞ্জে?”

“না থাকিলে কি আসিয়াছি? এই দেখুন সেই অছিয়তনামার বাক্স। যদি খুলিতে পারি খুলিব না হয় ভাঙ্গিব। অছিয়তনামা দেখিয়া কোণায় কি পরিবর্তন করিতে হইবে, তাহা আজ রাত্রেই আপনাকে বলিতে হইবে।”

“এ বাক্স কাহার? এত মৌরসাহেবের বাক্স নয়।”

“বলেন কি? সেই বাক্স। আমি বহু পরিশ্রমে এই বাক্স হাতে পাইয়াছি।”

“তা যাইহউক, না খুলিলে আমি কিছুই বলিতে পারি না। এই দেখুন না ইহার নীচে কুইধরা। মৌরসাহেব এই বাক্সে অছিয়তনামা রাখিয়াছেন, আমার তো কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।

“এখনি দেখিবেন! এখনি সন্দেহ দূর হইবে। এই দেখুন আমি আপনার সম্মুখেই খুলিতেছি।”

এক গোছা চাবি বাহির করিয়া স। গোলাম কত চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই খুলিতে পারিলেন না। এসকল চাবি অনেকবাব লাগাইয়া দেখিয়াছেন। তত্রাচ দেবীপ্রসাদের সম্মুখে এক এক করিয়া লাগাইয়া দেখিলেন। একটিও লাগিল না। বাক্সও খুলিল না। শেষে বাক্স ভাঙ্গাই স্থির হইল। দেবীপ্রসাদ একখানি “দা” আনিয়া দিলেন। স। গোলাম অতি কষ্টে বাক্সটি ভাঙ্গিয়া যাহা দেখিলে, এবং যাহা পাইলেন, তাহাতে আর মুখে কথা সরিল না। মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

দেবীপ্রসাদ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—“সাহেব! দেখিলেন! বাক্সে কি আছে! “কাগজপত্রের নামও নাই। একদলা রুইর মাটি। বোধহয় বহুকালের পুরাতন কোন কাগজপত্র রুইতে থাইয়া একেবারে মাটি করিয়াছে। বাক্সের তলা উল্টাইয়া মাটির দলা ফেলিয়া দিলেন। তলাতেও স্থানে স্থানে ছিল, স। গোলামের

মুখেরভাব এক আকৃতিতে বোধ হইতে লাগিল যে, তিনি এ ভগতে 'নাই ঘেঁহটা' যেন অকারণে পড়িয়া আছে। এক প্রকার সংজ্ঞাহীন—কত কষ্টে, কত পরিশ্রমে, যে চুরি করিয়াছিলেন, তাহা তিনিই জানেন। এমন সাংঘাতিক বেদনা তাহার জীবনে অদ্ভুতব করেন নাই।

দেবীপ্রসাদ বলিলেন—“আর চিন্তা করিয়া কি করিবেন এবারেও ঠিকি-য়াছেন। সন্ধানী যথার্থ সন্ধান দিতে পারেন নাই।”

“কিসে যে কি হইল, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। ইহার কারণ কি? যে এই বাস্তবের সন্ধান দিয়াছিল, সে মিছে বলিবার লোক নয়।”

“সন্ধানীর দোষ না হইতে পারে, আপা-হ আন্ধারে ভুল করিয়াছেন! সোনা ধরিতে ছাই ধরিয়াছেন।”

স। গোলাম অপ্রস্তুতের একশেষ হইয়া মুহূৰ্ত্তে বলিলেন, আপনার কথাই ঠিক হইল। বোধ হয় আমিই ভুল করিয়াছি। যাহাউক রাত্রিও অধিক হই-য়াছে, আজকার মত বিদায় হই।

এই বলিয়া স। গোলাম যতনের ধন বাক্সটি বগলে করিয়া উঠিলেন। দেবী-প্রসাদও বক্ষা পাইলেন। তাহার প্রাণে ভবসার জল গড়াইতে লাগিল। স। গোলামের প্রস্থান তাহার গমন—

স। গোলাম ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছেন। সদর রাস্তায় আসিয়া দাঁড়া-ইলেন। নিকটেই গৌরীন্দী, গৌরীর স্রোত অবিরত বেগে কুমারখালির দিকে যাইতেছে। নদীতটে দাঁড়াইয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন। বাক্সটি গোপনে লইয়া আসিয়াছি—আবার এ ভাঙ্গা-বাক্স ফিরাইয়া লইয়া কি করিব। এই বলিয়া বাক্সটি গৌরীগর্ভে ফেলিয়া দিলেন এবং ভাবিতে ভাবিতে বাটি আসিয়া বিছানায় পড়িলেন। বালিসে মাথা দিলেন।

মৌবসাহেবের আমোদ তখনও শেষ হয় নাই। বসীকদ্দিন মাথায় পাগ বাধিয়া হাতে চামর ধরিয়া জারী আরম্ভ করিয়াছেন।

চতুর্দশ তরঙ্গ

মিসেস কেনীর বিলাত যাত্রা

টি. আই. কেনী. মাগুরা হইতে আসিয়া কুঠির অবস্থা সমুদায় শুনিলেন। কারোগার লাস পাওয়া যায় নাই, তাহাতে বড়ই দুঃখিত হইলেন। যাজিস্ট্রেট

সাহেবের বুদ্ধিকে শত শত ধিক্কার দিয়া হুঃখের সহিত বলিলেন—দারোগার লাস ছাড়িয়া দেওয়া নিতান্তই অত্যাচার হইয়াছে। মোকদ্দমাটি মাটি হইয়াছে। বাহা-হউক কিছুদিনের জন্য প্যারীসুন্দরী মাথা নোয়াইয়া থাকিবেন। কুঠি লুটের মোকদ্দমা এ পর্যন্ত শেষ হয় নাই। তাহার পর আবার এই ঘটনা। এ মোকদ্দমার সাক্ষী প্রমাণের তত আবশ্যক হইবে না। স্বয়ং মাজিস্ট্রেট সাক্ষী। প্যারীসুন্দরীকে জব্দ করিতে আব বেশি চেষ্টা করিতে হইবে না। কোম্পানী বাহাদুরই এখন বাদী। দারগা খুন, কম কথা নয়। মোকদ্দমার খোঁজ খবর রাখা তদন্ত করা, আসামীগণকে ধরিয়া থানাদারের হাওয়ালা করাই এখন আমাদের কার্য। নায়েব, দেওয়ান বাহাকে বাহা বলা আবশ্যক মনে করিলেন বলিয়া “প্রাইভেট কমে” গুপ্ত কক্ষে যাইয়া বার দিলেন। মামলা-মোকদ্দমা বিষয়াদি এবং নীল বেশমের অধিক আবাদ সম্বন্ধে নানা প্রকার চিন্তা ও মনে মনে বাদান্তবাদ করিয়া বাহা স্থির করিলেন মনেই রাখিলেন। এসকল চিন্তার পর একটি বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। মনে মনে অনেক তর্ক-বিতর্কের পব সাবাস্ত হইল। মিসেস কেনীকে আপাততঃ বিলাত পাঠান কর্তব্য। মেমসাহেবকে স্থানান্তর করিলে প্রধান একটি চিন্তা হইতে অবসর হওয়া যাইবে। বিশেষ—অন্য আর একটি চিন্তারও সুবিধা হইবে।

কেনী মনে মনে “মনের কথা” স্থগিত করিয়া মেমসাহেবের নিকট বলিলেন। “প্যারীসুন্দরীর টাকা অনেক, জমিদারীও আমার অপেক্ষা অনেক বেশি, বুদ্ধিও বেশি, সাহসও বেশি। জমিদাবেব মেয়ে জমিদাব, তাহার কথাই স্বতন্ত্র। সে বাহা বাহা বলিয়াছে, তাহা করিতে বিশেষ চেষ্টা করিবে। দুবার তিনবার ঠকিলে কি ফেল করিলে, পারিয়া না উঠিলে যে কখনই পারিবে না, একথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না।”

সেখানে অন্য লোক আব কেহই ছিল না। তত্রাত কেনী, মিসেস কেনীর সহিত অতি মৃদু মৃদু স্বরে অনেক কথা বলিলেন। মাঝে মাঝে মেমসাহেবের চেহারা আনন্দ আভা চমকিতে লাগিল মুখেও ফুটিল “হোম”—

“হোম” যে কি জিনিস, “হোম” কথাটি যে কত মিষ্টি তাহা বিলাতী অন্তর না হইলে আমাদের অন্তরও বরাবর সাধা নাই। আমরা বাঙ্গালী, আমাদের হোমকে আমরা কেবল পদতলেই দলিত করিতে শিখিয়াছি। কি প্রকারে পূজিতে

হয় তাহা জানি না। এই হোমই যে, স্বর্গস্থ ভোগ করা যায়, তাহাও স্বীকার করি না। এই ঝড়, জঙ্গল, জলে ডোবা, সৈঁত সৈঁতে, কুঁড়েঘর শোভিত হোমই যে, পবিত্র স্বর্গ হইতে গরিয়সী, তাহাই বা কয়জন মনে করি। সামান্য কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, প্রভৃতিরও “হোম” মায়া আছে। হোমেব প্রতি যত্ন আছে, আদরও আছে। বিলাতী হৃদয়ে থাকিবারই তো কথা। আমরা নিমকহাবাম, আমরা কৃত্রিম, তাহাতেই এই দশা। আমরা বাঙ্গালী প্রায়ই মা বাপের মধ্যাদা বুঝি না। স্থপুত্র বলিয়াই হোমের কুছা, হোমের গ্রানি, হোমটা একটা “নেষ্টী প্লেস, বাঙ্গলা-দেশ পায়খানার সামিল” অধঃপাতে যাক—আমরা স্বাধীন। ধর্ম, কর্ম, সমাজ যথেষ্টরূপ ব্যবহার কবিত্তে পারি, আমবা স্বাধীন। আমাদের মন স্বাধীন। হোমের আবার নির্দিষ্ট কি? জগৎময় হোম। সমৃদ্ধ জগৎ আমাদের হোম। কনষ্টাণ্টিনোপল কি আমাদের নহে? সেন্টপিটার্সবার্গ কি আমাদের হোম নহে? হোম কি আমাদের হোম নহে? যে দেশ, যে স্থান ভাল সেই আমাদের হোম।

এ তো লাক কথার এক কথা, একথাব উক্তব নাই! আমি উদ্দাসীন পথিক। মনের কথা বলিতেছি। —এ জগতে আমাব কেহই নাই, সেকথা আগেই বলিয়াছি। ধরিবার লক্ষ্য নাই, পা বাধিবাব স্থান নাই। ইহার পবেও সময় সময় অনেকের নিকট পাগল সাব্যস্ত হইতে হয়। এ অবস্থাতেও পার্ক! হোমেব জন্ম পথিকের প্রাণ কাঁদে।

অনেক বাজে কথা বলা হইল। মিসেস কেনী হোমের নামেই গলিয়া পড়িলেন। তবে এখানেও অনেক স্থখ, সেখানেও অনেক স্থখ। বেশীর ভাগ জন্মভূমি।

হোমের আলাপেই মিসেস কেনী গলিয়া পড়িলেন। প্রাণ থলিয়া স্বামী-মুখ চুখন করিলেন। বিশেষ আদরের প্রতিদানও পাইলেন। বিলাত যাওয়া স্থির হইল। মিসেস কেনীর বিলাত যাত্রার কথা পাকা হইয়া দাঁড়াইল।

প্রভাতে সকলেই শুনিল মেমসাহেব বিলাত যাইতেছেন। বজ্রার দাঁড়ি, মাগি, সাজ-সরঞ্জামসকল সংগ্রহ হইল। পাঁড়ে, দোবে, চোবে, সিং, চার জওয়ান নোকা বন্ধক হইয়া চলিল। মিসেস কেনী বেলা বার টার সময় কলিকাতা যাত্রা করিলেন। কলিকাতা যাইয়া বজরা বিদায় দিবেন জাহাজে চাপিবেন।

মেমসাহেব বিলাত যাত্রা করিলেন টি. আই. কেনী তিন দিবস শয়নগৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন না। কোন কাজকর্মও দেখিলেন না।

মামলা-মোকদ্দমার কথাও কিছু শুনিলেন না। সন্ধান নিলেই জানা যায় যে, সাহেব “শোয়ার কামরায়।” কার্যাকারকগণ অনেক তর্ক-বিতর্কের পর সাব্যস্ত করিলেন, মেমসাহেব বিলাত গিয়াছেন, তাহাতেই সাহেবের মন ভাল নাই।— কাজকামের দিকে তত মন নাই।

সাহেবের মন ভালই থাক আর যাহাই থাক, তিনদিন তিন-রাত্রের পর কেনী সাংসারিক কার্যে মন দিলেন। কুঠিব লোকে দেখিল সাহেব নীচে নামিয়া ফুলবাগানদিক যাইয়া পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছেন। “পাইপ” চলিতেছে।

কেনী শুধু পায়চারি করিতেছেন না। মনের কথা মনেই তুলিতেছেন, মনেই আলোচনা, মনে মনেই মীমাংসা করিতেছেন।

প্যারীসুন্দবীর সহিত মোকদ্দমা চলিল। মোকদ্দমার ফলাফল দেখিয়া পরে অণু কথা। পাংশার ভৈরববাবু, নলডাঙ্গার রাজা, নড়ালের রতন রায়, এই তিনটিই এখন দেখিতেছি। কিন্তু ইহাদের সহিত লাঠালাঠি, মারামারি নাই। আইন-আদালতের মাঝপেঁচে আমাকে জব্দ করিবেন, তারই যোগাড় হইয়াছে। চলুক—কিন্তু মারামারি, লাঠালাঠি না হইলে মনের ফুর্তি হয় না। আমি প্রস্তুত, কিন্তু তাহা বা কেহই ওপথে যাইতে চাহে না!

ভৈরববাবু ভাবী চতুর! কিছুতেই দাঙ্গা-হাঙ্গামায় ভেড়ে না। বাবুকে বলে আনার জন্ত এত চেষ্টা করিলাম, কিছুতেই কিছু হইল না। নিকটে নয় কি করি। আচ্ছা এবারে একহাত বাবুর সহিত খেলাইতে হইবে।

কেনী পায়চারী করিতেছেন। একবার দক্ষিণমুখী হইতেছেন, আবার ফিরিয়া উত্তরদিকে যাইতেছেন। একবার দেখিলেন, হরনাথ কতকগুলি কাগজ-পত্র হস্তে করিয়া বাগানের প্রবেশদ্বারে দাঁড়াইয়া আছে। সাহেবের নজর পড়িতেই হরনাথ প্রায় মাটি পর্য্যন্ত মাথা নোওয়াইয়া সেলাম বাজাইলেন। কেনী ইঙ্গিতে হরনাথকে ডাকিলেন। হরনাথ বাগানের মধ্যে আসিয়া পুনরায় দস্তরবস্ত সেলাম বাজাইয়া খাড়া হইলেন। কথা চলিল—

মোকদ্দমার কথা—খুনী মোকদ্দমার কথা, লুটের মোকদ্দমার কথা, রাজার কথা, নড়াইলের কথা, নানা কথা চলিতে লাগিল। হরনাথ সাহেবের পিছে পিছে হাঁটিতে লাগিলেন। তাহার হাওয়া খাওয়া—ইহার প্রাণে মরা পঠক! আমরা নিজের বাঙ্গালী, হাওয়া খাইতে ভালবাসি না। ঘরে বসিয়া কেবল

বাতাস খাইতে বড়ই ভালবাসি। হরনাথের গা দিয়া ঘাম ছুটিল। কেনী একটুকথায় রাগিয়া দাঁড়াইলেন। হরনাথ বক্ষা পাইল।

কেনী বলিতে লাগিলেন—“আমি ভয় করি না—আমি তোমার বাঙ্গালার সকল ভেদ বুঝিয়াছি। বাঙ্গালার—সাহস, বল, বিক্রম সকল জানিয়াছি। বাবুকে একবার দেখা চাই। তোমরা আমাকে এইমাত্র খবর দিবে যে, অমুক তারিখে ভৈরবাবুর জমিদারীর সদর খাজনা অমুক পথে যশোহর রওয়ানা হইল। আর আমি কিছুই চাই না। এই খবরটি চাই মাত্র।”

হরনাথ যে আজ্ঞা, যে হুকুম হুকুরের, আবার সেলাম বাজাইয়া বাগানের বাহির হইলেন। সাহেবও শয়নকক্ষে ঢুকিলেন।

পঞ্চদশ তরঙ্গ

পাঠক বিরক্ত হইবেন না। একটু ধৈর্য্য ধরিয়া পথিকের মনের কথা শুনিয়া যাইবেন। এ কথার বাঙ্গুনী, মিল-গরমিলের দিকে আঁধো লক্ষ্যই নাই। মনের কথা, তাই আবার কানে শোনা। সে শোনাও সেই ছোটবেলায়। অসংলগ্ন, ভুল ভ্রান্তি হওয়াই সম্ভব। যেখানে সন্দেহ, যেখানে গরমিল বোধ করেন, দয়া করিয়া নিজগুণে সংশোধন ও সংলগ্ন করিয়া লইবেন। মনে হয়?—পোষাপাখির কথা মনে হয়? জকি গাউওয়ানের পোষাপাখি। বুলি ধরিয়াছে, বেশ কথা কয়—মনে হয়? কেনী যে কথাটা শেষে বলিয়াছিলেন মনে আছে? “উচিং মূল্য দিয়া আনিবে, সকের জিনিস জবরানে লইব না।”

পাখিটাব কি হইল? জকি সম্মত হইয়া দিল—কি জবরানে আনা হইল, সে কথা এ পর্যন্ত মুখে আনি নাই। কিছু আভাষ প্রথম তরঙ্গে দিয়াছি। মার্জনা করিবেন, সময় পাই নাই।

ভাকে খবর আসিল—মিসেস কেনী নির্বিঘ্নে কলিকাতায় পৌঁছিয়া জাহাজে উঠিয়াছেন। কেনী একদিকে নিশ্চিন্ত হইলেন। মেমসাহেব ক্রিয়য়া আসিতে আসিতে এদিকে প্যারীসুন্দরী টিকিবেন কি না? তাহাতেই সন্দেহ! ইহাতে কার বালা কে পরায়? আর কার শাড়ী কে পরে?

টি. আই. কেনী নিয়মিতরূপে বিষয়াদির কার্য করেন, এবং প্রায় সকল সময়ই কুঠিতে থাকেন। ডিহি দেখিতে আর—কুঠির বাহির হন না। আফিস-দালানে বসিয়া মাংসলা-মোকদ্দমার পরামর্শ করিতে করিতে, বিষয়াদির কাৰ্য্যে

দেখিতে দেখিতে হঠাৎ উঠিয়া যান। কিছুক্ষণ শয়নঘরে থাকিয়া আবার আফিস-ঘরে আইসেন। দশ পোনেব মিনিট অতীত না হইতেই পুনরায় শয়নকক্ষের দ্বিবে ছুটিয়া যান। কেন জান? তিনিই জানেন। কেন তাহার মন এত উতাল তিনিই জানেন।

অদৃষ্ট ফিরিতে কতক্ষণ? প্রভুর অমুগ্রহ পাত্র হইলে, তাহার অদৃষ্ট ফিরিতে কতক্ষণ? জকি গাড়ী চালাইত, কলি, মজুরের সঙ্গে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিত। এখন তাহার কপাল ফিরিয়াছে। জকি এখন আর গাড়ি ওয়ান নাই, এক ময়নাই জকির সকল দুঃখ ঘুচাইয়াছে।

মিসেস কেনী কুঠিতে থাকিতে জকিকে কেহ কুঠির হাতায় দেখে নাই সেই গাড়ীর আড্ডায়।

এখন দিন দিন জকির উন্নতি—কপালের জোরে ক্রমে ক্রমে সাহেবেব ঘবেব কার্যে নিযুক্ত হইল। সকলেই ভুলিল, জানিল এবং দেখিল, সাহেব জকিকে বড়ই ভালবাসেন। সাহেবেব ইস্তক বন্ধনশালা, লাগাদ শয়নকক্ষ, সকল স্থানেই জকিব সমান অধিকার! সোনাউল্লা যে এত বিশ্বাসী খানসামা ও পুবাঁতন চাকর, সময়ে সময়ে জকি তাহাকেও কটু কথা কহিতে ক্রটি করে না। সাহেবেব পেয়ারের চাকর বলিয়া সোনাউল্লা কিছুই বলে না। ক্রমে জকির নাম জাঁকিয়া গেল। যে জকিকে কুঠির আমীন, তাগাদগীর, পাদা পাইক বা ইচ্ছা তাই বলিয়াছে, এখন বড় বড় আমলা—বড় বড় লোক জকির নামে চমকিয়া উঠেন। যে দেখে, জকির সহিত যাহার দেখা হয়, সেই আদর করে, ভালবাসে।—কেমন আছ জিজ্ঞাসা করে—মায়া দেখায়, মমতা জানায়। সময় সময় কাহা উদ্ধাবের জন্য জকিকে কেহ কেহ সেলামীও দেয়।

জকি, সাহেবেবের নিকট বলিতে পাক্ক বা না পাক্ক, সাহেবেবের অমুগ্রহ ও ভালবাসা সকলেরই বিশ্বাস যে, জকি বাহা বলে, সাহেব তাহাই শুনে। অল্প-দিনের মধ্যে জকির কপাল একেবারে ফিরিয়া গেল। জকি বাহা বলিত প্রায়ই তাহা হইত। জকি বলিল, উহার চাকুরী বাইবে, রাত্র প্রভাত হইতে না হইতে সাহেবেবের অর্ডার পাশ হইল। নির্দোষী বেচারীর চাকরী গেল। জকি বলিল আজ ঐ আমীন বেটার পিঠের চামড়া উঠাইব, সূখ্য ডুবিতে না ডুবিতে আমীন মহাশয়ের পিঠে চাবুক পড়িল, চামড়াও উঠিল। দেখিয়া শুনিয়া জকির নামে

অনেকেই কাঁপিতে লাগিলেন। এখন যা করে জকি।—আমীন, ভাগ্যদগীসি, খালাসী, পাইক, বরকন্দাজ, প্যাঙ্গা, বাবুরচি, খানসামা, খেদমতগার জকির জালায় অস্থির হইয়া পড়িল। জকি অনেক সময় প্রধান প্রধান কার্য্যকারকদিগের প্রতিও হুকুম চালাইত। তাহারা মান-সম্মত বজায় রাখিতে বাধ্য হইয়া জকির হুকুম তামিল করিতেন।

দিন দিন জকিব অবস্থা পরিবর্তন হইতে লাগিল। বাটিতে বড় বড় ঘর উঠিল। বাঁশের খুঁটি উঠিয়া শাল কাঠের খুঁটি হইল। ভাল ভাল গরু ও ভেড়াতে গোশালা পরিপূর্ণ হইল। প্রতিবেশীরা শেষে গ্রামস্থ লোকেরা সকলেই জকিকে ভালবাসিতে লাগিল। সদাসৰ্কদা জকিব বাটিতে লোকের গতিবিধি, আমোদ-আহ্লাদ, লেনা দেনা, কথাবার্তা, পবামর্শ চলিতে লাগিল। যে জকি এক কাঠা ধানের জন্ত মহাজন বাড়িতে ছালা পাতিয়াছে। আজ মনিবের ভালবাসায়, গোলাভরা ধান, বাস্তুভরা টাকা। কত লোককে ধান কর্জ দেয়, টাকা কর্জ দেয়। জকি এখন মহাজন। ইচ্ছাধীন চাকুবী। পরিবার মধ্যে এক স্ত্রী। যে কারণেই হউক জকি আবার বিবাহ কবিতে ইচ্ছা করিল।

জকির ময়না বেশ কথা কয়। মানুষের মত কথা কয়—কান পাতিয়া কথা শুনে। কথার উত্তর করে। এ বিবাহের কথা শুনিয়া কিছুই বলিল না।

জকিব বিবাহেব সম্পূর্ণ ব্যয় সাহেব দিলেন। সাহেবই ভালবাসিয়া আবার বিবাহ দিতেছেন, কুঠির লোকে এই বলিতে লাগিল। এক বলিতে দশজনে রাজি হইল। সতীনের ঘর বলিয়া কেহই কোন আপত্তি করিল না। সপ্তাহ মধ্যে বাজি বাজনায়ে, জকির বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের খাওয়া দাওয়া বিদায়, ইত্যাদি গোলযোগ মিটিয়া গেল। একদিন টি. আই. কেনী জকিকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, যে আজ হইতে তোমার অগ্র কাজ আর কিছুই করিতে হইবে না। কেবল আমার হাতি, ঘোড়া, গরু ইত্যাদির তদারক করিবে। আর ইহাদের দানার বন্দোবস্ত তোমার হাতে থাকিবে। স্ত্রীবিধা মত প্রতিদিন কোন সময়ে একবার কুঠিতে আসিয়া হিসাবমত দানা বাহির করিয়া মাহত ও সইসের জেদা করিয়া দিয়া যাইবে। আর কোন কার্য্য করিতে হইবে না। সেই হইতে জকি দুই এক দিন পর কি সপ্তাহে একদিন কুঠিতে যাইয়া দানা বাহির করিয়া দিয়া আসিত। আর কোন সময় কুঠিতে বাহিত কি না তাহা কেহ বলিতে পারে না। একদিন জকি

কুঠি হইতে আসিতেছে, বাটির নিকটেই জকির খুড়তুত ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হইল। তাহার নাম কি আমরা জানিতে পারি নাই, পূর্বে এক বাড়িতেই ছিল, এক্ষণে সুন্দরপুর প্যারীসুন্দরীর এলাকায় বাড়ি করিয়াছে। জকি বহুদিনের পর ভাইকে পাইয়া খুব খুশি হইল। বাটিতে লইয়া গিয়া হাত, পা ধুইবার জল আনিয়া দিল। ভাল একটি মাদুর ও পরিষ্কার একখানি কাপা ও একটি বালিশ আনিয়া বাহির-বাটিরঘরে বিছানা করিয়া দিল। জকির বাটিতে ডাবা-ভ্রুকার অভাব ছিল না। তামাক সাজিয়া একটা নিজে খাইতে খাইতে আসিল, আর একটি ভাইয়ের হাতে দিয়া দুই ভাইতে কথাবার্তা চলিল। অগ্ন্যান্ত রুখক হইতে জকির অবস্থার উন্নতির সহিত খাণ্ডাখাণ্ডেরও অনেক উন্নতি হইয়াছে। ঘরে খাণ্ড-সামগ্রীর অভাব নাই সকল সময় খাজা, বাতাসা, চিড়ে, মুড়কি, গুড়, দুধ সকলি থাকিত। ঐ সকল জিনিসে ভাইকে জল খাওয়াইয়া সন্ধ্যার পরেই ভাতের যোগাড় করা হইল। দুই ভাই একত্রে আহার করিয়া অনেক কথাবার্তা পব, আগন্তুক ভ্রাতা প্রত্যাশেই বাড়ি যাইবে বলিয়া বিদায় হইয়া বহিল।

দুইদিন পর জকি ছোট ঠাক বাটির কাজকর্মের কথা বলিয়া শেষে বলিল যে, আমি ভাইয়ের বাড়িতে সুন্দরপুর যাইতেছি। বাড়ির কাজকর্ম দেখিয়া করিও। ভাইয়ের বাড়ি আজ যাইতেছি, দুই-এক দিন বিলম্ব হইতে পারে। এই কথা—ছাতা, লাঠি লইয়া রঙ্গিন গামছাখানা কাঁধে করিয়া বাটির বাহির হইল। দুইদিন চলিয়া যায়, জকির খোঁজ খবর নাই। কুঠির ঘোড়া গরুর দানা বন্ধ। কারণ জকির হাতেই দানার ঘরের চাবি। জকির বাটি পর্যন্ত খোঁজ করা হইয়াছে। জকির সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কুঠির লোকে জকির বাহিরবাটি হইতেই জিজ্ঞাসা করে। কেহ বাটির মধ্যে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হয় না। সর্দার, পাইক, মুখা, বরকন্দাজ, প্রভৃতির অগ্ন্যান্ত বাজে চাকরের বাটির উপর জোর জব-রানে চলাফেরা করে—জকির বাটির উপর গিয়া বড় করিয়া কথা কহিতে কাহারও সাহস হয় না। জকি বাটিতে নাই এ-স্থির করিয়া শেষে সাহেব পর্যন্ত খবর হইল যে, জকি বাড়িতে নাই। কোথায় গিয়াছে কেহ বলিতে পারে না। দুইদিন যায় কোন খবর নাই। গুদাম বন্ধ, দানা বাহির করার কোন উপায় নাই। ঘোড়া, গরু মারা পড়িল।

টি, আই. কেনী. বলিলেন—জকি যেখানে গিয়াছে আমি জানি, গুদামের

চাবি বোধহয় তাহার বাড়িতেই বাখিয়া গিয়াছে। চাবি আনিয়া ওদাম খুলিয়া দেও। জকিকে জব্দ করিবার আশায় যাহারা সাহেব পর্যন্ত এতলা দিয়াছিল তাহারা বড়ই অপ্রস্তুত হইল।

পরদিন জকি বাটি আসিয়া বাটির কাজ কাম দেখিয়া কুঠিতে যাইয়া আপন কর্তব্য কার্য্য করিয়া আসিল। জকির বিরুদ্ধে সাহেবের নিকট কোন কথা কহিতে কেহই আর কোমদিন সাহসী হইল না।

জকি তিন চারদিন বাটিতে থাকিয়া কোথায় চলিয়া যায়। সুন্দরপুর হইতে কুটুম-স্বজনও প্রায়ই আসা যাওয়া করে। গোপনে গোপনে অনেক পরামর্শও হয়। এই সকল দেখিয়া ময়না ভারি চটিয়াছে। লোকজন চলিয়া গেলে মিষ্টি মিষ্টি রাগের সহিত বলিতে লাগিল। “এত ঘন ঘন ভায়ের বাড়িতে যাওয়া ভাল হইতেছে না। মারা পড়িবে।” তাহাতে জকি যে উত্তর করিল, তাহা শুনিয়া ময়না মাথা হেঁট করিয়া বহিল।

ষোড়শ তরঙ্গ

ভয়ানক ব্যাধি

ব্রাহ্ম জাগরণেই হউক কি অজ্ঞ কোন অনিয়মেই হউক মীরসাহেব পীড়িত হইলেন। পীড়ার কয়েকদিন পূর্বে রাত্রে দুগ্ধপান করিতে দুগ্ধের স্বাদ-বিস্বাদ-বোধে সে দুগ্ধ পান না করিরা ফেলিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সেই হইতে শরীর অসুস্থ, ক্রমে জ্বর, ভয়ানক জ্বর—একেবারে চৈতন্যরহিত। মীরসাহেব বাহির দালানের কুঠিরীতে পড়িয়া ছটফট করিতেছেন। মাস্তান, বিনোদ বিপ্লবাসী চাকর, তাহারা নিকটে আসেন না। একমাত্র গরিবুল্লা! যথাসাধ্য মনিবের সেবা-শুশ্রূষা করিতেছে। বাড়িপোরা লোকজন, কেহই তাহাব দিকে ফিরিরা তাকাই না। কি মনে করিয়া যে, মনিবের পীড়ার সময় সেবা-শুশ্রূষা করিতে নারাজ, তাহা তাহা-রাই জানে। একা গরিবুল্লা কি করিবে? বাটির অজ্ঞাত লোকজন স্বচ্ছন্দে “খানা-পিনা” করিয়া বেড়াইয়া বেড়ায়। বাড়িতে সে একটি পীড়িত লোক আছে—সে কথা কাহারও মনে আছে ভাবে একপাশে বোধ হয় না। কেবল বসীকুদ্দিন সদা সর্ব্বদা দেখাশুনা করে। সা গোলাম বসীকুদ্দিনকে দুই চক্ষে দেখিতে পারে না। বসীকুদ্দিনের দিকে নজর পড়িলেই মুখ ফিরাইয়া অজ্ঞদিকে ঘুরিয়া বসেন। বাটির কর্তব্য-ব্যক্তির কুদৃষ্টি হইলে কয়দিন কে টিকিতে পারে? বিশেষ বসীকুদ্দিন যাহার

বলে সা গোলামকে গ্রাহ্য করিতেন না, যে দাঁত কিচিরমিচির ভয় করিতেন না, তিনি শয়্যাগত পীড়িত। উঠিবার শক্তি নাই, বসিবার শক্তি নাই, কথা বলিবার শক্তি নাই, তাঁব কথা কে শুনে। বিশেষ নূতন আমল প'লে, পুরাতনে প্রায়ই লোকের ঘৃণা হয়। কোন দোষ না থাকিলেও, একটু বেশি পরিমাণ আদর পাবার লোভে, সাচা, মিচা, হক, নাহক সাতকথা বলিয়া মন হইতে তফাত করিতে চেষ্টা করে। এ গুণটা প্রায়ই মোস্তা-খোডা জ্ঞাতি—কুটুম্ব এবং বাড়ির চাকর-চাকরাণী ও দাস-দাসীর হইয়া থাকে।

দিন দিন পীড়ার বৃদ্ধি, কষ্টের একশেষ। রোগির পথ্য, সেবা-শুশ্রূষার প্রতি কাতারও দৃষ্টি নাই। কে প্রস্তুত কবে, কে চেষ্টা কবে, কেইবা যত্ন করে, কেইবা কার কথা শুনে? সা গোলাম মাঝে মাঝে দেখিতে আসিতেন, কিন্তু রোগির আপাদমস্তক একধানে চক্ষু পাতিয়া দেখিতেন। নাড়ি-জ্ঞান ছিল কিনা জানি না। সা গোলাম মনের ব্যাগ্রতায় কোন কোন দিন ঋন্তুকের হাত ধরিয়া নাড়িব গতি দেখিতেন।

টি. আই. কেনীও শুনতে পাইলেন যে, মীরসাহেব অত্যন্ত পীড়িত। হাতিতে চাপিয়া, মীরসাহেবকে তখনই দেখিতে আসিলেন। সেদিন মীরসাহেব একটু ভাল। কেনী আসিয়া দেখিলেন, সা গোলাম একজন কবিরাজের ঔষধ মীরসাহেবকে খাওয়াইতে জিদ করিতেছে—মীরসাহেব খাইবেন না, কবিরাজের ঔষধ খাইবেন না বলিয়া ঔষধ খাইতে অস্বীকার হইতেছেন। সা গোলাম কত অমুনয় বিনয় করিতেছেন। মীরসাহেবের পীড়া শীঘ্র শীঘ্র আরাম হওয়ার জন্ত সা গোলাম বড়ই ব্যস্ত। টি. আই. কেনী চিকিৎসা শাস্ত্র ভালই জানিতেন। নানা প্রকারের ঔষধ তাহার কুঠিতে থাকিত। কোন পীড়িত ব্যক্তি ঔষধ চাহিলে বিনামূল্যে দান করিতেন। কেনী মীরসাহেবের হাব ভাব, চক্ষু দেখিয়া কি পীড়া, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেন না। পীড়ার প্রথম অবস্থা এবং এ পর্যন্ত কি কি ঘটিয়াছে কি প্রকার চিকিৎসা হইতেছে, সমুদয় বৃত্তান্ত মনোযোগের সহিত শুনিলেন। কেনীর মুখে ভাব দেখিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণ সকলেই বুঝিল যে, মীরসাহেবের পীড়ার ভালরূপ চিকিৎসা হইতেছে না। ইহা ভিন্ন মাঝে আঁর কি বুঝিবে কেনী অনেকক্ষণ পর্যন্ত সা গোলামের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কোন কথা বলিলেন না। কিছুক্ষণ পরে মীরসাহেবকে বলিলেন—আপনি কোন চিন্তা

করিবেন না। আমি আপনার ঔষধ করিব। কুঠিতে গিয়াই আপনার ঔষধ পাঠাইব। আমি জ্বরের কথা শুনিয়া কয়েকটি ঔষধ সঙ্গে আনিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি আপনার এ-জ্বর ভয়ানক জ্বর, বিষাক্ত জ্বর, আর ভয় নাই। আরাম পাইবেন। আজ যে ঔষধ পাঠাইব, তাহা খাইলেই বুঝিতে পারিবেন যে, আমার ঔষধে আরাম পাইবেন কি না। আমি আপনাকে বার বার নিষেধ করিতেছি কাহারও ঔষধ খাইবেন না, আমি এখনি ঔষধ পাঠাইয়া দিব। যে যে নিয়মে পান করিতে হইবে তাহাও পত্রে লিখিয়া পাঠাইব। টি. আই. কেনী এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

সাঁ গোলামের মনের আশা পূর্ণ হইল না। যে নূতন চাল চালিয়াছিলেন, তাহাতে কিস্তিমাত হইল না। কেনীর ঔষধ ভিন্ন মীরসাহেব আর কাহারও ঔষধ খাইবেন না। সাঁ গোলাম স্বয়ং কমল কবিরাজের বাড়িতে গিয়া যে যে ঔষধের যোগাড় করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহা কবিরাজের পুঁটুলিতেই রহিয়া গেল। প্রাণ বাঁচিল, টাকাও থাকিল। উপস্থিত ঘটনায় সাঁ গোলাম মনে মনে হাসিলেন কি কান্দিলেন, তাহা তাহারই মনে জানে। প্রকাণ্ডে সকলের নিকটেই বলিলেন—ঔষধ না খাইলে আর আমি কি করিব! কমল কবিরাজের মত কবিরাজ বোধহয় এদেশে আর নাই। তারই ঔষধে যখন তাঁর ঘুণা, তখন আর ভরসা নাই। সাহেবের ঔষধ কত ভাল হয় দেখতে পারবেন। সাঁ গোলাম কমল কবিরাজকে অনেক কথা কহিয়া বিদায় করিলেন। একটি টাকা দর্শনী দিলে কবিরাজ মহাশয় আর দুটি কথা বলিতেন না। সাঁ গোলাম খুন্সুরের খাতিরে একমুঠো টাকা কবিরাজের হাতে দিয়া, কবিরাজ বিদায় করিলেন। ব্যবস্থা লওয়া হইল না, ঔষধও গ্রহণ করা হইল না। একমুঠো টাকা দিয়া কবিরাজ বিদায় করিলেন।

টি. আই. কেনীর প্রদত্ত ঔষধ বসীফুদ্দিন মহাযত্নে মীরসাহেবকে সেবন করাইলেন। এতদিনের পর ঔষধ সেবন-মাত্রই চক্ষে নিদ্রা আসিল, ঘোর-নিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন।

সাঁ গোলাম এতদিন নিশ্চিন্ত স্বপ্নে নাই। মীরসাহেবের বাস্তু, পেটারী ও সিন্ধুক মাক্কন-বিনোদের সাহায্যে তন্ন তন্ন করিয়াছেন, কোন স্থানেই অছিয়ত-নামা প্রাপ্ত হন নাই। খুঁজিতে আর বাকি নাই। শেষে মীরসাহেবের পীড়ার কিঞ্চিৎ উপসম হইলে, সাঁ গোলামের মনে হইল যে, হা! এত স্বযোগ পাইয়াও

তাহার হাতবান্ধটি খুঁজিলাম না কেন? যদিও বান্ধটি মীরসাহেবের নিকটেই থাকে, চেষ্টা করিলে অবশ্যই দেখিতে পারিতাম। তাহার মধ্যে কি আছে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে পারিতাম। এইক্ষণে সে উপায় আর নাই। ক্রমেই স্বস্তি হইতেছেন। হাতবান্ধের কাছে যায় কে? একটি কথা—সামান্য হাতবান্ধ মধ্যে যে ঐ মহামূল্য দলিল রাখিয়াছেন, তাহাই বা কি করিয়া বিশ্বাস করি।

অচিয়তনামার চিন্তাই—সা গোলামের প্রধান চিন্তা। মীরসাহেব দিন দিন স্বস্তি হইতে লাগিলেন। চাকরেরাও কিছু কিছু করিয়া নিকটে আসিতে আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে সপ্তাহ-মধ্যে একেবারে নিরোগ হইয়া কার্য্যক্ষম হইলেন। কেনী প্রতিদিন মীরসাহেবের খবর লইতেন। ক্রমেই ভালকথা, ভাল-খবর, একেবারে নিরোগ হইয়াছেন শুনিয়া একদিন মীরসাহেবের সহিত নাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। মীরসাহেবকে দেখিয়া বলিলেন, আপনি প্রতিদিন খুব ঠাণ্ডা জলে স্নান করিবেন, ঠাণ্ডা জিনিস খাইবেন।

কেনী পীড়া সম্বন্ধে কথাবার্তা কহিয়া শেষে সা গোলামের কথা তুলিলেন।

মীরসাহেব বলিলেন, “ভূলা মি’য়া” আজ বাটিতে নাই, চাপড়ার বিলে পাখি শিকার করিতে গিয়াছেন।

কেনী বলিলেন আপনার জামাতা বড় চতুর। বুদ্ধিও খুব পেঁচাও। যে মাগুসের সর্ব্বদাই রু কুণ্ঠিত থাকে তাহার মন সরল নহে।

মীরসাহেব বলিলেন, বুদ্ধি যে খুব পেঁচাও, তাহা জানিয়াই বিষয়াদির কাজকৰ্ম্ম সমুদায় তাহার হাতে দিয়াছি। বিষয়াদির চিন্তায় আর আমাকে এখন চিন্তিত হইতে হয় না। কার্য্য তিনিই করিয়া থাকেন। আমাকে আর কিছুই দেখিতে হয় না। খুব চতুর ছেলে। বেশ স্থখে আছে।

কেনী একটু হাসিয়া বলিলেন। জামাই পরের ছেলে।

মীরসাহেব বলিলেন, না না, সে পরের ছেলের মত পর নহে। আমাকে বিশেষ ভক্তি করে, পিতার গায় পূজা করে, মান্ত করে। আমার পীড়ার সময় নিজে কবিরাজের বাড়ি পর্য্যন্ত গিয়া কবিরাজ আনিয়াছিল। ঔষধ খাওয়াইতেও কষ্ট স্বত্ব করিয়াছিল। কত অল্পনয়-বিনয় করিয়াছিল। কবিরাজের ঔষধে আমার ভক্তি নাই বলিয়া খাই নাই। তজ্জাচ সা গোলাম কবিরাজকে টাকা দিতে কম করে নাই।

কেনী বলিলেন—ভাল হয় সে ভাল কথা। কিন্তু হঠাৎ হাতছাড়া করিবেন না। ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া কাষা করিবেন।

মীরসাহেব কেনীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল তাঁহার মুখে কোন কথাই আসিল না। একটু পরে বলিলেন ভাল কথা দারোগা! খুনের কি হইল?

“সে মোকদ্দমায় মহা-জলজ্বল বাধিয়াছে। শেষে সে কথা বলিব। বঙ্গুনতো পাংশার ভৈরববাবু সম্বন্ধে কি করি। তিনি আমার সহিত সময় সময় দেখা করেন বটে, কিন্তু আসলকাজে ভিড়িতেছেন না। লোকটি ভারি চতুর বটে। আমি বাঙ্গালাদেশের অনেক লোককে দেখিলাম। অনেকের সঙ্গে বিবাদ-বিসম্বাদ করিলাম। স্ত্রীলোকের মধ্যে প্যারীসুন্দরী—নাম করিতেও ভয় হয়। আর পুরুষের মধ্যে ভৈরববাবু। ভৈরববাবুর আরও গুণ এই যে, তিনি নিতান্তই কৌশলী, দাঙ্গা-ফেসাদে অগ্রসব হইতে চাহেন না। বিষয়াদি লিখিয়া দিতেও অস্বীকার হন না। অথচ একরূপভাবে লিখিত-পড়িত করিতে চাহেন যে, আমি তাঁহার একটা তহশীলদার মাত্র থাকি। বিনা বায়ে খাজনার টাকা মাস মাস পান। ইহাই তাঁহার আন্তরিক-ভাব। নিজের লাভ ব্যতীত কিছুতেই ক্ষতি স্বীকার করিতে চাহেন না।

“ভৈরববাবু বডঘরানা বনিয়াদী বাবু। আমাদের সহিত এত নিকট-সম্বন্ধ যে, হিন্দু-মুসলমান বলিয়া কোনপ্রকার হিংসার ভাব নাই। পুরুষায়ক্রমে ভ্রাতৃত্ব চলিয়া আসিতেছে। জাতিব-বিদ্ভায় মহাপণ্ডিত, ফারসী ও আরবীতে মহাবিদ্বান, সঙ্গিত-বিদ্ভায় এদেশে অমন গুণীলোক আর দ্বিতীয় কেহ নাই। বাহাই করুন তাঁহাকে সম্মত করিয়া করিবেন। এইটি আমার বিশেষ অনুরোধ।

তাঁহার অসম্মতিতে আমি কিছুই করিব না। কিন্তু তিনি কেমন ভৈরব-বাবু আমি একবার পরীক্ষা করিব। তিনি বাঙ্গালাদেশের বুদ্ধিমান, চতুর। আমিও বিলাতী ‘শয়তান’ দেখি, তাঁহার বাঙ্গালী-বুদ্ধির দৌড় কত? আমি তাঁহার সহিত বিবাদ করিব না, কেবল বুদ্ধির দৌড় দেখিব। মস্তিস্কের ক্ষমতা বুঝিব।

মীরসাহেব বলিলেন—আচ্ছা তা দেখবেন—প্যারীসুন্দরীর কি হইল?

কেনী বলিলেন—হাঁ হাঁ! সে কথাটা ভুলিয়াছি। জানেন—আমরা নিশাচর লোক যতগুলি এইদেশে বাস করিতেছি, আপনাদের সহিত বন্ধুত্ব

করিয়া মনের কথা বলিতেছি, কিন্তু আমাদের মনের নিগূঢ়তত্ত্ব—গুপ্তকথা কখনই পাইবেন না। আপনি দেখিবেন, কালে প্যারীসুন্দরীর যথাসর্বস্ব যাইবে। খুঁচি-হস্তে ধারে-ধারে ভিক্ষা করিতে হইবে। এ ঘটনা শীঘ্র ঘটিতেছে না। কারণ এখনও টাকার অভাব হয় নাই। ঘটিতে বিলম্ব আছে। কুঠি লুটের মোকদ্দমায় হাজিরা আসামীগণ সাতটি বৎসরের জন্ম জেলে গিয়াছে। দারোগা খনের মোকদ্দমায় স্বয়ং কোম্পানী বাদী। শীঘ্রই দেখিবেন সুন্দরপুরের জমিদারী খাস হইয়া কোম্পানীর হস্তগত হইয়াছে আর অধিক কি বলিব।

“আমিও একবার সৌলি যাইতে ইচ্ছা করিয়াছি। আপনার এই গোলযোগে সেবাবে যাইতে পারি নাই। তাহাবপবই জ্বর,—জ্বর নয় বিষম জ্বর, প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

“আরও কয়েকদিন বিলম্ব যাইবেন। শরীরটা ভালকবে শুধরে যাক, তার পর যাইবেন। আর একটি কথা—বিরক্ত হইবেন না। খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে একটু সাবধান-সতর্কে দেখিয়া গুনিয়া খাইবেন।

এ পর্যন্ত বলিয়াই কেনী উঠিলেন। মীরসাহেব কেনীর সঙ্গে সঙ্গে দালানের সিঁড়ি পর্যন্ত আসিলেন। কেনী সেকছাণ্ড করিয়া অঞ্চে চাপিলেন। সেইস, বব-কন্দাজ প্রভৃতি কেনীর-সঙ্গের লোকজন মীরসাহেবকে ভক্তির সহিত সেলাম করিয়া সাহেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িল।

সপ্তদশ তরঙ্গ

অনন্ত-আকাশ ময়নাপাখি

আশাই জীবনের আশ্রয়, আশাই সংসারের মূল—আশাই মানব-হৃদয়ের একমাত্র ভরসা। ভাবিতে গেলে—আশাতেই সংসার। কে না জানে মরিতে হইবে। তথাচ মরিতে অনিচ্ছা কেন? মরিবার নামে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে কেন? আজ যদি কেহ বলে যে, কাল তোমাকে মরিতে হইবে—আর তাহা যদি নিশ্চয় হয়, তবে কাল কেন? যখন মৃত্যুর কথা কানে প্রবেশ করে, তখনই যেন মরিয়াছি বলিয়াই বোধহয়। মরণে ভয় করিয়াও আশার কুহকে পড়িয়া মরণ কথাটি বুকেবোরে ভুলিয়া গিয়াছি। মনে করিয়াছি, জগৎ চিরস্থায়ী,—আমিও চিরস্থায়ী। এত ভ্রম হইবার কারণ কি? আর কিছুই নাই, কেবল একমাত্র

আশা। আশা আমাদিগকে মাতাইয়াছে,—মজাইয়াছে। আশাই আমাদিগকে ভুলাইয়াছে।

জকির আশা কি? সে কি আশায় সুলন্দরপুর গ্রামে ভ্রাতার বাড়ি যাওয়া-আসা করিতেছে। গরু, লাঙ্গল, জমি, বাড়ি, ঘর, ধান, টাকা বাহা জকির আশা ছিল, সকলই তো একপ্রকার সম্পূর্ণ হইয়াছে। এখন আর কি আশা? এ ভাই তো পূর্বেও ছিল। আগে এত যাওয়াআসা হয় নাই। এখন এত ঘন ঘন আসা কেন? আর একদিন ছাতি, লাঠি হাতে করিয়া জকি ভ্রাতার বাড়ি যাইতে উদ্যত হইলেই ময়না বলিল—“দেখ! কুটুম্ববাড়িতে এত যাওয়াআসা ভাল নয়।”

জকি দাঁড়াইয়া লাঠি দিয়া মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে বলিল—“একটা কথা ছিল তাহাতেই”—

“কথা থাকুক সুলন্দরপুর যাওয়াআসার কথা সাহেবের কানে গেলে কি ঘটবে? তুমি সাহেবের প্যারাচাকর, তুমি সাহেবের শক্তের এলাকায় কুটুম্বিতা করিতে যাও। নিশ্চয়ই জেনো, সাহেবের কানে গেলে তিনি হাড়ে হাড়ে চটে যাবেন। জল, জঙ্গল, মনিব কোনকালেই আপন নহে। আবার প্যারীসুলন্দরীও সাহেবের প্যারাচাকর—মনে যাহা ইচ্ছা তাহাই কবিতো পারেন।

“প্যারীসুলন্দরী আমাকে কিছুই বলিবেন না। তিনি আমাকে বড় ভালবাসেন।”

ময়না আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিল “তিনি তোমাকে ভালবাসেন? তাকে মানে কি? তুমি কি তাহার বাটিতে যাও নাকি?”

জকি চুপে চুপে কয়েকটি কথা ময়নার কানের নিকট কহিয়া আপন শয়নগৃহ-মধ্যস্থিত হাতচাক্সির উপর হইতে ধুতি-চাদর বাহির করিয়া আনিয়া ময়নাকে দেখাইল। আর যাহা পাইয়াছিল, তাহা আর দেখাইতে সাহসী হইল না। কারণ সে পাঁচশত টাকার একটি তোড়া—টাকার তোড়া ধানের ডোলের মধ্যে থাকিল। তাহা বাহির করিয়া ময়নাকে দেখাইতে কিছুতেই জকির সাহস হইল না। ময়না ধুতি-চাদর দেখিয়া বলিল “দেখ, এ কাঁপড় তুমি কখনই পরিও না। লোকে দেখিলেই সম্বোধ করিবে। তুমি যে কথা বলিয়া সকলকে প্রবোধ দিবে তাহা কেহই বিশ্বাস করিবে না। যে যেমন, তাহার আশাও তেমন। চক্ষুও তেমন—পছন্দও তেমন। নিশ্চয় লোকে একথা বলিবে যে, তুমি এ কাপড় চুরি করিয়া আনিয়াছ।

না হয় তোমাকে বড়লোক দিয়াছে। এ ধুতি-চাদর কালীগঙ্গায় ফেলিয়া দেও। নয় পোড়াইয়া ফেল। আর ঘরে রাখিও না। আমার কথা শুন।”

জকি বড়ই দুঃখিত হইল। মনে করিয়াছিল, ময়না তাহার কাষে যোগ দিবে—কত প্রশংসা করিবে। ধুতি-চাদর দেখিয়াই এই কথা—পাঁচশত টাকার কথা শুনিতে তো আজই আগুন জ্বলাইয়া দিয়া হারথার করিয়া দিবে। টাকার কথা না বলিয়াই ভাল করিয়াছি। জকি মনে মনে এই কথা কহিয়া ময়নার সম্মুখ হইতে ধুতি-চাদর উঠাইয়া লইয়া গেল। একটুকু পবে আসিয়া বলিল যে, আর সুন্দরপুর যাইব না।

“কুটুম্ব-স্বজনের বাড়ি যাওয়া আসায় দোষ কি? তবে ঘন ঘন যাওয়াটা ভাল দেখায় না—আদরও থাকে না। মুখে কিছু না বলুক, মনে মনে বড়ই বিরক্ত হয়। আমি যাতে বারণ করি না, মাসেক-ছমাস পরে কুটুম্ববাড়ি যাওয়াই ভাল।”

“না আমি সে বাড়িতেই আর যাইব না। সুন্দরপুর গ্রামেই আর যাইব না। সেখানে আমার কোনই কাজ নাই।”

ময়না কাতরস্বরে বলিতে লাগিল। “দেখ আমার পেটের বেদনা আজ বড়ই বেশী হইয়াছে। সাহেবের নিকট হইতে যদি একটু ঔষধ চাহিয়া আনিয়া দিতে তাহা হইলে বাঁচিতাম, কত লোককে তিনি ঔষধ দেন। তুমি চাহিলেই ঔষধ দিবেন।”

জকি সুন্দরপুর না যাইয়া কুঠিতে চলিয়া গেল। ময়না মাটিতে বসিয়া মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল। ভাবনা কি? স্বামীর সহিত সময় সময় দেখা হয়, কিন্তু বিবাদ-বিসম্বাদ, বিচ্ছেদ, মিলন কিছুই নাই। স্বপত্নী আছে, তাহার সহিতও মনবাহ নাই। ময়নাই ইচ্ছা করিয়া স্বামীকে বিবাহ দিয়াছে। স্বপত্নী-ঘরে আনিয়াছে। একদিনের জন্তও স্বপত্নী সহিত বাদ-বিবাদ হয় নাই। অন্ন-বস্ত্রে ময়নার কোন বিষয়ে কষ্ট নাই। তাহার আচরণে, কথাবার্তায় প্রতিবেশি-গ্রামস্থ লোক সকলে একমুখে ভাল বলে। এবং ভালবাসে। প্রতিবেশিনীর মধ্যে একজন বয়োধিকারী সহিত ময়নার বিশেষ আলাপ ছিল। সে সর্বদাই ময়নার নিকট কথাবার্তা কহিত, হাসি-ভাস্ক্য করিত। ময়নার পোড়ার কথা শুনিয়া দেখিতে আসিয়া বলিল—

“কি হয়েছে দিন দিন যে একেবারেই সারা হইতেছ? আগে তো ভালই ছিলে,—পাঁচ ছয় মাসের মধ্যে তোমার ভাব অনেক বদল হইয়াছে। আবার আজ কয়েকদিন হইতে তো একেবারেই যাচ্ছেতাই দেখিতেছি। ক্রমেই যে সারা হলে? কথাটা কি বলত?”

ময়না কোন উত্তর করিল না। কিন্তু চক্ষু দুটি জলে পরিপূর্ণ হইল। চক্ষুজল সম্বরণ করিতে ক্ষমতা হইল না। দুই-এক ফোঁটা মাটিতে পড়িল অবলা নিঃসহায়ার চক্ষুর জল মাটিতে পড়িয়া মাটি ভিজাইল। পরে বলিল “আমার কিছু হয় নাই। কোন, পাঁড়াই আমার শরীরে নাই। তবে বলবে এ ভাব কেন? সত্যীনের জালায় জলিতেছি—তাহাও নহে। সে সত্যীন তো আমিই আনিয়াছি—এ সংসারে আমিই কর্তা, আমার হাতেই সকল, কিছুতেই আমার দুঃখ নাই। অথচ এ জগতে আমার আর স্থখ নাই। আমার মনের কথা মনেই রহিল।”

“বোন! অনেকদিন হ’তে ইচ্ছা একটি কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করিব, কিন্তু সময় পাই নাই। তোমার সম্মুখে কেহ বলে না। ভেস্কেচুরে খোলাসা করেও কেহ বলিতে সাহসী হয় না। আকার-ইঙ্গিতে অনেকেই অনেক অনেক কথা বলে। ভাই জকির সহিত তুমি কথা বল না। সে তোমার ঘরে আসে না। এ কথাটা প্রকাশই সকলে বলে। পুরুষ বাঁজা হইলে দশটি বিয়ে কবিলেও ছেলেপেলে হয় না। এ কথাটাও সঙ্গে সঙ্গে উঠে। কিন্তু তোমার মুখের ভাব, শব্দবাব অবস্থা দেখে অনেকেই অনেক কথা বলে। কিন্তু মুখফুটে কেহই কিছু বলিতে সাহস পায় না। একটু ঘাৎ রাখিয়া দেখ যে, হলেই দেখা যাইবে।”

ময়না নিরব—কিন্তু চক্ষুর জলে মাটি ভিজিতেছে।

প্রতিবেশিনী পুনরায় বলিল, কান্দ কেন? সকলই কপালের লেখা। ময়না অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিয়া বলিল বোন! আমি সকলকেই চিনিয়াছি। বিশেষ করিয়া স্বামীকে চিনিয়াছি। স্বামী, আপন স্বামী—হায়!

জকি ঔষধের শিশি লইয়া উপস্থিত হইয়া বলিল, সাহেব ঔষধ দিয়াছেন।

প্রতিবেশিনী বলিল—কিসের ঔষধ?

ময়না বলিল—বেদনার ঔষধ।

জকি শিশি রাখিয়া ঔষধ খাওয়াইবার জন্য ভারি ব্যস্ত হইল। সাহেব বলিয়াছেন তোমার দ্বীর হাতে ঔষধ দিও। তুমি খাওয়াইও না। এ কথাটা

বলিতে তখন জকির সাহস হঠল না। কারণ সম্মুখে পাড়ার একটি দ্বীলোক।
কিসে ঔষধ খাওয়াইবে, এইকথাই বার বার বলিতে লাগিল।

ময়না বলিল ঔষধ দেও খাই! বাস্তব হইতেছে কেন?

জকি বলিল—না না বাস্তব কি! তা—না—ঔষধ খাও। এখনই বেদনা
সারিয়া যাইবে।

ময়না বলিল—“দেও তুমিই হাতে করিয়া দেও খাইতেছি।”

জকি—তা আচ্ছা দেই, খাও বলিয়া শিশির সমুদায় ঔষধ ময়নার মুখে
ঢালিয়া দিয়া জকি নিস্তার পাইল। ঔষধ গলাধ করিতে ময়নার মহাকষ্ট হইল।
অনেকক্ষণ পর্যন্ত নিশ্বাস ফেলিতে পারিল না।

জকি ঔষধ খাওয়াইয়া বলিল যে, সাহেব জল দিয়া মিশাইয়া খাইতে বলি-
য়াছিলেন, তাহা তো হইল না। সে কথাটা আমি ভুলিয়া গিয়াছি। তাড়াতাড়ি
খাট আনিয়া ময়নার সম্মুখে রাখিয়া দিল। ময়না জলপান করিল না। জকি
শিশিট লইয়া বার বার দেখিতে লাগিল, এবং শিশির গলায় স্তৃতা বাধিয়া ঘরের
বেড়ায় ঝুলাইয়া রাখিল। এবং তামাক খাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে হুঁকা-কলকে
লইয়া ঘর হইতে বাহির হইল। প্রতিবেশিনী আবাব জিজ্ঞাসা করিল বোন!
কিসের বেদনা?

ময়না একটু স্থির হইয়া বলিল—বেদনা আমার মাথা আর মুণ্ড!

জকি কলিকায় তামাক সাজিতে সাজিতে বলিতে লাগিল—সাহেব বলিয়া
দিয়াছেন যে, ঔষধ খাওয়াইলে কিছুক্ষণপর কি ভাব হয়, বেদনা কমে কি বাড়ে,
আসিয়া বলিও।

প্রতিবেশিনী বলিল—বোন! আমি এক্ষণে বাই, বাড়ির কাজকাম অনেক
বাকি আছে। আবাব আসিয়া দেখিয়া যাইব। প্রতিবেশিনী চলিয়া গেল।
ময়না যেখানে ঔষধ খাইল, সেইখানেই বসিয়া রহিল। ক্রমে পেটমধ্যে যেন
আগুন জ্বলিয়া দিল। কয়েকবার উঠিয়া ঘরের কানাচি-পিয়া শেষে একেবারে
অচল হইয়া পড়িল। সপত্নী ব্রজ বাড়ির অনেক কথাই জানিত। ময়নাকে
ধরিয়া কয়েকবার কানাচি লইয়া গেল। শেষে ময়না অস্থির হইয়া পড়িল। কাপড়
অসামান্য হইল। জকি সাহেবের নিকট সংবাদ দিতে দৌড়িয়া ছুটিল। বাঁচিবার
ভরসা নাই, চক্ষু ঘোর হইয়া আসিতে লাগিল, সপত্নী ব্রজের কোঁড়ে মাথা রাখিয়া

অতি মুহূ মুহূ স্বরে বলিতে লাগিল—“বোন ! আমি যে, ঔষধ খাইয়াছি কেন, তাহা তুমি বোধহয় জ্ঞান ? যে জ্ঞাত ঔষধ খাওয়া তাহা অপেক্ষা মরণ ভাল । আমার স্বামী বর্জমান । ঐ ঔষধের পরিমাণের বেশী আমি খাইয়াছি । যিনি ঔষধ দিয়াছেন, তিনিই আমাকে বলিয়াছিলেন, বড় ভয়ানক ঔষধ । যাহা দিব তাহার চারিভাগের একভাগ চারিগুণ জলে মিশাইয়া খাইবে । যদি তাহাতে না হয়, তবে সেদিন আর খাইবে না । তারপরদিন আবার ঐ পরিমাণ ঔষধ আটগুণ জলে মিশাইয়া খাইও । এষ্ট ছিল ঔষধের ব্যবস্থা । সেই ঔষধের ব্যবহার-নিয়ম জানিয়াও যে অকাতরে শিশির সমুদায় ঔষধ বিনাজলে পেটে ঢালিলাম কেন ? মরিব বলিয়া । আমার ঝাঁচিবাব সাধ নাই । আমি অনেকদিন হইতে মরিয়া বহিয়াছি ।

বোন ! তুমি তোমার স্বামীকে চিনিতে পার নাই, আমি অনেকদিন হইতে চিনিয়াছি । সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেককে চিনিতে পারিয়াছি । ইহার বিচার অবশ্যই একদিন হইবে । যিনি সকলের বিচারের মালিক, তাঁহার হাতে একদিন পড়িতেই হইবে । কথা অনেক, কিন্তু বলিবার সাধা নাই । বোন ! একটি কথা বলি—তোমার স্বামীকে তুমি কখনই বিশ্বাস করিও না । তিনি না করিতে পারেন, এমন কোন কার্য হুনিয়ায় নাই । মাঝুবে যাহা কখনই করিতে পারে না, তিনি তাহা টাকার লোভে অনায়াসে কবিত্তে পারেন । পারেন তো পরের কথা—করিয়াছেন । আর কি বলবো বোন ! আর কি বলবো ! ঐ যে ধুতি-চাদর দেখিয়াছ, নিশ্চয়ই জানিও ঐ ধুতি-চাদরেই তোমাদের সর্বনাশ হইবে । ঐ কাপড়েই তোমাদের যথাসর্বস্ব যাইবে । প্রাণ যাইতেও বড় আশ্চর্য্য নাই । আগেই বলিয়াছি, তোমার স্বামী টাকা পেলে না পারে, হুনিয়ায় এমন কোন কু-কাজই নাই । প্রথম লোভ ধুতি-চাদর তারপর যে লোভ আছে সে লোভ তোমার স্বামী—কখনই সামলাইতে পারিবে না ।

আমি তো চলিলাম, তুমি যদি ঝাঁচিয়া থাক তবে দেখিবে তোমার স্বামীর কি দুর্দশা ঘটে । বোন ! “তোমার স্বামী” বলিলাম বলিয়া মনে কোন দুঃখ করিও না । মনের কথা চিরকাল মনেই রাখিয়াছি । এখন আর কেন ? ইচ্ছা করিয়া শিশির সমুদায় ঔষধ খাইয়াছি । খাইলাম কেন ? আপন প্রাণ আপন-হাতে বাহির করিলাম । তাহা বলিব না । ময়নার মন জানে, আর সেই পাক-পরও যারদেগার জানেন ।

একদিকে স্বামী, অগ্ৰদিকে দুঃস্থ বাঘ ! বাঘ হা করিয়া ধরিতে আসিল, স্বামী রক্ষা না করিয়া, আরও বাঘের মুখে ধরিয়া দিল। আর ঝাচ্চি কি করিয়া, ঘাই কোথা—কে রক্ষা করে ? খোদায় আছেন জানি, তিনি সকলের রক্ষক তাও লোকের মুখেই শুনি ! সেও হতভাগিনীকে তো রক্ষা করিলেন না ! আর শক্তি নাই—কথা কহিবাব আর শক্তি নাই। উহ ! স্বামীর এই কার্য ! জকির মুখ আর দেখিব না বলিয়া ময়নাব দুটি চক্ষু একেবাবে বন্ধ হইয়া গেল। ব্রজ এই তিনটি অশ্রুট কথা শুনিল মাত্র। নির্দয় স্বামী ! নির্দয় ইংরেজ ! মুখের কথা মুখেই রহিল। ময়নার প্রাণবায়ু কোনপথে কোথায় চলিয়া গেল ব্রজ তাহার কিছুই দেখিতে পাবিল না। নিববে কান্দা ভিন্ন ব্রজের আর কি ক্ষমতা আছে ?—কান্দিতে লাগিল।

জকি সাহেবের নিকট পাড়ার অবস্থা জানাইতে গিয়াছিল, উর্দ্ধ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া ইপাইতে ইপাইতে বলিতে লাগিল, সর্বনাশ হইয়াছে ! সাহেব কত দুঃখ করিতেছেন। আমাকে মারিতে তাড়া দিয়াছেন। আর পাছা খাবড়াইয়া বলিতেছেন “ও ম্যান—তুমি ক্যা করিয়া”। ঔষধে জল দেই নাই, আর সমুদায় ঔষধ খাওয়াইয়াছি শুনিয়া কেনী আব্দুল দাঁতে কাটিতেছেন। সাহেব মহাব্যস্ত হইয়াছেন।

এখন কেমন ? ময়নাব নাকে মুখে হাত দিয়া দেখিয়া জকি মাথায় ঘা মারিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। ব্রজের কান্না তখন একটু বাড়িল। প্রতিবেশিনীরা যে যেখানে ছিল ছুটাছুটি করিয়া ব্রজের কান্নার সহিত যোগদিয়া কান্দিতে কান্দিতে চক্ষের জলে নাকের জলে একাকার করিয়া ফেলিল। জকি প্রতিবেশীদের সাহায্যে ময়নার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যোগাড় করিয়া তাড়াতাড়ি ময়নার ঘরের জিনিস-পত্র বাস্ক-পেটাবায় বন্ধ করিতে আরম্ভ করিল।

অষ্টাদশ তরঙ্গ

জন্মভূমি

জন্মভূমি কাহার না আদরের ? উপমা-রহিত কাহার না ভাল বাসস্থান ? জন্মভূমির জন্ত কে না লালায়িত ? বহুদিন পরে প্রবাসী দেশে আসিলে তার মনে কতই স্মৃতি ! আনন্দ ! মিসেস কেনীর মন কিরূপ তাহা জানি না। বাঙ্গালার কাল-মুখের ভাব এবং খোলা বুকের ভিতরের খবর বুঝিয়া উঠাই দুঃসাধ্য ! তাহাতে

সেই ধবধবে সাদা মুখের হাব-জাব, সাদা চোখের চাউনির আভাষে, এবং আটা-সাটা সাতপ্রকার কাপড়ে ঢাকা—সাদা-চর্ম সাদা-অস্থি জড়িত—সাদা কি কালো ঈশ্বর জ্ঞানেন—কোমল কি কঠিন ভগবান জ্ঞানেন, সে মনের ভাব বুঝিয়া ব্যক্ত করা উদাসীন পথিকের সাধ্য নহে। জন্মভূমি পত্তরাও ভালবাসে, পক্ষীরাও ভাল চেনে, কীট-পতঙ্গ ক্ষুদ্র প্রাণীরাও বোধহয় হঠাৎ ভুলিয়া যায় না। আপন আপন বাসস্থান, বাসা, কোটর, গর্ত, অগাধজলে অনায়াসে চিনিয়া যাওয়াআসা করে। সীমা-বিশিষ্ট—জ্ঞানের ভালবাসাই চেনা, এবং আপন আপন স্থানে সম্মত চিনিয়া, যাওয়া।

মিসেস কেনী জন্মভূমিতে পা বাখিয়াই যেন বিবস্ত্র হইয়াছেন। কেহ দুহাত তুলিয়া, ঘাড় নোওয়াইয়া, মাটিতে মাথা ঠুকিয়া দম্ববমত সেলাম বাজায় না। সরিয়াও দাঁড়ায় না। গা ঘেঁষিয়াই যাতায়াত করে। মান মর্যাদার নাম নাই। খানসামা নাই, বেয়ারা নাই, বাবুরচি নাই, সর্দারবেয়ারা নাই, বয় (boy) নাই। সমুদায় কাজ নিজে করিতে হয়। ইস্তক রন্ধন-লাগাদশয্যা, তাহার পরেও ছি! ছি! বড় ঘুণার কথা। নিজের মলমূত্র নিজেই পরিষ্কার—চিঠিখানা দিতে হলেও ডাক-ঘবে নিজে যাঁহিতে হয়। হুকুমের-তাঁহে কেহই খাটে না। একে বলিতে দশজন আসিয়া উপস্থিত হয় না। অত্যাঘ হুকুম কেহই শুনে না। ভদ্রতা ব্যবহারে কার্য্য করিতে হয়, কথা বলিতে হয়। সকলের সহিত নম্রতা এবং ভদ্রতা ব্যবহার না করিলে বড়ই অপদস্ত হইতে হয়। চক্ষু রাঙ্গাইয়া, সাদা মুখ বাকা করিয়া কার্য্য লওয়া দূরে থাকুক, প্রতি কার্য্যে ধন্যবাদ না দিলে, অসভ্য, জঙ্গলী বলিয়া বেতন-ভোগী কার্য্যকারকেরাও উপেক্ষা কবে। নির্ধারিত এবং নিয়মিত কার্য্য সময়েই একটু নরম বোধহয়। তাহারপরেই যেন অত্যাঘ। খাওয়া দাওয়াতেও অস্থখের একশেষ। মুরগী মেলে না। আণ্ডা পাওয়া যায় না। তরকারীও তথৈবচ। পাওয়া যে না যায় তাহা নহে। দাম কত? সে দামের কথা হঠাৎ শুনিলে, সোনার ভারতের কথা মনে পড়ে। এইপ্রকারে মিসেস কেনী ভাবিতেছেন আর বলিতেছেন—এমন প্রভুভক্ত দেশ কোথাও নাই, আমার বোধহয় জগতে নাই। চাকরে-মনিবে কি সম্বন্ধ, রাজা-প্রজায় কি সম্বন্ধ, তাহা ভারতবাসীরাই জানে। সেকথা আর কি বলিব। আমাদিগকে দেবদেবীর ত্রায় পূজা করে। রাস্তা-ঘাটে দেখিলে সেলাম বাজাইয়া পঞ্চাশ হাত সরিয়া যায়। দিবারাত্রি খাটুনি—চাকর

হইলেই যেন সে চিরকালের জ্ঞা বাধা পড়িল। সর্বদা প্রস্তুত, সর্বদা ঘোড়হাত হ মার কাট কথাটি মুখে নাই। যত ইচ্ছা মাথায় বোঝা চাপাও আহা কি উহু শব্দটি মুখে নাই। যথাসর্বস্ব কাড়িয়া লও কিছুই বলিবে না। যেমন অবোধ তেমনই সরল। আর কত বলিব। যাহা ইচ্ছা তাহা কর, সৌভাগ্য-জ্ঞানে সঙ্ক করিবে, কত সাহেব শিকার করিতে যাইয়া, মাছুষ শিকাব কবিয়া বসেন, কিছুই হয় না। ক্রোধবসে এড়ির গুতোয় পিলে ফাটাইয়া দেন, টু শব্দটি মুখে আনে না। টাকা লইতে ইচ্ছা হইল, লুকুম ভাবি করিয়া দাও অমনি আদায়। আমাদের প্রতি এমনি বিশ্বাস যে, রূপা বলিয়া দস্তা হাতে দেও, মাথায় করিয়া লইয়া যাইবে। এমনই ভক্তি যে আরাধ্য দেবতাকে ভুলিয়া আমাদেরকেই কায়মনে পূজা করে, মনের সহিত সেবা করে। তাহারা পরিশ্রম করিয়া যাহা কিছু উপার্জন করে, এ দেশের ছাইভস্ম জিনিস দেখিয়া—ভুলিয়া সকলই আমাদেরকে দেয়। এই আমি যে খণ্ডে বাস কবি, সমুদায় ক্ষমতা আমার হস্তে—আমি ইচ্ছা করিলে কি না করিতে পারি। পরিশ্রম তাহাদের, ভোগ আমাদের। এমনই সরল, এমনই সাধু যে, সর্বস্ব দিয়াও আমাদের খাতিব রাখে, মন যোগায়। হায়! হায়! এমন সোনার দেশ কি আছে? আমার এত কষ্ট হইতেছে যে, একমুখে তাহা প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই। খাওয়া দাওয়াব স্তব্ধই বা কত! দান-দাতব্যের ঘটাই বা কত! আদর-অভ্যর্থনার ধুমই বা কত! সকলেরই বাড়ি ঘর, দোর আছে, খাইবার সংস্থা আছে। সাতপুরুষ দূরে থাকুক এক জীবনের মধ্যে ষাট দিনও কেহ গাছতলায় বাস করে না। ভাড়া দিয়াও পবের ঘরে নিদ্রা যায় না। যেমনই হোক থাকিবার, শুইবার ঘর সকলেরই আছে। ছল, চাতুরী, জুয়াচুরি জানে না। মিথ্যাতান করিয়া কাহাবও সম্পত্তি হরণের কেহ চেষ্টা করে না। তবে যাহারা পাওনাদার, তাহারাই দাবী করে, মামলা-মকদ্দমাও হয়। সে বিচারও আমবাই করিয়া থাকি। বিচার-দরুন নজর সেলামী টাকা লই। তাহাদেরই দেশ, তাহাদেরই টাকা, তাহাদেরই সম্পত্তি—মজা করি আমরা। এমন স্তব্ধ কি আর কোথাও আছে?

আহা সে দেশের জীলোকদিগের কষ্ট দেখিয়া মনে বড়ই বাধা লাগে। তাহারা যেন বন্দিনী! চিরবন্দিনী! ঘাটে-মাঠে বাহির হয় না। সর্বদা মাথা, মুখ ঢাকিয়া থাকে। অপর কাহাবও সঙ্গে কথাবার্তা কথা দূরে থাক, হঠাৎ নজর

পড়িলেই ঘরের মধ্যে লুকায়। একটু বেশি বয়স হইলে জন্মদাতা পিতার সম্মুখে আসিতেও লজ্জা বোধকরে এক পরিবারস্থ একবাড়ির আপন আত্মীয়-স্বজন— এমন কি পিতার সম্মুখেও আহ্বার কবে না। স্বামীসহ সর্বদা একত্র উঠাবসা করিতে মাথা কাটিয়া ফেলিলেও স্বীকার হয় না। অন্তের কথা কে বলে। পুরুষেরাই সর্বসর্বা, পুরুষেরাই তাহাদের হৃদয়কর্তা। একরূপ বিধাতা। স্বামীমুখে কতকথা শুনিতেছে, কত বকুনি খাইতেছে সময় সময় স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলিতেছে, প্রহার পর্য্যন্ত করিতেছে। নালিশ নাই, করিয়াদ নাই, পুরুষে সকলই পারে। স্ত্রীলোকেরা কেবলই সহ্য করে। এত কষ্ট, এত অসুখ, এত যন্ত্রণা, তবু পিতামাতায় ভক্তি, ভ্রাতাভগ্নীতে ভালবাসা, স্বামী-স্ত্রীতে একাত্মা, একপ্রাণ কি আশ্চর্য্য! এমন আশ্চর্য্য দেশের কথা কোথায়ও শুনি নাই। কেতাবে স্বর্গের কথা শুনিয়াছি, মিথ্যা বলিতেছি না, আমবা সেই স্বর্গের রাজ্যে বাস করিতেছি। এই কতকদিনে আমার মন বড়ই চঞ্চল হইয়াছে। ক্ষণকালও আর এদেশে থাকিতে ইচ্ছা হইতেছে না। আজই মিষ্টার কেনীকে পত্র লিখিব এবং এই সম্ভাহেই দেশের মুখে চুনকালি দিয়া সোনার ভাবতে যাত্রা করিব। বাপরে! এমন বে-আদব, বেতমিজ্জ দেশে ভদ্রলোক বাস করে? সকলই সমান। কেহ কাহারও খাতির রাখে না—গ্রাহ করে না—মান্তও করে না। দু-দণ্ড বসিয়া খোসগল্পেও সময় অতিবাহিত করে না। চাকর বেতনভোগী। চাকর মনিবের কত প্রশংসা করিবে, কত প্রকার যশঃগান গাইবে। সে কথার আভাষ কাহারও মুখে নাই। নির্ধারিত বেতন, নিয়মিত কার্য্য। আর সকলেই যেন ব্যস্ত, আপন আপন কাৰ্য্যে সকলেই ব্যস্ত। ইস্তক লক্ষ্যপতি ধনী, লাগাদ মুটে, মজুর, সকলেই আপন আপন কাৰ্য্যে সমান ব্যস্ত। কাৰ্য্যের মূল্যে অবশ্যই ন্যূনাধিক আছে। কিন্তু ব্যস্ত ও যত্নের মূল্য সকলেরই সমান। এমন কড়া দেশে আর আমার বাস করা সাজে না। আমি শীঘ্রই এদেশ পরিত্যাগ করিব। এ জীবন থাকিতে আর জন্মভূমির নাম করিব না।

মিসেস কেনী সেইদিবসই শালঘর মধ্যায় কেনীর নিকট পত্র লিখিয়া নিজের ভাকঘরে দিয়া আসিলেন। পত্রের ভাবার্থ এই যে বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা বড়ই কষ্টকর! নাথ! আর আমার সহ্য হয় না! বিরহ-বেদনায় বড়ই অস্থির হইয়াছি। প্রাণ যায় যায় হইয়াছে। এরূপ ঘটবে আগে জানিলে, বিরহে এত যাতনা আগে বৃক্ষিলে,

নাথ ! আমি কখনই শালঘর মধুয়া পরিত্যাগ করিতাম না। ক্ষণকালের জ্ঞাত ছাড়িয়া আসিতাম না। খুব শিক্ষা হইল। আর না কখনই আর •এরূপ হইবে না। আমি শীঘ্রই পৌঁছিতেছি। এই সপ্তাহেই জাহাজে উঠিব। অতী টিকিট খরিদ করিব।

উনবিংশ তরঙ্গ

প্যারীসুন্দরীর পরিণাম

কুঠি লুটের মোকদ্দমায়, হাজারী আসামীগণের ফাটক হইয়াছে। দারোগা খুনের মোকদ্দমায় আসামী হাজির হয় নাই—গ্রেপ্তারও হয় নাই। কিছুই সন্ধান হইতেছে না। সরকার বাহাদুর প্যারীসুন্দরীর সমুদায় জমিদারী ক্রোক করিয়া আছি-সরবরাহকার নিযুক্ত করিয়াছেন। বরিশালের নিকট সায়েস্তাবাদ নিবাসী সৈয়দ আবি আবদুল্লাহ আছি-সরবরাহকার নিযুক্ত হইয়া আসিয়া সমুদায় জমিদারী সরকার বাহাদুরের পক্ষ হইতে ক্রোক করিয়া কার্য চালাইতেছেন। প্যারীসুন্দরী সদর দেওয়ানীতে আপীল করিয়াছেন। বহু তদবিব, বহু যত্ন, বহু পরিশ্রম ও বহু অর্থব্যয়ে জমিদারী খালাস করিলেন।

নিরপরাধী কয়েকজন আমলা এবং বাজে চাকর, বিনা অপরাধে সাক্ষীর দোষে, দোষী সাব্যস্ত—যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হইল। অল্পদায়ে চাকুরীতে মজিয়া, একেবারে প্রাণেই সারা পাইল। বামলোচন খালাশ পাইলেন। “আহম্মদ” মনিবের আদেশে বিশেষ কর্তব্য-কার্য্য করিতে গিয়া বেঘোরে প্রাণ হারাইল। কান্তর মাতার চির-কান্না সার হইল। বাঁসুর স্ত্রী বাপের বাড়ি চলিয়া গেল। প্যারীসুন্দরী জমিদারীর কতক অংশ পত্তনী ইত্যাদি বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া ঋণ-দায় হইতে মুক্তি হইলেন। আয়ের শ্রেষ্ঠ অংশই প্রায় কমিয়া গেল। পাঠক ! প্যারীসুন্দরীর প্রসঙ্গ সঙ্গ হইয়া অগ্ৰ কথা আরম্ভ হইল।

বিংশ তরঙ্গ

মীরসাহেবের নৌকাযাত্রা

পূর্বকথা অল্পসারে মীরসাহেব এক্ষণে সিরাজগঞ্জের অধীন সৌলিগ্রামে জমীর বাটিতে ষাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন। নিকটেই গৌরীনদী হইয়া ধুমাকলের

নৌকা (ষ্টিমার) প্রায়ই উজান-ভাটি যাওয়াত করে। কিন্তু কোথায় যায়, কোথা হইতে আইসে তাহার খোঁজ খবর কেহই রাখেন না। সকলের মনেই বিশ্বাস যে, মাহেবলোক না হইলে, ধুমাকলের নৌকায় দেশীলোকের চড়িবার অধিকার নাই। মাহস করিয়া সে সময় ষ্টিমারে চড়িতেও কেহ ইচ্ছা করে নাই।

নদীগর্ভে দপ দপ শব্দ হইলে এবং আকাশে ধোঁয়া দেখিলেই তীরস্থ গ্রাম-বাসীরা আপন আপন কর্ম ফেলিয়া নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইত এবং চলতি ষ্টিমার দেখিয়াই চক্ষু জুড়াইত। নদীতীরে যে যে স্থানে পাথুরিয়া কয়লার আড্ডা, সেই সেই স্থানে ষ্টিমার আগাইয়া কয়লা লইয়াই চলিয়া যাইত। কোন আরোহী কি বাঙ্গালীব মালামাল লইত না। কেহ মাল দিতেও প্রস্তুত হইত না। কোম্পানীর কাৰ্য্যই কবিত, মালামাল যাহা কিছু আমদানী-রপ্তানি হইত সে কুঠি-য়াল নীলকরের একচেটিয়া।

মীৰসাহেব নৌকাযোগে সিরাজগঞ্জ যাইতেছেন। বিছানা, বালিশ, খাণ্ড-সামগ্রীর ভার, ভাবে ভাবে দাঁড়ী-মাঝিয়া এবং কুলী মজুরেরা নৌকায় তুলিতেছে। বাবুবাচিনানা নৌকোয়—জালানী কাঠ, বাউলী, বটি, হাতা, তামার পাতিল ঝাঁকা বোঝাই করিয়া উঠাইতেছে। বসীরউদ্দিন নিজের কাপড়ের গাঁটরী, সেতার, তবলা ইত্যাদি বাহকের মাথায় দিয়া নৌকায় উঠাইতেছে, পাশা-খেলার কোট, গুটী আপনহাতে রাখিয়াছেন।

সাঁ গোলাম, দেবীপ্রসাদ এবং অগাধ কশ্চারী, দুই চারিজন প্রতিবেশী মীরসাহেবের সঙ্গে সঙ্গে নদীতীরে নৌকা পর্য্যন্ত যাইতেছেন। সাঁ গোলামের মুখে কথা নাই, বড়ই দুঃখিত, বড়ই চিন্তিত। এত চেষ্টা কবিয়াও কোন ফল হইল না, অছিয়তনামা হাতে আসিল না। কি হইল? শেষে কি হইবে? এই চিন্তাতেই একবারে সারা হইতেছেন। আহা—বিহারে, সাংসারিক কাৰ্য্যে কিছুতেই মন নাই—কিছুতেই আরাম নাই, বড়ই উদ্বিগ্ন—চিন্তার সহিত উদ্বিগ্ন।

অছিয়তনামা নিশ্চয়ই মীরসাহেবের হাতবাক্সে আছে, এইটি তার ধ্রুব বিশ্বাস। এইতো হাতছাড়া হইয়া চলিল। এইতো চলিয়া গেল। আর কি হইবে। সকল আশায় ছাই পড়িল। ঐ তো এখনি হাতবাক্স হাতছাড়া হইয়া চলিল। উপায় কি? মনের আশা মনেই মিটিয়া গেল। মধ্যাহ্নে কতগুলি কথা দেবীপ্রসাদের কানে গেল। একবার মনে করিলেন, হাতবাক্সটা চাকরের হাত

হইতে কাড়িয়া লই। অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহা হইবে। আবার ভাবিলেন যদি এ বাল্কেও না থাকে, তবে আরও বিপদ। এতকালের পরিশ্রম, চিন্তা সকলই মাটি। সাত-পাঁচ ভাবিয়া বড়ই দুঃখিতভাবে সকলের সঙ্গে সঙ্গে ঘাট পৰ্য্যন্ত যাইতে লাগিলেন।

মীরসাহেব গৌরীতটে যাইয়া নৌকায় না উঠিয়া জলের কিনারায় দাঁড়াইলেন। সঙ্গীরাও দাঁড়াইল। সা গোলামকে দুঃখিত দেখিয়া বলিতে লাগিলেন—বাপু! চিন্তা কি? আমি শীঘ্রই কিরিয়া আসিব। আমি তো আর চিরকালের জন্ত যাইতেছি না যে, এত দুঃখিত হইয়াছ। বিষয়াদি, বাড়ি, ঘর, পরিবার সকলই থাকিল। আপন কাজকর্ম দেখিয়া করিবে। ঈশ্বর-ইচ্ছায় কোন বিষয়ে ভাবনা-চিন্তার কাবণ থাকিল না! মধ্যে মধ্যে কেনীব সহিত সাক্ষাৎ করিও। কোন গুরুতর কাণ্ড উপস্থিত হইলে তাঁহাব সহিত পরামর্শ করিয়া, তিনি যেরূপ উপদেশ দেন, সেইরূপ করিবে। সাবধান! কেনীব সহিত কোন বিষয়ে গোলযোগ না হয়। সাবধান! লোকের কথাষ তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হইও না। এইপ্রকার নানা কথা বলিয়া, সা গোলামের মাথায়, মুখে, হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া মীরসাহেব বিদায় হইলেন। সকলেই মাথা নোয়াইয়া সালাম বাজাইল। নৌকার সিঁড়ির উপর উঠিতেই কি কথা মনে হইয়া হাতবাক্স আনিতে অলুমতি করিলেন। বাক্স খুলিয়া একখান জড়ান কাগজ বাহির করিয়া, সা গোলামকে বলিলেন—আমি নৌকাপথে যাইতেছি। পদ্মা, যমুনা হইয়া যাইতে হইবে। ভবিষ্যতের কথা বলা যায় না না। এই দলিলখানিও মূল। ইহাই আমাদের সর্বস্ব-ধন! আমার পিতা-কৃত “অছিয়তনামা” এই দলিলখানি বড় দরকারী এবং আবশ্যকীয় দলিল—হারাইলেই সর্বস্ব হারাইতে হইবে। কারণ এ সম্পত্তির শত্রু অনেক। আর যত দলিল আপনাকে দিয়াছি, সকলের অপেক্ষা এ-খানি অধিক সাবধানে যত্নের সহিত রাখিতে হইবে। জলের উপরে যাওয়া, এ সকল দলিল বাটিতে সাবধানে রাখাই ভাল। বাপু! সাবধানের মার নাই। আমি বহু যত্নে দলিলখানি সর্বদা আপনকাছে রাখিতাম, তুমিও যত্নেই রাখিবে। বিশেষ সাব-ধানে রাখিবে বলিয়া অছিয়তনামা সা গোলামের হাতে দিলেন।

সা গোলাম অছিয়তনামা হাতে পাইয়া একেবারে আত্মবিস্মৃত হইলেন। যা কখনও স্বপ্নেও ভাবেন নাই তাহাই ঘটিল। যাহার জন্ত এত চক্র, যে দলিল

হস্তগত কবিবার জ্ঞান দুখে বিষদান, কবিরাজের সহিত ষড়ষদ্ব, কত চক্র, কত চেষ্টা, কত পরিশ্রম, আজ তাঁহার ভাগ্যে লক্ষ্মী প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকেই বিশ্বাসী পাত্র করিয়া মীরসাহেবের সর্বনাশ ঘটাইতে মীরসাহেব হস্তেই অদ্বিত্যতনামা সা গোলামের হস্তগত হইল। কি আশ্চর্য! ঘটনাস্রোত নিবারণ করে সাধ্য কার! বিধির-নির্বন্ধ ঘূচাইতে ক্ষমতা কার! আত্মবিশ্বাসে শ্বশুরকে প্রণাম করিতেও না গোলামের মনে হইল না। মীরসাহেব নৌকায় উঠিলেন। মাঝিরা লগি উঠাইয়া “দরিয়া গাজী, পাঁচ পীর বদর বদর” বলিতে বলিতে নৌকা জলে ভাসাইয়া দিল। স্ববাস পাওয়া দাঁড়ীরা আর গুণ টানিতে নামিল না। পাইল খাটাইয়া মনের আনন্দে যাইতে লাগিল। নৌকা গৌরীর জলে, গা ভাসাইয়া বায়ু-সহযোগে স্রোত অতিক্রম করিয়া উজান ছুটিয়া চলিল। মীরসাহেব জলে ভাসিলেন। চিরকালের মত জলে ভাসিলেন।

একবিংশ তরঙ্গ

গারদের কয়েদী

ছয়মাস যায় পেটে অন্ন নাই, তবে বাঁচে কিসে? প্রাতে প্রতিজন একসের ধান পায়। সেই ধান হাতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া চাল বাহির করে। সেই চাল আর সন্ধ্যার সময় এক ঘটা জল ইহাই মালখানার কয়েদীর আহারের ব্যবস্থা। কেনীর গারদ বড়ই কঠিনস্থান। যাহার ভাগ্যে সে গারদবাসের অবসর হয় তাহার জীবনে সংশয়। পাঁড়ে, দোবে, চোবের অত্যাচারে, অর্থপিশাচদিগের অমানুষিক ব্যবহারে প্রাণ আর বাঁচে না। তবে যাহার আত্মীয়-স্বজন আছে, দুটাকা সেলামী—গারদ-সেলামী দিবার সাধ্য আছে, তাহার পক্ষে ছুই একদিন একটু নরমে যায়। তাহারপরেই হাড় ভাজাভাজা হয়। প্রাণ যাই যাই করে। মাল্লখের কঠিন প্রাণ—বিশেষ বিপদগ্রস্ত, বিপদাপন্ন ব্যক্তির কষ্টের জীবন। সহজে প্রাণ বাহির হয় না। তাহাতেই কেনীর গারদের কয়েদী—কাজী সমসের আলী এবং তাঁহার ভাতৃপুত্রগণের প্রাণ আজ পর্য্যন্ত বাহির হইয়া সংসারচক্রের জালা-যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পায় নাই। হায়! কি দুঃখের কথা! বিনাপরাধে কয়েদ। পৈতৃক সম্পত্তি লিখিয়া দেয় নাই, তাহাতেই এই বিপদ—গারদে আবদ্ধ। ঘরে ঘরে খাড়া পাহারা। হায়! কেমন করিয়া লিখিয়া দিবে? কোন হাতে, কোন কলমে, কোন

কালিতে, কোন কাগজে লিখিয়া দিবে? পৈতৃক সম্পত্তি, বাহার আয়ের প্রতি নির্ভর করিয়া কতজনার প্রাণ বাঁচিতেছে। কত বিধবার জাতি, ধর্ম রক্ষা পাই-তেছে। কত পিতৃহীন বালকের একমুঠো ভালভাতের সংস্থান রহিয়াছে। কত পুত্রহীনা বৃদ্ধার জীবনোপায়ের উপায় রহিয়াছে। কোনপ্রাণে বিনাপণে লিখিয়া দিবে? আবার প্রাণেও আর সহ্য হয় না। কষ্টের দিন শীঘ্র যায় না। সে রজনী শীঘ্র প্রভাত হয় না। এ সকল সহিয়াও সমসের আলী ভাতুপুত্রগণসহ আজ ছয়মাস বন্দী। সেই যে বসন পড়িয়া শয়ন করিয়াছিল, সেই যে বিছানা হইতে হাত পা রাখিয়া, নিশীষোগে ডাকাতের হায়ে কেনীর লাঠিয়াল সমসের আলীর বাড়িতে পড়িয়া, শয়নঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া কুঠিতে আনিয়াছে। ভাতু-পুত্রগণ বৃদ্ধ খুড়ার উদ্ধারহেতু কুঠিতে ইচ্ছাপূর্বক আসিয়া ধরা পড়িয়াছে, ফাঁদে আটকিয়াছে, গারদখানায় নীত হইয়া বৃদ্ধ খুড়াব সহিত যন্ত্রণাব একশেষ ভোগ করিতেছে। ক্ষৌরী কাষা নাই। চুল বাড়িয়াছে, হাতপায়ের নখ বাড়িয়া সেই এক বিক্রীভাব ধারণ করিয়াছে। চিন্তায়, ভাবনায়, পেটের জালায় অস্থি-চর্মসার হইয়াছে। যাহাদের বীরত্ব কুটিয়া অঞ্চলে প্রসিদ্ধ, সেই সকল বীরবাহুগণ, বীর-শ্রেষ্ঠ বীরগণ অম্মাভাবে ক্ষীণকায় এবং হীনবল হইয়া জরাগ্রস্ত চিররোগীর হায়ে গারদের মধ্যে পড়িয়া জীয়ন্ত মৃত্যুযাতনায় অস্থির হইয়া ছটকট কবিতোছে। কে দেখে? কে জিজ্ঞাসা করে? সূর্য-অস্ত না হইলে আর দ্বার খোলা হয় না। পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হইলেও কেহ ডাকিয়া জিজ্ঞেস করে না। কাছে আসে না, একঘটি জল এগিয়ে দেয় না। খুড়া—ভাইপোয়ে অতি ক্ষীণস্বরে কথাবার্তা হইয়া সাব্যস্ত হইয়াছে যে, আর কতকাল এভাবে থাকিব। সাহেব যে প্রকারে লিখাপড়া করিতে চাহে, দিয়া চল অন্তদেশে ভিক্ষা করিয়া জীবন রক্ষা করি। পরিবার প্রতিপালন করি। এ-কষ্ট আর সহ্য হয় না। এ-যন্ত্রণা আর প্রাণে সয় না। সম্পত্তির জন্তই যখন এতকষ্ট তখন আর সে সম্পত্তিতে লাভ কি? বিপদ-সাগরের একমাত্র কাণ্ডারীই নগদ অর্থ বা ভূসম্পত্তি। ভাগ্যক্রমে আমাদের সেই সম্পত্তিই আমাদের কাল হইয়াছিল। সম্পত্তি ছিল বলিয়াই এতকষ্ট। পৈতৃক বিষয়বিভব ছিল বলিয়াই আজ আমরা কেনীর গারদে। সন্ধ্যার পর দরজা খুলিবেই, একঘটি করিয়া জল দেওয়া—ওটা একটা ভান মাত্র। দুবেলা দুবার দরজা খোলার কারণই এই যে, আমরা কোন কৌশলে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করি, কি

পারছে কয়েদী অবস্থাতেই থাকি, কি নূতন কোনরূপ ঘটানোর মস্তপার চেষ্টা করি। অবশ্যই দরজা খুলিবে সেইসময় বলিয়া দিব যে, আমাদের বিষয়াদি, বাড়িঘর সমুদায় লিখিয়া দিতে রাজী আছি। আমাদেরকে কয়েদখানা হইতে বাহির কর। প্রাণ বাঁচাও।

সময়মত জীবনদাতার নিকটে মনের কথা জানাইলেন। কিন্তু কোনই ফল হইল না। অবশ্যই সে তাহার কর্তব্যকার্য্য করিয়াছে। প্রধান কার্য্যকারক হরনাথ মিশ্রীর নিকট বলিয়াছে। কোনই ফল হইল না। হরনাথ মিশ্রী, শত্ৰু সাহায্য প্রভৃতি কার্য্যকারকগণ মহাঅস্থির—সপ্তাহকাল সাহেবের সঙ্গে দেখা হয় না। কেনী শয়নকক্ষ হইতে আর নীচে নামিয়া আইসেন না, উপরেই থাকেন। কি ভাবে থাকেন, তাহা কাহারও জানিবার ক্ষমতা হয় না। যে কেনী সাংসারিক কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যস্ত, সর্ব্বদা প্রস্তুত। মুহূর্তের জ্ঞাও সংসার ভুলে না। আজ সপ্তাহকাল একেবারে নিরব। আরদালী, চাপরানী দ্বারা খবর পাঠান হইয়াছে কোন উত্তর আইসে নাই। কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কেনীর ছকুম “আমার বিনাদেশে আমার নিকট কেহ না আইসে।” সে আদেশ ঠেলিয়া কারসাধ্য সেদিকে পা ধরে। কাজেই সকলে মহাব্যস্ত। পাংশার ভৈরববাবুকে লইয়াই এখন চলিতেছে। কত মাঝ পেঁচ, পেঁচাও বুদ্ধির পাক নায়েবমশায়ের মাথায় ঘুরিতেছে। কত মিথ্যা প্রবঞ্চনার বৃহৎকনা সকল নৌলকরের চাকরের মক্কাভূমিসদৃশ মনক্ষেত্রে চাকচিক্য দেখাইয়া, মনিবের মনভাবের কারণ অব্যক্ত অজ্ঞাতহেতু চিন্তা-বায়ুর ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া কোথায় পড়িতেছে, তাহার কিছুই ঠিকানা হইতেছে না। কুল-কিনারা পাইতেছে না। এতদিন কয়েদের পর সমসের আলী পৈতৃক সম্পত্তি যোলআনা বিনাপণে লিখিয়া দিতে রাজি হইয়াছে। সে কথাও জানাইতে পারিতেছেন না। একেবারে নিষেধ। কেহ কোনকথা লইয়া তাঁহার বিনাছুমতিতে কে তাহার সম্মুখে যায়।

মেমসাহেবের আসিবার দিনও অতিনিকট হইয়া আসিতেছে। প্রথম বিলাতেব পত্র, তাহারপর কলিকাতার পত্র পাওয়া গিয়াছে। সেও প্রায় দশ বার দিন। বাতাসের জোর নাই বলিয়া, বজরা-নৌকা আসিতে বিলম্ব হইয়াছে। সকলেরই অহুমান এই যে, অল্প লাগাদসঙ্ক্যা অবশ্যই বজরা ঘাটে লাগিবে। নিতান্ত পক্ষে না আসিলে কাল আর কিছুতেই পথে থাকা সম্ভব নহে।

টি. আই. কেনী আজ সপ্তাহকাল নির্জনে বাস করিতেছেন। বিষুববিশ্তবের কথা ভুলিয়াছেন, মামলা-মোকদ্দমার কথা ভুলিয়াছেন। শয়নকক্ষের দরজা বন্ধ কি কারণে, তিনিই জানেন। ষাঁহার জীবর মনের ভাব বুঝিয়া পাঠকগণের নিকট প্রকাশ করিতে উদাসীন পথিকের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে, সে জীবর, স্বামীর মনোগত ভাব বুঝিবার পথিকের ক্ষমতাই নাই। কেনী কয়েকদিন হইতেই বিধাধিত, চিন্তিত, ভাবিত। সময় সময় সাদা চক্ষু সাদা জলে পরিপূরিত। কারণ কি? সে স্বদীর্ঘ গোঁপ এবং গালপাট্টা সংযুক্ত ধবল মুখ এত মলিন হওয়ার কারণ কি? সে নিটোল, নিরেট বিলাতী মজ্জাপূর্ণ বৃহদাকার মস্তক সর্বদা বালিশের আশ্রয়ে থাকিবার কারণ? সে রক্তরাগ পরিপূর্ণ হৃদয়-মধ্যে সর্বদা জাগে কি? সাধ্য নাই—বুঝিবার সাধ্য নাই! উদাসীন পথিকের বুঝিবার সাধ্য নাই। সহস্র অবলার অঙ্গাবরণ হরণকালে যে হৃদয় একটুও নড়ে নাই, শত-সহস্র প্রজার ঘরের চালের আগুন দেখিয়া যে হৃদয়ে ব্যথা লাগে নাই—জ্বালাও, লাগাও, লুটিয়া লও, এই সকল হুকুম করিয়া অশপৃষ্ঠে বসিয়া বঙ্গের নিরীহ প্রজার যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন, কুল-বধুর বস্ত্রহরণ ইত্যাদি মহাপাপ কার্য দেখিয়া যে বিলাতী হৃদয়ে কিছু মাত্র দয়ার সঞ্চার হয় নাই, যে চক্ষু এই সকল মহামারী ঘটনা দেখিয়া একটু নীচে নামে নাই, সে চক্ষে জল! গণ্ডুল ভাসিয়া বালিশ ভিজিতেছে। পালঙ্গের গদি ভিজিতেছে, ইহার মর্ম্ম কে বুঝিবে? তবে কি যে কারণে মহাবিভ্রান অপদস্থ, বুদ্ধিমান নিরস্থ, পূণ্যবান অদস্থ, ধনবান বিপদগ্রস্ত, বীরশ্রেষ্ঠ মহাবীর পরাস্ত, সেই কারণেই কি এই কারণ?—যাক ষাহা নির্ণয় করিতে অক্ষম, আলোচনা নিশ্চয়োজন। মনের কথা কে জানে? যে জানে, সে জানে, যে বুঝে তাহার গোপন করাই কর্তব্য। উজ্জয়েই বল্লী, কেহ ইচ্ছায় কেহ অনিচ্ছায়।

দ্বাবিংশ তরঙ্গ

মিলন

অম্ভমান মিথ্যা হইল। মিসেস কেনী সেদিন আসিয়া পৌঁছিলেন না। প্রধান প্রধান কার্য্যকারকগণের দ্বিতীয় একটি চিন্তার কারণ হইল। আজিকার দিনও যায় যায়। কিন্তু কুঠির আমলা, চাকর, নেগাহবানগণ সকলেই দেখিল যে, কেনী পরিত্কার-পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিয়া শয়নগৃহের সম্মুখস্থ ফুলবাগানে ধীরে

ধীরে বেড়াইয়া বেড়াইতেছেন। বাগানের সংলগ্ন কালীগঙ্গা, দুই একবার কিরিয়া ঘুরিয়া কালীগঙ্গার তীরে যাইয়া দক্ষিণমুখী হইয়া দূরবীন দ্বারা কি যেন দেখিতেছেন। হরনাথ মিলি সময় বুঝিয়া বন্দী কাজী সমসের আলীকে লইয়া বাগানের গেটের নিকট যাইয়া দাঁড়াইলেন। কেনী দ্বিতীয়বার ঘুরিয়া আসিতেই হরনাথের উপর নজর পড়িল। একটু ত্রস্ত-পদে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, খবর কি? কাজীসাহেব এবশে কোথা হইতে আসিলেন।

হরনাথের মুখে কথা ফুটিতে না ফুটিতেই কাজী সমসের আলী বলিতে লাগিলেন সাহেব! তোমাব যেক্রপ ইচ্ছা হয় লিখিয়া লও। আর আমরা বাঁচি না। আর প্রাণে সহ্য হয় না।

কেনী একটু মুচকিয়া হাসিয়া উত্তর করিলেন—কি হইয়াছে? আপনি এতদিন আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই কেন? এতদিন কোথায় ছিলেন? ভাল আছেন তো? লোকে আগে বুঝে না, শেষে পায় ধরিয়া কান্দিতে থাকে। আচ্ছা! আর আমার কোন আপত্তি নাই। সকলই মিটিয়া যাইবে—লিষণপড়া কনাই হইবে। আব আপনাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না।

কাজীসাহেব বলিলেন—ব্যস্ত আমরাই এখন বেশী হইয়াছি। প্রাণের মায়া বড় মায়া। আর অধিক কি বলিব! পৈতৃক তালুক, জোত ইত্যাদি স্থাবর-অস্থাবর যাহা কিছু আছে, সমুদায় লিখিয়া লইয়া আমাদেরগকে ছাড়িয়া দিন। আর বাঁচি না। দোহাই আপনার! প্রাণ গেল—আর বাঁচি না।

কেনী বলিলেন—“বাঁচি না, বাঁচি না” করিতেছেন, আগে বুঝেন নাই কেন? আচ্ছা, আজ কোনকথা হইবে না। বোধহয় মেমসাহেব এখনই আসিয়া পৌঁছিবেন। আমি তাঁহার বজ্রার মাঙ্গল দেখিতে পাইয়াছি। বোধহয় কুঠির বজ্ররাই আসিতেছে আপনি এখন আপনার বাসস্থানে গমন করুন। কাল লিষণপড়া হইবে—আজ দিবি আহার করিয়া শয়ন করুন গে।

কাজী সাহেব মাথা হেঁট করিয়া বলিতে লাগিলেন—অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে। বরাতে যাহা আছে তাহাই আহার করিব। কোন পাপে ইহা ঘটিল—খোদায় মালুম। আর আপনাকে কি বলিব। চলিলাম, আপনার গুদাম ঘরেই চলিলাম।

কেনী মুচকি হাসির আভা দেখাইয়া আবার নদীর তীরে যাইয়া দূরবীন

চক্ষে ধরিলেন। দেখিলেন, এবারে স্পষ্ট দেখিলেন। সেই বজরা—সেই তাঁহারই কুঠির বজরা। যে বজরায় মেমসাহেব কলিকাতায় গিয়াছিলেন। স্ববাতাস পাইয়া পাইলভরে জ্বল কাটিয়া শ্রোত ঠেলিয়া যেন উড়িয়া আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে বজরা নিকটবর্তী হইল, পাইল পড়িয়া গেল সকলেই দেখিল মেমসাহেব ছাতের উপর ইজিচেয়ারে কুঠির দিকে তাকাইয়া আছেন। মুহূর্তমধ্যে বজরা ঘাটে লাগিল। লাগিবামাত্র সিঁড়ি পড়িল। টি. আই. কেনী দ্রুত-পদে যাইয়া প্রিয়-তমার হস্ত ধারণ করিলেন। কমলমুখীর কমলদলসদৃশ মুখমণ্ডলের স্তম্ভবোধ-স্থানে বাব বার চুষন কবিলেন। এবং প্রাণ প্রতিমার দক্ষিণহস্ত বামবগলে চাপিয়া ধীরে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া ফুলবাগানে প্রবেশ করিলেন। মেমসাহেবের আসবাব, লগুয়াজিমা ঘরে উঠিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যাদেবী জগৎ অস্বীকার করিয়া লোকের চক্ষুজ্যোতি হরণ করিলেন। বিরামদায়িনী নিশা সমাগতা হইয়া পুরাতন দম্পতির বিচ্ছেদের পর মিলনস্তম্ভের স্তব্যাগ করিয়া দিয়া ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। চন্দ্রমা হাসিতে হাসিতে, তাবাদল ফুটিতে ফুটিতে সময় সময় মিটিমিটি ভাবে চাহিতে চাহিতে, বিমানরাজ্যে বিহার করিতে করিতে ক্রমে রজনীব শোভাবর্দ্ধন কবিত্তে লাগিলেন। পুরাতন-দম্পতি বিশ্রামগৃহে, মখমলমণ্ডিত-কোচে উপবেশন কবিয়া হাসিমুখে নানাপ্রকার কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন।

সোনাউল্লার ক্ষুষ্টি দেখে কে? সর্দার বেহারার ছুটাছুটির অন্ত পায় কে? দেয়ালগীব, ল্যাম্প, লণ্ঠন, হাতবাতি যেখানে যাহা প্রয়োজন মনের আনন্দে জালিয়া দিয়া মেমসাহেবের শয্যার আরোজনে প্রবৃত্ত হইল।

নিয়মিত সময় সাহেব, মেমসাহেব আহাৰাদি সমাপন করিয়া আপন আপন শয্যায় গমন করিলেন। মিসেস কয়েকমাস পরে কুঠিতে আসিয়াছেন। পরিবর্তন-শীলা জগতে পরিবর্তন কথা নূতন নহে। মিসেস কেনী রাত্রিবাস পরিধেয়ে অঙ্গ ঢাকিয়া পালঙ্কে বসিয়াছেন। মনে নানাকথা উদয় হইয়াছে। স্বামীর হাবভাব, চাকরদের মুখভাব দেখিয়া তাঁহার মনে মনে নানাপ্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার অল্পপস্থিতকালে, বিশেষ কোন ঘটনা যেন ঘটিয়া গিয়াছে। কি ঘটিল? কি হইল? এমন ঘটনা কি? কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অনেক চিন্তা করিলেন, কোন কিছুই স্থির হইল না। স্বভাবতঃই হউক কি চিন্তের বিকারেই

হউক, কি দশ-বারদিন নৌকায় থাকা গতিকে মাথার দোষেই হউক, স্থির করিলেন, একটি স্থির করিতে দশটির প্রমাণ পাইলেন। প্রথম বজরায় স্বামীর কবম্পর্শ—সে পরশে যেন তাঁহার শরীর বোমাঞ্চ হয় নাই, সে অপূর্ব বিজলীছটা শরীরের নানাহানে খেলা করিয়া যেন হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নাই। সে অপূর্ব রসময় প্রেম-চুষনে প্রেমাত্মরাগ যেন বৃদ্ধি করে নাই। বজরার সিঁড়ি হইতে নামিবার সময়, হরিহরআত্মা হইয়া নামিয়াও প্রেমউল্লাসে মন গলিয়া যায় নাই। কারণ কি? তাইতো একত্র একাসান বসিয়াও হৃদয়কমল, অমুরাগ প্রতিভায় যেন সম্পূর্ণ বিকশিত হয় নাই। গায়ে গায়ে মিশিয়া একত্র আহারেও যেন পূর্বের ত্রায় স্বথ বোধ হয় নাই—তৃপ্তি জন্মে নাই। স্নমূর শ্রাম্পিনের মাস স্বামীহস্তে গ্রহণ করিয়াও যেন মন খোলে নাই। কাবণ কি অনেক চিন্তা করিলেন, অনেক কথা মনে তুলিলেন, কিছুতেই মন বুঝিল না। শান্তিস্থখে-মন ভয়িল না—মজিল না। কেন এমন হইল? দোষ কাহার? লজ্জিত হইলেন। নিকটস্থ বৃহৎ দর্পণে মুখখানি ভাল করিয়া দেখিলেন। লজ্জায় অধোমুখী হইয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। উপস্থিত চিন্তার সমালোচনার ফল প্রকাশ হইতে বাকি রহিল না। সে মনোবেগ আমাতে প্রবেশ করিবে, আমার মনোবেগ তাঁহাতে যাইবে। ইহাতে নিশ্চয়ই বোধহইল দোষ তাঁহার? তাঁহারই মনে যেন কি বসিয়াছে। স্বামী-হৃদয়েই যেন কি পশিয়াছে। পুরুষের হৃদয়-কন্দরে প্রবেশ করিতে কতক্ষণের কাজ। চিন্তা কি? আজ নাহয় কাল, কাল নাহয় পরন্তু, বুঝিতেই পাবিবে। কয়দিন গোপনে থাকিবে? রাত্রিও অধিক হইয়াছে। কয়েকদিন জলের উপর থাকিয়া এখনও যেন মাথা ঝুলিতেছে। একটু ঘুমাই।

ত্রয়োবিংশ তবঙ্গ

অধঃপাতের সূত্রপাত

ময়নার মৃত্যুর পর জকি প্রায়ই স্নানবপুর যাইত। দুই-তিনদিন থাকিয়া আবার আসিত। জকির প্রতি টি. আই. কেনোব বিশেষ অনুরাগ। ময়নার মৃত্যুর পর জকির ইচ্ছাধীন চাকুরী হইয়াছে। জকী অভাবে কোন কাজকর্ম আর বন্ধ থাকে না। গুদামের চাবি, দানার গোলাব চাবি জমাদারের হস্তে গিয়াছে। জকির ছোট স্ত্রী মাথনা সপত্নীর নিকট যে কয়েকটি কথা শুনিয়াছিল, তাহা তাহার প্রতিবর্ণ অন্তরে বসিয়া গিয়াছে। জকিকে দেখিলেই মাথনার শরীরে আশ্রয়

জলিয়া উঠে। মাথনা ক্ষুব্ধিত করে, চক্ষু পাকল করে, ভার ভার মুখখানি আরও ভারি করিয়া সরিয়া যায়। জকির মুখ দেখিতেই একেবারে নারাজ। কি করে, উপায় নাই। আর কি করিতে পারে?

ভারতে দ্বীপ নিকট স্বামীর বড়ই মান ও আদর। বড় করিয়া কথা কহিতেও ভয় করে। স্বামী দেবতা, স্বামী অন্নদাতা, স্বামী বিধাতা, স্বামী ত্রাণকর্তা,—স্বামীই বুদ্ধি, স্বামীই বল, স্বামীই সকল, স্বামী পদসেবা করাই কুলদ্বীপ প্রধান ধর্ম। জকি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, সুন্দরপুরের কোন লোক আজ আসিয়াছিল? মাথনা বলিল—“একটি লোক আসিয়াছিল। তোমার নাম করিয়া ভাই! ভাই! বলিয়া, কয়েকবার ডাকিয়া কোথায় চলিয়া গেল। বাটিতে কেহই ছিল না আমি কোনকথার উত্তর দেই নাই।”

জকি রোষভরে বলিল—“এমন হতভাগিনী তো আর দেখি নাই যে, আমি বাটিতে নাই বলিয়া কি আর কাহার সহিত কথা কহিতে নাই? তাদের তো বুদ্ধি নাই। তোরা মানুষও নহিস। বনের পশুও নহিস। একটি কাজ নষ্ট হইয়া গেল।” মাথনা বলিল—“আমি কি জানি, তোমার সহিত তাহার কি কাজ। ভাই ভাই করিয়া থাকিল, আমি বেড়াব আডালে থাকিয়া দেখিলাম সে একা নহে। তাহার সঙ্গে আরও একটি লোক আছে। আর সেই লোকটির বগলে কাপড়ে জড়ান একটা ভারী কি জিনিস আছে। অনেক ডাকডাকি করিয়া বগল হইতে কাপড়ের পুঁটলি মাটিতে ফেলিতেই বোধহইল যেন কতকগুলি পয়সা কি টাকাই একত্রে বান্ধা।”

জকি শুনিয়াই অস্থির। প্রকাশে বলিতে লাগিল—“তাদের কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান নাই! আমি সাহেবের কুঠিতে থাকিয়া দেখিতেছি, নূতন কোন সাহেব আসিলে মেমসাহেব নিজে যাইয়া আগু বাড়াইয়া আনেন। দুইজনে চুমা খাওয়া হয়, গলায় গলায় মিশিয়া হাত ধরাধরি হয়। তোরা কোন কার্যের নহিস। কেবল ঘোমটা—তাদের কেবলই ঘোমটা।”

“আমি গরিব, দুঃখী বাঙালীর মেয়ে। বাঙ্গালা আমাদের দেশ। আমাদের দেশের চাল-চলন যাহা আছে তাহাই করিব। সাহেব বড়লোক, দেশের রাজা। তাঁহারা যাহা কখন, আবার সে সকল দেখিয়া দরকার কি? আমি গরিব মানুষ, মেমসাহেবের মত ব্যবহার করিতে আমার ক্ষমতা নাই। হইবেও না।”

“আমি জানি, যে আমার ঘরের লক্ষী ছিল সে চলিয়া গিয়াছে।”

“সে চলিয়া গিয়াছে না বাঁচিয়াছে। তোমার হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। তুমি টাকার লোভে তাহার সঙ্গে যে ব্যবহার করিয়াছ, তাহাকে যে পথে চালাইয়াছ, যে প্রকারে বাঘের মুখে—মাছ-বাঘের মুখে ধরিয়া দিয়াছ তাহা সকলি শুনিয়াছি। তুমি টাকা হাতে পাইলে না পার এমন কোন কুকাঁজ দুনিয়া-জাহানে নাই। সে কি করিবে? তোমার হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় ছিল না। নিজের প্রাণ নিজে দিতেও কতদিন সে প্রস্তুত হইয়াছে, পারে নাই। নিরুপায় হইয়া তোমার অত্যাচাৰ সহিয়াছে। স্বামী হইয়া যাহা করিয়াছ, ভালই করিয়াছ। সে পাপের ভোগ তোমাকে কোনদিন ভোগ করিতেই হইবে। তা যা করিয়াছ ভালই করিয়াছ। আমি তোমার দুখানি পাপ ধরিয়া মিনতি করিয়া বলিতেছি, আমার বাপ-মাঘের বাড়িতে আমাকে পাঠাইয়া দেও। আমার মন বড়ই অস্থির হইয়াছে। অনেকদিন হইতে মাকে দেখি না—বাবাও আর এখানে আসেন না। তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য আমার মন বড়ই উচাটন হইয়াছে। আমি খোদার নাম করিয়া বলিতেছি, এখানকার কোনও কথা আমি কাহারও নিকট বলিব না। আমাকে শীঘ্রই পাঠাইয়া দেও। কিছুদিন পরে আমি আবার আসিব। তুমি না পাঠাও তাহাদিগকে খবর দিলে তাহারা আমাকে লইয়া যাইবে।”

জকির মুখে কথা নাই। যে কথা কেউ জানে না—মনের অগোচর, স্বপ্নের অগোচর, সেই কথা তুলিয়া এতকথা বলিল। জকির গা দিয়া ঘাম ছুটিল। রোষ-ভাব বহুদূর সরিয়া গিয়া লজ্জায় মাথা নিচু হইল। কালমুখ আর কাল হইয়া গেল। এই সময় বাটি হইতে কে উচ্চস্বরে ডাকিতে লাগিল, ‘ভাই জকি বাড়িতে আছে?’

জকি গলার আওয়াজেই চিনিতে পারিয়া ভান্সাঘরে উত্তর করিল—ভাই! বাড়ির তিতরে আইস। আমার ঘরের লক্ষী আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। এখন এক অলক্ষীর হাতে পড়িয়াছি—আর আমার ভালাই নাই।

আগন্তুক বাড়ির মধ্যে উপস্থিত। জকি আদর করিয়া একখানি পিঁড়ি আনিয়া দিল, আগন্তুক ভাতা ছাতি, লাঠি সম্মুখে রাখিয়া পিঁড়ি পাতিয়া বসিল। তখনই তামাক, তখনই হাত-পা ধুইবার জল, তখনই জলবোগের (নাস্তার) খই, বাতাসা ভাইয়ের সম্মুখে দিয়া ময়নার স্বরবকথা অতি সংক্ষেপে বলিয়া নান্দা-

প্রকার দুঃখ করিতে লাগিল।

আগন্তুক বলিল—‘তাই ! দুঃখ করিয়া আর কি লাভ হইবে ! শেকি আর ফিরিয়া আসিবে ? যে ভালহয় সে থাকে না। এখন কথা শুন ! আমি আবার এখনই যাইব। বড় জরুরী কাজ।’

‘কথা তো শুনিয়াছি, আমিও প্রস্তুত আছি। তবে কথাটা কি জান ? আশা অনেকেই দেয়, কাষা-উদ্ধারের জন্য অনেকেই কথা বলিয়া থাকে। কাষা শেষ হইলে বুঝিতেই পার—তুমি বা কে আমি বা কে ?’

‘সে কি কথা ! তুমি কি আমাকেও অবিশ্বাস কর ?’

জকি মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিতে লাগিল। ‘না—না তাও কি হয়। তোমায় অবিশ্বাস করিব ? তাও কি হয়।’

‘তবে আর আপত্তি কি ? আব দেখ তোমাকেই তো আগে বিশ্বাস করিয়াছে। কিছুই হয় নাই। কাজের কিছুই হয় নাই। আগেই তোমার হাতে একটি নয়, দুইটি নয়, দশটি নয়, পাঁচশত দিয়াছে। আর চাই কি ? অর্ধেক তো হাতেই আসিয়াছে। আবার আমিও কিছু আনিয়াছি। এরপর যাহা বাকি থাকিবে, তুমি আমার নিকট হইতে লইও। তুমি জানিও, এদিকের চক্র ওদিকে গেলেও সে ঘরের কথা, একটুও এদিক-ওদিক হইবে না। এখন তুমি পারিলে হয়। আর আমি বেশীক্ষণ তোমার বাটিতে থাকিব না। এই টাকা আর এই সেই জিনিস নেও, যত শীঘ্র হয় করিবে। আমি চলিলাম।’

জকি টাকার তোড়া এবং কাঠের ছোট একটি কোটা ত্রস্তে ভাইসাহেবের হস্ত হইতে লইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল। ভাইসাহেবও ত্রস্তপদে বাড়ির মধ্য হইতে বাহির হইয়া সরিয়া পড়িলেন।

জকি ঘর হইতে বাহির হইয়া স্ত্রীকে বলিল—‘তুমি প্রস্তুত হও, আমি বেহায়াবাড়ি চলিলাম আজই তোমাকে পাঠাইয়া দিব।’

জকি বাড়ির বাহির হইয়া মনে মনে স্থির করিল যে, এই বালাইকে আর এখানে রাখিব না। আজ আমাকে বলিল, কাল আর একজনকে বলিবে, ক্রমেই কথা প্রকাশ হইবে। ভাল হইল, কিছুদিন বাপ-মার বাড়ি গিয়া থাকুক।

চতুর্বিংশ তরঙ্গ

বিষ

জকি স্ত্রীকে বাপেরবাড়ি পাঠাইয়া কুঠিতে হাজিরা দিতে আসিয়াছে। সে-দিন নাই, সে-কাল নাই, সে আদর নাই, জকির সে খাতির নাই। জকির নামে কাহাব ভয়ও নাই। প্রতিদিন হাজিরা দিতে হয়। নিয়মিত সময় উপস্থিত না হইলে, মেমসাহেবের বকুনি খাইতে হয়। কিন্তু মেমসাহেবের কামরা ব্যতীত জকির সকলস্থানেই যাওয়াব অধিকার আছে। সেটা এখনও বারণ হয় নাই।

অন্যকক্ষে সাহেব-মেম উভয়ে ব্রাণ্ডপানীর স্বাদ লইতেছেন। মিসেস কেনী পূর্বে ব্রাণ্ডব নাম গুনিতে পারিতেন না—এবাবে বিলাত হইতে আসিয়া খুব চালাইতেছেন। সকল সময় হাসি-খুশী-বাজনায গানে সময় কাটাইতেছেন।

জকি মেমসাহেবের নিকট হাজিরা দিয়া সেলাম রাজাইয়া বিদায় হইল। কিন্তু বাড়িতে আসিল না। একবার নীচে একবার উপরে, একবার বাবুরচিখানায়, একবার সাহেবের লিখিবার ঘরে, এইরূপে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। জকি যেন মনে মনে কি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। কোন জিনিস খুঁজিবার ভার নহে। সময় খুঁজিতেছে। স্থযোগেব সন্ধান করিতেছে।

খানসামা, সর্দার বেহাবা সকলেই আপন আপন নিদিষ্টস্থানে বসিয়া নানা-প্রকারেব গল্প কাঁদিয়া বসিয়াছে। জকি পুনরায় উপরে আসিল। খানার মেজ সাজান। সাহেব-মেম অল্প কামবায়। খুব হাসি-তামাসার রগড় চলিতেছে। জকি ক্রমে ক্রমে খানাব কামরায় উপস্থিত। চাবদিকে তাকাইয়া অগ্রসর, আবার তাকাইয়া আরও অগ্রসর—চারদিক দেখিয়া দাঁড়াইল। কোমরের খুঁট হইতে একটা কোটা বাহির করিল। কোটার পরিচয় আর বিশেষ করিয়া কি দিব। সেই কোটা ভায়ের-দস্ত কোটা। কোটা হইতে কি যেন উঠাইয়া চা-দানির মধ্যে ফেলিয়া দিল। চা-দানির সরপোষ দিয়া পূর্বমত ঢাকিতেই ভয়ে হাত কাঁপিয়া উঠিল। সরপোষের প্রতিঘাতে একটু শঙ্ক হইল। ঠিকভাবে পূর্বমত সরপোষ বসিল না। ভাল করিয়া পূর্বমত ঢাকিতেও আর সাহস হইল না। তাড়াতাড়ি অল্প দরজা দিয়া নীচে নামিয়া গেল। সোনাউল্লা, সর্দার বেহারার খোশ-গলপে মন মাতাইয়া বসিয়াছিল। খানারকামরা মধ্যে হঠাৎ একটি শব্দ হইয়া তাহার কানে গিয়াছিল। কিন্তু উঠিয়া আসিয়া দেখা, কি, কি কারণে শব্দ তাহার কারণ অল্পসন্ধান করা তত

আবশ্যক মনে করিল না। কারণ মুখ ফিরাতেই দেখিল যে, জকি সিঁড়ি দিয়া নিচে নামিতেছে। আর কোনরূপ সন্দেহের কারণই হইবার কথা নহে। জকি ঘরের চাকর, সাহেবের বিশ্বাসী ও ভালবাসার। অন্তলোক হইলে তখনই উঠিত। কি কারণে শব্দ হইল তাহার অনুসন্ধান করিত। জকিকে চিনিয়া আর উঠিল না। কান পাতিয়া রেঙ্গুনের গলপ শুনিতে লাগিল।

কিছুক্ষণপরেই মেমসাহেবের হাত ধরিয়া কেনী খানারকামরায় আসিলেন। সোনাউল্লা, বেহারা প্রভৃতি চাকরবো হাজির। খানার বাসনের সরপোষ উন্মোচন হইল। ছুরি-কাঁটা চলিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে স্প্রিংয়ের কাক ফুটিতে আরম্ভ হইল। প্লেট বদল হইতেছে। ছুরি চলিতেছে। গ্লাস উড়িতেছে। একটির পর একটি খাণ্ড উদবে ঢুকিতেছে। পবম্পব কথাবার্তাও হইতেছে, উচ্চহাসি, মুহূহাসি উভয়েই মুখেই দেখা দিতেছে। পাকা একঘণ্টাব পব আহাৰ শেষ হইল। এখন “চা” খাওয়ার পালা। সোনাউল্লা চা-দানির নিকট গিয়া দেখে যে, চা-দানির সরপোষ নিয়মমত বসান নাই। কোন অজ্ঞানালোক সব-পোষটি চা-দানির উপর রাখিয়া গিয়াছে সন্দেহ হইল। সোনাউল্লা মনে সন্দেহ হইল। হঠাৎ সেই শব্দের কথা মনে পড়িল। সোনাউল্লা অনেক বিবেচনা করিয়া সাহেবের নিকট ঘোড়হাতে বলিতে লাগিল—“হজুব, ! এই চা-দানির সরপোষ আমি যেভাবে রাখিয়াছিলাম, ঠিক সেইভাবে নাই। আর একটি কথা—আমি বাহিরে বসিয়া ঘরের মাঝে একটি শব্দও শুনিতে পাইয়াছিলাম। সেইসময় জকি এই ঘর হইতে পাশের দরজা দিয়া বাহির হইয়া নীচে নামিয়া গিয়াছিল। তাহাও দেখিয়াছি। আমার মনে সন্দেহ হইতেছে। যেই হউক চা-দানির সরপোষ উঠাইয়াছে।”

সাহেব চা-দানির নিকট যাইয়া বলিলেন—“জকি খানারকামরায় আসিয়া চা-দানি নাড়িবে কেন ?”

সোনাউল্লা বলিল—“সে তো চিরকাল খানারকামরায় আসিয়া থাকে।”

মিসেস কেনী বলিলেন—“খানার ঘরে তাহার কাজ কি ? সে এখানে কেন আসিবে ? তোমরা এ ঘরে তাহাকে আসিতে দাও কেন ? শুনিয়াছি যে, সে ঘরের কাজের চাকর। তার যে কি কাজ, তাহা আমি দেখি নাই। অথচ সে ঘরের চাকর—কি অশ্রদ্ধা কথা।

মেমসাহেব চা-দানি হইতে, প্যালায় চা ঢালিয়া কেনীকে দেখাইলেন—চার আসল রং নাই। একটু ময়লা ময়লা রং! বেশী কড়া হইলেও একরূপ হয় না। টি. আই. কেনীর মনে সন্দেহ হইল। প্যালায় চার মধ্যে এক টুকরা কুটি ভিজাইয়া মেমসাহেবের কুকুরকে খাইতে দিলেন। টরী লেজ নাড়িতে নাড়িতে চপর চপর শব্দে বিবাক্ত কুটি উদবস্থ করিল। কেনী ঘড়ি ধরিয়া খানারকামরা-তেই বসিয়া রহিলেন। ত্রিশ মিনিট অতীত হইতে টরী ভারী-অস্থির হইল। এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়, একখানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। গড়াগড়ি দেয়। অস্বাভাবিক স্বরে খেউ খেউ করে। খানসামা, খেদমতগার, বাবুরচির মুখ শুকাইয়া গেল। একঘণ্টা পূর্ণ না হইতে টরী মাটিতে হাত-পা ছড়াইয়া পড়িয়া গেল। গড়াগড়ি পড়িয়া হাউ-মাউ করিতে করিতে একেবারে নিশ্বেজ হইয়া পড়িয়া গেল। সোয়া-ঘন্টার মধ্যে কুকুরের চেতনা রহিত, মৃত্যু।

কেনী ক্রোধে অধীর হইয়া জমাদারকে ডাকিয়া বলিলেন—“যত সর্দার, বরকন্দাজ, লাঠিয়াল আমার চাকর আছে, এই মুহুর্তে যাইয়া জকিকে বান্ধিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত কর।”

জমাদার সেলাম বাজাইয়া, তখনই লাঠি ঘাড়ে করিয়া ছুটিল। জকির প্রতি কেহই সন্দেহ ছিল না। অনেকে পূর্ব-দাদ তুলিতে সর্দারের সঙ্গি হইয়া জকিকে ধরিয়া আনিতে চলিল। কেনী—সোনাউল্লা, সর্দার, বেহারা, বাবুরচি, মশালচি, পাখাওয়ালা সমুদায় চাকরকে আটক করিয়া রাখিলেন।

জমাদারদিগকে জকির বাড়ি পর্যন্ত যাইতে হইল না। জকি কুঠিতেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সাহেবের খানাখাওয়া হইলে ছটফটি দেখিয়া সুন্দরপুর যাইবে মনস্থ করিয়াছিল। তাহা আর ঘটিল না। ঈশ্বর টি. আই. কেনীকে রক্ষা করিলেন। একজনের চক্ষে পড়িতে পড়িতে জকি দশজনের চোখে পড়িয়া মৃত হইল। বন্ধন-অবস্থায় সাহেবের নিকট আনীত হইল, সাহেব দালানের খাষার সহিত বান্ধিতে আদেশ করিয়া, শ্রামচাঁদ বাহির করিয়া আনিতেই জকি বলিতে লাগিল—জব্বর! আমাকে প্রাণে-জারিবেন না। আমি যখন ধরা পড়িয়াছি আমার জীবন শেষ হইয়াছে। আপনার যা ইচ্ছা হয় করুন।

টি. আই. কেনী কিছুতেই ক্রোধ সঞ্চরণ করিতে পারিলেন না। দুই চার ঘণ্টা মারিতেই জকি বলিতে লাগিল—আমি বিষ দিয়াছি। ধর্মবতীর! আমি

চার মধ্যে বিষ মিশাইয়া দিয়াছি। বিষের কোটা এখনও কোমরেই আছে। সাহেব প্রহার ক্ষান্তদিয়া কোমরের কাপড় খুলিতে খুলিতে কোটা পড়িয়া গেল, আর জকিকে প্রহার করিলেন না! বন্ধন অবস্থায় একটি কক্ষে তালাচাবি দিয়া বন্ধ করিবার আদেশ দিলেন। আরও আদেশ করিলেন যে, এই রাত্রেই জকির বাড়ি, ঘর, দ্বার ভাঙ্গিয়া কালীগঙ্গায় তাসাইয়া দেও। মালামাল, টাকাকড়ি যাহা থাকে, সমুদায় কুঠিতে লইয়া আইস।

আদেশ মাত্র রামইয়াদ, ধনইয়াদ, লছমীপৎ সিং, রামলাল তেওয়ারী, কুড়ান, জুড়ান, নবীন প্রভৃতি প্রধান প্রধান সন্দার, দেশওয়ালী উদ্ধবাসে ছুটিল। কুঠির বাজে চাকর যাহারা চিরকাল জকির নামে হাড়েচটা তাহারাও লাঠিয়ালদিগের সঙ্গে যাইয়া জকির বাড়ি লুট আবস্ত করিল।

জকির স্ত্রীর পূর্বেই পিতার বাটিতে গিয়াছিল। বাটিতে কয়েকজন চাকর মাত্র ছিল। কে কোথায় পালাইল, তাহার আর সন্ধান হইল না।

টি. আই. কেনী চক্ষে সে রাত্রে নিদ্রা নাই। কুকুরের দশা যাহা স্বচক্ষে দেখিলেন, নিজের অবস্থাও তাহাই ঘটত—এই সকল চিন্তা করিয়া আরও নানা-প্রকার কথা মনে উঠিল। চিন্তিতভাবেই সে রাত্রি কাটিয়া গেল।

প্রত্যুষেই প্রধান কাধ্যকারক হরনাথকে ডাকিয়া জকির অবস্থা বলিলেন। আর আদেশ করিলেন যে, তুমি নিজে যাইয়া দেখ, জকির সমুদায় ঘর ভগ্ন হইয়াছে কিনা। যদি না হইয়া থাকে—একেবারে সমভূমি করিয়া কালীগঙ্গায় ফেলিয়া দিও। বাড়ীর নিশান মাত্র না থাকে। এবং ভিটায় চাষ দিয়া এখনই নীল-বুনানি করিয়া আসিবে ইহার কোন বিষয়ে ত্রুটি না হয়।

হরনাথ সেলাম বাজাইয়া মনিবের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে চলিলেন। সাহেব পুনরায় ডাকিয়া বলিয়া দিলেন। আর একটি কথা। মুসলমানেরা কবরকে বড় মাগু করে। কোন কবরের উপর যেন চাষ দেওয়া না হয়। সাবধান! আমি এখনই জকিকে পাবনায় মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট চালান করিব।

হরনাথ পুনরায় সেলাম করিয়া বিদায় হইলেন। টি. আই. কেনী পাবনার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত লিখিয়া জকিকে বন্ধন করিয়া পাবনায় পাঠাইয়া দিলেন।

পরে জকির স্বীকৃত-জবাবে বিষ পরীক্ষায় পর সেসনের বিচারে জকির

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দৃশ্যভাষ্য হইল। জকির দ্বীপ পিতা-মাতার বাড়ি থাকিয়া স্বামীর অবস্থা শুনিয়া কান্দিয়া, নাকের নখ, হাতের চুরি সমুদায় খসাইয়া ফেলিল। জকির প্রমদ, জকির দ্বীপান্তর পয়নের সঙ্গে সঙ্গে একেবারে শেষ হইয়া গেল।

পঞ্চবিংশ তরঙ্গ

ভৈরববাবু

পাংশা স্টেশনের নিকটেই ভৈরববাবুর বাড়ি। ভৈরববাবু বনিয়াদীবাবু। যে সময়ের কথা, সে সময় বাবুর সংখ্যা বড়ই কম ছিল। বাবু বলিতে ভৈরববাবু। বিশেষ শ্রান্ত-গণ্য, বনিয়াদী-ঘরানা, সচ্চরিত্র, সং-স্বভাব, সকলেই প্রিয় যিনি, তিনিই বাবু নামে পরিচিত হইতেন। শুধু আলবার্ট কেতায় চুল কাটাইয়া সিঁথির বাহার উড়াইলে সে সময় বাবু হওয়া যাইত না। বাবুর বাজার বড়ই কড়া ছিল। ভৈরববাবু যথার্থ বাবু। ভৈরববাবুকে জন্ম করাই এখন কেনীর মতলব। মীরসাহেব ভৈরববাবু সম্বন্ধে অনেক বলিয়াছেন। বাবুকে বিশেষ কোনরূপ বিপদগ্রস্ত না করিয়া তাঁহাকে একটু জন্ম করাই কেনীর নিতান্ত ইচ্ছা। সকলেই বলে ভৈরববাবু ভারি চতুর, বুদ্ধিমান, সহজে ঠকিবার পাত্র নহেন। কেনীর তাহা সহ হয় না। বাঙ্গালী বুদ্ধিমান, বাঙ্গালী সূচতুর, বাঙ্গালী বিচক্ষণ-একথা কেনীর সহ হয় না। ভৈরববাবুকে আচ্ছা করিয়া জন্ম কবিয়া সাধারণকে দেখাইবেন, বিলাতী চাল চালিয়া বাবুকে মাত করিবেন, এই আশাতেই বড় সাবধানে ব'ড়ে টিপিতেছেন। বাবুও কম নহেন আত্মরক্ষায় খুব সাবধান হইয়াছেন। তিনিও তুখোড় খেলোয়াড়, সহজে পড়িতেছেন না।

কেনীর প্রধান গোয়েন্দা ফটিক, আর হরিদাস। ফটিক প্রায়ই ফকির-বেশে গোয়েন্দাগিরি করে। হরিদাস বৈরাগী সাজিয়া খমক বাজাইয়া মনিবের কার্যোদ্ধার জন্য গান করিয়া বেড়ায়। সময় সময় খনজনীও বাজায়। ভিক্ষাও করে।

ভৈরববাবুর চাকরেরা সন্মানে জানিয়াছে যে, এবারে লাটের কিস্তির খাজনা যশোহরে যাইতেই, যে কোশলে হউক পথ হইতে কেনী লুটপাট করিয়া লইবে।

বাবুও সে কথা শুনিয়াছেন।

খাজনা দাখিলের দিন নিকটে আসিল। আমলারা সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল যে, বাবু খাজনা পাঠানোর কোন উপায় করিলেন না। পক্ষে

কেনী এবারে নিশ্চয়ই টাকা লুটিয়া লইবে। তাঁহার ইচ্ছা এই যে, টাকা লুটিয়া লইলে, যশোহরের খাজনা দাখিল হইবে না। মহাল নাটে উঠিবে। যত টাকাই হউক, নিলাম ডাকিয়া খরিদ করিবে। বাবু সে-বিষয় কোনই যোগাড় করিতেছেন না। কেনী যে দুরন্তলোক—সে যাহা মনে করিয়াছে তাহা করিবেই, করিবে। সম্পত্তি নিলামে উঠিলে কি আর রক্ষা আছে? কার সাধ্য কেনীর সম্মুখে নিলাম ডাকে? কোন কোন পাঠক বলিতে পারেন, কথাটা এমন গুরুতব নহে। নোট খরিদ করিয়া ডাকে পাঠাইলেই তো হইতে পারিত। সে সময় নোটের চলতি এত ছিল না। ডাকবিভাগের অবস্থাও এত ভাল ছিল না। মহকুমা, ব্যতীত গ্রামে গ্রামে ডাকঘরও ছিল না। টাকারই কারবার। নগদ টাকারই বেশী চলতি।

ভৈরববাবুর বৈঠকখানা অতি পরিষ্কার। ফরাসের চাদর, বড় বড় তাকিয়ার খোল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বাবু বড় একটি তাকিয়ায় ঠেস দিয়া বসিয়া আছেন। সোনা-বান্ধান, রূপা-বান্ধান হুঁকাগুলি, ধূতরাফুলে কলকি ও রূপার সরপোষ মাথায় করিয়া বৈঠকের উপর বসিয়া আছে গুডগুড়ি ও মজলিসে স্থান পাইয়াছে। শ্রামাদানে বাতি জলিতেছে, দুই একটি দেয়ালগিরি ও নারিকেল-তেলে জলিতেছে। ভৈরববাবু বড় শৌখিন, সঙ্গীতবিদ্যায় মহাপণ্ডিত। প্রতিদিনই সঙ্গার পর সঙ্গীত শাস্ত্রের আলোচনা হয়। অগ্নও হইতেছে। প্রধান শিল্প মাধবচন্দ্র বায় তানপুরা লইয়া, সুরট, মল্লার খেয়াল ধরিয়াছেন। বাবুর মধ্যম পুত্র দেববাবু পাখওয়াজ বাজাইতেছেন। পিতার নিকটেই শিক্ষা, অগ্নাগ্ন শিল্প অপেক্ষা পাখওয়াজ-তবলায় দেববাবুর হাত খুব খুলিয়াছে। চমৎকার বোল উতরিয়াছে। অগ্নীলতা শ্রুতি-দোষ, দোষভাপন্ন কোনপ্রকার গান তাঁহার বৈঠকখানায় স্থান পাইবার অধিকার ছিল না।

প্রধান কার্য্যকারক মহাশয় সেলাম বাজাইয়া দণ্ডায়মান হইলে, ফরাসের এক-পার্শ্বে বসিতে অল্পমতি পাইলেন। সে সময় আর খাজনা পাঠানোর কথা কহিতে অবসর পাইলেন না। কেনীর চক্রান্তের কথাও বিশেষরূপে বাবুকে বুঝাইয়া বলিতে পারিলেন না। সেদিন বড় জাঁকাল-মজলিস। প্রাচীন নগর দিল্লী হইতে বিখ্যাত কালওয়াজ খাজা খাঁ আসিয়াছেন। মাধববাবু গান শেষ করিয়া তানপুরা রাখিলেন। খাজা খাঁ বৃহৎ এক তানপুরা লইয়া, সাত আটবার সেলাম বাজাইয়া তানপুরা ফোড়ে করিয়া বসিলেন।

খাজা থা দেখিতে ঘোর ক্রম্বর্ণ, মাথায় সাদা পাগড়ি, দাড়িগুলিও সম্পূর্ণ সাদা—পাগড়ি, দাড়ি আর দস্ত এই তিনটি সাদা জিনিসেই সকলের দৃষ্টি পড়িতেছে। তানপুরার আডাল, ঘোর ক্রম্বর্ণের চেহায়া খাজার সাদা জিনিস কয়েকটি ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইতেছে না।

খাজা থা মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গান করিলেন। তুল বাহাব পড়িতে লাগিল। খাজা থাও সেলাম বাজাইতে বাজাইতে অস্থির হইয়া পড়িলেন। কালওয়াজিব গান শেষ হইলে মাধব রায় পুনরায় গান ধরিলেন। রায়জি মাথা মুখ হাত নাড়িয়া গলাবাজী কবিতে ক্রটি কবিলেন না। খাজা থা পর্য্যন্ত রায়জিকে বাহাব বাতাসে খুব দোলাইয়া দিলেন। বাঙ্গালীর মুখে বাঙ্গালদেশে এই প্রথম তানলয় পরিশুদ্ধ গান আজ শ্রবণ কবিলেন। রায়জির আনন্দের সীমা নাই। মজলিস ভাঙ্গিয়া গেল। তানপুরা খোলে পুরিয়া কালওয়াজি বিশ-পঁচিশবাব সেলাম বাজাইয়া বাদায় চলিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে মজলিসের অধিকাংশ লোক বাহাবে আসিল। কাষ্যকাবক মহাশয় বসিয়াই বহিলেন। তিনি আর উঠিলেন না।

ভৈরববাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন কথা আছে নাকি ?

কাষ্যকারক মহাশয় বলিলেন—ভজুব। কেনীক কথা তো ক্রমেই বেশি বেশি শুনিতেছি। পথে পথে লোক রাখিয়াছে। গোয়েন্দা রাখিয়াছে। শুনিতেছি লাটেব খাজানা যশোহরে লইয়া যাইতেই স্ত্রোণ ও স্ত্রবিধামত—দিনে হউক বাত্রে হউক, যে উপায়ে হউক লুটিয়া লইবে। সর্বদা সন্ধানী লোক ঘুরিতেছে। কে কোন বেশে, কোন স্ত্রোণে যে আমাদের কাজকর্মের সন্ধান লইতেছে তাহার কোন সন্ধান পাইতেছি না। অথচ আমরা এখানে যেদিন যে কাষ্য করিতেছি, তাহার খবর প্রতি মুহূর্তে সাহেবের নিকট যাইতেছে। আশ্চর্য! এমন লোক কে আমাদের এখানে আসা যাওয়া করে যে, তার কল্যাণে এখানকার কোন কথাই আর গোপন থাকে না—যে পরামর্শ, যে গুপ্ত-মন্ত্রণা করা হয়, এমনই প্রকাশ হইয়া পড়ে। এখন উপায় কি? লাটের দিন অতি নিকট, কোন পথে, কি উপায়ে টাকা পাঠাইব তাহার কোন উপায় করিতে পারিতেছি না। অত কিছু নয়, খাজানার টাকা। দেখুন কি আশ্চর্য কথা! যে পথে টাকা পাঠান সাব্যস্ত করি, অমনি সংবাদ আসিয়া পড়ে যে, সন্ধানীরা সে পথেও ঘুরাফিরা করিতেছে। সন্ধি-

পথে সাহেবের গুপ্ত লাঠিয়াল নিয়োজিত হইয়াছে। যে বেশেই হউক, যেভাবেই হউক তাহারা গম্যপথে বাধা দিবেই দিবে। টাকাও কাড়িয়া লইবে।

ভৈরববাবু বলিলেন—আমিও সে বিষয় না ভাবিতেছি তাহা নহে। ঈশ্বর রক্ষা করিলে কিছুতেই মার নাই। সেই একমাত্র বল ভরসা। যাহা হউক আগামী পরশু দিবস নিশ্চয় টাকা রওয়ানা করিব। ঈশ্বর রক্ষা না করিলে আর উপায় কি? আমাদের যেক্রপ সংসার, আয় হইতে ব্যয়ের ভাগই অধিক। খাজানাগুলি মারা গেলে বিষয় রক্ষা করিবার আর কোন উপায়ই দেখিতেছি না। লাটের খাজনা যদি সাহেবের হস্তগত হয় তবে বিপদের একশেষ দেখিতেছি। কোথা হইতে আবার টাকা সংগ্রহ করিব। কাজেই একেবারে সর্বস্বাস্ত হইতে হইবে। সর্বস্ব যাইবে। ঈশ্বর আছেন!

ভৈরববাবু এই সকল কথা বলিতেছেন, এমন সময় দুইজন বাহক বড় বড় দুইটি ঝাঁকা-পূর্ণ, নূতন হাঁড়ি মাথায় করিয়া বৈঠকখানার মধ্যে উপস্থিত, ভৈরববাবু তাহাদিগকে দেখিয়াই—উঠিলেন, এবং কাষ্যকাবক মহাশয়কে বলিলেন রাত্রিও অধিক হইয়াছে। খাজানা পাঠানোর সমুদায় বন্দোবস্ত কাল করিব। আপনি বিশ-পঁচিশজন ভাল ভাল লোকের জোগাড় করিয়া রাখিবেন। এই কথা বলিয়াই বাবু বাহকদ্বয়কে সঙ্গে করিয়া বৈঠকখানা হইতে চলিয়া গেলেন।

ষড়বিংশ তরঙ্গ

খাজানার চালান

রাত্র প্রভাত হইবার বেশি বিলম্ব নাই। চোকগেল পাখি জগতের পাপ-তাপ সহিতে না পারিয়া ‘চোক গেল চোক গেল’ করিয়া রব করিতেছে। কেনীব গোয়েন্দা ছদ্মবেশে তখনও ঘুরিয়া ঘুরিয়া সন্ধান লইতেছে। গোয়েন্দা একজন ফকির একজন বৈরাগী যেখানে যাহার সহিত কেনিব শত্রুতা-বিবাদ সেইখানেই গোয়েন্দা, সেইখানেই গুপ্ত-সন্ধানী। সেইখানেই তাহাদের গমন। ফকিরকেও লোকে ভক্তি করে, বৈরাগীকেও শ্রদ্ধা করে, ভিক্ষাও দেয়। ফকির, বৈষ্ণবের প্রতি কাহারও কোনপ্রকারের সন্দেহ হইতে পারে না। বিশেষ গ্রাম্য-জমিদার—তায় আবার বহুকালের কথা। সেকাল আর একাল অনেক প্রভেদ। দেউড়িতে নেগাহবান থাকিলেও প্রবেশ-প্রস্থানে তত মনযোগ নাই। বেশি কড়াকড়ি,

আটাআটি নিয়মও নাই। অনায়াসেই বাহির আঙ্গিনায়, পূজার প্রাঙ্গণে—ইচ্ছা করিলে অন্দরখণ্ডেও ফকির, বৈষ্ণব যাইতে পারে। কোন বাধা নাই।

গোয়েন্দা যে সংবাদ পায়, স্ত্রযোগ মত অমুচর, সহচর, সঙ্গীলোক দ্বারা সমুদায় খবর কুঠিতে পাঠায়। এখন ভৈরববাবুর বাড়িতে বৈরাগী বাবাজির আগমন। চারদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া সন্ধান লইতেছেন। ইতিপূর্বে আরও কয়েকদিন বৈরাগীঠাকুর বাবুর বাড়িতে যাইয়া ভিক্ষা আনিয়াছেন। স্ত্রযোগ আর সময় পাইলে অন্দর মহলে গিয়াও দুই একটি গান শুনাইয়া পাড়ার ছেলেমেয়ে একত্র করিয়া ভিক্ষা করেন। আজ বৈরাগী শেষ নিশিতে উঠিয়া তিলক-চন্দন ফোটা কাটিয়াছেন। গায়ে হরিনামের মার্কা মারিয়াছেন। করতাল বাজাইয়া হরিনাম কবিতে কবিতে ভৈরববাবুর বৈঠকখানাব সম্মুখ হইয়া চলিয়া যাইতেছেন এবং তাঁহার কর্তব্য-কার্য্য করিতেছেন

দেখিলেন যে বাবু অন্দরমহল হইতে বাহির হইলেন। সঙ্গে সাত আটজন ভারী ঝাঁক ঘাড়ে করিয়া বাহির হইল। ঝাঁকের দুইদিকে তোড়া বোঝাই। দেখিতে অল্প, কিন্তু খুব ভারী। ঝাঁক বাহকের ঘাড়ে ঢুলিয়া পড়িয়াছে। দেউড়ির পরেই সদর দরজায় আসিলে আটজন দেশওয়ালী ঢাল-তরবারি বান্ধা, গোঁপে তা দেওয়া বড় বড় পাগড়ি মাথায় বান্ধা—ভারীদিগকে মাঝে কবিয়া ছাতি ফুলাইয়া আগেপিছে চলিল। বাড়িব বাহিব হইলেই ভৈরববাবু বৈঠকখানায় আসিলেন। বৈরাগীও প্রভাতী গাইতে গাইতে অল্প আব এক বাড়িতে চলিয়া গেল।

স্বর্ঘ্যোদয় হইতে হইতে দেশওয়ালীবা ভাবীসহ গ্রামের বাহির হইয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িল। বৈরাগীও অল্প আর একপথ দিয়া তাহাদের সঙ্গী হইল। দেশ-ওয়ালীরা সকলেই বৈরাগীকে চিনিত। মনিব বাড়িতে প্রায়ই দেখিয়াছে। বিশেষ আসিবার সময়েও প্রভাতে প্রভাতী গাইতে শুনিয়াছে।

রাম সিং জিজ্ঞাসা করিল—“ঠাকুর! এদিকে কোথায় যাওয়া হইবে?”

বৈরাগী হাঁটিতে হাঁটিতে—উত্তর করিতে কবিতে চলিল—“বাবাজি! একবার বিনদর দিকে ভিক্ষায় যাইব ইচ্ছা আছে।”

রাম সিং বলিল—“আচ্ছা আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই চল। এ-পথে একটু ঘুরা হইবে, তা হ'ক, একসঙ্গে সকলেই কথায়-বার্তায় যাইব।”

বৈরাগী বলিল—“বাবা! আমি ভিখারী, একমুষ্টি অন্নের জন্ত দ্বারে দ্বারে

সুখিয়া বেড়াই। তোমরা বাবা বড়লোকের চাকর, তোমাদের সুখে যাওয়া আমার সাধ্য নাই। আমি যে কতদিনে যাইব তাহারও ঠিক নাই। ভগবান যে পথে লইয়া যাইবেন সেই পথেই যাইব।

রাম সিং বলিল—“আচ্ছা ঠাকুব! আজিকার দিনতো একত্রে যাই।” নানাকথায় এবং কথার উদ্ভব-প্রত্যুদ্ভব, অপব কথা, উড়তি কথা, বাজে আলাপ করিতে কবিত্তে সকলেই যাইতে লাগিল। সকলেই একদম খুব হাঁটিলেন। হাঁটিতে হাঁটিতে বোদের উদ্ভাপে গলদঘর্ষ হইয়া বাস্তার পাশেব একটি বটগাছ তলায় সকলেই দাঁড়াইলেন। হাঁফ ছাড়িলেন। ভাবগণ ভাব নামাইয়া গামছার বাতাস খাইতে লাগিল। কেহ কেহ আবশ্যকীয় কার্য করিতে গেল। বাম সিং প্রভৃতি নেগাহবান মাটিতে বসিয়া কাঁধেব ঝোলান বাটুয়া বাহিব করিয়া খর্দান তামাকে চুপ মিশাইয়া হাতের তালুতে আঙ্গুলি-দ্বারা টিপিতে লাগিল। কেহ গাঁজাব ভাটা বাহিব কবিয়া কাটাছেড়ায় মন দিল, বৈরাগী ভিক্ষার ঝুলি নামাইয়া ‘গৌব-নিতাই হবি বোল’ শব্দে শ্রান্তি দূব করিল।

রাম সিং বলিল—“বাবাজি ত্রিতানন্দ সেবা হবে কি?”

বৈরাগী বলিল “না বাবা! আমি ও সকল আনন্দে আনন্দিত নই। পেটের ভাত জোড়াইতে পারি না, তার উপব আবাব আনন্দ কববো!”

“আচ্ছা বাবা! আনন্দ নাই কললে, একটি গান কর শুনি। বেশ ছায়ায় বসিয়াছি। বড় জোরে এই তিনকোশ পথ হাঁটিয়া আসিয়াছি, বড়ই মেহনত হইয়াছে। বাবাজি! একটি গান গাও শুনে মনটা স্থির কবি।”

বাম সিং প্রভৃতি খুব দম কষিয়া ত্রিতানন্দের সেবা করিল। চক্ষু লাল হইয়া উঠিল। দুই একবার কলিকা ফেরা-ঘোরার পরেই পুনরায় রাম সিং বৈরাগীকে গান করিবার অন্তমতি করিলে, বৈরাগী ঝোলা হইতে খনজননৌ বাহির করিয়া চাটি দিয়া গান আরম্ভ করিলেন। রাম সিং না বলিলেও বৈরাগী বাধ্য হইয়া গান ধরিত। স্বযোগ পাইতে ছিল না বলিয়া ক্ষান্ত ছিল।

বৈরাগী খুব বডমুহুরে গাইতে লাগিল—

“ওবে কললি কি বিশাখা, একবার এনে দেখা,

মলেম মলেম প্রাণে না হেরিয়া বঁকা।

আমরা তো জানি না তোরাই তো জানালি,
এমন সরল প্রেমে কেন গরল মাখালি”—ইত্যাদি—

রাস্তার উভয়-পার্শ্বস্থ গ্রামেই বৈরাগীর গলার আওয়াজ প্রবেশ করিল। ছোটবড় ছেলেমেয়ে কেহ অর্দ্ধবসন, কেহ শূচ-বসনে আসিয়া গাছতলায় ঘাইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু দশ বারজন লাল পাগড়িওয়ালা ঢাল-তরবার বাস্কা সেপাই দেখিয়া একটু দূরে দাঁড়াইল। একেবারে গা-ঘেঁষা হইয়া নিকটে আসিল না। দূরে দাঁড়াইয়া বৈরাগীর গান শুনিতে লাগিল। একটি গান শেষ হইতে না হইতেই রাম সিং, পঁাড়ে পুনঃ অন্তরোধ করিল, বাবাজি! দোসরা আর একটি গান হউক। খুব ভাল গান।

বৈরাগীর অভিলাষ এখনও পূর্ণ হয় নাই। যে উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে গান এখনও তাহা সফল হয় নাই। মহাবাস্ত হইয়া চতুর্দিকে চাহিতেছেন। ক্রমে গ্রামের অনেকে বটতলায় আসিয়া গান শুনিতে লাগিল। বৈরাগীও চারিদিকে তাকাইয়া গান গাইতেছেন। তিনি যে মুখ দেখিতে ইচ্ছা করেন, সে মুখ দেখিতেছেন না। কাজে কাজে গানও ধামিতেছে না। দেখিতে দেখিতে ঐ জনতার মধ্যে মনোমত রূপ দেখিলেন। তাহার উদ্দেশ্য সফল হইল। তাড়া-তাড়ি সে গানটি সাবিয়া নূতন-তালে আব একটি নূতন গান ধরিলেন—

গান

“তোমরা যাও সবাই এখন ঘরে ফিরে রে!

আমি যাই বে, ওরে এসেছি এই ভবে একা, একা যেতে হল রে।”

—কেহই ফিরিয়া গেল না। একমনে বৈরাগীর গান শুনিতে লাগিল। তবে একজন ফকির ঐ গোলার মধ্যে দাঁড়াইয়া গান শুনিতেছিল, সে তখনই চলিয়া গেল। আর দাঁড়াইল না। ত্রস্তপদে জনতা ভেদ করিয়া রাস্তার বামপার্শ্বে নামিয়া গ্রাম ধরিল। বৈরাগী ছই তিনবাব গানটি আওড়াইয়া যখন দেখিল ফকির সম্পূর্ণরূপে চক্ষের আড়াল হইল—গানভঙ্গ দিয়া খনজনী ঝোলায় বন্ধ করিলেন।

রাম সিং সঙ্গীদিগকে—বাহকদিগকে বলিতে লাগিল—“চল ভাই চল খুব ঠাণ্ডা হুয়া, আবার চল, দেখি কত দূর যাইতে পারি।” ভাবীরা ভার ঘাড়ে ঝুলাইল। দেশওয়ালীরাও পূর্বমত ভারীদিগের অগ্র-পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। বৈরাগী বাবাজিও জোরে জোরে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন।

সপ্তবিংশ তরঙ্গ

আশ্চর্য ডাকাতি

পাংশা গ্রাম হইতে যশোহর জেলা অনূন ৩৫ ক্রোশ ব্যবধান। পাংশা হইতে যে সময়ই কেন বওনা হউক না যশোহর যাইতে তাহাকে পথে একরাত্রি প্রবাস থাকিতেই হইবে। ভৈরববাবুর আর একটি কাছারি পাংশা হইতে চৌদ্দ-পনেগো ক্রোশ ব্যবধান। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে রাম সিং, পাঁড়ে প্রভৃতি টাকা লইয়া কাছারিতে উপস্থিত হইল। কাছারির কার্য্যকাবক ভৈরববাবুর উপদেশপূর্ণ পত্র পূর্বেই পাইয়া-ছিলেন। কেনী টাকা লুটিয়া লইবে তাহাও পত্রে লিখা ছিল। কশ্মচাঁরী টাকার তোড়াগুলি স্বহস্তে অতি সাবধানে কাছারি-গৃহের মধ্যস্থ বড় একটি সিন্ধুকে বাথিয়া তালাচাৰি ভালরূপে পরীক্ষা কবিয়া চাবি বন্ধ করিলেন। টাকার শব্দ না হয় বলিয়া বিশেষ সতর্কতার সহিত সিন্ধুকে তোড়া বোঝাই করিলেন। এবং সকলকে বলিলেন, একরাত্রি কষ্টে-স্বপ্নে সকলকেই জাগিয়া থাকিতে হইবে। সাবধানের মার নাই, অসাবধানে শতবিঘ্ন। অদৃষ্টে যাহাই থাকুক আজ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিতে হইবে। তোমরা সকলে সকলে আহাবাদিব জোগাড় করিয়া আহার শেষ করিয়া আইস। কাছারির নেগাহবানগণকেও নায়েব মহাশয় বিশেষ সাবধান করিয়া দিলেন যে, তোমরাও শীঘ্র শীঘ্র আহাব কবিয়া আসিবে। আজ রাত্রি বড় ভয়ানক বাত্মি। বড় সাবধানে—বড় সতর্ক থাকিতে হইবে। আর অতিরিক্ত যে কয়েকজন লোককে রাখা হইয়াছে তাহাবাও মায় হাতিয়ার, সড়কি, লাঠি, স্তলফী লইয়া সমস্ত বাত্মি বাধাকোমরে থাকিয়া পাহারা দিবে। আমিও তোমাদের সঙ্গে জাগিয়া থাকিব। এই সকল বিলি-বন্দোবস্ত করিয়া নায়েব মহাশয় দেশও-য়ালী, বরকন্দাজদিগের আহারের জোগাড় করিয়া দিলেন। রাম সিংএর অল্পগ্রহে বৈরাগীঠাকুরও চাউল, দাউল, তরকারী ইত্যাদি আহাৰ্য্য-সামগ্রী প্রাপ্ত হইলেন। সকলেরই আহারের সুব্যবস্থা নায়েব মহাশয় করিয়া দিলেন। বৈরাগী আহার-অন্তে নায়েব মহাশয়ের নিকট আসিয়া পরিচিত হইলেন। নায়েব মহাশয় স্বয়ং টাকার সিন্ধুকের উপর শয্যা রচনা করিয়া ছঁকা হাতে করিয়া বসিয়া কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। বৈরাগী ঠাকুরকে সিন্ধুকের নিকট বসাইয়া ধর্ম কাহিনী শ্রবণ করিতে মন দিলেন। ধর্ম কথার পর হরি গুণগান শ্রবণে নায়েব মহাশয়ের নিতান্তই ইচ্ছা হইল। বৈরাগীকে বলিলেন, বাবাজি! আমি রাম সিংএর নিকট শুনিয়াছি আপনার

শ্রামা বিষয় সংকীর্ণনে বেশ ক্ষমতা আছে। যদি সত্য হয় তবে শুধু শুধু বসিয়া রাত্রি জাগরণ অপেক্ষা আমোদে থাকা মন্দ কথা নয়। ঈশ্বরের নামও হইবে, পাহারার কার্যও চলিবে।

বৈরাগী বলিলেন—“বাবাজি! কথাটা ভালই শুনাগেলেন কিন্তু, বলি কি রাত্রি জাগরণটা বড় ভয়ানক কথা। আর এই সকল সিপাই-বাবাজিরা সারাদিন ইাটিয়া যে পবিত্রম করিয়া আসিয়াছে এখন কি আর জাগরণেব সময়? যেই বিছানায় পড়িবে অমনি ঘুমাইবে।”

নায়েব মহাশয় বালিশে ঠেস দিয়া তামাক টানিতেছেন আর বাবাজিব সহিত আলাপ করিতেছেন। নায়েব মহাশয়ের অন্তরোধ বাবাজি ঠেলিতে পারিলেন না। খনজনী বাহিব করিয়া আরম্ভ কবিলেন। খনজনীর চাটায় শব্দ অনেকদূর যাইয়া ফকিবেব কণে প্রবেশ করিয়াছিল। রাত্রের শব্দ দিন অপেক্ষা বহুদূরে যাইতে লাগিল। বৈরাগী অনেকক্ষণ খনজনী বাজাইয়া গান আবিস্ত করিল।

গান

“আয় মা সাধন-সমরে।

দেখবো মা হাবে, কি পুত্র হারে ॥

অধারোহণ করিয়ে কালীসাধন রথে, তপ-জপ ছুটো অশ্বযুতে তাতে,

দিখে জ্ঞান ধনুকে টান, ভক্তি ব্রহ্মবাণ বসেছি ধ’রে ॥

মা দেখবো তোমার বণে, শঙ্কা কি মরণে,

ডঙ্কা মেরে লব মুক্তিধন—

তাতে বসনা স্বাক্ষাবে, কালী নাম হুঙ্কারে,

কার সাধা আমার বলে রণ ॥

বাবে বারে বল তুমি দৈত্যজয়ী, এই আমার বাণ, এস ব্রহ্মময়ী,

ভক্ত রসিকচন্দ্র বলে, মা তোমারই বলে,

জিনবো তোমারে ॥”

গানটি শেষ হইলেই বাবাজি তামাক ইচ্ছা করিয়া নায়েব মহাশয়ের হস্তে কলিক দিলেন। রাম সিং প্রভৃতির শরীরের বেদনা তাড়াইতে কবে গাঁজায় দ্রব দিয়া জাগিতে জাগিতে ঘোর-নিদ্রায় নাক ডাকাইয়া পাহারা দিতে লাগিল। সন্দ্বারেরা লাঠিখানি বগলে করিয়া “একটু কাং হই” বলিয়া নিদ্রায় অভিভূত

হইল। জাগরণের মধ্যে কেবল নায়েব মহাশয় আর বৈরাগী বাবাজি। বৈরাগীর মনেও নানা কথা, নায়েব মহাশয়েব মনেও নানা কথা—এবারকার পূজাব খবচটা উপরি-টাকাষ কবিবেন মনে করেছিলেন। প্রজাবা বাদী হওয়ায় তাহাতে রুত-কাষা হইতে পারেন নাই। বিবাদী প্রজাগণকে কি কি কৌশলে জয় করিবেন সেও এক প্রধান চিন্তা। সে জমাখবচটা কাছাবিতে দাখিল কবিয়াছেন তাহার সমুদায় খবচ মজুরা পাইবেন কিনা, সেও এক প্রধান চিন্তা। তাব নেযা খরচ এক-ভাগ, আর তিনভাগই মিথ্যা। অনেক ফর্দে ঠিক নামাইতে বৈঠক কবিয়াছেন। কোন স্থানে শুভ বৈঠক কবিয়া দিয়া নামাইয়া বাখিয়াছেন। কিছু কিছু বাজেয়াপ্ত হইলেও আসলে মার নাই। সদবের আমলাগণকেও বীতিমত রূপচাঁদ সহায়ে সেলাম বাজাইয়া আসিয়াছেন। সময় সময় পাঁঠা, ঘত ইত্যাদি দিয়াও তাঁহাদের মন যোগাইয়াছেন। বাবুর চক্ষে পড়িলে ধরা পড়িবেন এইটি মহা চিন্তা। তাহারপর কেনীসাহেব যে কাছারি লুট কবিয়া খাজানা লুটিয়ে লইয়া যাইবে সে চিন্তাটাই বৈঠক চিন্তা। লুটিবে কথায় চিন্তিত হন নাই। লুটিলেও ভাল না লুটিলেও ভাল। যদি লুটই হয়, তবে লুটের বাহানায় কিছু কিছু সবাইয়া আত্ম-শাং কবিবেন। কোন কোন জিনিস এবং নগদ তহবিলেব সমুদায় সরাইবেন কি কিছু রাখিবেন ও কাগজপত্রগুলো একেবারে পোড়াইয়া ফেলিবেন কি জলে ডুবাইবেন, তাহাও স্থির কবিতো পারেন নাই। লুট হইলেই ভাল। আরও কিছু লাভ না হয়, মোকদ্দমা খরচে বেশ একহাত মারিতে পাবিবেন।

পুনরায় বৈরাগী বাবাজিকে বলিলেন বাবাজি। গানটি বড চমৎকার। আর একবার গানটি হক। গানটি বড মিষ্ট।

যত রাত শেষ হইতেছে ততই বৈরাগীব চিন্তা বাড়িতেছে। সহযোগী-ফটিক (ফকির) কুঠিতে গিয়া টাকা বওয়ানা সংবাদ সময়মত সাহেবকে দিতে পারিয়াছে কি না? এ কথাও তাঁহার চিন্তার এককথা। পুনরূপ খনজননীতে ঘা দিয়া “আয় মা সাধন সমরে” বলিয়া প্রথম ধূয়া ধরিতেই ‘হো হো’ শব্দে লাঠিয়ালেরা মশাল জালিয়া ডাক ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে কাছারিঘরে আসিয়াই নায়েব মহাশয়কে চক্ষের পলকে বাধিয়া ফেলিল।

বৈরাগী বাবাজি সঙ্কেতে দেখাইয়া দিল যে ঐ সিন্দুক। সঙ্কেত করিবা মাত্র কুঠারঘাতে সিন্দুক খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। সিন্দুকস্থ টাকার তোড়া

লাঠিয়ালেরা বাহির করিয়া সজ্জি বাহকগণের মাথায় দিয়া ডাক ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে কাছারিঘরের বাহির হইয়া পঞ্চাশজন সন্দাব সঙ্গে দিয়া টাকা কুঠিতে পাঠাইয়া দিল। অবশিষ্ট দুইশত লাঠিয়াল কাছারির অগ্নি অগ্নি ঘরের জিনিস পত্র লুটপাট কবিশ্য লইতে লাগিল। বাম সিং প্রভৃতি সন্দাবদিগকে লাঠি আঘাত, মড়কির গুতায় জাগাইয়া তুলিল। সকলেই নিদ্রাব ক্রোড়ে অচেতন। গুতা খাইয়া থতমত হইয়া উঠিয়া পড়িল। কিন্তু কেহই কিছু কবিতে পারিল না। বাবাজি ঘরের সকল জিনিস জোবে জোরে বাহির কবিশ্য আনিয়া লাঠিয়ালদিগের সম্মুখে বাথিতে লাগিল। কাছারি লুট কবিশ্য লাঠিয়ালেরা দলবদ্ধ হইয়া কাছারি সম্মুখ-সমীপ মশাল জালিয়া গুণকাল দাঁড়াইয়া ডাক ভাঙ্গিতে লাগিল। কাছারির কোন লাঠিয়াল আব অগ্রসব হইল না। কে কোথায় পলাইয়াছে তাহার সন্ধান নাই। সাহেবের লাঠিয়ালেরা অনেক ঠাট্টা-বিদ্রূপ এবং গালিগালাজ দিয়া মশাল জালিতে জালিতে চলিয়া গেল। শেষে বাম সিং, হুম্মান সিং, বেতবন হইতে বাহির হইয়া “ক্যা ভ্যা ক্যা ভ্যা” কবিশ্য নায়েব মহাশয়ের বন্ধনদশা মোচন করিল। আর আব সকলে যাহাবা পলাইয়াছিল, কেহ লাঠি, কেহ মড়কি-হস্তে আসিয়া মহা-ধুমধাম আরম্ভ কবিশ্য দিল। “কোথা গেল, সাহেবের লাঠিয়ালরা কই? এক চোটে ফেঁদে কবির। কই কোথা গেল” বলিয়া আপন আপন মর্দমৌ দেখাইতে লাগিল।

নায়েব মহাশয়ের মুখে কথাটি নাই। তাঁহার নিজের বাক্স, পেটরা, থালা, ষটা বাটা যাহা ছিল সকলি গিয়াছে। দেখিলেন বৈরাগীব ঝোলা, খনজনী সকলি পড়িয়া আছে। নানা প্রকাব মতলব, পবামর্শ ঋটিতে ঋটিতে পূর্বদিক ফর্সা হইয়া প্রভাত বায়ু বহিতে লাগিল। ভৈরববাবুর কাছারি লুট এই পর্য্যন্ত শেষ হইল।

অষ্টাবিংশ তরঙ্গ

টাকা নয়—খাপরা

রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। সাহেবের লাঠিয়ালেরা যে পথেই চলিল, সূর্য্যদেব সকলকেই দেখাইলেন যে, ভৈরববাবুর কাছারি লুট কবিশ্য চোদ্দ তোড়া টাকা লইয়া চোদ্দ জন মুটিয়া এবং ঢাল-মড়কি কোমর বান্ধা লাঠিয়ালেরা ত্রুপদে মার মার কার্টকাট শব্দে পথ জঁকাইয়া চলিয়াছে। যে দেখিতেছে সেই বলিতেছে যে, ভৈরব-

বাবুর সর্বনাশ হইল লাটের খাজনা লুট! আর সর্বনাশের বাকি কি? হঠাৎ এত টাকা এই কদিনের মধ্যে কোথা হইতে জোটাইয়া বিষয় রক্ষা করিষেন! লাটের দিন কি ভয়ানক দিন। বাজকর আদায়ের কড়া এমনি নিয়ম, যে স্তূৰ্য্যঅন্ত হইলেই দফা রফা, কার্য্য শেষ। জমিদারী নিলাম—নিলাম তো সত্য-সত্যই নিলাম। আর দেয় কে, আর পায় কে? কিস্তিমত টাকা দাখিল না হইলে কিছুতেই আর রক্ষা নাই।—হাজাব হউক বেলাতী বুদ্ধি, সে বুদ্ধির কাছে বাঙ্গালী বুদ্ধি কোনই কাজের নহে। ধত্ত কেনী! কি কৌশলে কি সন্ধানে টাকাগুলি হস্তগত কবিল। এমন কৌশলে ধত্ত! ধত্ত তোমার সাহস।

কেনী শোক. তাপ, বিবহ, বিচ্ছেদ নানা প্রকাব মনকষ্ট ভোগ করিয়া শেষ-কালে বাঙ্গালীর উপব চটিয়া গিয়াছেন। হাড়ে হাড়ে চটিয়াছেন। বাঙ্গালীব নামেই জলিয়া ওঠেন। চক্ষের শূল মনে কবেন। লাঠিয়ালদিগকে ভাল না বাসিয়া পারেন না বলিয়া মুখে ভালবাসা জানান। কার্য্যেও দেখান যে, তোমরাই আমাব সকল। বাঙ্গালীর কথা-কার্য্যে আর তাঁহাব বিশ্বাস নাই। বিশ্বাসতরুর মূলে তাহাবই ভালবাসা জ্বকি—বিষবারি সিঞ্চন করিয়া বিষময় ফল ফলাইয়া গিয়াছে। তাহাতেই এত চটা। কেনীব অদৃষ্ট-চক্রের গতি ক্রমেই উর্ধ্বে! যে কার্য্যে হাত দিতেছেন তাহাতেই প্রভুল হইতেছে। নীল, বেশমে বিস্তর আয় হইতেছে। জমিদারীতেও বেশ লাভ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। দিন দিন উন্নতি—দিন দিন মজুদ টাকার সংখ্যা বৃদ্ধি। চারিদিক হইতে টাকা আসিতে থাকে তখন চারিদিক কেন, দশদিক হইতে বিশপ্রকাবে টাকা আসিতে থাকে।

সন্ধ্যা নিকট। কেনী ফুলবাগানে মেমসাহেবের সঙ্গে বাগানের শোভা, কালীগঙ্গার শোভা, সাংকালীন সেই প্রকৃতির শোভা দেখিয়া মনপ্রাণ শীতল করিতেছেন আর উভয়ে—হাত ধরাধরি করিয়া পরচক্ষে প্রণয়ভাব গাঢ়রূপে দেখাইয়া যুগ্মমন্দভাবে মনের আনন্দে পা-চারি করিয়া বেড়াইতেছেন। এমন সময় ফকির গোয়েন্দা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া—সেলাম বাজাইয়া বলিল—“হজুর! বকশিশ চাই।”

সাহেব বলিলেন—“বকশিশ পরে দিব, খবর কি?”

“হজুর! বকশিশের ছকুম হউক, কাজ ফতে হইয়াছে। বাবুর ভুল ভাঙ্গিয়াছি। বাঙ্গালা-রাজ্যে এমন কোন লোক নাই যে, হজুরকে ঠকায়। মামলা,

মোকদ্দমা, লাঠিবাজী, আর একটিতেও হুজুরকে কেহ পরাস্ত করিতে পারিবে না। বাবুর কাছারিতে চোদ্দ তোড়া পাওয়া গিয়াছে। আমাদের লাঠিঘাল সর্দারের নিকট বাবুর লোকজন মাথা তুলিয়া একটি কথা বলিতেও সাহসী হইল না। কে কোথায় পালাইল তাহাব খোঁজ খবর পাওয়া গেল না। ফকিরের কথা শেষ হইতে না হইতে লাঠিঘালগণ শোবগোল কবিত্তে করিতে পায়তাবা করিয়া লাঠি ভাঁজিতে ভাঁজিতে চোদ্দ তোড়া টাকাসহ সেলাম বাজাইয়া বকশিশের প্রার্থনায় সাহেবের সম্মুখে কাতাব বান্ধিয়া দাঁড়াইল। সাহেব পাঁচশত টাকা বকশিশের হুকুম দিলেন। আরও বলিলেন “দেখ ভৈরববাবু বড় চতুৰ। ও সকল তোড়া-গুলি এখনি জ্বালাইয়া ফেলিতে হইবে। টাকা আমাব সম্মুখে ঢালিয়া তোড়া-গুলি জ্বালাইয়া ফেল। আব এ টাকা খাজাঞ্চীখানায় লইয়া দেও।” আদেশ মাত্র তখনি বামইয়াদ পাঁড়ে গায়েব বড় চাদর মাটিতে বিছাইয়া টাকার তোড়া একে একে নামাইয়া মুখ খুলিতে লাগিল। সহজে খুলিতে পারিল না। বড়ই কোশলে বাধা এবং লাবাতা দিয়া মুখ ঝাঁট। তোড়ার মুখের দড়ি কাটিয়া সাহেবেব সম্মুখে ঢালিল। সাহেব দেখিয়া অবাক। তাড়াতাড়ি অল্প একটি তোড়ার মুখ কাটিয়া খোলা হইল, তাহাতেও অবাক ! ক্রমে চোদ্দটি তোড়ার মুখ খুলিয়া টাকা ঢালা হইল। কাহাবও মুখে কথা নাই। চতুরের চাতুরী—আশচর্য বাটপাড়ি। একটি তোড়াতেও টাকা নাই। সমুদায় খাপরা।—আর একদলা কবিয়া সীসা। ভৈরববাবু চাতুরীতে কেনীর মাথা ঘুরিয়া গেল। পর-স্পর মুখ চাওয়া-চায়ি ভিন্ন মুখে কাহারও কোন কথা নাই। লাঠিঘালদিগের উৎসাহ—বকশিশ সকলি খাপরায় পবিণত হইল। কেনী বড়ই অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন—ভৈরববাবু বড় ঠকাইয়াছে। বাঙ্গালীর মাথায় এত বুদ্ধি, ইহা আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই। সাহেব মাথা হেঁট করিয়া এক দুই পায়ে প্রিয়তমার হাত ধবিয়া কামবায ঢুকিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, ছালাগুলি নদীতে ফেলিয়া দেও। বামইয়াদ পাঁড়ের চাদর পাতাই সার হইল। খাপরা সমেত তোড়া চোদ্দটা কালীগঙ্গায় বিসর্জন কবা হইল। তিন-দিবসেব মধ্যে সাহেব ঘর হইতে বাহির হইলেন না।

ভৈরববাবু ছাড়িবার লোক নহেন। ইংরেজ দেখিয়া ভীত হইবার পাত্র নহেন। রীতিমত রাজদ্বারে কাছারি লুটের নালিশ উপস্থিত করিয়া দিলেন।

প্রমাণের অভাব হইল না। কাছারি লুট, চোদ্দ তোড়া টাকা লুট—এ-কথার প্রমাণ সহজেই পাওয়া গেল। কেনীব পক্ষীস কয়েকজন লোকের বিশেষ শাস্তি হইল। কিন্তু ভৈরববাবু তাহাতেও ক্ষান্ত হইলেন না। চোদ্দ হাজার টাকার দাবীতে আদালতে নালিশ উপস্থিত করিয়া মায়-খরচা-সমুদায় দাবী ডিক্রি কবিলেন।

উনত্রিংশ তরঙ্গ

বাঙ্গালীর হৃদয়

কিছুদিন পবে যশোহরে সদরআলাব এজলাসে ভৈরববাবুর সহিত কেনীব দেখা হয়। যদিও, কেনীব বড়লোক। বিস্তর টাকা। কিন্তু খাপরাব পবিবর্তে—চোদ্দ হাজার টাকা নগদ দিতে কাহার না কষ্ট বোধহয়? কেনীব ইচ্ছা যে আপোষে নিষ্পত্তি হয়। খরচাটা লইয়া বাবু দাবিব টাকা ছাড়িয়া দেন—এই কেনীব আস্ত-রিক ইচ্ছা। কিন্তু কোনমুখে একথা বলিবেন। হাকিমের সম্মুখে, এজলাসের মধ্যে কেনীব ভৈরববাবুকে দেখিয়া বলিলেন।

“তুমি বাবু বড় জুয়াচোব। খাপরা দিয়া তোড়া পুবিয়া চোদ্দ হাজার টাকার দাবী করিয়া ডিক্রি করিয়াছ।”

“ভৈরববাবু বলিলেন—“আমি জুয়াচোর, তুমি গরুচোব।” কথা দুইটি পথিকের কল্পনা প্রসূত নহে। হাকিমের সম্মুখে ভৈরববাবু ও কেনীব কথাপ্রসঙ্গ আজ পর্য্যন্ত ঐ অঞ্চলে সাধাবণের মুখে চলিয়া আসিতেছে। ভৈরববাবু কেনীব শুধু গরুচোর বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। আবও বলিলেন—“দেখ। তুমি আমাদের দেশের বাজা! দেশের লোকে তোমাকে ভয়েই হউক, আব ভক্তিতেই হউক, রাজার তুল্য মান্য করে। আমাদের দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য কবিয়া কিছু টাকা উপার্জন কবিবে, এইতো তোমার ইচ্ছা! তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু তাহা না কবিয়া তুমি আমাদের সর্বনাশ কবিতে বসিয়াছ। যাহা যাহা করিয়াছ, এদেশের লোকে তাহা কখনই কবিতে পারে না। দয়া, মায়া, ধর্ম, এবং হৃদয় হইতে তাহারা বঞ্চিত নহে। তুমি দেশের গরুচুরী কবিয়া কৃষি-প্রজার সর্বনাশ করিয়াছ। তোমার নিকটস্থ জমিদার, তালুকদারের যথাসর্বস্ব লইয়াও তোমার উদর পরিপূরণ হয় নাই। এখন দূবস্থিত তালুকদার, জমিদারের সর্বস্ব লইয়া নিজের স্বার্থসিদ্ধি করিবে ইহাই তোমার আস্তরিক ইচ্ছা। তুমি এদেশে

আমিয়া কত পাপের কাণ্ড কবিয়াছ, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি ? কত সতীর সতীত্বনাশ, কত শত প্রজ্ঞার যথাসর্বস্ব হরণ, ঘব জ্বালানী, দিনেরাত্রে ডাকাইতি, নিরপরাধে দণ্ড, এসকল তোমাব অঙ্গের ভূষণ। সকল ধর্মে যে কাণ্ড পাপ বলিয়া নিদ্রিষ্টে রহিয়াছে, তাহাব একটিও তুমি নাকি রাখ নাই। তুমি ইংরেজ জাতিব পাপ-কলেক। তোমার মত ইংরেজকে শতধিক ! আমি খোলা-খাপরায় তোডাবন্দী কবিয়া টাকা বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম, তাহা স্বীকার করি। তুমি ভাবিয়াছিলে যে বাংলাদেশে লোক নাই, বাঙ্গালীর মানুষ নাই। এ রত্নগর্ভা ভারতভূমিব বঙ্গ খণ্ড কেন ? যে খণ্ডে ঘাইয়া সন্মান করিবে তোমার পক্ষে কাল ভৈরবস্বরূপ—শত শত ভৈব—দেখিতে পাঠবে। রাজশবীব, রাজমন, রাজচরিত্র, রাজনীতিজ্ঞ, বাজবুদ্ধি, বাজচক্ষু, রাজ-বিবেচনা সংযুক্ত দেহবই যে অভাব আছে—তাহাও মনে কবিও না। আব সকল মস্তকই যে বিকৃত তাহাও নহে। অনেক মস্তকেই প্রধান, প্রধানমন্ত্রীর মস্তক-সদৃশ-মজ্জা আছে। মহাবীর, মহাবলশালী যোদ্ধাব ত্রাঘ বাহুবল আছে ? সাহস আছে, হৃদয় আছে—ধবিতে গেলে কি না আছে ? তবে সময় মন্দ হইলে কিছুতেই কিছু হয় না। আজ তোমার নামে গগন ফাটিয়া যাইতেছে। ভয়ে গভিনীর গর্ভ পর্যন্ত পাত হইয়া যাইতেছে। খুঁজিলে তোমাব মত নামজাদা লোকই যে এই পবায়ীন বাজো না পাওয়া যায় তাহাও নহে। সময় মন্দ, কপাল মন্দ, তাতেই এই দশা।

কেনী বলিলেন—বাবু ! “তুমি আমাকে বড় ঠকাইয়াছ।”

বাবু বলিলেন—“আমি তোমাকে ঠকাই নাই। তুমি আমাকে পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিলে, আমিও তোমাকে পরীক্ষা কবিলাম। এবং দেখাইলাম ডাল-ভাতের গুণ কি ? বাঙ্গালীর মাথায় আছে কি ? আমি টাকার প্রত্যাশী নহি। অর্থ করিয়া টাকা লইয়া আমার কয়দিন যাইবে। তুমি আমার কাছারি লুট কবিয়াছ যথার্থ। আমি যদি ঐ কাছারিব পথে সত্য-সত্যেই খাজানার টাকা পাঠাইতাম তাহা হইলে তুমি কি করিতে ? আমারই টাকা দিয়া আমারই বিষয় খরিদ করিতে—এইতো তোমার মনের কথা।”

কেনী বলিলেন—বাবু ! আমি তোমার নিকট ঠকিয়াছি।

ভৈরববাবু বলিলেন—বেশ তুমি ইংরেজ, তোমার মান্ন কোথায় না আছে ? আমি বাঙ্গালী, আমার নিকট পরাস্ত স্বীকার করিলে, আমি টাকা পাইলাম।

দেখ ! বাঙ্গালীর-হৃদয়ে সাহস আছে কি না । দেখ ! ভৈরবের হৃদয় আছে কি না । এই বলিয়া পকেট হইতে ডিক্রিথ ও বাহির করিয়া স্বহস্তে ছিঁড়িয়া কেনীর হস্তে দিয়া বলিলেন—“যাও ! তোমায় ভিক্ষা দিলাম । চোদ্দ হাজার টাকার ডিক্রি হইতে তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম ।” কেনী মহালজ্জিত ভাবে বিশেষ নম্র ও ভক্ত-তার সহিত ভৈরববাবুর হস্ত ধরিয়। কাছাবিগৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন—বাবু ! আমি জানিলাম তুমি যথার্থ বাবু । আমি আব কখনও তোমাব সঙ্গে বিবাদ-বিসম্বাদ কবিব না । তোমার সহিত আর আমার কোনদিন কোন কারণে বিবাদ হইবে না এই প্রতিজ্ঞা করিলাম ।”

পরস্পর করমর্দন করিয়া বিদায় হইলেন । সকলে ভৈরববাবুর সাহস, উদারতা দেখিয়া অবাক হইল । কেনী সেই হইতে জীবিতকাল পর্য্যন্ত ভৈরববাবুর সঙ্গে বন্ধুত্বভাব বজায় রাখিয়াছিলেন । প্রতিজ্ঞা বক্ষা করিয়াছিলেন ।

ত্রিংশ তবঙ্গ

সংসার

পাঠক ! মীরসাহেবকে অনেকদিন হইল গোবীন্দদীর গর্ভে সঁওতার ঘাট হইতে নৌকায় ভাসাইয়া দিয়াছি । আজিও ভাসিলেন, কালিও ভাসিলেন বলিয়া বিদায় করিয়াছি । তিনি সময়মতো সিরাজগঞ্জ যাইয়া ভগ্নীর-বাটতে গিয়াছেন । বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেছেন । এদিকে সা গোলাম “অছিতনামা” আপন মনমত পরিবর্তন করিয়া লইয়াছেন । আব আর যাহা অবশিষ্ট ছিল, যে যে দলিল পরিবর্তন করিতে আবশ্যক হইয়াছিল, স্ত্রযোগ পাইয়া সমুদায় দলিল পরিবর্তন করিয়াছেন । সেরেস্তার অগ্রাণ্ড কাগজপত্র যাহার যেখানে দোষ ছিল, সমুদায় সারিয়াছেন । প্রধান প্রধান জালসাজদিগের আশ্রয়ে, অর্থের সাহায্যে এ সকল সাংঘাতিক ঘটনা-ঘটাইয়া, আটঘাট বান্ধিয়া দলিল দস্তাবেজ দুর্বল করিয়া নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া আছেন । চাকর-চাকরাণীরা অনেকদিন হইতেই তাঁহার বাধ্য হইয়াছে । কাহাকে কৌশলে, কাহাকে অর্থে, কাহাকে তোষামোদে—যাহাকে যাহা দিয়া বাধ্য করিতে হয়, দিয়া আপন মনমত সাজে সাজাইয়া রাখিয়াছেন । ঘরাও-বিবাদে প্রতিবেশি এবং দেশের লোকের বড়ই আনন্দ । লক্ষ্মীশ্রী যাহার চক্ষে সহ্য হয় না, নির্ঝিবাদে কোন পরিবার একত্র একজোটে থাকা যেনরাধম দেখিতে পারে না, আপন স্বার্থের জন্ত সা গোলামের সঙ্গে যোগ দিয়াছে । যে

পিশাচ ঘরাও-বিবাদ বাধাইয়া দিয়া বেশ দশ টাকা উপার্জন করিয়া আদর বাড়ায়, সকল লোকেই সা গোলামের সাহায্যে দাঁড়াইয়াছে। যাহারা মীরসাহেবের নিকট কখনই স্থান পায় নাই তাহারাই এক্ষণে সা গোলামের পরামর্শদাতা। যে নীচ প্রকৃতির লোকেরা সাঁওতাব বাটির চতুঃসীমায় আসিতে থরহরি কম্পে কাঁপিয়াছে, তাহারাই এক্ষণে সা গোলামের প্রধান সাহেব। যাহাদের কোন স্বার্থ নাই, তাহারিাও থোংগল্লের একঅঙ্গ মনে কবিয়া সময় সময় আসিতেছেন, যাইতেছেন। ঐ সকল কথা লইয়াই তোলাপাড়া করিয়া কাল কাটাইতেছেন। কাহার সর্বনাশ, কাহার পৌষমাস। কেউ ধনেপ্রাণে বিষয়-সম্পত্তি-হারা হইয়া পথের কাঙ্গাল হইতেছে। কেহ ঐ ঘটনা লইয়া কত কথায় কত আমোদ মনে কবিয়া আমোদে মাতিয়াছে। কেহ “মামার জয়” মতে মত প্রকাশ করিতেছে। কেহ কেহ সা গোলামের মনেব মধ্যে প্রবেশ করিতে মৌখিক মীরসাহেবের স্বপক্ষ হইয়া দুটি কথা বলিয়া অপব পক্ষের উত্তবেই হাব মানিয়া চুপ করিয়া বসিয়া সা গোলামের মনের মধ্যে যাইতে ঘুরিতেছে। সা গোলাম নিজেই নাচিতে দাঁড়াইয়াছেন। তাহাবপর তোঁষামোদে কুকুরের পদ-সেবার আনন্দে মাতিয়া সকল কথা ভুলিয়া ঘরভাঙ্গা লোকেব কথায় কান দিয়া, আরও নাচিয়া উঠিয়াছেন। একথা ভাবিতেছেন না যে জগৎ কয়দিনের! মিথ্যা-প্রবঞ্চনা করিয়া একজনকে ঠকাইলে তাহার প্রতিফল অবশ্যই একদিন না একদিন ফলিবে। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত একদিন হইবেই হইবে। সে পাপভোগ একদিন ভুগিতেই হইবে। একপ্রকার গুপ্ত-ডাকাতি করিয়া মৌবসাহেবকে পথের ভিখারী কবিতে বসিয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বরের মহিমা অপার! যে ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই তাঁহাব জীবিকা নির্বাহের কোন উপায় করিয়া দিবেন। কথা চিরকাল থাকিবে। জগৎ যতদিন কথাও ততদিন! হায়রে সংসার!

দেবীপ্রসাদের মন্ত্রণায় জামাইবাবু সকল কার্য্য দৃঢ়রূপে পাকা করিয়া রাখিতেছেন। শেষদিনের কথা এখন কিছুতেই মনে স্থান পাইতেছেন না। রে মাঝুষ! রে সংসার! বে বিষয়! রে জমিদারী! রে লোভ! রে জামাট! তোর অসাহায্য কিছুই নাই।

মীরসাহেব ভগ্নীর-বাটিতে কয়েক মাস থাকিয়া তাঁহার বিষয়াদির স্মৃঙ্খলা করিয়া বাটি আসিতে মনস্থ করিলেন। ইহার মধ্যে দুই-তিন খানি মাত্র পজ

জামাইকে লিখিয়াছেন—একখানিরও উত্তর পান নাই। উড়-উড়ভাবে কয়েকটি কথা তাঁহার কানে গিয়াছে—কর্ণপাত করেন নাই। তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে ঘরাও-বিবাদ বাধাইয়া দিতে দেশের কতকগুলি লোক বড়ই পটু। এই যুক্তিতেই—মনে কোনরূপ সন্দেহের কারণ হয় নাই। কার্য শেষ করিয়া বাটি আসাই মনস্থ করিলেন। ভগ্নীব নিকট সমুদায় ব্যক্ত কবিতা শীঘ্র শীঘ্র বাটি আসাই স্থির করিলেন। নৌকার জোগাড় কবিতা মীবসাহেব সিরাজগঞ্জ অঞ্চল হইতে বওয়ানা হইলেন।

সা গোলাম শৌলি পর্য্যন্ত লোক বাখিয়াছেন। সর্বদা যাতায়াত করিয়া মীবসাহেবের গুপ্তসন্ধান গোপনে লইয়া সা গোলামকে বলিতেছে। সংবাদ আসিল, মীবসাহেব বাটি অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তিন চার দিবস পবেই দ্বিতীয় সন্ধানী আসিয়া বলিল, মীবসাহেব পাবনা পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। বোধহয় দুইতিন-দিন পাবনায় বিলম্ব হইবে। সেখানে অনেক আলাপী লোক আছে। জেলায় বহুতর লোক। নানা দেশ-বিদেশের লোকে পরিপূর্ণ। বিশেষ মুন্সী নাদিব-হোসেন, পাবনা জেলার নাজিবের সঙ্গে তাঁহাব বিশেষ বন্ধুত্ব। দুই তিন দিবস পাবনায় না থাকিয়া আসিতে পারিবেন না।

সা গোলাম এদিকে ভালবকমে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। মীবসাহেব পাবনা পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। একথা গ্রামের লোক, চতুঃপাশ্বস্ত গ্রামের লোক, সকলেই শুনিয়াছে। বাটি আসিলে তাঁহার ভাগ্যে যাহা ঘটিবে তাহাও সকলে পূর্ব হইতেই জানিয়াছে। অনেকেই তাঁহাব আগমন প্রতীক্ষায় আছে। কিভাবে তিনি পৈতৃক বসতবাড়ি, পৈতৃক সম্পত্তি হইতে তাড়িত হন, সকলেরই তাহা দেখিবার ইচ্ছা। এক দুই কবিতা তিনদিন কাটিয়া গেল। পাবনাতেও জামাই-বাবুর সম্মুখে মীবসাহেব অনেক কথা অনেকের মুখেই—তাঁহার পূর্ব শোনাকথার ত্রাণ—শুনিলেন। মনে কিছু সন্দেহ হইল। কথাটাব মধ্যে কিছু সত্যাংশ না থাকিলে এত দূর ছড়াইবে কেন? সাধাবণে শুনিবে কেন? সে কথা লইয়া আন্দোলনই বা হয় কেন? অবশ্যই কিছু হইয়াছে। অবশ্যই কোন কথা নূতন উঠিয়াছে। অবশ্যই কিছু না কিছু হইয়াছে। নানারূপ চিন্তায় মশগুল হইয়া পদ্মা পার হইলেন। নৌকা গৌরীশ্রোতে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। মাঝিয়া জোরে দাঁড় টানিতেছে। সন্ধানী লোকেরা প্রতি মুহূর্ত্তে সংবাদ দিতেছে যে, এই পর্য্যন্ত আসিলেন—অমুক স্থান হইতে নৌকা ছাড়িলেন।

মীরসাহেব লাহিনীপাড়া গ্রামের ঘাট ছাড়িয়া শাঁওতার ঘাটের নিকটবর্তী হইয়া দেখিলেন যে, বহু-সংখ্যক লোক ঘাটে দণ্ডায়মান। মনে মনে ভাবিলেন যাহা শুনিয়াছি তাহা যদি মিথ্যা হয় তবে নিশ্চয়ই সা গোলাম লোকজন সহকারে আমার অভ্যর্থনার জন্ত ঘাটে দাঁড়াইয়া আছে। নৌকা বত নিকটে আসিতে লাগিল মীরসাহেব ততই আশ্চর্য্যাম্বিত হইতে লাগিলেন। দেখিলেন সা গোলাম আছে, দেবীপ্রসাদ আছে, আরও অনেক লোক আছে। কিন্তু দৃশ্য ভিন্ন, এ দণ্ডায়মানের অর্থ ভিন্ন—ভাব ভিন্ন। লাঠি, সড়কি, ঢাল, তরবার, বাঁধাকোমর, কদ্রুভাব—রোষের লক্ষণ। সকলেই দণ্ডায়মান। ডাক্তার নিকটে নৌকা ভিড়িতেই উচ্চস্ববে একজন বলিয়া উঠিল “যদি প্রাণ বাঁচাইতে চাও, যদি মান রাখিতে চাও তবে এঘাটে নৌকা-ভিড়াইও না। ভাসিয়া আসিতেছ, ভাসিয়াই চলিয়া যাও। এ-ঘাটে কোন প্রয়োজন নাই। নৌকা লাগাইবার কোন অধিকার নাই।”

শ্রোতস্বতী গোবীরশ্রোতে নৌকা টানিয়া ধরিয়া নৌকার বেগবন্ধা করিতে বা ফিরাইতে কাহারও সাধ্য নাই। মুখের কথায় কেমন করিয়া কুল না ধরিয়ে কি প্রকারে অত্মদিকে যাইবে অথবা ফিরাইবে? শ্রোত ছাড়াইয়া মন্দশ্রোতে নৌকা পড়িতেই দাঁড়িবা দাঁড় ছাড়িয়া লগী ধবিল। তখন দেবীপ্রসাদ পুনর্বার বলিতে লাগিল—“এখানে নৌকা ভিড়াইতে পারিবেন না, কেন অপ্রস্তুত হইতেছেন।”

পাঠক! যে জামাই শতহস্ত ব্যবধান থাকিতে সেলামেব উপর সেলাম বাজাইয়া শব্দরের নিকট ভক্তি প্রকাশ করিত, স্নেহ-আকর্ষণের আকর্ষণী ফেলিয়া শব্দরের মনকে শতহস্ত দূর হইতে টানিয়া লইত, আজ সেই জামাই স্বয়ং তরবারি হস্তে বুক ফুলাইয়া চক্ষু উল্টাইয়া নজোরে দণ্ডায়মান। চাকরের হস্তে বন্দুক। সেলাম আলায়কুমের নামও মুখে নাই। ইহার পর দেবীপ্রসাদের ঐ কথা। জামাইবাবু এখন পর্য্যন্ত কিন্তু নীরব। আজ কে কাহার অভ্যর্থনা করে। আজ কে মীরসাহেবকে মান্য করে? সর্দাব, লাঠিয়াল, এবং অগ্ন অগ্ন আরও অনেক হাত সেখানে ছিল, কিন্তু মীরসাহেবকে সেলাম বাজাইতে আজ কোন হাতই উপরে উঠিল না।

মীরসাহেব বুঝিলেন যে গুড়ে বালি পড়িয়াছে। হুধে গো-চনা মিশিয়াছে। দেবীপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “নৌকা ভিড়াইবে না কেন?”

দেবীপ্রসাদ বলিলেন—“নৌকা লাগাইয়া কি হইবে ? নৌকা লাগাইতে আমরা দিব না । আপনি দেখিতেছেন না ?”

“কই আমি তো কিছুই দেখিতেছি না ! তোমরা কি আমাকে আগু বাড়াইয়া লইতে আইস নাই?” তখন জামাইবাবু মুখে কথা ফুটিল ।

সাঁ গোলাম কর্ণশভাবে বলিলেন,—“না, না, খাতির-তওয়াজা করিয়া লইতে আসি নাই । একেবারে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতে আসিয়াছি । এ মাটি তোমার নয়, এ-ঘাট তোমার নয়, এ জমিদারী তোমার নয়, এ-বাড়িও তোমার নয় । বড় মীরসাহেব অভাবে সকলি তাঁহার কন্ঠাব—তোমার ইহাতে কোন স্বত্ত্ব নাই !”

মীরসাহেব হাসিয়া বলিলেন—বাপু ! তুমি স্তখে থাক ! আমি চলিলাম ।

জলেব উপব থাকিয়াও জামাইয়ের কথায় মীরসাহেব যেন দশহাত মাটিতে বসিয়া পড়িলেন । মাঝিদিগকে নৌকা ছাড়িয়া দিতে আদেশ করিলেন । কোনদিকে যাইবেন, কোথায় যাইবেন কিছুই বলিলেন না । গোবীন্দ্রোতে নৌকা ভাসিয়া চলিল । সাঁওতার ঘাট ছাড়াইয়া ক্রমে চাপড়াগ্রামের সীমা ধরিল । তখন মীরসাহেব বলিলেন—“গুরে কোথায় যাও ?”

নৌকা লাগাইতে অনুমতি করিলেন—আর বলিলেন, ‘এপারেই থাকিব না । পাড়ি দিয়া ওপারে যাও । মাঝিরাও নৌকার মুখ ফিরাইয়া দাঁড় ধরিল । অতি অল্প-সময়ের মধ্যেই নৌকা অপরপারে গিয়া চবে ঠেকিল । মীরসাহেব পৈতৃক-বাটি, জমিদারী ও জিনিসপত্র ইত্যাদি সমুদায় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি হইতে আজ সম্পূর্ণরূপে বেদখল হইলেন । তাঁহার চিরসাধের আশাতরী সোনার-চাঁদ জামাই তরবারি হস্তে আজ গোবীন্দ্র-গর্ভে ভাসাইয়া দিয়া স্থস্থির হইলেন । হাসিমুখে দলবলসহ বাটি আসিলেন আশা পূর্ণ হইল । কিন্তু চিন্তার ভাগ কিছু বেশী বোধ হইল । অত্যাচার সকলেই আজিকার এই ঘটনায় মহা-দুঃখিত হইলেন । মীরসাহেব কাহারও নিকট এ-দুঃখ প্রকাশ করিলেন না । তাঁহার সেই পূর্ব-সাহস, সেই পূর্ব-বল, সেই পূর্ব-আমোদ, পূর্ব-ভাব, সকলি সমভাবে রহিয়া গেল । তিনি প্রায় ছয়াস নৌকায় নৌকায় থাকিয়া নানা স্থান বেড়াইয়া নানা কারণে বাধ্য হইয়া সাঁওতার অতি সংলগ্ন লাহিনীপাড়া গ্রামে মূল্যী জিনাতুল্লার কন্যা বিবি দৌলতন-নোসাকে বিবাহ করিলেন । আবার সংসারী হইলেন ।

একত্রিংশ তরঙ্গ

দৌলতনামেসা

মাননীয় দৌলতনামেসা দেখিতে উজ্জ্বল শ্রীমবর্ণা, মধ্যমাকৃতি। চক্ষু, কণ্ঠ, নাসিকা, হ্র, ললাট নিখুঁত। সে পবিত্র রূপের বর্ণনা কবা পথিকের অসাধ্য। অপূর্বের সহিত তুলনা করিয়া, দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বুঝাইয়া দিতেও অক্ষম। মুসলমান বর্ণা মধ্যে অনেক খুঁজিলাম, পাইলাম না। হয় তো এ কথায় পাঠক মাত্রেই উদাসীন পথিককে পাগল মনে করিতে পারেন। কি কবিব! পথিকেব চক্ষে যদি জগতের কোন বর্ণাকেই দৌলতনামেসার সহিত তুলনা করিয়া দেখাইতে না পারে তবে সে কি কবিবে? তবে কি উপমা রহিত? না তাহাও নহে। কিন্তু পথিকেব চক্ষে বটে। এই সকল কথায় কোন পাঠক ক্রোধে জ্বলিয়া-পুড়িয়া যদি এই তবঙ্গ পাঠ না করেন, আক্ষেপ নাই। কাবণ জগৎ পবাদীন, মন স্বাধীন।

পথিকের চিন্তাপথে কতকগুলি মুসলমান রমণী আসিয়া বিস্তৃতভাবে দাঁড়াইলেন। ইহাদেব মধ্যে বাজকছা, মহামানীয় বংশেব অতি-পবিত্রা, সদ-চরিত্রা, দেবীসদৃশা, বর্ণীকুলের শিরোমণি মহোদয়গণও বহিয়াছেন। মহামতি লিখকগণ-হস্তে যিনি, যে অবস্থায় যে প্রকাব কল্পনার চক্ষে পড়িয়াছেন উহার মধ্যে তাঁহাও অনেক বহিয়াছেন। কিন্তু পথিকের চক্ষের দোষে, তাঁহাদিগকে যেন কেমন কেমন দেখাইতেছে। উপস্থিত রমণীগণ মধ্যে—অনেকেই পবিত্রা, অনেকেই স্বর্ণা রমণী-সদৃশা। অনেকেই রূপে গুণে ভুবন-বিখ্যাত। কিন্তু সর্ব-বিষয়ে সর্বাদ্বিনী স্তন্দরী বলিয়া বহু চেষ্টাতেও পথিক আপন মনকে সেকথা স্বীকার করাইতে পারিল না। সে মনে দৌলতনামেসার রূপই যেন জগতের আরাধ্যা, পথিক-চক্ষে ঐ রূপই যেন সকল রূপের শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সুতরাং তুলনা করিয়া পাঠকগণকে বুঝাইতে সক্ষম হইল না। তবে প্রাচীন কয়েকটি কথা শুনাইয়া উদ্দেশ্য সাধনে প্রয়াস পাইল বটে, কিন্তু তাহাতে অনেকেই চটিতে পারেন। মহানিশুক, মহাপাপী, বলিয়া নানাপ্রকার ভৎসনা করিতে পারেন—করুন, পথিক তাহা সহ করিবে। কিন্তু কথা শুনাইতে ক্ষান্ত হইবে না। বাহার যেরূপ মনের গতি এবং মাথার ক্ষমতা, তিনি সেইরূপ বুঝিয়া লইবেন। যথা—

প্রভু মহম্মদের স্ত্রী, ইহার মহাপবিত্রা এবং পূণ্যবতী? দৌলতনামেসা

তাঁহাদের কিস্করীর কিস্কবী ! মুসলমান জগৎ-চক্ষে তাঁহাদের দাসীর দাসী । কিন্তু সপত্নী বাদে, হিংসার আগুনে তিনি মনে মনে জলিয়া-পুড়িয়া থাক হইয়াছেন কিনা তাহা অন্তর্ঘামী ভগবান ভিন্ন মানুষে কখনই জানিতে পারে নাই । আকার-প্রকারে, হাবভাবেও কখন সে তাব কেহ দেখে নাই । তাহার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জলন্ত অক্ষরে পরে দেখাইব । আর একটি কথা—

প্রভু মহম্মদের কন্যা মহামাতা হাসেন-হোসেনের জননীবিবি যিনি ইসলাম জগতে রমণীকুলের সর্বশ্রেষ্ঠা । সকলের মাননীয় এবং আশ্রয়দাত্রী । তিনিও কিন্তু সপত্নীবাদ—মহানলকে হৃদয়ে আশ্রয় দিয়াছিলেন । সে মহাযাতনাসম্মত মহাবিষ সে পবিত্র শবীবো প্রবেশ কবিয়াছিল । পয়গম্বরের দুহিতা, এমামেব জননী, মহাবীরেব অঙ্ক-লক্ষী হইয়াও (হিংসার কল্যাণে) সে মহাবেগ হইতে মনকে রক্ষা করিতে পারেন নাই । অনেক সময় বিবি হুজুমার নামে জলিয়া উঠিতেন ।

পথিকেব পূজনীয়া দেবী, এক মুহূর্তেব জন্ত শত্রুমুখে কখনও অপবাদগ্রস্ত হন নাই ! সে মিথ্যাবাদে অতি অল্পকালের জন্তও স্বামীর মন হইতে সবিয়া যান নাই । ইহা কি কুলদ্রবী গোববের কথা নহে ? —উদাসীন পথিকের কি গোববের কথা নহে ?

বিবি আয়েশাসিদ্দিকা হজরাত মহম্মদেব প্রিয়তমা স্ত্রী । শাস্ত্রে বলে হজরাত নূরনবী মহম্মদ, আয়েশাসিদ্দিকাব বক্ষে পবিত্র মস্তক রাখিয়া জগৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন । জীবনের শেষসমায় ভালবাসার সম্পূর্ণ চিহ্ন জগতে ভাল কবিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন । সে সময় আয়েশাসিদ্দিকার বয়স সবে আঠার বৎসব ছিল । এত অল্পবয়সে পতি-পরায়ণা, পতিগত-প্রাণা ছিলেন । বদরল আকবরির যুদ্ধের পর মদিনায় ফিবিয়া আসিতে মিথ্যাপবাদে কিছুদিনেব জন্ত সে পবিত্র রমণীকেও স্বামীর অপপ্রিয়পাত্রী হইতে হইয়াছিল ।

রমণী-প্রধানা বিবি খাদিজা প্রভু মহম্মদেব প্রধানা স্ত্রী । কয়েক স্বামীর পর চল্লিশ বৎসর বয়সে হজরাত মহম্মদের কার্যো ও বিশ্বাস-গুণে বয়সের ন্যূনাধিকা থাকা সত্ত্বেও যুবা মহম্মদকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন । সে সময় প্রভুর বয়স পঁচিশ বৎসর । তখনও ধর্মোপদেষ্টা বলিয়া আরব-খণ্ডে পরিচিত হন নাই ।

পথিকের পূজনীয়া দেবী আজীবন এক স্বামীপদ কায়মনে সেবা করিয়া, সেই স্বামীপদ-প্রাপ্তে মস্তক রাখিয়া জগৎ কান্দাইয়া, জগৎ হইতে চলিয়া গিয়াছেন । ইহাও পথিকের কম গৌরবের কথা নহে ।

অন্তরূপ চিত্র দেখুন। আফ্রিকাথেও নীলনদ-তীরে স্থবিধ্যাত মিশর নগরের রাজমন্ত্রী আজিজ মেসেরের স্ত্রী, যাহার গুণের বর্ণনা পারসিক মহাকবি জামী-মহোদয় সহস্রমুখে বর্ণনা করিয়াছেন। নাম “জুলেখা”। তিনিও ধর্মের মাধ্যম কুঠার মারিয়া পবিত্র-প্রণয়-বন্ধন ছিন্ন করিয়া, মহামতি ইউসুফের প্রেমে মজিয়া, —রূপে মোহিত হইয়া, বমণীকুলে কলঙ্করেখা পাতিয়া গিয়াছেন। ইউসুফের মন ভুলাইতে, কত যত্ন, কত চেষ্টা, শেষে “হফতম খানা” (সপ্ততল বাসর) নির্মাণ করিয়া নিজ-মুক্তিসহ মানসাক্ষিত নাগরে প্রেম-ভাবপূর্ণ, কৃচ্চি-সম্পন্ন, নানাবিধ চিত্র, বিখ্যাত চিত্রকর দ্বারা চিত্রিত করিয়া ইউসুফের মন ভুলাইতে, প্রিয়দর্শনের হস্ত ধরিয়া চিত্রগুলি দেখাইয়াছিলেন। মহাপুত্র মন ভুলাইয়া কপথে আনিতে কত প্রকার যত্ন করিয়াছিলেন। যাহার বক্ষক ঈশ্বর, তাহার মতিগতি কিবাইতে সাধ্য কাব? সে চিত্রে সে মন ভুলিল না। জুলেখা মিথ্যাতান করিয়া হৃদয়ের রত্ন—মহাবত্ন ইউসুফকে অযথা অপরাধী করিয়া বন্দিখানায় পাঠাইতেও ক্রটি করেন নাই। স্তবং পথিক তাহা হইতে চক্ষু ফিরাইল।

ভাবতরমণী “নূরজাহান” শেষে রাজবাণী। প্রথমে শের আফগানের মন-মোহিনী ছিলেন। আশ্চর্য্য পতিভক্তি। অন্যায়সে স্বামীঘাতককে পতিত্বে বরণ করিলেন। রাজবাণী হইয়া আবও যশস্বিনী হইলেন। অকাতবে পতিঘাতককে ক্রোড়ে শয়ন করিয়া প্রেম বিতরণ করিলেন। ইহাতেও কি বলিব নূরজাহান রমণীরত্ন? রাজদৌরাগ্না-ভয় অবশ্য ছিল, স্বাকার করি, কিন্তু স্বামীর উদ্দেশ্যে প্রাণ বিসর্জন করিতে কি সে-সময় কোন উপায় ছিল না? যাহার ইচ্ছা হয়, তিনি সৈনিক—সীমন্তিনীর রূপগুণের প্রশংসা সহস্রমুখে করুন কিন্তু উদাসীন পথিক যাহা ভাবিবার ভাবিয়া চক্ষু অতৃদিকে ফিরাইল।

তৃতীয় চিত্র—কবির বন্ধিম যে-চক্ষে আয়েষার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যে “পজিসনে” তিলোসুতার “ফটো” তুলিয়াছেন। যে তুলিতে কুন্দ-নন্দিনীর শরীর আকিয়াছেন। এবং গুণাকর যে কৃচি ও প্রবৃত্তিতে কৃ-স্বভাব-সম্পন্ন—মালিনীর মুখে বিহার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, পথিক সে চক্ষু, সে পজিসনে, সে তুলি, সে প্রবৃত্তিতে দৌলতনেনসাবেব রূপগুণ বর্ণনা করিতে অক্ষম। কাজেই শেষকথা দৌল-তননেসা পবিত্রা, মহাপবিত্রা, দয়াবতী, পুণ্যবতী, এবং আজীবন চিরসতী। সে পবিত্রপদই পথিকের মুক্তিপদ, পূজনীয় পদ। স্বর্গ হইতেও গরিয়সী। ইহা

অপেক্ষা পথিক আর কি বর্ণনা করিবে। তুলনা করিয়াই বা আর কি দেখাইবে? কাজেই নীরব। কাজেই সকালের কথা, একালের কথা আপাততঃ এইখানেই শেষ। মনযোগ করিয়া এখন মনের কথা শুভুন।

মীরসাহেব পৈতৃক-বসতবাড়ি, বিষয়-সম্পত্তি হইতে জামাইয়ের চক্রে অদৃষ্টের লিখায় বঞ্চিত হইয়াছে। পথেব ভিখারী হইয়াছেন। এই সকল ভাবিয়া দৌলতননেসা তাঁহাকে বিশেষ যত্ন ও আদরের সহিত সযত্নে রাখিয়াছেন। পিতাব সঞ্চিত সমুদায় অর্থ স্বামী হস্তে অর্পণ করিয়া স্বামী পদসেবায় সর্বদা-বত রহিয়াছেন। কোন কারণে তাঁহাব মনে কোনরূপ কষ্টের কাবণ না হয় তদপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন।

দৌলতননেসাবের পিতা বঙ্গপুর জেলায় মীরগুন্সীব কাব্য করিতেন। কথায় কথায় টাকা আসিত। তাঁহার বংশের প্রদীপ, উজ্জল-বস্ত্র, মহামূল্য-মণি বাহা বল, সকলই ঐ একমাত্র কল্যা। স্মৃতরাং কল্যার আদরে জামাই সর্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। বিবাহের তিন বৎসর পূর্ব মুনী জিনাতুল্যা পবলোক গমন করিলে সংসাবের সমুদায় ভাব মীরসাহেবের শিরেই পড়িল। ভাগী নাই, অংশী নাই, অন্ন দাবী নাই, কোন বিষয়ে অভাব নাই। পাঠক! দয়াময় জগদীশ মীব-সাহেবকে বাহ্যিকস্বখে একপ্রকাব সে-সময় ভালই রাখিয়াছিলেন। সর্বদা হাসি-খুসী, রঙ্গ-তামাসাতেই। সংসাবষাত্রা নির্ঝাঁক কবিতা লাগিলেন। বসিরুদ্দীন আবার আসিয়া জুটিয়াছে। গান, বাজনা, বগড, আমোদ, বেদম চলিতে লাগিল।

দৌলতননেসা নিজগৃহে শয়ন করিয়া আছেন। বাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া যাইতেছে। মীবসাহেব আমোদ-আহ্লাদেই আছেন। দৌলতননেসাবেব কর্ণে গানের স্বর আসিতেছে, বাজনার শব্দ যাইতেছে। বামাকণ্ঠেব মধুবধনিও সময় সময় প্রবেশ করিতেছে। নূপুংসেব বনবানীও কানে লাগিতেছে—বাজি-তেছে। ষত রাত্রিই হউক স্বামীর সহিত দেখা হইলে, সেই বিস্ময়ভাব, সেই বিস্ময়-প্রেমভাব, সেই হাসিমুখে সেই মধুমাখা হাসি-কথা।

পাড়া-প্রতিবেশীরা সময় সময় অনেক অনেক কথা বলিত। তোমাবই বাড়ি, তোমাবই ঘর, তোমাবই বিষয়, তোমাবই সকল। তুমি একঘরের একটি মেয়ে, তোমার আদরের সীমা নাই। আর তোমার স্বামী সর্বদা রঙ্গ-রসে আমোদে মত্ত। আমোদ চুলোয় যাক, মাঝে যে আবার কি ঘটনা। মীরসাহেবের এ-নিতান্তই

অগ্নায়। তুমি কিছুই বলিতেছ না, কিন্তু ভাল হইতেছে না। শেষে বড়ই পস্তাইবে।

দৌলতননেসা হাসিয়া বলিতেন। বাড়ি-ঘর, টাকা, কাহার? বল তো বোন! আপন জীবনই যখন আপনাব নয়, এ-জগতই যখন চিরস্থায়ী নয়, তখন গৌরব কিসের? তাবপবে তাঁহার সকলি ছিল। আমার সম্পত্তির চতুর্গুণ সম্পত্তি তিনি কিনিতে পারিতেন, এত টাকা তাঁহাব ছিল। না ছিল কি? সম্ভান-সম্মতি, পরিবার সকলই ছিল। সংসাবে লোকের যাহা চাই, সকলি অতি পরি-পাটিক্রুপে তাঁহাব ছিল। সে সকল এখম নাই। আশ্চর্য্য কথা—তিনি সে সকল কথা লইয়া কোনদিন কোন কথা মুখে আনেন না। কিন্তু তাঁহার মনে যে কিছু না বলে একরূপ নহে। এখন ভাব দেখি বোন! তাঁহাব মনে দুঃখ কত? ও গান-বাজনা, নাচ ধরিতে নাই। ও বামাকণ্ঠে কোন কৃতাবেব কাবণ নাই। আব কারণ থাকিলেই বা কি? আমি ইহাই চাই, আব ইহাই ঈশ্ববেব নিকট সর্ব্বদা প্রার্থনা কবি যে তিনি স্বখে থাকুন। তাঁহার অসীম-চিন্তা অস্তব হইতে দূব হউক, তাঁহার মনেব দুঃখ ক্রমে উপশম হউক। তিনি যাহাতে স্বখে থাকেন সেই আমার স্বখ। প্রতিবেশীবা এই সকল কথা শুনিয়া অবাক হইয়া বহিত। কেহ বা রাগ করিয়া উসিয়াই চলিয়া যাইত।

দ্বাত্রিংশ তবঙ্গ

অপূর্ব্ব দৃশ্য

জগৎ অসীম নহে। সমুদ্রতলও অতলস্পর্শ নহে। জগতে যাহা আছে, তাহাব সীমাপরিমাণ, শেষ যাহাই কেন বল, না অবশুই আছে। স্বখ, দুঃখ, বিরহ, যন্ত্রণা, উন্নতি, অবনতি সকলই ঐ সীমারেখারই মধ্যগত। জন্মই মৃত্যুর কারণ। স্বস্থ-তাই পীড়াব পূর্ব্ব-লক্ষণ, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে ঐ দুইটি কথার মধ্যে, আদি, মধ্য, অন্তসীমা সকলই রহিয়াছে! আবার দেখুন, উদয়ই অস্তের কারণ! বজ্রনাই প্রভাতের আদি-লক্ষণ! প্রভাত আছে বলিয়াই আবার সন্ধ্যা। স্তবরাং উন্নতির শেষসীমাই অবনতির সূত্রপাত। সীমাবেখা-স্পর্শ করিলেই পরিবর্তন। কেনীর দৌয়াত্মো অগ্নি রহিয়া রহিয়া জলিগ! একেবারে সীমারেখা পর্য্যন্ত গিয়া ঠেকিয়াছে। কার সাধ্য রক্ষা করে? প্রকৃতি কাহারও নিজস্ব-রূপে আয়ত্তাধীন নহে। স্ব-ভাবেব অভাব কখনই হইতে পারে না। জমিদার, তালুকদার,

মধ্যশ্রেণী, কৃষকশ্রেণী প্রভৃতি যাবতীয় শ্রেণীর লোকেরই অসহ্য হইয়া উঠিল। প্রাণ যায়, আর সহ্য হয় না। কি করে কোথায় গেলে বক্ষা পায়! কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না। কিন্তু মনের গতি অন্তপ্রকাব দাঁড়াইয়াছে!

অতঃদিকে হরিশের হৃদয়ভেদী বক্তৃতায়, এবং “পেটরিয়টের” সেই জ্বলন্ত ভাবপূর্ণ বাক-বিতণ্ডায় অনেক বঙ্গভূষণের হৃদয় দুঃখে গলিয়া গিয়াছে। নীলকরের বিরুদ্ধে একটু উত্তেজিত না হইয়াছে তাহাও নহে। দীনবন্ধু, দীনবন্ধুব মহামূল্য দর্পণখানি অনেকের ঘরেই উঠিয়াছে। অনেকেব হস্তে উঠিয়া যাহা দেখাইবার তাহাও দেখাইতেছে। ভারত-বন্ধু লং দর্পণখানি বেলাতীমাঞ্জে সাজাইতে গিয়া কাবাবাসী হইয়াছেন। জরিমানার হাজাব টাকা দাতা কালী সিংহ আনন্দ-সহকায়ে দান করিয়া তবজমা-কাবককে খালাস কবিয়াছেন। মাননীয় হর্গেল বাহাদুর ভারতীয় সিভিল সার্ভিস আকাশে পূর্ণ-জ্যোতি-সহকারে, পূর্ণ-কলেবরে, পূর্ণচন্দ্র-রূপে দেখা দিয়াছেন। প্রজার দুর্দশা স্বচক্ষে দেখিতেছেন। প্রজার আর্গুনাদে বঙ্গেশ্বরের আসন পধ্যস্ত টলিয়াছে। মহামতি লাটবাহাদুর প্রজার দূরবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জ্ঞাত নীলকরের দৌবাত্ম্য স্বয়ং তদন্ত জগা “সোনামুখী” আশ্রয়ে মকসলে বাহিব হইয়াছেন।

বর্ষাকাল। কালীগঙ্গা জলে পবিপূর্ণ। “সোনামুখী” নদীয়া অঞ্চল ঘূবিয়া, কুমারনদ হইয়া কালীগঙ্গায় পড়িয়াছে। কালীগঙ্গাব আজ অপার-আনন্দ। বঙ্গেশ্বরের বাপ্পীয়তরী বঙ্গে করিয়া প্রজার দূরবস্থা, নীলকরের অত্যাচার দেখাইতে দেখাইতে ক্রমে শালঘব মধুয়ার কুঠি পর্য্যন্ত লইয়া আসিয়াছে। পাঠক! যখন সৌভাগ্য গগনে স্তবাতাস বহিতে থাকে, তখন তাহা নিবারণ করিতে কাতারও মাধ্য হয় না। আজ প্রজাব ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছে। সকলেই শুনিয়াছে যে এই জাহাজে লাটসাহেব আসিয়াছেন। আমাদের যথার্থ রাজা এই কলের নৌকায় আসিয়াছেন। প্রাণ ভরিয়া প্রাণের কথা লাটসাহেবকে শুনাইব। মনের কথা মন ভরিয়া বলিব। আমাদের দুঃখের কাহিনী শুনিতেই বঙ্গাধীপ স্বয়ং মফস্বলে বাহির হইয়াছেন। প্রজার মনে এই বিশ্বাস। ঘটনাও তাহাই—ঘটিলও তাহাই।

কালীগঙ্গার দুইধারে সহস্রাধিক প্রজা স্তিমারের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়া চলিল। শুধু দৌড়িল তাহা নহে—সহস্রমুখে বলিতে লাগিল—দোহাই ধর্ম্মাবতার! আমরা

মারা গেলাম। আমরা একেবারে সাবা হইলাম। আপনি রাজা, আমরা প্রজা, আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমরা ধনেপ্রাণে সাবা হইয়াছি। আমাদেরকে রক্ষা করিয়া যান। দোহাই ধর্মাবতার। আমরা ধনেপ্রাণে একেবারে সাবা হইয়াছি। আমাদের দুঃখেব কথা শুনিয়া যান। যমেব হাত হইতে আমাদেরকে উদ্ধার করিয়া যান। “শ্রামচাঁদ” আঘাতে পৃষ্ঠে দাগ বসিয়াছে একবার পবিত্রচক্ষে সেই দাগগুলি দেখিয়া যান। আপনি দেশেব রাজা! আমাদের পেটের দিকে মুখের দিকে একবার চাহিয়া যান। দোহাই ধর্মাবতার! আমাদের দুর্বস্থাব প্রতি একটু দৃষ্টি করিয়া যান।

সে কান্না কে শোনে? কাহাব কর্ণেই বা যাইবে? ইঞ্জিনের স্বাভাবিক বিকট-শব্দে প্রজাব আর্ন্তনাদ লাটমহামতিব কর্ণে উঠিবে কেন? বোধহয় তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, গ্রামালোক স্টিমাব কখনও দেখে নাই, তাহাই ছুটাছুটি করিয়া শোরগোল করিয়া আমাদের সহিত দেখিতেছে। আহ্লাদে দৌড়িতেছে। ক্রমেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ক্রমেই কান্নার-বোল দ্বিগুণ বৃদ্ধি। স্টিমার উজ্জানমুখে যাইতেছে। শ্রোতবেগ অতিক্রম করিয়া যাইতে সম্ভবতঃ একটু ধীবে চলিয়াছে। কালীগঙ্গাও বেশী প্রশস্ত নহে। একপারের কথা অপরপারের লোকে বিনামনযোগে বুঝিতে পারে। স্টিমারের সেই কর্ণভেদী ধব-ধব-ঘস-ঘস শব্দ পরাজয় করিয়া সে হৃদয়-বিদাবক আর্ন্তনাদ গ্রান্টমহামতিব কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি চৈতন্ত হইলেন। যেমনই মনযোগ, অমনি হৃদয়ে আঘাত। উভয়কুলেব বহুসংখ্যক প্রজাব আর্ন্তনাদে আজ বঙ্গেশ্বরের মন গলিয়া গেল। মনে মনে মনস্ত্র কবিলেন সে জেলায় যাইয়া ইহাব ব্যবস্থা করিবেন। প্রজাব দুর্বস্থা নিবারণ জন্ত বিশেষ যত্নবান হইবেন। মহামতিব মনেরভাব প্রজার জানিবার ক্ষমতা হইল না। আশ্বাসমূলক একটি কথা শুনিতেও তাহাদের ভাগ্য হইল না। তাহারা ভাবিয়াছিল যে আমাদের এই কান্নায় লাটসাহেব স্টিমার থামাইতে আদেশ করিবেন, আমরা মনের দ্বাব খুলিয়া দেখাইব। দুর্বস্থার কাহিনী আজ মনের সাধে শুনাইব। তাহা হইল না। স্টিমার থামিল না। কি ভীষণ দৃশ্য! “নীলকরের দৌরাখ্যা আগুনে আর কতকাল জ্বলিব। রাজগোচরে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জন করিব সেও স্বীকার! তত্ৰাচ নীল আর বুনিব না।” এই কথা স্থির করিয়াই সহস্রাধিক প্রজা নদীকূল হইতে জলে ঝাঁপ দিয়া ডুবিতে ডুবিতে ষ্টিমাব দিকে আসিতে লাগিল। প্রাণের মায়া নাই, জীবনের আশা নাই,

কোনরূপ স্ব্থের ইচ্ছাও আর নাই। কেনীর দৌরাভ্যো মরিতেই হইবে। আর কেন? রাজ-সম্মুখেই ডুবিয়া মরিব। এই কথা মনে করিয়াই সহস্রাধিক প্রজা জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল, নদীশ্রোতে অঙ্গ ভাঙ্গাইল। মহামতি লাটবাহাদুর মহা-বাতিব্যস্ত হইলেন। ষ্টিমার থামাইতে আজ্ঞা করিলেন এবং ষ্টিমারস্থ সমুদায় জালিবোট জলে নামাইয়া প্রজাদিগকে উঠাইতে আদেশ করিলেন। যাহাবা সম্ভরণ দিয়া ষ্টিমার ধরিল, ষ্টিমাবের উপর উঠিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া ছুরবস্তার বিষয় বলিতে লাগিল। ক্রমে সমুদায় প্রজা ষ্টিমারের চতুষ্পার্শ্বে, কেহ জলে, কেহ জালিবোটে, কেহ ভাস্কায় থাকিয়া আপন আপন দুঃখের কান্না কান্দিতে লাগিল। প্রজাব ছুরবস্তার কথা শুনিয়া লাটবাহাদুর অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল। দশ-বাব জন প্রজাকে ষ্টিমারে লইয়া অপব অপব সকলকে আশ্বাস বাক্যে বুঝাইয়া বলিলেন—‘তোমাদের যাহার যে নাশিথ থাকে, আগামী পবন্ত শনিবাব পাবনায় গিয়া আমাকে জানাইও। আমি তোমাদের বিচার অবশ্যই করিব। তোমরা কুষ্টিয়ালকে ভয় করিও না। এ-দেশে তাহাবাও যেমন প্রজা, তোমাবাও সেইরূপ প্রজা।’ এই বলিয়া ষ্টিমাব ছাড়িয়া দিলেন। অল্পক্ষণ-মধ্যেই সোনা মুখী গোবীর অগাধ জলে আসিয়া গড়িল। দেখিতে দেখিতে গোবী পাব হইয়া পদ্মাব শ্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া পাবনা অভিমুখে চলিল।

ত্রয়োত্রিংশ তবঙ্গ

সূত্রপাত

নৌল—বিদ্রোহের সূত্রপাত। বাঙ্গালায় নৌলকরের অধঃপতনের সূত্রপাত। প্রজার আনন্দের সীমা নাই। সকালে সকালে স্নান-আহার করিয়া—ঘরে যাহা ছিল সিদ্ধপোড়া, ভাতেভাত যাহা জুটিল আহাব করিয়া গ্রামেব মাথালপ্রজা ছাতি-লাঠি, গামছা লইয়া লাটদরবারে যাত্রা করিল। নৌলকবেব দৌরাভ্যো আগুনে যাহারা পুড়িয়া ছারখারে যাইতেছিল, তাহাবাই জ্বিয়া চলিল।

এদিকে কেনী পথে পথে লাঠিয়াল সর্দার, দেশওয়ালী, দোবে, চোবে, পাড়ে, সিং মোতাইন করিয়া বাধিয়াছেন। তাঁহার এলাকার যে প্রজা পাবনায় যাইবে তাহার পিঠের চামড়া থাকিবার তো কথাই নাই। তাহার পর অল্প ব্যবস্থা। ফিরে গিয়ে বাস্তভিটার মাটি আর চোখে দেখিতে হইবে না। স্ত্রী-পরিবারের ভাগ্যে যাহা থাকে তাহাই হইবে।

একথা কুঠিয়াল পক্ষেব মুখে জাবী হইল। প্রজার কানে উঠিতেও বাকি রহিল না। কিন্তু কেহই গ্রাহ্য করিল না। বাতাসে কথা আসিল বাতাসেই উড়িয়া গেল। প্রজার মনে সেই উৎসাহ, সেই আনন্দ। কাব কথা কে শোনে? কে আজ সেকথা গ্রাহ্য কবে, আমীন, তাগাদঙ্গীব, পাইক, ববকন্দাজের ভুকুমের চোটেই আগুন জলিয়াছে, আজ খোদকেনীর ভুকুম শুতো শুতো উড়িয়া গেল। এক কানে প্রবেশ,—অন্য কানে বাহির! ভুকুম অতুলেব ভয়ে প্রজাব হৃদয় থরহরি কম্পে আজ কাঁপিয়া উঠিল না। সাহসের উপর নির্ভর কবিয়া সকলে এক জোটবদ্ধ হইয়া জ্বিয়া চলিল। কি আশ্চর্য্য! খোদযমেব ভুকুম আজ শুতো শুতো উড়িয়া গেল।

হিন্দু-মুসলমান একত্রে একযোগে পূর্ণ উৎসাহে বক্ষবিস্তার কবিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিল। কাহাবও কোন কথা কানে কবিল না। কারও বাধা মানিল না। কাল বঙ্গেরেব মুখে যে কথা শুনিয়াছে সেই কথাতেই প্রজাব চিব-পবিশুস্ত হৃদয়ে কথঞ্চিৎ আশাবারিব সঞ্চার হইয়াছে। তাহাতেই এত আনন্দ। কার সাধা বাধা দেয়? কাব সাধা সে মাত ওয়াদিগেব গতি, ভয় দেখাইয়া বলপূর্ব্বক রোধ করে? কে তাহাদিগকে আটকাইয়া রাখিতে পারে? কাব সাধা তাহাদেব সম্মুখে ঐ কথা মুখে কবিয়া দাঁড়ায়? পঞ্চ-ঘাট ভবিয়া প্রজাগণ দলে দলে পাবনা অভিমুখে মনের আনন্দে চলিল। প্রজার বল, প্রজাব সাহস, প্রজার ঐ সকল কথা কেনীর কর্ণে উঠিলে কেনী কি করিতেন, জানি না। তাহার কর্ণে এইমাত্র উঠিল যে—“অমুক-অমুক গ্রামেব প্রজারা ভুকুম মানিল না। নিশ্চয়ই তাহারা পাবনা যাইবে।”

আব কি কথা আছে? যেই শুনা অমনি ভুকুম। প্রধান প্রধান আমলাগণ হাতিঘোড়ায় চড়িয়া, যমদূতের গ্রায় বাছা বাছা সর্দার, লাঠিয়াল, হিন্দুস্থানী, দেশ-ওয়ালী সেপাইগণ সঙ্গে কবিয়া মনিবেব নিকট বাহাজুরী লইতে, গ্রামে গ্রামে প্রজাদমনে চক্ষুবাক্স করিয়া চলিলেন। চলিলেন—না ছুটিলেন। যে দল যে গ্রামের প্রজার চক্ষে পড়িল, তাহাদেব চক্ষের চাউনি দেখিয়াই তাহাদেব শরীর গবম হইয়া গেল। চক্ষের কথা তো আপেক্ষেই বলা হইয়াছে। কাবণ বাহা কথনো দেখেন নাই, কানে শোনেব নাই, তাহাই দেখিলেন এবং শুনিলেন। গ্রামে প্রবেশ কবিতেই একজন শোর করিয়া বলিয়া উঠিল—“ঐ আসিয়াছে, ঐ আসিয়াছে, তোরা কে কোথায়?”—

হাতের মাথায় যে যাহা পাইল, সে তাহা লইয়া ছুটিল। চক্ষের পলক ফিরাইতে না ফিরাইতে বহু-লোক একত্রে দলবদ্ধ হইয়া হাত নাড়িয়া নাড়িয়া বলিতে লাগিল—“ভাল মানুষ হও তবে চলে যাও, যদি প্রাণের ভয় থাকে তবে ফিরে যাও। আব এক-পা এদিকে আসিলেই মাথা ভাঙ্গবে। কাল লাটসাহেবেব মুখে শুনিয়াছি, কুঠেলসাহেববা আমাদের রাজা নয়, হঠাকষ্ঠার মালিকও নয়। ওবে! আমবা আগে বুঝিতে পারি নাই। আজ আমরা আমাদের রাজার দরবারে যাইব। এতদিন যা-যা কবেছ, তাই জানাব। একটি কথাও মিছে বলিব না। এখন বেশ বুঝাচ্ছি। আর হবে না—এখন খুব বুঝেছি, আমবাও প্রজা তোমরাও প্রজা! আমরাও যা তোমরাও তাই। ভাল চাস ফিরে যা—আব আগে বাড়িস না। আমবা যথার্থ বাজাব কাছে যাচ্ছি। তোদের ও-ভেল—রাজার কথা কে শোনে রে?”

কুঠিব চাকর! কমপাত্র নহে সহসা হটিবার লোক নহে—হটিল না। কিন্তু প্রজার কথায় পায়ের তালু হইতে মাথা পর্যন্ত জলিয়া পুড়িয়া থাক হইয়া গেল। ভাবিল না, চিন্তাও কবিল না, চিন্তা কবিলার সময়ও পাইল না। হঠাৎ একপ কেন হইল? একপ পরিবর্তন কেন ঘটিল? উপস্থিত ক্ষেত্রে ভাবাও কঠিন কথা। চিন্তা করাও শক্ত কথা। তাহাতে কুঠিব চাকর, পূর্ণমাত্রায় সর্বদাই রাগেচড়া। ঐ সকল মর্ষভেদী কথায় বেগে ভূত হইলেন। স্ব-স্ব পদ-মর্যাদা, কুঠির ক্ষমতা, নিজ এলাকা। কাল যাকে চাবুক সহি কবেছি, সাহেবের শামচাঁদের ঘা আজ পর্যন্ত পিঠে বিরাজ করছে। উঠতে কানমলা, বসতে কানমলা, লাথি, কিল, চড়চাপড়ের সীমা কে করে? মেয়েমানুষ ধবে নীল কাটাইয়াছি। যে ব্যাটা হাত নেড়ে বেশী কথা বলছে, কালও এই কালাগঙ্গায় ঐ ব্যাটার ঘাড়ে গুণবাড়ি দিয়া নীলের নৌকায় গুণ টানাইয়াছি। আজ এতবড় কথা, কি কাণ্ড! এই সকল কথা মনে মনে তুলিয়া শেষ করিতে করিতেই উত্তেজিতভাবে তেড়িমেরী করিয়া মুখে স্পষ্ট কথা ফুটিল—

মার! দের! মার! দের! একমুখ হইতে কথা ছুটিতেই অধীনস্থদিগের পক্ষাশ মুখে ঐ কথা—

ঐ পীট পীট প্রায় পাঁচশত মুখে আন্তরিক ক্রোধের সহিত ঐ কথা—বেশীর

ভাগ প্রজার মনেব অন্তঃস্থান হইতে বাহির হইল আর কি ? কর খুন ! মার ! দেব ! ভাঙ্গ মাথা, মার লাঠি—

যাহা ঘটবার ঘটিল—শেষে যাহা ঘটিল, সে কথা প্রকাশ করিতে যথার্থ বলিতেছি পথিকের মনে বড়ই কষ্টবোধ হইল ! চক্ষে জল আসিল ! পাঠক ! যথার্থ বলিতেছি মনে সেই একপ্রকাব ভাবেব উদয় হইল। যে, হা ! কাল কি আজ কি ভগবান ! তোমাব যে অপাব মহিমা, তোমার যে অপার লীলা ! তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আজিকাব এই ঘটনা। নীলকব এবং প্রজার ঘটনা। সাধারণ চোখে দেখিতে গেলে কিছুই নহে। হয়ত কাহারও চক্ষে নাও পড়িতে পারে। কিন্তু স্থিরভাবে একবার ভাবিয়া দেখিলে আজিকার এই ঘটনার ভগবানেব একটি মহৎ-মহিমার স-প্রমাণ হইল।

পাঠক ! অনেকেই গান গায়, অনেকেই গানে গলিয়া যায়। কেনীর কার্য-কারক, লাঠিয়ালদিগের অবস্থা দেখিয়া মাননীয় ভ্রাতার একটি গান পথিকের মনে পড়িল। গানটি শুন্মন—উপস্থিত ঘটনার ভাব এই গানেই পাইবেন.—বিস্তারিত বর্ণনায় আর শক্তি হইল না গানেই বুঝিবেন। শুন্মন—

গান

দেখ ভাই জলেব বৃন্দ-বৃন্দ, কিবা অদ্ভুত, দুনিয়ার সব আজব খেলা।
আজি কেউ বাদশা হয়ে দোস্তল'য়ে রংমহলে কবছে খেলা—
কাল আবার সব হারিয়ে ফকির হয়ে সার করেছে পাছেরতলা
আজি যে ধন গরিমায়, লোকের মাথায় মাবছে জুতা এড়িতোলা—
কাল আবার কপনীর পরে টুকনীর করে, কান্ধে ঝোলে ভিক্ষাবঝোলা ॥
আজি যেখানে শহর কতই নহব বসিয়াছে বাজারমেলা—
কাল আবার তথা নদী নিরবধি করছেরে তরঙ্গ খেলা ॥

পাঠক ! কৃষ্টির লোক প্রজাশাসনে দল বান্ধিয়া দলে দলে কৃষ্টির নিকটবর্তী যে যে গ্রামে বাহাদুরি লইতে আসিয়াছিল—যে দল যে গ্রামে ঢুকিল। সেই গ্রামেই ঐ এক কথা। একরূপ অভ্যর্থনা। একরূপ ভাব। শেষফল সকল স্থানেই সমান। গ্রাম বিশেষ, কিছু ইতর বিশেষ যে না ঘটিল তাহাও নহে। কোন-দলই দল বাঁধিয়া আর কৃষ্টিমুখ হইতে পারিল না। নানা পথে, নানা ভাবে, নানা আকারে, যে যে প্রকারে স্ববিধা-স্বযোগ পাইল, প্রাণ লইয়া কৃষ্টিমুখে ছুটিল।

ছুটিল কি? পালাইল। কাহাকে বাধা হইয়া ঘোড়াটি ছাড়িয়া যাইতে হইল। কেহ কেহ পবিত্র বসন ফেলিয়া বাধা হইয়া দিগম্বরবেশে মাঠে মাঠে দৌড়িয়া পালাইল। ঢাল, তরবার, লাঠি, ঠেঙ্গা কালীগঙ্গার শ্রোতে যাহা ভাসিবার ভাসিয়া চলিল, যাহা ডুবিবাব ঐখানেই ডুবিয়া পড়িল। জলে ফেলিল কে? অমোঘঅস্ত্র সকল আজ জলে বিসর্জন করিল কে? সকলি সেই দয়াময়ের মহিমা। কুঠির লোক প্রাণ লইয়া পার। কেনাব অস্ত্র প্রজা হস্তে আজ প্রথম জলে ভাসিল, এই প্রথম জলে ডুবিল। যাহারা দব্বারে যাইতে একটু বাধা পাইয়াছিল, তাহারা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মনের আনন্দে সম্পূর্ণ উৎসাহে জিলায় লাটদরবারে চলিল। পূর্বে যাহাদের যাইবার কোন কথাই ছিল না, উপস্থিত ঘটনায় তাহাবাও অনেকে তাহাদেব সঙ্গি হইল। কি জানি আবার কোন দুস্মন কোন পথে কি ঘটনা ঘটায়। হিন্দু-মুসলমান একত্রে আপন আপন ইষ্ট দেবতার নাম করিয়া সাব বাঁধিয়া পথে বাহিব হইল। কালীগঙ্গায় গৌরীগর্ভে নৌকায় পদ্মার ঘাটে এবং চলতি বাস্তায়, পদপ্রজে কত লোক যাইতে লাগিল, তাহার সংখ্যা করা কঠিন। সকলের মুখেই আনন্দের আভা। সকলেই যেন কি একটা মহৎকার্য্যে কৃতকার্য্য হইবে আশয়েই মহাখুশী। সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত। সকলেই যেন জেল হইতে খালাস পাইয়াছে। অবিচাবে অত্যাচারে এতদিন জেলখানায় পচিতেছিল। দৈববলে বলীয়ান হইয়া জেল ভাঙ্গিয়া যেন কোন যথার্থ আশ্রয়দাতার পদাশ্রয় লইতে বেগে ছুটিয়াছে! পদ্মা-গোবী-সংযোগস্থল বড়ই ভয়ানক। পদ্মা পাড়ি না দিলে জিলায় যাইবার উপায় নাই! নৌকাতে পদ্মাপার হইতে হয়। স্থল-পথে বান্দারাস্তা বহিয়া গেলেও কাঁচাদিয়াডেব ঘাটে পাটনীর নৌকায় খেয়াপার হইতে হয়। পাঠক! চলুন আমবাও পদ্মাপাবে যাই।

চতুর্ত্রিংশ তরঙ্গ

দরবার

আজ শনিবার। বঙ্গেশ্বর প্রকাশ্য দরবারে প্রজার দূরবস্থা শুনিবেন। প্রার্থনাপত্র গ্রহণ করিবেন। এই ঘোষণা। জিলাময় লোক। মাঠে, ঘাটে, রাস্তায়, ইছামতী:নদীর পূর্ব-পশ্চিম, উভয়তীরে, দালানে, কোঠায়, ঘরে, বোটে, বজরায়, নানাবিধ স্থানে লোক আর ধরে না। লাট দেখিতে, দরবার দেখিতে, মনের বেদনা জানাইতে নীলকরের দৌরাত্ম্য বিষয় বঙ্গেশ্বরের গোচর করিতে

হিন্দু, মুসলমান, কৃষকশ্রেণী, মধ্যশ্রেণী, তালুকদার ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র জমিদার, মহাজন, ব্যবসায়ী নানা শ্রেণীর লোক উপস্থিত। নীলকর পক্ষীয়, নীলকর সংশ্রবী, হিতৈষী, ভালবাসার লোকও যে ঐ সকল দলের মধ্যে কেহ কেহ না আছে এরূপও নহে। তাহার! নানাবেশে, নানাভাবে দলমধ্যে গোপনে, প্রকাশ্যে বেড়াইতেছে—সন্ধান লইতেছে। উপস্থিত লোকসমুদ্র মধ্যে কুটিয়াল-পক্ষীয় লোক বিন্দু-সদৃশ। হঠাৎ কাহারও নজরে পড়িতেছে, আবার কোথায় মিলাইয়া যাইতেছে, তাহার আর সন্ধানই পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু এত লোকের মধ্যে সে ছদ্মন চেহারা যেন মার্কামারা। মুখের দিক নজর পড়িতেই যেন মুখভাবেই স-প্রমাণ করিয়া দিতেছে যে, আমরাই কুটিয়াল-পক্ষীয়। আমরাই নীলকরের গুপ্তচর ও সন্ধানী। বড় বড় জমিদার বড় বড় বজরায়, বড় বড় নিশান উড়াইয়া, ঘাট-অঘাট আলো করিয়া ইচ্ছামতী বক্ষে ভাসিতেছেন। বায়ু প্রতিঘাতে জল নাচিতেছে। বোট-বজরাও নাচিতেছে। অনেকই নানাদোলায় ডুলিতেছেন। কে কোন পক্ষে থাকিবেন, প্রজাব হইয়া দুইটি কথা বলিবেন কি নীলকরের পক্ষ সমর্থন করিবেন। লাটসাহেব আজ আছেন কালই চলিয়া যাইবেন, শেষে—ধরিবে কে? কুটিব নায়েব, পেস্কার দেওয়ানজীবাবুকে কত ডালা, কত ফলফুল, কত চব্য-চম্প-লেহ-পেয় দিয়া একটু অম্লগ্রহ পাইয়াছেন। লোকে বলে ভালবাসা হইয়াছেন। তাহার পরেও কত কৃধির, কত তৈল উপহার দিয়াছেন। কত আলাপী লোকের নিকট হইতে গ্রিসীয়ান মিলিপর কেহ ঠনঠনের জোগাড় করিয়া আমলাদিগেব সম্মুখে হাজির করিয়াছেন। তাহাতেই রক্ষা! তাহাতেই আজ বজবার মাঙ্গুলে বড় বড় নিশান। কুটিয়াল-দিগকে দিয়েথুয়ে যা আছে তাহাতেই কষ্টেফটে কোন গতিকে মানসম্মত বজায় রাখিয়া এতদিন কাটাইয়াছেন। মনের কথা মনেই আছে। মুখ ফুটে প্রকাশ করা জমিদারশ্রেণীর বড়ই কষ্টের কারণ হইয়াছে। পরিণাম ফল প্রতি তাঁহাদের অনেকের লক্ষ্য পড়িয়াছে। প্রজার দিকে থাকিলেই বা কি হয়। নীলকরের পক্ষে তো যে প্রকারেই হউক, প্রকাশ্যেই হউক, মানসম্মত বজায় রাখিতে গোপ-নেই হউক, একভাবে আছেনই। আর প্রজার পক্ষে যে না আছেন তাহাও নহে। গোপনে গোপনে তাহাদের সহিত বিশেষ যোগ রাখিয়াছেন। আজ পর্যন্ত, কোন পক্ষের নিকটেই মনেমুখে, পরিচিত হন নাই যে তিনি কাহার? রামের, না রাবণের? নীলকরের না প্রজার—বড়ই কঠিন সমস্যা উপস্থিত! আর পা দিয়ে

সাপ খেলান চলিল না। দুইমন যোগাইয়া নিরাপদে থাকা আর ভাগ্যে ঘটিল না। মহা-সঙ্কটকাল উপস্থিত! এই শ্রেণীমধ্যে মীরসাহেবও আছেন, ম্যা গোলামও আছেন। কিন্তু পৃথক পৃথকভাবে স্বতন্ত্র নৌকার। কে কোন পক্ষে আছেন তাহ! এখনও প্রকাশ পায় নাই। তবে এটা নিশ্চয় কথা একপ্রকার জানা কথা। মীর-সাহেব যে পক্ষ অবলম্বন করিবেন, সা গোলাম তাহার বিপরীত দিকে—বিপক্ষে নিশ্চয়ই থাকিবেন। মনে স্থখ কাহারও নাই। অল্প অল্প জমিদারগণেরও ঐ কথা! মনে নানাকথা। স্বার্থ, লোভ, স্বদেশ, প্রজা, নীলকব গুদাম, গ্রামচাঁদ, নীলহউজ, নীলের নৌকা, গুণ টানা ইত্যাদি। অল্প দিকে লাটদরবার! যা থাকে কপালে ইত্যাদি নানা কথায় নানা চিন্তায় সকলেই চিন্তিত। মনে-স্থখ কাহারও নাই। প্রজার মনেও স্থখ নাই, নীলকরের মনেও স্থখ নাই।

সোনামুখী ইছামতীগর্ভে নানাসাজে সজ্জিত হইয়া উচ্চ-মাস্তুলে ব্রিটিশ নিশান সদর্পে উডাইয়া—শ্রীশ্রীমতী মহাপ্রাণীব জয়! ঘোষণা, ইছামতীর শ্রোতের সহিত একত্র মিশিয়া করিতেছে।

বর্ষাকাল। শহরের প্রায় তিনদিকে ইছামতী পবিথাকপেই স্বাভাবিক বক্রগতিতে পদ্মায় মিশিয়াছে। পবিসব বেশী নহে। এপাব-ওপাব, কথা। যাওয়া-আসা করিতে পারে। কালগতিকে জলস্থল প্রায় সমান হইয়াছে। নদী কিনারের দালান, কোঠা, বড়াস্তা, বড় বড় গাছ, তাহারপরেই বোট, বজরা, ডিঙ্গি-নৌকা, জল, মাস্তুলে নিশান। একটু দূরেই সোনামুখীর সেই মহামাস্তুলের মস্ত-কোপবী বাজনিশান অতি গম্ভীরভাবে ছলিয়া ছলিয়া বঙ্গেশ্বরের শুভাগমন চিহ্ন বায়ুকে দেখাইয়া সর্বত্র ঐ আগমন সংবাদ প্রচার জগৎ নব্রতার সহিত অনুরোধ করিতেছে। সোনামুখীর পশ্চিম দিয়া চলতি নৌকা, শ্রোতসহায়ে মহাবেগে ছুটিয়াছে। ইছামতীর পশ্চিমতীরে লোকের অবধি নাই। কত আসিতেছে, কত সারিবান্দিয়া, দাঁড়াইয়া, জাহাজ, নৌকা, বজরা, বোট, নিশান দেখিতেছে। খেয়ানৌকা ডোব ডোব হইয়া মানুষ পার করিতেছে।

মফস্বলের দরবার! বিশেষ বর্ষাকাল। দরবারে সাজ-সজ্জা, বাহার, জাঁকজমক কিছুই নাই। বৃহৎ সামিয়ানার তলে শতাধিক আসন। তিনখানি বড়চৌকি একত্র করিয়া তাহার উপরে একখানি গদীবসান ভাল চেয়ার। তহুপরি জড়াও চাঁদওয়া। জিলায় হাকিমান, থানাদার, জামাদার, বরকন্দাজ, চৌকিদার

সকলেই হাজির। দুইপ্রহর হইয়া বেলা কিছু গড়িতেই জিলার মান্দিগণ্য-সম্ভাস্ত মহাশয়গণের দরবারে বার আরম্ভ হইল। চতুর্দিক হইতে সাধারণ প্রজার চরি-বোল এবং আল্লা-ধ্বনিতে জলস্থল কাঁপিতে লাগিল। সময় বুঝিয়াই বঙ্গেশ্বর পারিষদগণসহ দরবারে পদার্পণ করিলেন। সে সময় প্রজাগণ উৎসাহের সহিত দ্বিগুণ রবে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। জলহল কাঁপাইয়া, বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া, সে অনন্ত জয়ধ্বনির প্রতিধ্বনি অনন্ত আকাশে হইতে লাগিল। চারিদিক হইতে ‘চুপ চুপ’ কথা উঠিয়া অতিঅল্প সময় ঐরূপ গোলযোগেই কাটিয়া গেল। শেষে সকলেই নীরব। বঙ্গেশ্বরের পারিষদগণের মধ্য হইতে একজন বাঙ্গালা ভাষায় প্রজাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—

“বঙ্গাধীপের আজ্ঞাক্রমে আমি তোমাদিগকে বলিতেছি। তোমাদের প্রার্থনাপত্র দাখিল কর, আর মুখে যদি বলিবার থাকে তাহা বল”—মুখের কথা মুখ হইতে না ফুরাইতেই অতিকম হইলেও দশহাজাব মুখে একযোগে বলিয়া উঠিল—

“দোহাই ধর্ম্মবতার! আমরা মরলাম। নীলের জুলুমে আমরা মরা গেলাম। আমাদের পেটে ভাত নাই। ধানের জমিতে জবরাণে নীল-বুনিয়া লয়। আমরা কি খাইয়া বাঁচি।”

কথা শেষ হইতে না হইতে প্রার্থনাপত্র সকল হাতে হাতে বঙ্গেশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইতে লাগিল। এক পারিষদে দরখাস্ত লইয়া কুলাইতে পারিলেন না। শেষ সমুদায় পারিষদ স্বয়ং বঙ্গাধীপ, স্থানীয় হাকিমান প্রভৃতি প্রজার প্রার্থনাপত্র হাতে লইয়া লাটসাহেবের দক্ষিণ-বামে রাখিতে লাগিলেন। পাঠক! একেবারে উপকথা মনে করিবেন না। এত প্রার্থনাপত্র দাখিল হইল যে লাটবাহাদুরের দুই পার্শ্বে দুইটি কাগজের স্তূপ খাড়া হইল। একটি মানুষ সেই স্তূপের পার্শ্বে অন্য-রাসে গা ঢাকা দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। তথ্যচ ইতি নাই, ক্রমেই হাতে আসিতেছে। মাঝে মাঝে প্রজার আর্তনাদ। নীলকরের দৌরাঙ্গ্য কথা, অত্যাচারের কথা লাটবাহাদুরের কানে আসিতেছে। মুখে যে কথা প্রার্থনাপত্রেও সেই কথা। তবে বিস্তারিতরূপে লিখা। কিন্তু মূল একই। প্রজার মনের জ্বালা, প্রার্থনাপত্রের চুষকভাব বুঝিতে লাটবাহাদুর কেন, দরবারস্থ যাবতীয় লোকেই বুঝিতে বাকি রহিল না। নীলকরের অত্যাচার যে প্রজাগণের অসহনীয় তাহাও

বেশ বোঝা গেল। নীলকর পক্ষীয় লোকের এবং দারোগা, জমাদার ও স্থানীয় হাকিমান, জমিদার সকলের সম্মুখে প্রজাগণ কাতরস্বরে দুঃখের অবস্থা কান্দিয়া কান্দিয়া বলিতে লাগিল। মনের কথা প্রাণ খুলিয়া বলিতে লাগিল। হাকিমান লজ্জিত, দারোগা, জমাদারের মাথা হেঁট, নীলকবেব মুখে চুনকালি, প্রজার চক্ষে জল। আর বুঝিতে বাকি কি? সকলেই বুঝিলেন, হাকিমান বুঝিলেন, বঙ্গাধীপও বিশেষ করিয়া বুঝিলেন যে যথার্থই নীলকবগণ অত্যাচারী। অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়াই এত উতলা, এত উত্তেজিত, এত একগুঁয়ে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আপাততঃ মিষ্টি কথায় ইহাদিগকে সান্ত্বনা করা কর্তব্য।

বঙ্গাধীপেব আদেশে আমাদের পূর্ব পরিচিত পারিষদমহোদয় উচ্চস্বরে স্পষ্টাক্ষরে বলিতে লাগিলেন—

“প্রজাগণ! তোমরা স্থির হও, এত উতলা হইও না। স্থির হইয়া শুন! গোল করিলে তোমাদের কাষোই বিয় ঘটিবে। স্থির হইয়া কথা শুন।”

প্রজাগণ! তোমরা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর প্রজা। তোমাদের প্রতি সবলেরা কোনপ্রকার অত্যাচার না করে, চোরডাকাতে তোমাদের টাকাকড়ি লুটপাট করিয়া না লয়। জমিদার, নীলকর তোমাদিগকে অত্যাচারে কোনপ্রকারে কষ্ট না দেয়, জোর জবরাণ না করিতে পারে তাহার জন্তই অর্থাৎ তোমাদিগকে চিরকাল সুখে রাখিবার জন্তই স্থানে স্থানে থানা, মহকুমা, জিলা বসান হইয়াছে। তোমরা সর্বপ্রকারে সুখে থাক ইহাই আমাদের অভিপ্রায়। নীলকবের অত্যাচারে তোমরা যে কষ্টে আছ তাহা বেশ বোঝা গিয়াছে।

প্রজাগণ মধ্য হইতে একজন বলিতে দশজন বলিয়া উঠিল—“দোহাই ধর্মান্বতার! আমরা একেবারে সারা হইয়াছি। আমাদের জাত, কুল, মান, প্রাণ সকলি গিয়াছে। পেটে ভাত নাই। তাহার উপর আমীন, খালাসীর বেতের ঘা, কপালগুণে কোন কোন দিন শ্রামচাদের সঙ্গেও আলাপ। দেখুন! পেটের, পিঠের অবস্থা দেখুন! আর কি বলব।”

পারিষদসাহেব বলিলেন—আর দেখাইতে হইবে না। তোমাদের দুর্দশার বিষয় সকলেই ভালমত বুঝিয়াছেন। শুন—স্থির হইয়া কথা শুন। যাতে তোমাদের ভাল হইবে, তোমরা সুখে থাকিবে তাহাই শুন।

তোমরা জমিদারকে দস্তুরমত জমির খাজানা বিনাওজবে দিবে। নীলকর

কি জমিদার তোমাদের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিলে প্রথম খানায় জানাইবে। পরে তাহারা যাহা বলিয়া দেয় অর্থাৎ মাজিস্তারসাহেবের নিকট জানাইতে বলিলে তাঁহাব নিকট জানাইবে। তিনি তোমাদের নালিশ শুনিবেন—তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। তোমরা যাহাতে স্থখে থাক তাহার উপায় করিবেন। তোমরা ইচ্ছাপূর্বক যদি নীলের আবাদ না কর তবে তোমাদিগকে জোর করিয়া কেহই নীল বুনি করাইতে পারিবে না। যে জোর জবরণ করিবে সেই শাস্তি পাইবে। বড, ছোট, গরিব, ধনী, কৃষিপ্ৰজা, জমিদার কি নীলকর বলিয়া বিচারে কোন ভেদ বিশেষ নাই। বিচারদালতে সকলেই সমান। এমন বিচারে আর তোমাদের ভয়েব কাবণ কি? মন্দ কাজ করিলে তোমরা ও যেমন শাস্তি পাইবে, নীলকর সাহেবও তেমনি শাস্তি পাইবেন। যে অপরাধে তোমরা কাটক খাটিবে, সেই অপরাধে নীলকর সাহেবও জেলে যাইবেন। বিচারদালতে কোন প্রভেদ নাই। কোনরূপ খাতির নাই। কাহারও ইচ্ছাব বিরুদ্ধে কেহ কোন কাজই করাইতে পাবে না। তোমাদের ইচ্ছা হয় তোমরা নীল-বুনিয়া তাহার মজুরী লও। ইচ্ছা না হয় নীল-বুনিও না, মজুরী পাইবে না।

শতমুখে বলিয়া উঠিল—ধর্ম্মাবতার! আমরা মজুরি চাই না। ভিক্ষা কবিয়া খাইব তবু নীলের বীজ আব হাতে করিব না। মজুরী আমাদের মাথায়। আমরা কিছুতেই আব নীল বুনিব না।

পারিষদ সাহেব : “শুন! আবও শুন।” সে তোমাদের ইচ্ছা। অনিচ্ছায় তোমাদিগের দ্বারা কেহই কিছু করাইতে পারিবে না। আর তোমাদের এই সকল দরখাস্তের বিচার কলিকাতায় গিয়া হইবে। তোমরা ইহার খবর সম্বন্ধেই জিলার হাকিমান সাহেবগণের মুখে শুনিতে পাইবে। আর তোমাদিগকে আভাষ বলিতেছি, শালঘর মধ্যার কুঠির নিকটে শীঘ্রই এক নূতন মহকুমা খোলা হইবে। পদ্মাপারের প্রজাকে পদ্মাপাব হইয়া আর পাবনায় আসিতে হইবে না।

প্রজাগণ অন্তরেব অন্তঃস্থান হইতে মহারাণীর জয়! জয় মা ভারতেশ্বরী জয়! ঘোষণা করিতে করিতে আনন্দে নাচিয়া উঠিল। দুই হাত তুলিয়া লাট-বাহাদুরকে আশীর্বাদ করিতে লাগিল। এত হুঃখের পর, এত যজ্ঞনা এত ক্লেশের পর প্রধান রাজপুরুষের মুখে এইরূপ আশ্বাসবাণী শ্রবণ করিয়া আনন্দে-বিহ্বল প্রায় হইল। দারোগা, জমাদার, গ্রহরী, সাক্ষী কেহই আর সে গোলযোগ নিবারণ

করিতে পারিল না। পুনঃ পুনঃ জয় ঘোষণা, পুনঃ পুনঃ আশীর্বাদ—
 হৃদয়ের গভীর স্থান হইতে আশীর্বাদ। অতি কম হইলেও কুড়ি হাজার কণ্ঠ
 হইতে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর জয়ধ্বনি হইতে লাগিল—সেপাই, সাদ্বী, প্রহরী,
 দারোগা, জমাদার স্বয়ং মাজিষ্টার সে গোলযোগ নিবারণ জ্ঞা চেষ্টা করিতে
 লাগিলেন। কেহই কিছু করিতে পারিলেন না। প্রজার আনন্দ যেন আর ধরে না।
 জব্বানে কেহ নীল-বুনানি করিতে পারিবে না। এই মহামূল্য কথায় প্রজার
 আনন্দ আজ হৃদয়ে ধরে না। দুহাত তুলিয়া নাচিয়া শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে আশীর্বাদ
 করিতে লাগিল। সে জয়ঘোষণা—সে আশীর্বাদে বাধা দেয় কার সাধ্য! ঘোর
 উন্মত্ত। কে কাহার কথা শুনে, কে আজ কাহাকে মাগ্ন করে! কাব কথায়, কার
 নিবারণে সে মত্ততা হইতে ক্ষান্ত হয়? মনে অণু কোন কথা নাই, ভবিষ্যত ভাব-
 নার দিকে কাহারও মন নাই, গ্রামে ফিরিয়া গেলে নীলকরের হাতে জাতি, মান,
 প্রাণ বজায় থাকিবে কিনা? ঘেটুকু আছে—যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা থাকিবে
 কিনা? বাড়ি গিয়া স্ত্রী-পরিবার, সম্ভানসম্পত্তি, ভাই, বন্ধু, পরিজনদের মুখ দেখিতে
 পাইবে কিনা? আজিকার এ ঘটনাব পরিণাম ফল কি? ইহার সীমা কোথায়?
 সে সকল কথার দিকে কাহারও মন নাই। জয়রবে উন্মত্ত। আশীর্বাদ করিতে
 করিতে কণ্ঠ ভঙ্গ। স্থানীয় হাকিমান, শাস্তিবক্ষক মহোদয়গণ, এই উত্তপ্ত স্বর্ণ-
 মাথা, রাজবচনাবলী তাঁহাদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা হইবে কি-না? তাঁহারা
 রক্ষা করিবেন কি-না? রক্ষা করিতে পারিবেন কি-না? নিরীহ প্রজার প্রাণ,
 নীলকর রাক্ষকের বিষময় বিশালদণ্ড হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন কি-না? অসীম
 সুখসাগরে ভাসিয়া আবার বিবাদতরঙ্গে হাবুডুবু খাইয়া একেবারে ডুবিতে হইবে
 কি-না? ক্রমে নরজীবন স্থায়িত্ব হইবে কি-না? হইবার আশা আছে কি-না? সে
 বিষয় কাহারও মনে নাই। আনন্দে বিভোর, জয়রবে বিহ্বল, জয়রবে মত্ত, ক্লার
 কথা কে শুনে? স্মৃতরাং সভা ভঙ্গ—বঙ্গেশ্বর পার্শ্বদসহ সোণামুখীতে উঠিলেন।
 স্থানীয় জমিদার, নীলকর, মহাজন, সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণের আহ্বান হইল। ক্রমে
 সকলেই সোণামুখীতে যাইয়া লাটবাহাদুর সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় করিয়া সেলাম
 বাজাইয়া বিদায় হইতে লাগিলেন।

চলুন আমরা প্রজাগণের সঙ্গে সঙ্গে পদ্মা পার হই। আর তাহারাজ আজ যে
 মহামূল্য রত্ন লাভ করিয়া চলিল; চলুন! তাহাদের মনের ভাবটা ভাল করিয়া

শুনিয়া নই। বড়কঠিন স্থানে আসা হইয়াছে। মানবজীবনে—নবজীবন। বড়ই কঠিন ব্যাপার। কি যে ঘটবে, প্রজার ভাগ্যে কি ঘটবে, তাহা সেই অন্তঃকর্ষী শগবানই জানেন।

বঙ্গেশ্বর অল্পই পাবনা ছাড়িবেন। পাকনার বর্তমান-শ্রী সোনাখুঁয়ার ধূস উদ্‌গীরণ সহিত একেবারে বিস্তী হইয়া যাইবে। আর কেন? আগমনে যোগ আনন্দকর—বিদায়ে যোগ বড়ই দুঃখকর—চলুন! আর এখানে থাকা নয়।

পঞ্চত্রিংশ তবঙ্গ

মানবের কথা

পাঠক! আমিও বলিতেছি মনের কথা—আপনারাও শুনিতেছেন উদাসীন পথিকের মনের কথা। এখন প্রাণ ভরিয়া একবার প্রজার কথা শুনুন। এ কয়েকদিন তাহারা কি বুঝিল, কি পাইল, ঐ শুনুন অকপটে মনের কথা প্রকাশ করিতেছে। কান পাতিয়া শুনিতে শুনিতে উহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলুন। অধমও সঙ্গেই আছে।

প্রথম প্রজা : ভালই হল! পদ্মাপাড়ি দেওয়ার দায় হইতে রক্ষা পেলেন। বাঁচা গেল। কুঠির নিকটেই মহকুমা হবে। হাকিম থাকবে। যখন যাহা হবে তখন হাকিমকে জানাইতে পারিব। প্রাণটি হাতে করে পদ্মাপাড়ি দেওয়ার দায় হইতে তো বাঁচা যাবে।

দ্বিতীয় প্রজা : হলে তো ভালই হয়! ভায়া! না হলে আর বিশ্বাস নাই।

প্রথম : ভায়া! তা কি আর না হয়ে যায়? একি তোমার আমার কথা না—বড়লোকের কথা? ভায়া! এ সাহেব-স্ববোর কথা। এ-কথার মার নাই।

দ্বিতীয় : তাতো বটে। তোমার আমার কথাটা যেন ভাল করে না বুঝেই বললেন যে বুঝেছি। আর ভায়া! কষ্টের জীবনে, অনাটনের সংসারে, স্বার্থের প্রয়োজনে, বিশেষ কতাদ্বায়ে এবং অল্পচিন্তায় আমাদের কথা ঠিক থাকে না। থাকিতে পারে না, আমরাও কথা ঠিক রাখিতে পারি না—তা ঠিক। কিন্তু বড়লোকের কথাটা কি রকম?

প্রথম : ভায়া! হে! রকম আর কিছু নয়। বড়লোকের সকলই বড়, দান বড়, রূপণতা বড়, মান বড়, অপমান বড়, গলাও বড়, কথাও বড়। যেখানে বড় কথা, সেইখানেই গোলের কথা। ওকথাও বড়লোকেরই কথা। কিন্তু সে মুখ

ভিন্ন—সে কথাও ভিন্ন। সে কথার মূল্য অনেক। ভায়া! ঈংরেজের যে কথা সেই কাজ।

দ্বিতীয় : আচ্ছা! আর একটা কথা। আমরা এতদিন না বুঝে কত বোঝাই যে মাথাব বয়েছি, কত ভূতেরই যে বেগাব খেটেছি, কতজনেরই যে বিনামা সোজা করেছি। না বুঝে কাঁব না পায় ধরেছি। কত কষ্টই ভোগ করেছি। তার আব ইতি নাই।

প্রথম : ভায়া! যা হবার হয়েছে। এখন দেখে শুনে, ভুগে পাকা না হয়ে থাকি, এটুকু যেন শক্ত হয়েছে। আর এ-কয়েকদিনে দেখলেম অনেক গুনলেমও অনেক। ধাঁধা কেটে গিয়েছে। নীলকর সাহেবরা যে আমাদের রাজা নয় সে জানটা ভালই জন্মেছে। ভায়া! বাজার ভাবই ভিন্ন। দেখলে না লাটসাহেবের কাছে জজ, মাজিষ্টার যেন কিছুই নহে। চুপ চাপ কথাটি মুখে নাই। মাছিটি পর্যন্ত নড়ে না। সকলেই যেন ভয়ে ভয়ে পা ফেলে, ভয়ে ভয়ে তাকায, ভয়ে ভয়ে কথা কয়। নীলকর সাহেবরা কে কোথায় পড়ে রইল, ভায়া! দেখেছ তো? লাটসাহেব তাহাদিগকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করলে না। খাতির তওয়াজার নামও করলে না। যেমন আমরা তেমন তাহারা। মফস্বলে দারোগা, জমাদারদের লাফানি ঝাপানি দেখে কে? বাপবে। বরকন্দাজের তেড়িমেরী কথাই বা কত! আজ কেমন ছরস্ত? লাটসাহেবের কাছে কেমন সোজা যোড়হাত—এক হাত দু-হাত নয়, ভায়া! একেবারে পঞ্চাশ হাত তফাৎ! খাড়া পাহারা। বাপবে বাপ! বড় বড় হাকিম, বড় বড় জ্যাস্ত-দায। আজ লাটের সম্মুখে যেন বিড়াল। চুঁ শব্দটি মুখে নাই।

দ্বিতীয় : ভায়া! সত্যি সত্যি কি আর নীল হবে না?

প্রথম : ভায়া! গুনলে কি নীল আর হবেই না। আমরা যদি ইচ্ছা করে বুনি তবে হবে। নীলকর সাহেবরা জবরান করে আর বুনিতে পারিবেন না। আমাদের ধানের জমিতে আর জবরানে মার্কি দিয়া নীলজমির সামিল করিতে পারিবে না। যে জবরাণ করতে খাড়া হবে সেই মারা যাবে। ভায়া! সে কি যে সে মুখের কথা নিশ্চয় যেন, যে অত্যাচার করবে সেই জেলে যাবে।

দ্বিতীয় : জেলে তো যাবে। ধরে নিয়ে গিয়ে যদি আগেই কাজ ঠাণ্ডা করে দিলে তখন জেলে গেলেই কি, আর ফাঁসিতে ঝুলালেই আমাদের লাভ কি? আমরা তো সারা হলেম!

প্রথম : নাহে—না ! ঈশ্বর আছেন । আর সারা হতে হবেন না । আমরা তো আর স্ব-ইচ্ছায় নীল বুনিব না । আর কার সাধ্য আমাদের জমিতে জবরানে নীল-বোনে । সকলে একজোট থাকলে আর ভয় কি ভায়া ? যে ব্যাটা আমাদের জমিতে নীল-বুনতে কি চাষ দিতে আসবে ; সে বেটার মাথা আগে ভাঙবো । প্রাণ দিব তবু নীল-বুনিব না । নীল-বুনিতে জমিও দিব না । চল ! শীঘ্র শীঘ্র চল ! পদ্মা পাড়ি দিয়া ওপারে যেতে পারলে বাঁচি । লাটসাহেবের মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক । আব যেন আমাদের পদ্মা পারে না আসিতে হয় ।

নানপথে, নানাকথা তুলিয়া প্রজাগণ হাসিখুশীতে যাইতেছে । কেহ নীল-করেব পিতৃমাতৃ শ্রদ্ধা করিতেছে । কেহ মাজায় কাপড় বান্দিয়া বাহাদুরি জানাইয়া “নীল আর হবে না নীল আর হবে না” এই কথা চিৎকার করিয়া কহিতে কহিতে যাইতেছে । কথায় কথায় লাটসাহেবের খোসনাম গান গাইতেছে । সোনা মুখীরই বা কত সুখ্যাতি করিতেছে ।

ষট্ত্রিংশ তরঙ্গ

বৈঠক

প্রজাগণ মনের আনন্দে হাসিখুশী করিতে করিতে গ্রামে আসিল । যাহারা বাড়িতে ছিল তাহারা এই সুখবর শুনিয়া মৃত শরীরে যেন জীবন সঞ্চার হইল । দুই হাত তুলিয়া লাটবাহাদুরের দীর্ঘজীবন ঈশ্বরের নিকট কামনা করিতে লাগিল । শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর মঙ্গল কামনা করিয়া ঈশ্বরের নিকট কামনা করিতে লাগিল । মেয়েমহলেও হলস্থল পড়িয়া গেল । উলুউলু ধ্বনিতে গ্রাম, পল্লী, পাড়া জাগিয়া উঠিল । “নীল আর হইবে না” এই কথা স্তনিতেই বৃদ্ধা, যুবতী, এমনকি বালিকার প্রাণ পর্যন্ত আনন্দে আটখানা হইয়া গলিয়া পড়িল । আমীন, তাগাদগীর, পাইক-প্যাদার ভয়, দ্রীলোকদিগের মন হইতে অনেক তফাৎ হইল । কেনীর নামে প্রাণ কাঁপিত—শবীর রোমাঞ্চিত হইত, আজ যেন আর সেকরূপ হইল না । ঝুঠির নামে মুখ, বুক শুকাইয়া হৃদয়ের রক্ত জল হইয়া যাইত, প্রাণ ধরফড় করিত, তাহাও যেন আর হইল না । লাটবাহাদুরের হুকুম, নীল আর হইবে না । মুখে মুখে কথা সংক্ষেপ—ক্রমেই সংক্ষেপ—শেষে এই পর্যন্ত দাঁড়াইল যে লাটবাহাদুরের হুকুম, “নীল আর হবে না” ।

নূতন কথা, নূতন ঘটনা, মাঝেকের মুখে নূতন নূতন খুব চর্চ্চা হয়। বিশেষ মহাস্বার্থের আভাস থাকিলে দিনরাত্রে সহস্রবার মুখে আঙড়াইলেও মনে স্তম্ভ জন্মে না। প্রজামহলে দিবাক্রান্তি ঐ কথা। কুঠির কথা—কেনীর কথা, সন্ধ্যার, লাঠিয়ালের কথা, আমরান, তাগদিগীরের কথা,—জুলুম, বদ্বিত্যের কথা সর্বদা তোলশাড় হইতে লাগিল। কিন্তু আগে যেমন নামেই আতঙ্ক নামেই হৃৎকম্প, নামেই অজ্ঞান, তাহা যেন আর এখন নাই। সকলে একছোট, এক পরামর্শ থাকিলে একা কেনী কি করিবে? নীলকর আশাদের রাজ্য নহে। তাহারাও প্রজা, অমরাও প্রজা,—রাজার চক্ষে সকলেই সমান তখন আর ভয় কি? এই কথা কয়েকটি প্রজার অন্তরের অন্তঃস্থান প্রবেশ করাতোই ভাবের ভিন্ন, সাহসের দৃষ্টির, হৃদয়ের লক্ষণ—তাহাতেই পথিক বলিতেছে প্রজার নবজীবন লাভ। অথবা চিরবন্দীর—হঠাৎ মুক্তিলাভ।

কয়েকদিন এইরূপ মনের আনন্দেই কাটিয়া গেল। গ্রামের মাখাল মাখাল, পরামণিক (প্রধান) দুই-চারজন একত্র হইয়া মাঝে মাঝে অতি চুপে চুপে পরামর্শ করে। কি পরামর্শ তাহারাই জানে। একদিন শুনা গেল যে একজন কাড়াদার গ্রামে গ্রামে কাড়া মাঝিবা উচ্চস্ববে বলিঙ্গা শাইতেছে, ‘তাই সকল! কাল বেলা দুই প্রহরের সময় সা গোলাম সাহেবের বাটিতে এই অঞ্চলের সমুদায় প্রজার এক বৈঠক হইবে। এইদেশ হইতে যাতে নীল একেবারে উঠিয়া যায় সেইজন্য বৈঠক হইবে। সকলেই বৈঠকে যাইও। দেশের ভালর জগাই বৈঠক, সকলেরই যাওয়া দরকার।’

দশজনে একত্র হইয়া কায়া করিলে যে লাভ আছে, তাহা প্রজাগণ তখন বেশ বুঝিয়াছিল। পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে, ছেলের-বুড়োর, হিন্দু-মুসলমানে একত্রে সা গোলামের বাড়িতে উপস্থিত হইল, দেশহিতকর বৈঠকে যোগ দিল। চারদিক হইতে প্রজাগণ আসিতে আরম্ভ করিল। উপরে আঙ্গিনাছোড়া সামিয়ানার নিচে পতরনখীর বিছানা। অতিঅল্প সময় মধ্যে বৈঠকপ্রাঙ্গণ পুরিয়া আঙ্গিনার দক্ষিণ-পশ্চিম পার্শ্বে সামিয়ানার বাহিরে উলঙ্গ শিরে মনের আনন্দে দাঁড়াইয়া গেল। বধাকালের সেই উত্তম অধ্যাতপ, ক্রম্বেশ নাই, অনায়াসে সহিয়া বৈঠকে যোগ দিল। এবং মনসংযোগে কথাসকল শুনিতে লাগিল।

বৈঠকের প্রধানকর্তা দুইটি জমিদার। একজন হিন্দু, একজন মুসলমান। বলা বাহুল্য মুসলমানটি সা গোলাম। হিন্দু জমিদারটির এই মন্ত্রণা পথিক্স যে তিনি

দেশের মধ্যে সর্বসাধারণের নিকট মহামাননীয় । সকলেই তাঁহার কথায় বিশ্বাস করে, সকলেই তাঁহার কথা শুনে ।

সেই সর্বজনপূজিত মহামতি মহোদয় দণ্ডায়মান হইয়া মুদ্রস্থরে অতিমিষ্ট-ভাবে বলিতে লাগিলেন :

“সত্য হিন্দু-মুসলমান মহোদয়গণ । নীলকরেব অত্যাচারে আমরা সকলে অস্থির হইয়াছি । জমিদার, তালুকদার, মহাজন, জোতদার, কৃষক, মধ্যশ্রেণী, বর্ষযাজক, গুরুদেব, গোসাঁই, পীর, ফকির, এমন কি মুটেমজুর পর্যন্ত কেনীর অত্যাচারে অস্থির । তাহা কাহারও অবিদিত নাই । এই উপস্থিত বৈঠকে অল্পমান পাঁচহাজার লোক উপস্থিত আছেন । বোধহয় এই পাঁচহাজার লোকের মনেই কেনীর অত্যাচার-কাহিনী সর্বদা জাগ্রতভাবে, জলন্ত আকারে গাঁথা রহিয়াছে । সেসকল কথা, সেসকল অত্যাচারের কথা বিস্তারিত বর্ণনা করা নিষ্পয়োজন । কে-না ভুগিতেছে, কে-না জলিতেছে, কে-না কেনীর অত্যাচার আগুনে পুড়িতেছে ? এতদিন আমরা জানিতে পারি নাই । আমাদের মূর্খতাতে আমরা বুঝিতে পারি নাই যে, আমাদের প্রতিপালক এবং সর্ববক্ষক রাজা নীলকর নহে । নীলকর আমাদের হস্তাকর্তা বিধাতা নহে । ভ্রমেই আমাদের সর্বনাশ ঘটয়াছে । ভ্রমেই আমাদের এতো কষ্ট উপভোগ কবাইয়াছে । পাবনার দরবারে আমরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে আমাদের বাজার দয়ার পাব নাই । গুণেব সীমা নাই । নীলকরই হউন, আর বিলাতবাসী অণু কেহই হউন, অত্যাচারী হইলে, আমাদের প্রতি অত্যাচার-অবিচার করিলে, রাজহস্ত হইতে তাহার নিস্তার নাই । রাজ-বিচার হইতে কিছুতেই অত্যাচারীর অব্যাহতি নাই । রাজক্ষে তাহারা এক আমরা উভয়ই সমান । এই কথার প্রমাণও ঐ দরবারেই পাওয়া গিয়াছে । এখন আমাদের কর্তব্য কি ? কেনীর হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি ? সে কি সহজে ছাড়িবে ? সে নর-বাস্ত্র এতদিন যে বসে রসনা পরিতৃপ্ত করিয়াছে, উদর পরিপোষণ করিয়াছে, তাহার স্বাদ কি সে হঠাৎ ভুলিয়া যাইবে, না ভুলিতে পারিবে ? তাহার অনায়াস লাভের আশা হইতে সে কি সহজেই হস্ত সঙ্কোচিত করিবে, না মন ফিরাইবে ? কখনই নহে । অতি কম হইলেও বার্ষিক পাঁচলক্ষ টাকা আয়ের পথ সে কি লুপ্তিয়া ভিড়িয়া না দেখিয়া অমনি বন্ধ করিবে ? কখনই নহে । পূর্ব হইতে আমাদের মতক হওয়া আবশ্যক, পূর্ব হইতেই রক্ষার পথ পরি-

স্বার করিয়া রাখা কর্তব্য। ভাইসকল। মনযোগ করিয়া শুনিতে থাক! লাট-সাহেব বাহাদুর আমাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া যে আদেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদের করা কর্তব্য ও সকলেরই তাহা শিরোধার্য। কেনী জবরান করিয়া নীল-বুনানি করিতে পারিবে না—রাজার আজ্ঞা, কিন্তু ভাবি অত্যাচার নিবারণের কোন নির্দিষ্ট উপায় রাজ-আজ্ঞায় নাই। ঘটনা হইলে, প্রমাণ গ্রহণ—পরে বিচার। আমরা নীল বুনিতে, কি নীলজমিব চাষ করিতে, অথবা নীলকরের সঙ্গে কোনরূপ সংশ্রব রাখিতে ইচ্ছা করিব না। সেও ছাড়িবে না। কেনী যথাসাধ্য বলপ্রকাশে আমাদের গণকে নির্যাতন করিয়া তাহাব জেদ বজায় রাখিতে, প্রচলিত প্রথা রক্ষা করিতে, নীলের আয় হইতে বঞ্চিত না হইতে, তাহাব গোচরনির্মিত শ্রামটাদ সকলের মাথার উপর ঘুঝাইতে বিশেষ চেষ্টা করিবে—প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। জোর-জবরদস্তি, মার-ধর, লুটপাট এখন যাহা আছে, তাহার চেয়ে দশগুণ বেশী করিবে। মিথ্যা মোকদ্দমা সাজাইয়া, মিথ্যা প্রমাণ জোটাইয়া কাটকে আটক করিবার জন্তও বিশেষ যত্ন করিবে। যাতে হয়, যে উপায়ে আমরা তাহার পদানত হই, তাহা কবিত্তে আর এদিক-ওদিক তাকাইবে না। ধর্ম-অধর্ম, গ্নায়-অগ্নায় এ-সকলের প্রতি লক্ষ্য থাকিবার তো কথাই নাই। আমরা নিজেরা নিজেকে রক্ষা করিতে পারিব না। তবে এ অবস্থায় কি কবা কর্তব্য? পণ্ডাও নিজেরা নিজেকে রক্ষা করিতে সমর্থ—রক্ষা করিয়া থাকে। আমরা নিজেকে নিজে রক্ষা কবা দূরের কথা, একদল, একজাতি, একগ্রাম, একদেশ একত্র হইলেও রক্ষা করিতে পারে কিনা সন্দেহ। নিজেরা অশক্ত হইলে রাজদ্বার খোলা আছে, তখন রাজার আশ্রয় লইব, দেশের হাকিমের নিকট জানাইব—‘রক্ষা কব’ বলিয়া গলবস্ত্রে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইব।”

“নিজেরা নিজেকে রক্ষা করিতে না পারিলাম, কেনীর দুর্দান্ত প্রবলপ্রতাপ এবং বিষম আক্রমণ হইতে নিজেরা নিজেকে রক্ষা করিতে না পারিলাম, কিন্তু সকলে একজোট, একমন, একমত হইয়া থাকিলে বোধহয় কোন কোন বিষয় রক্ষা করিতে পারিব। যাহা না পারিব, পারিলাম না দেখিলাম—নিজেরা রক্ষা করিতে পারিলাম না, শেষ পক্ষে সর্বরক্ষক হর্তাকর্তা বিচারকর্তা, রাজপ্রতিনিধি, রাজ-সংশ্রবী যাহাকে যেখানে পাইব, রক্ষা হেতু সবিনয়ে প্রার্থনা করিব।”

“আমি দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছি—কুড়ি পঁচিশ জন কৃষ্টির সর্দার লাঠিয়াল

গ্রামের কোন প্রজাকে ধরিয়া লইতে আসিল। সে কুড়ি পঁচিশ জন সর্দারের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া একা একজনের সাধা নহে। আত্মীয়স্বজন, ভাই-বেরাদর কতই আছে যে, তাহারা সকলে একত্র হইয়া সে দুরন্ত ডাকাতিদিগের হস্ত হইতে বাড়ির কর্তাকে রক্ষা করে। পাড়া প্রতিবেশী, আবশ্যক বোধ করিলে—গ্রামের লোক চেষ্টা করিলে, কথার কথা—রামনাথ মণ্ডলকে রক্ষা করিতে পারে। কিন্তু রামনাথ একা কিছুই করিতে পারে না। খুব বিবেচনা কর, দেখ, নীলকব কসাইয়ের হস্ত হইতে বাংলার গরুগুলা রক্ষা করিতে হইলে একা একজনে কিছুতেই আটিয়া উঠিতে পাবিবে না। তাহাতেই বলিতেছি আমবা নিজেবা নিজেকে রক্ষা করিতে অক্ষম। কাজেই সকলকে, সকলের আপদবিপদে সাহায্য করা কর্তব্য। এক-জনের প্রতি নীলবানবে লক্ষ্য পোড়াইবাব উপক্রম করিলে—আর কিছু নয় শুধু থুথু দিয়া সে আগুন নিবাইয়া দেওয়া সকলেব উচিত। যে বিপদই কেন হউক না, একের মাথায় ষোল আনা ভর পড়িলে সে কিছুতেই বাঁচিবে না। মাজা দমিয়া যাইবে, হয়ত একেবারে সারা হইতে পারে। আব সেই বিপদভার আমরা সকলে যদি তিল তিল করিয়া বাঁটিয়া লই তাগ হইলে কি হয়? তাইসকল! বল দেখি তাহাতে কি আমবা মারা পড়ি? আমাদের কিছুই হয় না। বিপদ বলিয়া একটি কথা ঘূর্ণাক্ষরেও মনে ধাবণ! হয় না। শত্রুব মুখেও ছাই পড়ে। কারণ যত বিপদ চাপাইবে ঈশ্বর ইচ্ছায় তিল তিল হইয়া কোথায় উড়িয়া যাইবে। কোন পরমান্নর সঙ্গে মিশিয়া কোথায় সংযোগ হইবে, তাহার সন্ধানই থাকিবে না। পরাস্তই বলক্ষয়। এইরূপ ক্রমে বলক্ষয় হইলে কেনই কয়দিন নীলকাষ্য চালাইবে, কয়দিন শালঘর মধুয়ায় বসিয়া রাজত্ব করিতে পারিবে? লজ্জায়, অপমানে, দায়ে শেষে আমাদের সহিত আপস-মীমাংসা করিয়া যাহাতে উভয়কুল রক্ষা পায় তাহার কোন উপায় অবশ্যই করিবে, আমরাও তাহাতে সম্মত হইব। আমি এক্ষণে আমার মনের কথা বলিতেছি যে, ঐ উচ্চ বেদীর উপবে পৃথক পৃথক স্থানে তামা, তুলসী, এবং কোরাণ রাখা হইয়াছে, যাহাতে বাঁহাব ভক্তি তিনি আপন আপন বিশ্বাস ও ধর্ম্মতঃ ঐ সকল পবিত্র জিনিষকে সরলচিত্তে মহাপবিত্র জ্ঞান করিয়া ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক অকপটচিত্তে একথা বলুন যে, আমরা আপদে বিপদে সকলকে সাহায্য করিব। একের বিপদ অগ্রে আপন বিপদ জ্ঞান করিয়া সাহায্য করিয়া লইব। নিজ বিপদ জ্ঞানে যথাসাধ্য উদ্ধারের চেষ্টা করিব। অপাবগ হইলে সকলে একত্রে রাজদ্বারে প্রার্থনা করিব।”

মুহূর্ত পরে বৈঠকের প্রায় বার আনা কণ্ঠ হইতে “হরীবোল” “হরীবোল” ধ্বনি উখিত হইয়া বায়ুবিমান এবং সামান্য আবরণ চন্দ্রাতাপ ভেদ করিয়া অনন্ত ক্ষেত্রে অনন্তনামের সহিত মিশাইয়া গেল। মিশাইতে মিশাইতে অবশিষ্ট কণ্ঠ হইতে “আল্লাহ আল্লাহ” রবে চারিদিক কাঁপাইয়া তুলিল। সে রবের প্রতিধ্বনি সহস্র চপলায় চালিত হইতে হইতে স্থিরবায়ু ভেদ করিয়া—ঈশ্বরের আসন স্থান “তাহ-তাস্ সারা” চিন্তার অগম্যস্থান পর্যন্ত প্রবেশ করিল। ঈশ্বরে সাক্ষি করিয়া, পবিত্র জিনিষ সম্মুখে রাখিয়া মনের বেগে অনেকেই স্পষ্ট করিয়া প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইল। সকলের মনেই নতুনভাব, এ যে কি ভাব তাহা সেই অনন্ত ভাবময়-ভূত-তাবন ভিন্ন মহাভাবুক ও ভবভাবনা সংযুক্ত সহস্র সহস্র মহান্বত্তবেরও বুঝিবার সাধ্য হইল না। সকলে পরস্পর বৃকে বৃক মিশাইয়া আলিঙ্গন আরম্ভ করিল। সে পবিত্র ভাবময় আলিঙ্গন, ভাবের মনমত তুলি ধরিয়া যথা যথা আকিয়া দেখাইতে পশ্চিক অক্ষম। তবে সে সময়ের হাবভাবে যে ভাবটুকু সামান্যভাবে অল্পতর হইয়াছে, আকারে, ইঙ্গিতে, আভাষে, আলিঙ্গনের ভাবাভাবে বোঝা গেল যে সকলেই সকলকে কি যেন দিল। সকলেই যেন তাহা মনের আনন্দে গ্রহণ করিল। অথচ কাহারও কোন বিষয়ে অভাব হইল না। দাতা গ্রহীতায় সমান আনন্দ, সমান ভাব, সমান প্রণয়। প্রতিদানের যথার্থ প্রমাণই মন খুলিয়া হৃদয়ের সহিত আলিঙ্গন। বৃকে বৃক মিশাইয়া পরস্পরের মিলন। সে অপূর্ণ পবিত্র ভাব চন্দ্র-তপতলে কতক্ষণ বিরাজ করিয়া সূর্য্যতাপে তাপিত, দগ্ধিভূত হৃদয় শীতল কবিতে চন্দ্রাতপ বাহিরে নানা দিকে ছড়াইয়া পড়িল। এদিকে সা গোলাম ধীর এবং গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন যে, প্রতি গ্রামেই এই বৈঠকের একটি শাখা বৈঠক হউক। শাখাবৈঠকে গ্রামের হিত-অহিত, ভাল-মন্দ বিষয় প্রতি সক্ষম্য আলোচিত হউক। কোন কথার মীমাংসা আবশ্যক হইলে সেই স্থানেই উপস্থিত বৈঠকে মীমাংসা হউক। এক বৈঠকে না মিটে পরদিন বৈঠকে আবার সে বিষয়ে আলোচনা হউক। তাহাতেও যদি মীমাংসা না হয়, সন্দেহ থাকে, আমাদের সাপ্তাহিক বৈঠকের সময় গ্রামে গ্রামে বৈঠকের প্রধানের মধ্যে যিনি আসিয়া যোগ দেবেন, শাখা বৈঠকে মীমাংসা না হওয়া প্রস্তাব সদরবৈঠকে তিনিই মীমাংসার জন্ত প্রস্তাব করিবেন। সকলের বিবেচনায় যাহা সাব্যস্ত হয় তাহাই বলবত থাকিবে।

কেনার টাকা কম নাই। দশ বৎসর প্রজার সহিত লাড়িলেও সে কিছু

পক্ষ হইবে না। টাকার অভাবে বিবাহে জ্ঞপ্ত হইবে না। নৌলের কারবার সহজে ছাড়িয়া দিবে না। আমাদের দশজনের ক্রান্ত—সে দশজনও লক্ষ জায়গায়। সময় অসময় টাকার দরকার হইবে। উপস্থিত সময়ে দশজনকে এক করিয়া টাকা সংগ্রহ করিতে করিতে তদ্রূপ বিলম্বহেতু কাঙ্ক্ষিত বহু বিষয় যে না হইতে পাবে এমন কথা নহে। টাকার অনাটনে ভাল কার্য না হয়, তাহাও নহে। বাঘের সঙ্গে ছাগলের বিবাদ। নানা প্রকার বলের আবশ্যক। রক্ষা পাওয়াই কঠিন! তাহাতে টাকা অভাবে মার্য গুলে বড়ই বিষম কথা। তাহাতেই আমি বলি—গ্রামে গ্রামে যে শাখাবৈঠক হইবে, সেই বৈঠকের প্রতি টাকা সংগ্রহ করার ভাব দেওয়া আবশ্যক। সপ্তাহ অন্তে তহবিলের অর্দ্ধেক পরিমাণ টাকা সদরবৈঠকের তহবিলে দাখিল করিতে হইবে। ণানায়, মহকুমায়, জিলায় আমাদের পক্ষের ভাল লোক, বিশেষ জিলায়, মহকুমায় বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান উকিল-মোক্তার রাখিতে হইবে। কেনী সহজে কখনই ছাড়িবে না। নানা প্রকার মিথ্যা প্রবঞ্চনা, জাল জালিয়াত মকদ্দমা সাজাইয়া আমাদের কাটকে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিবে। ভাল লোক না রাখিলে, ভাল বুদ্ধি, ভাল পবামর্শ, ভাল উপদেশ না পাইলে রক্ষা পাওয়া ভার হইবে।

আপন আপন গ্রামে আপন আপন বাড়ি, আপন আপন পরিবার রক্ষা করিতে সর্বদা সকলে প্রস্তুত থাকিবে। কোন সময়, কোন পথে, কোন স্রযোগে কেনী কাহার কপালে কি ঘটায়, তাহা কে বলিতে পারে?

আমাদের দেশের লোক যাহারা কেনীর পক্ষে থাকিবে, কেনীর সাহায্য করিবে, তাহাদিগকে আমাদের দলভুক্ত করিতে অল্পনয়-বিনয় যাহাতে হয় তাহা করিতে হইবে।

গ্রামে গ্রামে শাখাবৈঠকের অধীন এক একটি ডঙ্কা থাকিবে। সকলের মত হইলে ভিন্ন গ্রামের লোক ডাকিতে হইলে ডঙ্কাধ্বনি করিতে হইবে। যিনি যে অবস্থায় থাকিবেন, তাহাকে সেই অবস্থায় ডঙ্কাধ্বনি-দ্বানে উপস্থিত হইতে হইবে।

যে উপায়ে হউক, শত্রুকে জয় করাই আমার মত। যাহাতে শত্রুর ক্ষতি হয় সে পথ অগ্রে অন্বেষণ করাই আমার ইচ্ছা। তাহাতেই বলিতেছি, কেনীর নিজ আবাদে কি প্রকার আবাদে যে গ্রামে বহু নীল আছে, তাহা অমূল্য

কাটিয়া পদ্মা, গৌরী, কালীগঙ্গা এই তিন নদীর জলে ভাসাইয়া দেওয়া যাউক । আমরাই বুনিয়াছি, আমরাই কাটিব, আমরাই জলে ভাসাইব । এতদিন আমরা চক্ষের জলে ভাসিয়াছি । কেনীর চক্ষের জল পড়িবে কি না জানি না । পাকা-নীল জলে ভাসাইয়া অতি অল্প সময়ের জন্য আমরা গাত্রের জ্বালাটুকু একটু ঠাণ্ডা করি ।

প্রায় দশহাজার মুখে উচ্চারিত হইল, “ভাল কথা বেশ বলিয়াছেন, গায়েব জ্বালা একটু ঠাণ্ডা করি ।

প্রজাগণ তখনি উঠিল । ছাতি, লাঠি, গামছা লইয়া একে বলিতে দশজনে খাড়া হইল । দলে দলে সভাস্থল হইতে বাহির হইতে লাগিল—সভা ভঙ্গ হইল ।

সপ্তত্রিংশ তরঙ্গ

বিপরীত যুদ্ধ

মরণকালে বিপরীত যুদ্ধ । কেনীর স্তব্ধত্ব অবসান হইতে আর বেশী বিলম্ব নাই । তাব সৌভাগ্য-শশীল চতুর্দশীৰ ভোগ উত্তীর্ণ হইয়া প্রতিপদে, ক্লম্পক্ষেব প্রতিপদের ভোগ উপস্থিত হইয়াছে । বিপরীত বুদ্ধিতে বিপরীত বুদ্ধিয়া মহা-বিপদে পড়িবার উপক্রম হইয়াছে । সায়ংকাল । কৃষ্টিব সম্মুখস্থ কালীগঙ্গা তীব্রত ফুলবাগান মধ্যে কেনী, গঙ্গা সম্মুখে করিয়া চেগারে বসিয়াছেন । হরনাথ, শঙ্কু এবং অল্প অল্প প্রধান আমলা, নীলকুটির প্রধান প্রধান দেওয়ান, প্রধান প্রধান আমীন, প্রধান প্রধান খালাসী, তাগাদগীব সকলেই উপস্থিত । এখন কি হইবে ? কি উপায়ে নীলকাষা চলিবে, কৃষ্টি চলিবে—কি শুধু জমিদারিই চলিবে, তাহারই মজ্জণ । পাবনাব ঘটনা, জোট তাহার পব সাঁওতার বৈঠক । সকল সময়েই তাঁহার সাবধান থাকিয়া সন্ধান লইয়াছেন । বিশেষ করিয়া বোধহয় কিছু বাড়া-ইয়াই মনিবসাহেবের নিকট দেশের অবস্থা, প্রজাব ভাব জানাইয়াছেন । পাবনা গমনে প্রজাদিগকে বাধা দিতে গিয়া যাহা ঘটয়াছিল, কার্য্যকারকগণ তাহার অনেক'ংশ গোপন করিলেও কেনীর কানে সম্পূর্ণ যাইতে বাকি ছিল না । গুপ্ত সন্ধানীরা সমুদায় কথা গোপনে কেনীর নিকট প্রকাশ করিয়া দিয়াছে ।

কেনী বলিতে লাগিলেন—প্রজা ইচ্ছা করিয়া নীল-বুনানি না করিলে জব-রানে বুনাইতে পারিবে না । এ কথায় আর নূতন কি আছে । কোন নীল-কর প্রজার দ্বারা নীল-বুনানি করে ! দাদন লইয়া চুক্তিপত্র দিয়া প্রজা নীল-বুনিতে

বাধ্য, নীলকরও আপন মাল বুঝিয়া লইতে বাধ্য। এই কথা লইয়া প্রথমতঃ কিছু গোলযোগ হইবে বুঝিতেছি। বিচার আদালতে যখন আমরা প্রজ্ঞাদত্ত-চুক্তিপত্র দাখিল করিব, তখন আর ওকথা থাকিবে না। তোমরা আগেই সাবধান হইবে। যখন সে চুক্তিপত্রের দরকার হয়, তাহা যেন পাওয়া যায়। তবে প্রজ্ঞারা যে জোট-বদ্ধ হইয়াছে। আমি বাঙ্গালাদেশে অনেক দিন কাটাইলাম, বাঙ্গালার খবর জানিতে আমার বাকি নাই। তোমাদের কথা, তোমাদের প্রতিজ্ঞা, তোমাদের দশ জনের এক হওয়া আমি সকলি জানি। আপন দেশের প্রতি তোমাদের যত মায়া, তাহাও আমার বিলক্ষণ জানা আছে। সকলে এক পরামর্শ, এক প্রাণ হইয়া কাণ্ডা করার ক্ষমতা তোমাদের যত আছে তাহা কেনীর জানিতে বাকি নাই। দিন দুই হৈ হৈ! তাহাব পর যে সেই। হয়ত দুহাত নীচেই নামিতে হইবে। ও সকল জোট ও সকল বৈঠক অনেক দেখিয়াছি—আমার কিছুই হইবে না। তাহাদের কিছু না হইলেও মাঝখানে কতকগুলি লোকের এই স্বযোগে বেশ দশ টাকা লাভ হইবে। তোমরা দেখ। ঐ সকল টাকাকড়ি লইয়াই উহাদের আপসে আপসে ঝগড়া, মারামারি নিশ্চয়ই হইবে। শেষ ফল আদালত পর্য্যন্ত গড়াইবে। গায়ে পড়িয়া এক দল আমার আশ্রয় লইবে। দাদনেব টাকা না লইয়া চুক্তিপত্র লিখিয়া দিবে।

আমি যথার্থ বলিতেছি, তোমরা নিজেরা নিজকে যতদিন বিশ্বাস না করিবে ততদিন তোমরা কিছুই কবিত্তে পারিবে না। তোমরা কার্যেব শেষ চিন্তা করিতে অবসর পাও না। পরিণাম ফলেব দিকে দৃষ্টি করিতে নিতান্তই নাবাঞ্ছ! সকল কাজেই ব্যস্ততা, হৃদয়েও বল বেশি নাই। নিজের ঘর সামাল না করিয়া পরের ঘরে আগুন দিতে খুব পটু। ধবিত্তে গেলে কোন শক্তিই তোমাদের নাই। কিন্তু লক্ষ্যেবক্ষ্যে খুব মজ্জবুত। আমি স্পষ্ট বলিতেছি, সকলে এক জোটবদ্ধ হইয়া নীল উঠাইয়া দেয়, আমার দুঃখ নাই। এদেশে ইংরেজদিগেরই যে নীলকুঠি আছে, দেশীয় লোকের নাই ইহাও নহে! আমার নীল যদি উঠিয়া যায় তাহা হইলে রতন-বাবুর কুঠিও মারা যাইবে। ঠাকুরবাবুর কুঠিই কি থাকিবে? মৌবমহাম্মদ আলীর কুঠিই কি চলিবে? এই প্রকার যত বাঙালী জমিদারের কুঠি, যেখানে যাহা আছে তাহাও থাকিবে না। আমার জমিদারি কেহ কাড়িয়া লইতে পারিবে না। ও সকল কথা কিছুই নহে। তোমরা সাবেক-বদন্তের কাণ্ডা চালাইতে থাক। এবারে

যে পরিমাণ নীলের এটিমিট পাইয়াছি তাহাতে গত সন অপেক্ষা তিনগুণ পরিমাণ বেশী নীল এই কুঠিতেই পাওয়া যাইবে। অল্প অল্প কুঠির খবর এ-পর্যন্ত পাই নাই। এবারে বেশী পরিমাণ জমিতে নীল-বুনানি করা আমার ইচ্ছা।

কোন আমলা কেনীর কথাই প্রতিবাদে কোন কথা কহিতে দাহঙ্গী হইল না।

হরনাথ মুহু মুহু স্বরে বলিতে লাগিল লুঙ্কর! প্রজায় যদি আমাদের নীল-জমি আবাদ না করে তাহা হইলে নিজ-আবাদে কুঠির নির্দিষ্ট জমি আবাদ কবাই কঠিন হইয়া উঠিবে।

কেনী রক্তাখি তিনবার হরনাথের দিকে ঘুবাইয়া বলিতে লাগিলেন—
কোন প্রজায় নীল বুনবে না? নীল না বুনিয়া আমার এলাকায় বাস করিবে?
একটু সামলাইয়া কেনী মনে মনে কি ভাবিয়া হঠাৎ রাগ—একটু সামলাইয়া বলিলেন—

“আজ্ঞা—প্রজারা আমার নীল বুনবে না, আমিও তাহাদের সাহায্য লইব না। অথচ নীলের আবাদ বেশী করিয়া কবিব। আমার দেশ, তোমাব মত নয়। এক প্রকার মূর্খের দেশ নয়। বিনা গরুতে আমাব দেশে জমি আবাদ হয়। তুমি দেখ আমি বিলাত হইতে কলের লাঙ্গল আনিয়া জমি আবাদ কবিব। আর কি চাও।”

হরনাথ মুহু মুহু হাসিয়া নতশিরে বলিলেন “তাহা হইলে আর আমাদের চিন্তা কি।”

কেনী চেয়ার হইতে উঠিয়া ধীবে ধীবে বলিতে লাগিলেন চিন্তার মধ্যে একটি কথাই বেশী চিন্তার—আমি দেখিতেছি সেইটিই শব্দ কথা—কুঠির নিকট মহকুমা হওয়া না হওয়ার পক্ষে যতদূর পারি চেষ্টা করিব। পারিব এমন ভরসা নাই। এই বলিয়া ক্রমে নদীতীরে যাইতে আরম্ভ করিলেন। আমলাগণও মনিবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মুহুমুদ গতিতে কালীগঙ্গায় দিকে চলিলেন। জলের দিকে দৃষ্টি পড়িলে সকলের চক্ষেই পড়িল যে বোঝা বোঝা নীল—গঙ্গাশ্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। কেনী স্থিরভাবে দণ্ডায়মান—নিরব! স্থির দৃষ্টিতে চক্ষু জলশ্রোতে—আমলাগণ মহাব্যস্ত। ব্যস্ততার সহিত কথা, কি সর্বনাশ! একি কাণ্ড! এত নীল কোথা হইতে ভাসিয়া আসিল? কে ডাঙ্গাইল? এক, দুই, তিন, চার, করিয়া গণনা করিয়া শেষে আর গণনায় ফুলাইল না। নদীর জল ঢাকিল খণ্ড খণ্ড নীলক্ষেত

সকল যেন জলে ভাসিয়া আসিতেছে। কে জানে কতক্ষণ হইতে ভাসিয়া যাইতেছে? কে জানে গৌরাঙ্গলে ভাসিতেছে কি না? পদ্মার খরতর শ্রোতে পদ্মার প্রশস্ত চরেব অপৰ্যাপ্ত নীল, পৰ্ব্বতাকারে ভাসিয়া যাইতেছে কি না তাহা কে জানে? কুঠিময় সোর পড়িয়া গেল যে, নীল ভাসিয়া যাইতেছে। কতলোক বড় বড় বাঁশ, বড় বড় লগি হাতে করিয়া বিনা উদ্দেশ্যে নদীর কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইল। বাঁশ ফেলিল, লাগ জলে ভাসাইল, ভাসমান নীল বোঝা আটকাইবার জ্ঞান নানা প্রকাব চেষ্টা করিল, একটিও আটকাইতে পারিল না। কেন আটকায়? দুই এক বোঝা আটকাইলে কি হইবে? আর সমুদায় আটকাইয়া কি বা হইবে? ইহাতে কোন রূপ সাব অংশ নাই, সমুদায় জলে ধুইয়া গিয়াছে। বিশেষ এত নীল একদিনে জ্ঞাতদিয়া মাল বাহিব করিবার সাধ্যও কাহার নাই। বোঝার সঙ্গে সঙ্গে দুই একখানি নোকা দেখা দিল। শ্রোতগতিতে নোকা ভাসিয়া আসিতেছে। ডিহিব আমীন, তাগাদগীর, সাহেবের চাকরগণ চিৎকার করিয়া বলিতেছে—তজুব। সর্কনাশ হইয়াছে। পদ্মা, গৌরী, কালীগঙ্গা এই তিননদী হইয়া এই প্রকাব নীল ভাসিয়া যাইতেছে। প্রজাগণ রাতারাতি নীল কাটিয়া ভাসাইয়া দিয়াছে। যাহা বাকি আছে, তাহাও আজ রাত্রে আর রাখিবে না আমাদেরগকে শাসাইয়া, ভয় দেখাইয়া বলিয়াছে যে, “কুঠিতে খবর দিতে যাইতেছ ফিরিয়া আসিয়া আর বাড়ি, ঘব, দোর, পরিবারের মুখ দেখিতে হইবে না। যাও জন্মের মত নীলের পাছে পাছে ভাসিয়া যাও।”

কেনী স্বচক্ষে নীলের এই দুরবস্থা দেখিয়া মনে মনে বড়ই দুঃখিত হইলেন। প্রকাশে বলিলেন, “কোন চিন্তা নাই। দশ বছর নীল না হইলে কি কেনী মারা যাইবে আর এই সকল নীল, যাহারা কাটিয়া গাঙ্গে ভাসাইয়াছে তাহারা কি অমনি বাঁচিয়া যাইবে? এখনই রওয়ানা হও। এক এক দলে পঞ্চাশ বাট জন লাঠিয়াল সর্দার লইয়া রওয়ানা হও। যে গ্রামে নীল আছে সে গ্রামের লোককে কিছু বলিও না। যে গ্রামে দেখিবে নীল নাই, সে গ্রাম আর রাখিবে না। বাড়ি, ঘরদোর, গাছপালা ভাঙ্গিয়া, কাটিয়া এই প্রকার জলে ভাসাইবে। আমি কাল এই সময় ঐ সকল প্রজার ভাড়াঘর, কাটাগাছ, গরুবাছুর, এই জলে ভাসিয়া যাইতে দেখিতে চাই। বত টাকা লাগে ব্যয় কর। লাঠিয়াল, সর্দার যে বত সংগ্রহ করিতে পার সংগ্রহ করিয়া আন। আর যাহারা এই সকল কাষের গোড়া—

তাহাদিগকে ধর, তাহাদিগের বাড়িঘর আগুনে পোড়াও। আর ছেলেমেয়ে-বুড়ো-বুড়ী থাকে পাও ধরিয়া আমার গারদে পোড। পাবনায় মোক্তার নিকট চিঠি লিখিয়া দেও যে, ডিহিরআমীন, তাগাদগীর বাহার দ্বারা স্ত্রিবিধা হয়, কৌজদারিতে নীলখনি বলিয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া দেয়। আসামী কবিত্তে কাহাকেও বাকি রাখিবে না। এদিকে তোমাদেব কার্য তোমরা কবিত্তে থাক। আব যত সত্তরে হয় নীলকাজ আরম্ভ করিয়া দেও। প্রতি কুটিতে ডবল—একডবল কুলি, চাকর রাখিয়া নীলকার্য আরম্ভ করিয়া দাও। খুব সাহসে, খুব বলবিক্রমে—নির্ভয়ে কার্য করিতে থাক। মীরসাহেবকে আনিবাব জন্ত এখনই লোক পাঠাও। চাবজন দেশওয়ালী যেন সঙ্গে যায়।”

কেনীব হুকুমে আমলাপণ মনে মনে বড়ই খুসী হইলেন। জুহুহাতে পাকা লুটিবেন, লাঠিয়াল সদ্দাবেব বেতনে, অচ্যপ্তকার খোসখুঁসি, নুসঘাসে থাং এক হাত মারিবেন, সকলের মনেই এই আশা। সকলেই মাথা নোয়াইয়া সেলাম বাজাইয়া বিদায় লইলেন। কেনী কিছুক্ষণ নদীতীরে ফিবিয়া ঘুরিয়া তাওয়া খাইয়া নানাক্রপ চিন্তা করিতে করিতে শগন গৃহে প্রবেশ করিলেন। সে পাত্রে নিদ্দাদেবী তাহাব প্রতি স্প্রসন্ন হইয়াছিলেন কি না,—তিনিই জানেন

অষ্টত্রিংশ তবঙ্গ

ঘরের কথা

মীরসাহেব পুনরায় সংসারী হইয়াছেন। বিবাহ করিয়াছেন। শস্ত্রবেব অতুল ঐশ্বর্যে মহাস্থখে কাল কাটাইতেছেন। ক্রমেই বয়স বেশী হইতেছে, পব-মায়ু ক্ষয় হইতেছে, দেহকান্তি, গঠন, শরীরেব অগস্তা দিন দিন পরিবর্তন হইতেছে। কিন্তু আমোদ-আহ্লাদ সর্বদা হাঁসিখুসী, বং তামাসা, গানবাজনা ইত্যাদি যেমন তেমনি রহিয়াছে। মনে কি আছে ঐশ্বর জানেন। প্রকাশ্য ভাব, মনের ভাব যেমন পূর্বে ছিল, হাবভাব বোধহয় যেন ঠিক সেইরূপই আছে, সাধারণ চক্ষে, দশ-বছর পূর্বেও যাহা, এখনও তাহা। পূর্বে স্ত্রী, পুত্র বিয়োগেব পবে যে ভাব, জামাই কর্তৃক পৈত্রিকসম্পত্তি, দালান, কোঠা, জমিদারি হইতে বঞ্চিত হইয়াও সেই ভাব, বর্তমান সুখসময়েও সেই একই ভাব। মীরসাহেবের মনেরভাব সুখেদুখে সকল সময়েই সমান। অতি দুঃখের সময় তাঁহার মুখে হাসিরআভা সর্বদা বিরাজ করিত। সাধারণলোক সেকথা লইয়াও কত সময় কত আন্দোলন করিয়াছে।

মীরসাহেব কি ধাতুর লোক সংজে কাহারও বুদ্ধিবাব সাধ্য ছিল না। কাণ্ডে ঋণে-
 দুঃখে সমান ভাব। অন্তবেব অন্তঃস্থানের ভাব অন্তঃসামী ভগবান ভিন্ন অগ্নের
 জ্ঞানিবার সাধ্য ছিল না। বসন্তদিন সান্ত্বনা ছাড়িয়া মীরসাহেবের শস্তব্যাড়ির
 অতি নিকটেই সর্পারবাবে বাস করিতেছেন। পূর্বমত মীরসাহেবের অন্তঃগ্রহ
 দৃষ্টিতেই চিবআমোদেব সহিত সংসাবযাত্রা নিশ্চিতভাবে নির্বাহ করিতেছেন।
 খানসামা বিনোদ বিদ্রোহীদলে দেই যে মিশিয়াছে, এখনও মিশিয়াই আছে।
 কিন্তু পূর্বমত আদব, ভালবাসা থাকে নাই। সা গোলাম এক্ষণ স্বয়ং মালিক।

মীরসাহেবও স্বয়ং মালিক। সূক্ষ্মা জিনাতুল্লাব মৃত্যুর পথ সমুদায় সম্পত্তি
 দৌলতনেনসা ও তাহার মালিক বন্ধিয়াছে বটে, কিন্তু মীরসাহেবই মালিক। মীর-
 সাহেবের হস্তেই সম্পত্তি। নামমাত্র তাহাদেব।

সা গোলাম এবং মীরসাহেব উভয়ে নিকটেই বাস করেন। সান্ত্বনা লাহি-
 নীপাড়া এপাড়া এপাড়া। কিন্তু পরস্পর দেখাশুনা হয় না। দৈবাকীর্ণ দেখা
 হইলেও কথাবার্তা হয় না। উভয়ে চাকর-চাকর, প্রজা-প্রজা, অল্পগত
 লোকজনের সহিত অল্পগত লোকের প্রায়ই বাগডা-বিবাদ, বচসা হইয়া থাকে।
 কখনও লঘু কখনও গুরুতর গোছেব হইয়া দাড়াই। আদালত পর্যন্ত যাব
 হয়। উভয়পক্ষের লোকের, ফরিমানা ফাটক হইতেছে, যাঁহিতেছে, মিটিতেছে,
 আবাব বাধিতেছে। কোন বিপদাপন্ন ব্যক্তি মীরসাহেবের আশ্রয় গ্রহণ করিলে,
 তাহার পরামর্শ মত চলিতে থাকিলে তছিববীত পক্ষ্য বাধা হইয়া সা গোলামের
 আশ্রয় লইতেছে। সা গোলামও যত্নপূর্বক গ্রহণ করিতেছেন। বলাবাহুল্য এখন
 মীরসাহেব কেনীষ পক্ষে। দেশের লোকের বিশেষ।

মনেব কথাব মধ্যে ঘরের কথা। প্রয়োজনীয় এবং আবশ্যকীয় একথা এতদিন
 চাপা ছিল। আবশ্যক না হইলে, ঘরের কথা পবেব কানে দেওয়ার ইচ্ছা পথিকের
 ছিল না। এখন বাধা হইয়া প্রকাশ করিতে হইল। ঘটনাস্রোতে বাধা দিতে
 কাহারও সাধ্য নাই। মানবীয় কার্যের আদিঅন্ত মধ্যে মাতৃষেরই প্রয়োজন!
 কিন্তু সূত্রপাত হইতে শেষ পর্যন্ত ঘটনার মূলীভূত কারণ কে? তাহা নির্ণয় করা
 কঠিন। সকলেই বুদ্ধিমান, সকলেই জ্ঞানবান। জ্ঞানবুদ্ধি পরাস্ত করিয়া ঘটনা
 স্রোতঃ অবলীলাক্রমে কত জীবন ডুবাইয়া কত জীবন ভাসাইয়া কোথা হইতে
 কোথায় লইয়া বাইতেছে। কোন বিবাদ সমুদ্রে ফেলিতেছে তাহা ভাবিতেও
 আশঙ্কা হয়।

মীরসাহেব জ্ঞানবান। পারিষদগণও অজ্ঞান নহেন। মাথার মজ্জা, শরীরের রক্ত, কাহারও তরল নহে। কেহই পাতলা লোক নহেন! নূতন সংসারী নহেন, নানা বিষয়ে পবিপক। সকল বিষয়েই পাকা। এত পাকাপাকির মধ্যে এমন একটি কাঁচা কাণ্ড হইতেছে যে, তাহার আভাষে ইন্ধিতে, আকারে প্রকারে প্রকাশ করা ভিন্ন বিস্তারিত প্রকাশ করিতে পশ্চিকেব সাহস হইতেছে না! সেই বামাকণ্ঠই ঘটনার মূল। সেই নূপুর-ধ্বনি সময়ে সময়ে যে দৌলতনেনসার কর্ণে প্রবেশ করিত, সেই ধ্বনিই ঘটনার মর্ম্মগত আন্তরিকভাব ও আভাষ। দৌলতনেনসা স্বামীসোহাগিনী। বিশেষ সম্ভানসম্পত্তি হইয়া সে সোহাগ আরও বুদ্ধি পাইয়াছে। বুদ্ধি হওয়ার কথা। স্ত্রীধনে ধনবান, স্ত্রী কল্যাণে অপবিমিত স্বথ ভোগ হইলে, সে স্ত্রীর আদর কোথায় না আছে? স্ত্রীর অকৃত্রিম ভালবাসা আছে বলিয়াই স্ত্রীধনে অধিকার। রূপসীর সহ হইল না। রূপসীর চেষ্টা স্বামীস্রীতে মনোমালিন্য ঘটাইয়া নিজে সুখী হয়। বহুদিন হইতে চেষ্টা কবিতাও কৃতকার্য হইতে পারিতেছে না। মীরসাহেব রূপসীকে ভালবাসেন, বড় কবেন, আদর করিয়া কাছে বসান, গান শুনেন। এ সকল কথা দৌলতনেনসার কানে তুলিয়া দিয়াও তাহার মন, স্বামীপদ হইতে টলাইতে পারিল না। তখন অস্ত্র চাল আরম্ভ করিল। অর্থ সহায়ে সাহায্যকারীরাও জুটিয়া গেল!

দৌলতনেনসা, রূপসীর কথা অনেকের মুখেই শুনিতেন। তাহার সেই পূর্বভাব, পূর্বকথা। রূপসীর মনে এই কথা যে, মীরসাহেব দৌলতনেনসার বেক্রপ অকৃত্রিম প্রণয়ভাব বর্তমান তাহা ভঙ্গ করা সাধ্য কি—রূপসীর সাধ্য কি—সে দাম্পত্য প্রণয়বন্ধন শিথিল করে। সে পবিত্র প্রণয়ভাবের পরমাণু পরিমাণ অংশ বিনষ্ট করাও রূপসীর সাধ্য নহে। তবে একমাত্র উপায় দৌলতনেনসাকে কোন কোণে জগৎসংসার হইতে সরাইতে পারিলে আশাবুদ্ধি ক্ষয় কলিবার কথঙ্কিত পরিমাণ আশা জন্মে। তাহা না পারিলে আর আশা নাই! এতদিন পরিশ্রম করিয়াও যখন কৃতকার্য হইতে পারে নাই। সে প্রণয়বন্ধন সমূলে বিচ্ছিন্ন করা দূরে থাকুক, সামান্যভাবে বিচ্ছিন্ন করিতেও সাধ্য হয় নাই, তখন ঐ লোজাপথই রূপসীর মনোরথ সিদ্ধির সহজ উপায়। এই সিদ্ধান্তই মনে মনে ঝাটিয়া আসরে নামিয়াছেন। সাহায্য জুটিয়াছে। অর্থের অসাধ্য কি আছে, অল্পগত এবং ভালবাসার লোকই যে গোপনে গোপনে এই সাংঘাতিক কার্যে প্রবৃত্ত

হইয়াছে, ইহা মীরসাহেব স্বপ্নেও কখন চিন্তা করেন নাই। কোনদিন কোন কার্যেও কথা ভাবিবারও কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই। দৌলতনেনেসারও জানিবার কোন কারণ ঘটে নাই। তিনি অকৃত্রিম ভক্তির সহিত স্বামীর পদসেবা করিয়া জীবন সার্থক মনে করিতেছেন। মীরসাহেব মনের সঙ্গে ভালবাসিয়া, মনে মনে মহাসৌভাগ্য জ্ঞান করিতেছেন।

মানুষের ভাল, মানুষের উন্নতি, মানুষের প্রেম, মানুষের চক্ষে দেখিতে পারে না। প্রণয়ভাব—বিশুদ্ধ প্রেমভাব, পবিত্র লক্ষণ প্রায় লোকেরই চক্ষুশূল। রূপসীরই যে, না হইবে আশ্রয় কি? তাহাতে রূপসী শিক্ষিতা নহে, ধর্মতাবে আত্মলা নহে। মহাপাপে ভীতা নহে—ইহকালই সাব। ইহকালই সকল। পরকাল পরের কথা। মবিলেই ফুরাইল। হিসাব-নিকাশের ধার কে ধারে। কেই বা অদেখা ঈশ্ববকে ভয় কবে। এই তো রূপসীর মত, ইহাতে আর আশা কি।

বসীরুদ্দিন সহচরী খুব অচ্যুত। চাকরের মধ্যেও দুই একটি সহচরীর আজ্ঞাবহ। অথচ তাহা বা দৌলতনেনেসাব বেতনভোগী, দৌলতনেনেসাব অল্পে প্রতিপালিত। বসীরুদ্দিনের অল্পের সংস্থানও দৌলতনেনেসাব অর্থে—তবে মীরসাহেবের হস্তে হইতেছে, এই মাত্র প্রভেদ। দৌলতনেনেসাব খাসদাসী, চারজন। তাহার একজনেব নাম দুর্গতী, দুর্গতীর মাতার নাম সবজা। দুর্গতী, ভরণ, হরণ, চম্পা, এই চারজন সর্বদা পবিত্র পরিচ্ছন্নভাবে তাহার সম্মুখে থাকিত! ফায়কর-মাস ইত্যাদি কাধ্য করিত। দৌলতনেনেসা ইহাদিগকে অল্প অল্প দাসী অপেক্ষা ভালবাসিতেন। বিশ্বাসও করিতেন। ইহা বা চারজন বাড়ীর বাহির হইত না। সবজা বৃদ্ধা, বাহিরে বাটির মধ্যে সকল সময় সর্বস্বতানে সমানভাবে যাওয়া আসা করিত। সবজার সহিত রূপসীর খুব আলাপ। রূপসীর সহিত সবজার অনেক সময় দেখা হয়, গোপনে গোপনে কথাবার্তাও হইয়া থাকে। এই সবজাই সহচরীর সাহায্যকারিণী! উপস্থিত এই কথা যে—

টি. আই. কেনী, হস্তী পাঠাইয়া মীরসাহেবকে কুঠিতে লইয়া গিয়াছেন। প্রজাগণ নীল কাটিয়া জলে ভাসাইয়াছে। নীল আর বুনিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। এই সকল উপস্থিত ঘটনার সুপরামর্শ জন্মই কেনী মীরসাহেবকে লইয়া গিয়াছেন। মীরসাহেব নীলকরের পক্ষ, সা গোলাম প্রজার পক্ষ।

মীরসাহেব শালঘর মধ্যর কুঠিতে গিয়াছেন। সন্ধ্যার পূর্বেই আসিবার

কথা। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল আসিলেন না। বৈঠকখানায় নিয়মিতরূপে আলো জ্বলিল। বিছানা, বালিশ পরিষ্কার হইল—প্রতিদিন যে যে নিয়মে বৈঠকখানার কার্য্য চাকর্য্য করে তাহা করিল। রূপসী ও বসীকুদ্দিন নিয়মিত চাকুরী বাজা-ইতে বৈঠকখানায় আসিয়া ভুটিল। মৌরশাহেব অবশ্যই আসিবেন। যতক্ষণ না আসেন, ততক্ষণ কি করা? পানবাজনা কবিতে সাহস হইল না। উত্তরে তাসখেলা কবিতে বসিলেন। খেলার মধ্যে পান, তামাক, হাসিতামাসা, খোসগল্প চলিতে লাগিল। খেলাটা হইতেছে—বঙ্গমার—দুই জনে খেলা—সেকালে দুইজনে তাসের ঐ খেলাই সৰ্ব্বত্র চলিত। নিনজন হলে ঐ খেলাই তিনহাতে—চারজন জুটিলে বিবিধবা বেশী সখ হইলে পাঁচইয়াবে গোলামচোর—কিন্তু বিবিধরাটাই সে সময জাঁকাল খেলা। রগডেবও বটে—তিনজনে অভাবপক্ষে দুইজনে বঙ্গমাব—বসীকুদ্দিন হবতনের ঢেকা ফেলিয়া বলিলেম—“তোমার চিন্তা কি?”

রূপসী অতি নম্রভাবে হবতনের দুবি ফেলিয়া একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া বলিলেন—“আমার চিন্তার কথা তুমি কি বুঝবে, দুবেলা পেটপূজাতো এখানেই হয়। আবশ্যক হইলেই কিছু পাও। কাপডচোপডের ভাবনাও বড় নাই! প্রায়ই ব্যারিংপোটে কাটিয়া যায়। হাত বুলাইয়া বাহা বাহির কর, ঘরেরগিন্নির জগা যা কেনবার দরকার হয় তাই কেন, আর চাই কি? তোমার মত স্থখী কে?”

বসীকুদ্দিন পাঁচ উঠাইয়া হবতনের সাহেব ফেলিয়াই বলিলেন—“আচ্ছা এল দেখি!”

রূপসীর হাতে হবতনের বিবি ব্যতীত আর হবতন ছিল না। বাধ্য হইয়া বিবিট ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—“দেখ দেখি ঘাড়টি ধরিয়া বিবিটি আদায় করিলে, হিসাব থাকিলে এই রূপই হয়। হিসাবমত যদি সাহেব গোথকরে ঝাঁড়ায়, তবে সাধ্য কি বিবি না পড়িয়া যায়। বেহিসাবী হইলেই বিবি অঙ্কের সহিত বাহির হইয়া যায়। তা গোলামেই কি, বদপাসের ছুরি তিরিই বা কি? সকল কাজেই হিসাব আছে—হিসাবের মার বড় শক্তমার”—

বসীকুদ্দিন তাড়াতাড়ি পাঁচ উঠাইয়া হবতনের গোলাম ফেলিয়া বলিলেন “এবার কি দেবে দেও দেখি।”

রূপসী গোলামপ্রতি নজর করিয়াই বলিলেন—

“এ গোলাম এখন সাহেবের বাবা—রঙেবন্ধিৎ—করি কি! আর দিবই বা

কি আছেই বা কি ? সকলি তোমাদিগকে দিয়াছি । কিন্তু আমিই কিছু পাই নাই ।”

“কি পাও মাই—সকলি তো পাইয়াছ আর চাই কি ?

আর চাই কি—“তোমার কি চক্ষু নাই ? আমার হাত একেবারে ঝাঙ্গি । হাতে কি কিছু আছে যাহা ছিল তাহাও গিয়াছে । এবারে পারিব না । কিরে বাঁটা থাক ।”

তাস রাখিয়া দিলেন, হাতের কাগজ পিঠের কাগজ একত্র করিয়া মিশাইয়া দিলেন । খেলাভঙ্গ হইল । অন্ত অন্ত কথা চলিল ।

মীরসাহেবের আঙ্গ এত বিলম্ব হইল কেন ?

বসীর্কাদিন বলিলেন—“সাহেবজ্বার ষা, বড়মানুষের চালচলন স্বতন্ত্র কথা । আমাদের মত উঠে বসেই কাঁধে-বোচকা তাতো নয় ? আবার আজকাল প্রজার যে ছোট, চাঁদিকে গোলযোগ । সেই সকল কথাতেই বিলম্ব হয়েছে । হয়ত নাও আসিতে পাবেন” ।

“না আসিতে পারেন, না আসিবেন, তাতে আর সন্দেহ নাই । শুধু বসে থাকো তো মহাদার ! তুমি একটি গান গাও আমি আন্তে আন্তে সঙ্গত করি ।”

“বাবা সে আমার দ্বারা এখন হবে না । মীরসাহেব না আসলে বৈঠক-খানায় গানবাজনা করে কার লাভ্য । এতেই সকলে চটা । বাড়িভিত্ত লোক আমাকে দেখতে পারে না, কেবল বিবিসাহেবের দলই রক্ষা । এমন মেয়ে হয় নাই । একালে কেউ এমন দেখে নাই । বাপরে বাপ ! তাবই সকল, তারই বাড়ী, তারই বৈঠকখানা, ভাব দেখি সে কেমন মেয়ে” ?

“ঠিক বলেছ ! এমন নিরাশী কখনও দেখি নাই । শুনিও নাই । আর স্বামীর প্রতি এত ভক্তি, এত ভালবাসা যে তা আর মুখে প্রকাশ করা যায় না । এমন-ভাবে কখনও দেখি নাই” ।

“সে কি আর বলতে ! আচ্ছা তুমি বস, আমি বাড়ি হতে একবার ঘুরে আসি—”

রূপসী আর বাধা দিলেন না । তাহার ইচ্ছা যেন তিনি একা একাই বৈঠক-খানায় থাকেন । বসীর্কাদিন চলিয়া গেলে, রূপসী তাসগুলি কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করিয়া গোছাইয়া রাখিলেন । পরিষ্কার বিছানা । সে সময় কেবলসিনতৈলেশ

ব্যবহার, ল্যাম্প ইত্যাদি বিলাতী আলোর চলন, বাজালীর ঘরে হয় নাই। সেজ্জ, মোমবাতি, বৈঠকী নারিকেলতৈলের বাতিই চলতি। তাহাই জ্বলিতেছে! বড় একটি বালিশ (গেদ্দা) ফরাসের উপর পড়িয়া আছে। রূপসী কতক্ষণ এদিকওদিক চাহিয়া বালিশে ঠেসদিয়া গম্ভীরভাবে বসিলেন। কিন্তু কোনপ্রকার শব্দ হইলেই সেইদিকে লক্ষ্য করবেন। কান পাতিয়া কি যেন শুনিতে থাকেন। ভাবে বোধ হইতেছে যেন কাহার প্রতীক্ষায় আছেন।

কথা মিথ্যা নহে—প্রতীক্ষায় আছেন। ঐ শুশুন মুখে কি বলিতেছেন। ক্ষণকাল গম্ভীর ভাব, মধ্যে মধ্যে চকিত ভাব, কাহারও আগমন প্রতীক্ষা ভাব। কি বলিতেছেন শুশুন।

কৈ এতকথা—এতকিবে—এত মাথাচোঁয়া, কৈ সকলি গিছে? এমন নির্জন, এমন স্তব্ধে সহজে পাওয়া যায় না। আর কি করিব। এমন স্তব্ধে সময়ও বধন আসিল না তখন আর কি করিব। সময়, স্তব্ধে, অবসর, স্থান এই চারটিই স্ত্রীলোকের সর্বনাশের মূল! রক্ষার মূল। এই কথা কহিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পা ছড়াইয়া বালিশে একটু বেশী পরিমাণে ঠেসদিয়া বৈঠক-খানাঘরের, পাশের একটি দ্বারে এক ধ্যান একমনে চাহিয়া রহিলেন। কতক্ষণ পরেই তাহার ভাববদল হইল। আন্তরিক চিন্তারভাবে মুখে যে মলিনতাটুকু দেখা দিয়াছিল, তাহা যেন হঠাৎ সরিয়া গেল। মন স্থায়ী না হইলে চক্ষু হাসিবে কেন? মুখে হাসিরআভা দেখা দিবে কেন? পাংশুবর্ণ মুখে, রক্তেরআভা খেলা করিবে কেন? অবশ্যই কারণ আছে। বোধ হয় আশাপূর্ণ। বাহার আসিবার কথা—বাহার জন্ম এতবাস্তব, এতচিন্তা, বোধহয় তাহারই আগমন? উঠিয়া বসিয়া হাত-তুলিয়া ইঙ্গিতে ডাকিতে লাগিলেন। সে যেন ঘরের মধ্যে আসিতেও নারাজ। তাহাতেই স্বর্ণরজতজড়িত দক্ষিণহস্ত উত্তোলন ও কব-সঞ্চালন—শেষে শয্যা-ত্যাগ। শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিতেই—উঠিলেন না।

বালিশ ছাড়িয়া একটু আগে সরিয়া বসিলেন। কারণ যে ঘবে আসিতে নারাজ ছিল, সে রাজি হইয়া আসিতেছে। পার্শ্বেরদ্বারে উপস্থিত। স্ত্রীমূর্তি দুই-একপায়ে ঘরে প্রবেশ করিল। রূপসী তাড়াতাড়ি বাইয়া দ্বার বন্ধ করিলেন! ফিরিয়া আসিতেই স্ত্রীমূর্তির অঞ্চল ধরিয়া ফরাসের নিকট টানিয়া আনিলেন। স্ত্রী-মূর্তিটি বাড়িরলোক, বয়সও বেশী—দৌলতনেনসার পরিচারিকা! দুর্গতীর মাতা,

নাম সবজা। মূল্যে জেনাতুল্লার খরিদ। সবজা যে সময় খরিদ হইয়াছিল, সে সময় উস্তুরঅঞ্চলে দাসী বিকিকিনিতে দোষ ছিল না। বাড়িরদাসী মাত্রেই ঐরূপ খরিদ। তাহাদের পেটে সন্তানসন্ততি হইয়াছে—সবজাব পেটের মেয়ে দুর্গতী। দৌলতনেনসার চাবিজন খাসপবিচারিকাব মধ্যে একজন দুর্গতী।

সবজার বড়ই চুরি করিয়া খাওয়ার অভ্যাস। টাকাপয়সায় তত লোভ নাই। যতলোভ ইলিশমাছে। বাড়ি হইতেও পায়, সময় সময় নিজেও কিনে। আবার মেয়েকে দৌলতনেনসার রান্নাবান্নজনও চুরি করিতে সময় সময় বলে! দুর্গতী কিছুতেই স্বীকার হয় নাই। সেজ্ঞা দুর্গতীর উপর ভারিচটা। সবজাব বয়সী আর চাব পাঁচ জন দাসী ঐ বাড়িতে আছে। তাহাদের পেটের কোনমেয়ে দৌলতনেনসার পবিচারিকাব মধ্যে নাই। সবজার কল্যা দুর্গতীই একজন খাস-বান্দী।—তাহাতে সবজার একটু আদবও আছে। মেয়েমহলে সকলে একটু ভয় করে।

ফবাসেব নিকট আনিয়াই রূপসীবলিলেন, ‘বস, এখানে বস’—

সবজা বলিল—না, না আমি এখানে বসিব না। আপনার পায়ে ধরি, আমি এখানে বসিব না।

“তাতে দোষ কি? আনি হো অব তোমার বিবিনয়” যে একবিছানায় বসিলে দোষ আছে। আমি জানি মাছুষ সকলেই সমান। সকলেই খোদাব তৈয়ারি।”

“তা হোক আপনি বসুন, আমি বসবো না। বেশীদেবীও করিতে পারিব না। সেদিন কিরেকরে মাথায় হাতদিয়ে বলে গিয়েছিলাম, তাহাতেই আসিয়াছি।”

“এসেছ ভালই করেছ। তোমার কথা তুমি বেখেছ, আমার কথাও আমি রাখি। অঞ্চল হইতে থলিয়া পাঁচটি টাকা আপ রূপার একছড়া গোট রূপসী সবজাব হাতে দিয়ে পুনবাণ বলিলেন—আমার কবার আমি পূর্ণ করিলাম, এখন তোমার ধর্ম, রাশা না বাশা তোমার ইচ্ছা।”

সবজার সঙ্গে আগেই গড়াপেটা পরামর্শ ছিল। সবজা টাকা পাঁচটা ও গলার জিজিরছড়া কাপড়ে বাঁধিয়া যাই বলিয়া বিদায় হইতেই, রূপসী সবজার হাত ধরিয়া বলিলেন—“তুমি বাহা বাহা চাহিয়াছিলে, আমি তাহা তাহা দিয়াছি! আরও বলি—বদি পার, যে কাজের জ্ঞান দেওয়া, তা বদি করে উঠতে পার, তবে এর উপরে বকশিশ বলে অবশ্যই আরও কিছু আছে। কি কৌশলে, কি উপায়ে খাওয়ারিতে হইবে তাহা তো মনে আছে?”

“তা বেশ মনে আছে। শিকড়িও একদিনে বেশ শুকাইয়া গিয়াছে। শুঁতো করতে আর বেশী মেহনত লাগবে না। দেখ ঐ শিকড়ের শুঁতো খাওয়ান ছাড়া আর কিছু পাববে না। আব যা দিযেছ—তা আমি কখনই খাওয়াতে পারবো না—আমার প্রাণ থাকতে পারবো না”।

“আচ্ছা, শিকড়টিতো শুঁতে কবে কোন খাণ্ডসামগ্রির মধ্যে মিশিবে খাওয়াতে পাববে?”

“ঐ—তা পাববো। —আব যা বলিলে তা কিন্তু দিবে।”

“কি বলিলাম?”

“ঐ যে, বলিলে আরও কিছু”—

“তোমাব মাথাং হাত দিগে বলিতেছি—যেদিন শুনিব, বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছে, পেট চলিয়াছে, সেইদিন তোমাকে মনের মত খুসি করবো। বকশিশ তো ধবা রইল।”

“সে তুমি যা দেও—আমি একখানা ভাল কাপড় চাই।”

“আচ্ছা—একখানি কেন, একজোড়া দিব।”

কথা হইতেছে, ইহাব মধ্যে বেহারাদিগের চললিবোল রূপসীর কাণে পড়িল। রূপসী তাতাতাড়ি উঠিয়া সবজাকে বলিল যে, “মীরসাহেব আসিতেছেন, তুমি যাও।”

সবজা উঠিতে পড়িতে সাতপাক খাইয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ঘরের বাহির হইল। রূপসী সবজার পিছনে পিছনে আসিয়া পাশের দ্বারবন্ধ করিয়া করিয়া দিলেন। এবং সম্মুখের একটি দ্বারে খাড়া হইয়া পালকি দেখিতে লাগিলেন।

বেহারার চলতিবোল বসীকদ্দিনের কাণেও গিয়াছিল। বৈঠকখানার সম্মুখেই পুষ্করিণী, পুষ্করিণীর দক্ষিণপারেই বসীকদ্দিনের খন্তরালয়। সেইখানেই অবস্থিতি! বসীকদ্দিন তাতাতাড়ি উঠিয়া আসিলেন।

মীরসাহেবের পালকি রাস্তা ছাড়িয়া প্রবেশ দ্বার হইয়া বৈঠকখানার আঙ্গিনায় আসিল। মীরসাহেব পালকি হইতে নামিয়া বেহারাদিগকে বলিলেন যে, “আবার কাল একপ্রহর পর বাইতে হইবে।”

এই কথা কয়েকটি কহিয়াই বাটির মধ্যে চলিয়া গেলেন। বসীকদ্দিন

আদার বাজাতিয়া সম্মুখে খাড়া হইয়াছিলেন, কিন্তু মীবসাহেবের সহিত একটি কথাও হইল না। বৈঠকখানার দ্বার অর্দ্ধোদঘাটন হইয়া আলোর সাহায্যে—বাহা দেখাইতেছিল। তাহা মীবসাহেবের নজরে না পড়িয়াছিল তাহা নহে : কিন্তু তিনি বাস্তির মধ্যেই চলিয়া গেলেন, কিনিয়াও নাকাইলেন না। ভাবে বোধ হইল খুব জরুরী কাজ। কাগজপত্রও কলকগুলি হাতে—

বসীকদ্দিন মাথাবদার খলিয়া পুনরায় জুড়াইতে জুড়াইতে বৈঠকখানাঘরে আসিয়া রূপসীকে বলিলেন—“এ মানে তো কিছু বুঝিতে পারেন না। কাহারও সহিত কোন কথাবাণী নাহি অন্যবে দাখিল”।

রূপসী বলিলেন—‘তাঁই তো—এব মানে কি?’

“বোধ হয় শবীর অস্ত্র, না হয় কুঠির সম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রয়োজন।”

“শবীর অস্ত্র! একথা হতে পাবে—কুঠি সম্বন্ধে বিশেষ প্রয়োজনে বাড়ির মধ্যে প্রয়োজন কি?”

“আছে—বিষগাধি-সংক্রান্ত-কথা হলেই বাড়ির মধ্যেই দরকার। টাকাকড়ি আবশ্যক হইলেই বাড়ির মধ্যে দরকার। তবে আজিকার মত বিদায় হই। কাল ভ্রমিতেই পাবিব। কতকগুলি কাগজ বখান হাতে দেখলেম, কোন লিখাপড়া করাব মতলব। হাঁ হাঁ মনে হয়েছে সাহেব কয়েকখানি গ্রাম ইজারা চাহিয়াছিল—কুঠির নিকটের গ্রাম—বোধ হয় তাহাই হইবে।—তাতেই কি হইবে।—প্রজার যে জোট—সাহেবকে আসিতেই দিবে না। বাক সে সকল কথা আমাব দরকার কি, চল্লম।”

উনত্রিংশ তরঙ্গ

গোলাঘোগ

কয়েকদিন পর্যন্ত কেনীর পাকানীল পদ্মা, পৌরী, কালীগঙ্গা শ্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। দিবাবাত্রি শ্রোতে ভাসিয়া বাইতেছে। এক শালঘর মধ্যাতেই যে নীলআবাহ, নীলেরকারবার তাহা নহে। যে কুঠির অধীন যত নীল ক্ষেত ছিল, সমুদায় জলে ভাসিয়া বাইতেছে। বাহারা প্রজা দমনে বাহির হইয়াছিলেন, তাহারা গ্রামের ত্রিসীমায় যাইতে সাহসী হইলেন না। বাহারা পাকানীল কাটিয়া জলে ভাসাইতেছে, তাহাদিগকে ধরিয়া কুঠিতে আনিবেন, সমুচিত শাস্তি দিবেন, মনিবের আদেশ মত কাষা করিবেন আশা করিয়াই সেলাম ঠুকিয়া দলবলসহকারে

বাহির হইয়াছিলেন, কিন্তু বড়ই গোলযোগ—কিছুই করিতে পারিলেন না। কুঠিতে যাইয়া সাহেবকে অবস্থা জানাইতেও সাহসী হইলেন না। কারণ কুঠির দেওয়ান, আমীন, খালাসী, সর্দার, লাঠিয়াল, সকল দেশেরলোক, বাড়ি, ঘর, জমি কারবার সকলি দেশে। আত্মাশ্রয়, কুটুম্ব, সকলি ঐ অঞ্চলে। পুত্র লাঠিয়ালের চাকর, পিতা প্রজাব পক্ষে; কনিষ্ঠ কেনী বৈতনভোগী, জ্যেষ্ঠ প্রজাব দলে। ইহার পর প্রজাব মৌখিক ঘোষণা—এই যে, “বে নীলকরের চাকুরী করিবে, যে ব্যক্তি নীলকরের সাহায্য করবে তাহাব ভালাই নাই।”

স্বার্থেব লোভে, অর্থলাভে যিনি প্রজাব বিপক্ষে হস্ত প্রসাবন করিলেন, দুই একপদ অগ্রসর হইতে না হইতে অগনি সোজা হইয়া প্রজাব দলে মিশিলেন। সাধা নাই যে নীলকবেব পক্ষ অবলম্বন করিয়া মানমর্যাদা বজায় রাখিয়া দেশে বাস করেন। যিনি কুঠি হইতে বাহির হইলেন, তাহাব আব প্রবেশেব সাধা থাকিল না। সপ্তাহ মধ্যে সর্দার, নেগাহবান, আমীন, খালাসী গোমস্তা, প্রভৃতি কুঠি পবিত্যাগ করিল। নীলকবেব সংশ্রব ত্যাগ করিল। দোবে, চোবে, সিং ব্যতীত বাঙ্গালী একটি প্রাণীও প্রকাশ্যভাবে নীলকবেব চাকুরী কবা দূরে থাকুক—সাধা হইয়া বিপক্ষে দাঁড়াইতে হইল। দেওয়ান, মুজ্জদি বড় বড় আমলা মহাশয়েবা কিছুদিন নিমকের সতরক্ষা কবিত্তে অনেক চেষ্টা কবিলেন, পারিলেন না। বাড়িব সংবাদ বড়ই শোচনীয়। দিনেদুপবে অত্যাচাব, লুটপাট, পবিত্রজনেব তর্দশাব একশেষ, কারসাধ্য নীলকবেব চাকুরী কবে? ক্রমে কুঠিতে লোকশূন্য হইয়া উঠিল। খানসামা বাবুচি পর্যন্ত কায্য ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কঠেব একশেষ। পক্ষকাল অতীত হইতে না হইতে কেনীৰ সমুদায় জমিদারিতে, অত্যাচাব কুঠিষালের জমিদারিতে প্রজাবিজোহের আগুন সতেজে জ্বলিয়া উঠিল। বড়ই গোলযোগ বাড়িল। কেনী তো ছাড়িবাব পাত্র নহেন—সহজে দরিবার লোক নহেন। তিনিও পুরাদমে বুদ্ধিবল, অর্থবল, প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। হিন্দুস্তানী চাকবেব সংখ্যা বিশগুণ বৃদ্ধি করিলেন। কলিকাতা হইতে খানসামা খিদমতগার, বাবুচি আনাইয়া নূতনভাবে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দোকানী, পসাবী একজোট, কুঠিরলোকেব নিকট কেহ কোন জিনিস বিক্রি করিবে না। হাটেঘাটে, বাজারে কুঠিরলোক পাইলে বিশ্বস্ত কবিয়া ছাড়িয়া দিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে অশান্তির বাতাস বহিয়া দেশে হলুতুল ব্যাপার পড়িয়া গেল। একট্রি মুরগীর জন্ত কেনী

লালাইত। খাণ্ডসামগ্রী জ্ঞাত কেনী লালাইত। খাণ্ডসামগ্রী জ্ঞাত বন্ধনশালা বন্ধ। টাকা থাকিলে কি হইবে? ক্রোডপতি হইলে কি হইবে? লোকের অভাব—খাণ্ড-সামগ্রীর অভাব অতদিকে প্রাণের আশঙ্কা। চারিদিকেই শঙ্কা, মুহূর্তে মুহূর্তে আতঙ্ক ও ভয়! মহাবিপদ! যে কুঠিতে দিবারাত্র লোকজনের গতিবিধি, কাজ-কর্মের গোলযোগে সর্বদা জলজার! সর্বদাই হৈ হৈ ব্যাপার, রৈ রৈ কাণ্ড, আজ সে কুঠিতে জনমানবশূন্য নিস্তরু! অলক্ষ্যে বাতাস বহিগা চারিদিকেই যেন হাহা-কার! আঙ্গিনা, রাস্তা ঘাট, ঘাসজঙ্গলে একাকার! কেনীর সংবাদ লইতে এক মৌরসাহেব ভিন্ন লোক নাই। কিন্তু মৌরসাহেবও সর্বদা শশঙ্কিত, সর্বদা ভীত। মা 'গোলাম স্ত্রীঃগ পাইয়' আপন অভিষ্ট নানাপ্রকারে সিদ্ধ কবিত্তে মনস্থ করিয়াও, কৃতকাৰ্য্য হইতে পারিতেছেন না। অনেকের অভিপ্রায় এই যে, মৌর-সাহেবকে কৌশলে আপন দলভুক্ত করা। একেবাবে নিমূলকরা কি কোন প্রকারে অত্যাচার করা, ইচ্ছা নহে। প্রকাশ্যভাবে কেনীর সহিত দেখাসাক্ষাত মৌরসাহেবের আর সম্ভাব্য নাই। প্রকাশ্য চিঠিপত্র চালাইতেও আর ক্ষমতা নাই। বিশেষ বিশ্বাসী দুই একটি লোককে ককির সাজাইয়া ঝোলার মধ্যে চিঠি দিয়া নিশীথ সময়ে অতি সাবধানে খবর আনা-নেওয়া করেন। নিজের লোকজন দ্বারা খাণ্ড-সামগ্রী ক্রয় করিয়া, অতি গোপনে শালঘর মধ্যায় অপথে পাঠাইয়া দেন। কেনীর খাণ্ডসামগ্রী সমুদায় কলিকাতা হইতে বিশেষ সাবধানে দোবে—চোবেদিগের সাহায্যে আসিতে আরম্ভ হইল। টাকার অসাধ্য কি আছে? অনেক তিন্নদেশীয় লোক ক্রমে কুঠিতে আমদানী হইতে লাগিল। আত্মরক্ষা ভিন্ন অত্ৰ কোন কাৰ্য্যেই কেনী অগ্রসর হইতে পারিলেন না। আপাততঃ আত্মরক্ষাই একমাত্র কাৰ্য্য মনে করিয়া তাহারই উপায় করিতে লাগিলেন।

মৌরসাহেব যে কষ্টে না পড়িয়াছেন, তাহা নহে। তাঁহার প্রতি তাঁহার পরিবারপরিজন প্রতিবিদ্রোহীদল কোনরূপ অত্যাচার করিবে না, এ কথা প্রধান-বৈঠকে সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে। তবে কৌশলে তাঁহাকে কষ্টে ফেলিয়া আপন দলে আনিবে, ইহার চেষ্টা বিশেষ রূপে হইয়াছে এবং হইতেছে। মৌরসাহেবের ধোপা, নাপিত, বেহারী সমুদায় বন্ধ হইয়াছে, চলাচল প্রতিবন্ধক হেতু নৌকাবন্ধ হইয়াছে। অনেক চাকর, চাকুরী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। এই কঠিন সময়ে দৌলতননেশা হঠাৎ পীড়িতা হইয়াছেন, কোন কথা নাই, বার্তা নাই, অনিয়ম নাই, হঠাৎ একদিন তাহার মুখে দুগ্ধবিস্ফাট বোধ হইয়াছিল, তাহার পরদ্বিষ হইতেই পেটেরপীড়া।

এদিকে কেনী অর্ধ বলে, ভিন্ন ভিন্ন দেশীয়লোকের সাহায্যে আত্মরক্ষায় কৃতকাৰ্য্য হইয়া প্রজাবিরোধী বিষয়ে ভারতবর্ষীয় পর্য্যন্ত বোধহয় প্রকাশ করিয়াছেন। শাস্তি বক্ষার জন্য সৈন্যসামন্তসহ শাস্তিবক্ষক কমিশনারবাহাদুর, শালঘর, মধ্যায় কুঠিতে আসিয়া হাউনি করিয়াছেন। বাজ্র বন্ধ! প্রহার নীল তো বুনিবেই না। খাজনা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়াছে। কথাই আছে যে—“যদি পাগ মংল, তো বায় রাজমংল।” নীলও বুনিবে না—খাজনাও দিবে না। অথচ নীলকরে আক্রমণ, নীলকরপক্ষীয় লোকেব প্রতি অত্যাচার! ক্রমেই অশান্তি, ক্রমেই বিরোধ-হিতাব বৃদ্ধি! স্বতবাং বাজ্র শাস্তিব আবশ্যক!

কমিশনারবাহাদুর খাজনা আদায় করিবেন। শাস্তিবক্ষা করিবেন, এই কথাই রটিয়া গেল। দেশেও শাস্তি স্বাভাবিক বহিতে আবশ্য হইল। অত্যাচার-অত্যাচার কমিতে লাগিল। কিন্তু প্রজাবিরোধী যেমন তেমনি রহিয়া গেল। কুঠিরনামে আগুন, নীলের নামে মহাআগুন।

কেনীও মাথায় শক্তি ও কর্ম নাই, অদৃশ্য বলও বাঙ্গালীর সমান নহে। সমুদায় এলাকার প্রজা একত্রিত। নীলের নাম ত্রো স্তনিতেই পাবে না। নেহ খাজনা দিতে সম্পূর্ণরূপে বাধ্য; তাহাও দেয় না। বলপ্রয়োগে খাজনা আদায়, প্রজা বশ করার ক্ষমতা একেবারেই বহিত। বাধ্য হইয়া মজুদঅর্থে হাত পাড়িয়াছে। নূতন নূতন লোক বাধিতে হইয়াছে। পুৰাতন চাকর ক্রমেই দিনেব মধ্যে দুই-একটি করিয়া দেখা দিতেছে। তাহাদের পূর্বভয় অনেক পবিমাণ কমিয়া গিয়াছে। একগ্রামে ডাক্তারনৌ হইলে শতশত গ্রামের লোক যে যে অবস্থায় থাকিবে সেই অবস্থায় একত্র চক্ষু কুঠির পক্ষীয় লোক, যাহারা কথায় বাধ্য না হইত, জোর জবাবের বাধ্য করিয়া চাকরী ছাড়িত, স্ত্রীতে যাওয়াখাসা বন্ধ করিত। এখন আর তাহা নাই। এখন সমুদায় আপন ইচ্ছার উপর নির্ভর। বাজ্রশক্তিতে অত্যাচার অত্যাচারে বাধ্য। ইচ্ছা অত্যাচারী অর্পালভী দুই একজন ক্রমে পুনরায় কুঠিতে জুটিতে লাগিল। কিন্তু সেদিন নাই, সে আমল নাই। এখন নিরীহ ভদ্রলোকের প্রতি অত্যাচার, জবাবান করার পক্ষেই আর ক্ষমতা নাই।

কেনী প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, বাঙ্গালীর সাহায্য লইবেন না। বাঙ্গালীর দ্বারা কোন কার্য্য করাইবেন না। খাজনা আদায় ও নীলকার্য্যও ক্ষান্ত দিবেন না। বিলাত হইতে কলের লাঙ্গল আনিবার জন্য চেষ্টা আছেন। নীলহউজে নীল-

মাড়াই করার জ্ঞান কলেব জোগাড় কবিত্তে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। প্রজাকে ডাকিবেন না, প্রজাব নাম শুনিতে আব ইচ্ছা কবেন না। বাজশক্তি দ্বারা খাজনা আদায় কবিয়া লইবেন, ইহাই তাঁহাব স্থির সংকল্প।

শবাসন হইতে শব ভূটিয়া গেলে তাহা নিবারণ করা মাছুষেব দুঃসাধ্য ! ঘটনাস্রোত : একবার দিবা গেলে তাহা নিবারণ কবাও মানুষ্যেব অসাধ্য। এই সকল ঘটনার মধ্যে বাজাশি বাজশক্তিব বিস্তার কবিলেন। কুষ্টিয়ায় মহকুমা স্থাপিত হইল। কুষ্টিয়াব থানা গোবীন্দদাব উত্তরপাব পুরাতন কুষ্টিয়াতে ছিল, তাহা উষ্টিয়া মহকুমার নিকট আসিল। বেলগুসেব লাইন খলিবার বন্দোবস্ত হইল। কেন্দ্রের প্রজাব নিকট বাকি কব আদায় কবিত্তে তিনজন ডপুটিকালেক্টর নিযুক্ত হইয়া কুষ্টিয়ায় আসিলেন। নূতনভাবে নূতনপ্রকাবে নূতনকাণ্ডে যেন কুষ্টিয়া অহলে নূতনরূপেব সৃষ্টি হকল ! মহকুমা সৃষ্টিব পূর্বে নালখনি এবং সমুদ্র-পাব মোকদ্দমা দাবনাতে কেন্দ্রাব পক্ষ হইতে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে কতক-গুলি প্রজা কটকে আটক পড়িয়াছিল এবং সা গোলাম প্রভৃতি জোটেব প্রধান-গনেব ছয় ছয় মাসেব বিনাশ্রমে শাস্তি হইয়াছিল। কিন্তু খাপীলে টিকিল না। সকলেই বেকস্তব খালাস হইল।

চতুঃশ তবঙ্গ

হৃদয়ে আঘাত

দৌলতননেশা সেইথে পীড়িত ইহুয়া শযায় পড়িয়াছেন, আব আরোপ্য লাভ কবিত্তে পাবেন নাই। দিন দিন পীড়াব বৃদ্ধি। দিন দিন শবীব ক্ষিপ ও বলহীন হইয়া একেবাবে শযায় ধবা হইয়াছেন। নানাস্থান হইতে বৈগমভেব চিকিৎসক আসিয়া কত ঔষধ, কত প্রকরণ, কত কি কবিত্তেছেন কিছুতেই পীড়াব শাস্তি হইতেছে না। তাহাব মাতা অল্পজল পবিত্যাগ কবিয়া দিবাভাত্রি কণ্ঠাব শুশ্রূষায় মন দিয়াছেন। অবসবমন্ডে ঈশ্বরেব নিকট প্রার্থনা কবিত্তেছেন, কিছুতেই কিছু হইতেছে না। মুসলমানীধর্ম-মতে কত সিন্নি, কত খয়বাত, কত কোরবানী কবিত্তেছেন, মানত কবিত্তেছেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না। অনেকেই দৌলতননেশাব জীবনে নিরাশ হইয়াছেন। একঘরেব এক কণ্ঠা,—এক বংশের একটি মাত্র কণ্ঠা ! দৌলতননেশা অসময়ে জগৎ ছাড়িয়া, বৃদ্ধমাতার হৃদয়ে আঘাত করিয়া,—স্বামীর মনে ব্যথা দিয়া জনমের মতন চলিয়া বাইবেন, একথা

তাহার মনে একদিনেব জগে ও উঠে নাই। কিন্তু চক্ষের জলে সর্বদাই ভাসিতে-
ছেম। বাড়ির এমন একটি লোক নাই, পাড়ায় এমন একটি প্রাণী নাই, যে
দৌলতনেনেসাব এই হঠাৎ পীড়ায় দুঃখিত হয় নাই। সকলের মনেই এই
‘হেই কথ’ যে হায়! কি হইবে? একটি বংশ একেবারে লোপ হইল! মুন্সী জিন্না-
তুল্লাব ঐ এক কথা। ঐ এক কথাই মাতার সম্বল! হৃদয়েব সার, মহামূল্য বস্তু।
সে বস্তু হারাইলে কি আব ফাখেবাখাতুন জীবিত থাকিবে? মীরসাহেব পুরুষ,
কিছুদিন জীবিয়োগ দুঃখ মনে থাকিতে পারে? কিন্তু মুন্সীর বিবির আর কল্যাণ
নাই। ভালই নাই। এমন রোগ কেউ কখনও দেখে নাই। হায়! হায়!
ছোটটি ছেলেরই বা কি দশা হইবে। হাজার বিষয় থাক, টাকা থাক, কিন্তু
মায়ের সমান যত্ন, মায়ের সমান ভালবাসা কি আর হয়?

বাড়িব চাকর-চাকরাণী সকলেই দিবাবাতি প্রাণপণ করিয়া খাটিতেছে।
সকলেই দুঃখিত। সকলেব চক্ষে জল! সবজীব চক্ষুও জলশূন্য নহে। সামান্য
অর্থলোভে, সামান্য অলঙ্কার লোভে সে, যে কুসাজ করিয়াছে, দৌলতনেনেসাব
উপস্থিত অবস্থায় দেখিয়া তাহার অন্ততাপ হইয়াছে। মনে মনে মহাযন্ত্রনা ভোগ
করিতেছে। রূপসী তাহাকে লোক দ্বারা আরও কয়েকবার ডাকিয়া পাঠাইয়া-
ছিল। সে আর যায় নাই। রূপসীর সঙ্গে আর দেখা করে নাই। সকলের কান্না,
সকলের দুঃখ একপ্রকার, সবজার কান্না, সবজার দুঃখ অল্পপ্রকার! তাহার কর্তৃক
যে একটি সোনার প্রতিমা অসময়ে সংসারসাগরের তরঙ্গে ডুবিয়া বিসর্জন হইল
তাহা সে বেশ বুঝিয়াছে। সে বিধাতা ঐশ্বর্য দুখে মিশাইয়া না দিলে যে একরূপ
সাংঘাতিক পীড়ায় দৌলতনেনেসা আশঙ্কিত হইতেন না, তাহা সে বেশ বুঝিয়াছে।
এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া সে আব রূপসীর নিকট যায় নাই। ছয়মাস যায়,
পীড়ার বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস হইল না। আজ আরও বৃদ্ধি। কি ভয়ানক বিষয়!
উহ! বলিতে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে, অঙ্গ শিহরিয়া যায়, অন্তরের অন্তঃস্থানে পথান্ত
আঘাত লাগে! হায়রে হিংসা! হায়রে আশ্রয়। নর্তকীসহ একত্রে আশ্রয়!
আজ দৌলতনেনেসাব নাড়ি পচিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ পড়িতেছে। চিকিৎসকগণ
নিবাস হইয়া মলিনবদনে বাহিরে আসিলেন। মীরসাহেব কবিরাজদিগের হাব-
ভাব দেখিয়া অবস্থাবুঝিয়া শুনিয়া সজলনয়নে স্ত্রীর পীড়িত শয্যার এক পাশে গিয়া
বসিলেন। দেখিলেন সে জলন্ত জ্যোতিঃপূর্ণ অকোমল মুখমণ্ডলে পূর্বভাব পরিবর্তন

হইয়া, গতকল্য বাহা ছিল, তাহাও আজ নাই। সে বিফারিতলোচনে খরতর জ্যোতির অভাব যে পরিমাণ কাল দেখিয়াছিলেন, আজ তাহার কিছুই নাই। সরল নাসিকা বামে কিঞ্চিৎ হেলিয়াছে, চক্ষের জলে চিবুকঘষ ভাসিয়া বাইতেছে। জ্যেষ্ঠপুত্র মায়ের পদতলে মাথা রাখিয়া মায়ের পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া কান্দিতেছে। মধ্যম পুত্রের বয়স দশ এগার বৎসর, সেও যে কিছু না বুঝিতেছে তাহা নহে। মায়ের বক্ষে মাথা রাখিয়া সজল নয়নে মায়ের মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছে। আর দুটিপুত্র তাহারা অতি শিশু, তাহারা সেখানে নাই। স্থানান্তরে দাসী-দিগের তত্ত্বাবধানে বহিয়াছে। কিন্তু সময় সময় তাহাদের কান্নার রবও শুনা বাইতেছে।

মীরসাহেব! অনেকক্ষণ সহধর্মিণীর মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।
কেমন বোধ হয়?

দৌলতননেসা কোন উত্তর কবিলেন না। দক্ষিণহস্ত উঠাইয়া ঈশ্বর উদ্দেশ্যে মাত্র তর্জনী উত্তোলন করিয়া দেখাইলেন। কোন কথা স্বামীকে বলিলেন না। অধিকন্তু বস্ত্র দ্বারা আপন মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন। স্বামীর পদ দুখানি দুইহাতে ধরিয়া অশ্রুটস্বরে কি বলিলেন, তাহা অপর কেহই বুঝিতে পারিল না। মীরসাহেব কিছুতেই তিষ্ঠিতে পারিলেন না। নীরবে ক্রন্দন করিতে করিতে ঘরেব বাহির হইলেন। কোনদিন কোনলোকে যে চক্ষে কখনই কোন কারণে জল দেখে নাই, তাহারা আজ মীরসাহেবের চক্ষে অবিশ্রান্ত জলধারা পতন দেখিল।

ফাখেরাখাতুন অল্প ঘরে মৃত্তিকা শয্যায় অজ্ঞান। কখন সচেতন, কখন দোড়িয়া কন্যার নিকটে আসিতেছেন। কখনও কন্যার পার্শ্বে কন্যাকে জড়াইয়া ধরিয়া অপরকে বলিতেছেন—হায়! তোমরা এঘর হইতে চলিয়া যাও। আমি মাকে ক্রোড়ে করিয়া থাকিব। দেখিব কে আমার মাকে কোথায় লইয়া যায়? আবার কোল ছাড়িয়া উঠিতেছেন। দৌহিত্রদ্বয়ের মুখপানে চাহিয়া হু হু শব্দে ক্রন্দন করিতে করিতে অট্টহাস্য হইতেছেন।

দৌলতননেসা মুখের বস্ত্র সরাইয়া ইঙ্গিতে জ্যেষ্ঠপুত্রকে ডাকিলেন। দুই-হস্তে দুইপুত্রের মুখে, মাথায় হস্তদিয়া অশ্রুটস্বরে কয়েকটি কথা কহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র মায়ের মুখে চামুচে করিয়া সরবত দিতে লাগিলেন। দুই-একটোক গিলিয়া আর গলাধ হইল না! গুণ বাহিয়া সরবত পড়িতে

লাগিল। খাসবুদ্ধি হইল, চক্ষু বিবর্ণ হইল, তারার কালীমাবেথা ক্ষেথিতে দেখিতে সরিয়া গেল।

ঈশ্বরের নাম কবিত্তে লাগিলেন। দৌলতনেনেসা মৃত্যুরে ঈশ্বরের নাম কবিত্তে কবিত্তে পুত্রহুয়েব মস্তক বক্ষে ধারণ করিয়া, জীবনের শেষ ভালবাসিয়া জগৎ হইতে চলিয়া গেলেন। প্রাণবায়ু কোন পথে কোথায় চলিয়া গেল কেহই কিছু জানিতে পারিল না। সকলেই দেখিল চক্ষেবপাতা বন্ধ হইয়াছে! শ্বাস-প্রশ্বাস আর নাই। ঠোঁট দুইখানি যে নড়িতেছিল, তাহাও আব নাই। দৌলতনেনেসা নাই—স্পন্দহীনদেহ শয্যায় পড়িয়া আছে। ঘবেবলোক মাথা ভাঙ্গিয়া কান্দিতে কান্দিতে ঘবেব বাহির হইলেন। বাড়িময় ক্রন্দনেব-রোল উঠিয়া গেল। যে যেখানে ছিল সেখানেই গড়াগড়ি পাড়িয়া মাথায় শত কবাঘাত করিয়া কান্দিতে লাগিল।

পুরজনেরা তখনি সংকারের ব্যবস্থা করিলেন। মীরসাহেবেব অভিমতে তাঁহাব পিতার সমাধিস্থানের নিকট দৌলতনেনেসার সমাধিস্থান নির্ণয় হইল। তাহাতে সা গোলাম কোন আপত্তি করিলেন না। সাঁওতাব বাড়িঘর, জমিদারি, সে সময় সকলি সা গোলামের। মীরসাহেবেব কোন স্বত্ব নাই। কিন্তু দৌলতনেনেসার সমাধি সাঁওতায় হইতে সা গোলাম কোন আপত্তি কবিলেন না।

এতদিনেব পর রূপসীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। রূপসীর প্রসঙ্গ পথিক এ কলমে আর আনিবেন না—এইখানেই ইতি কবিল। তবে তাহার পবিণামফল, পরিণামফলের সহিত জগৎকে দেখাইতে ইচ্ছা বহিল।

এক চতুঃশ তরঙ্গ

রূপান্তর

এই পরিশূন্য ঘূর্ণায়মান জগতে রূপান্তর আশ্চর্য্য নহে। যে কাঞ্চনশৃঙ্গ নীলাকাশ ভেদ করিয়া উপ্লে' উঠিয়াছে, হয়ত কালের প্রবাহে চূর্ণবিচূর্ণ সমতল-ক্ষেত্রে পরিণত হইতে পারে। মহাসিন্ধুও কালচক্রে পরিশুদ্ধ হইয়া বালুকাময় মরুভূমি হইয়া মরীচিকারূপে পথিকের ভ্রম জন্মাইতে পারে। যে স্থানে অতলস্পর্শ বলিয়া প্রবাদ, হয়ত সেই স্থান হইতে ভূধরের অতি উচ্চশিখর দেখা দিয়া জলধির জলরাশি সরাইয়া স্থিয়মস্তক উন্নত করিতে পারে। মহানগরী কলিকাতাও কালের করালগ্রাসে পড়িয়া মহাশ্মদান ক্ষেত্ররূপে দেখা দিতে পারে। নিয়তির

অসাধ্য কিছুই নাই। পরিবর্তন, রূপান্তর, জগতে আশ্চর্য্য নহে। যে রাজ্যে কেনীর নামে দোহাই ফিরিয়াছে, বালকে মাঘেরকোড়ে আতঙ্কে কাঁপিয়াছে, মহা-শক্তিশালী লক্ষপতির হৃদয় কেনীর নামে দূর দূর করিয়া অস্তির হইয়াছে, শামচাঁদের নামে মাগুঘের হৃদপিণ্ড পর্য্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছে, আজ সেই কেনীব ভাব স্বতন্ত্র, সর্ব্বোতভাবে রূপান্তর।

বাজশক্তিতে দেশের শান্তিবায়ু বহিয়া প্রজা নীলকরকে রক্ষা করিয়াছে। স্বৈচ্ছাচার অত্যাচারের দায় হইতে সকলকেই উদ্ধার করিয়াছে। সকলেই এখন বিধি অধীন। বাজবিধি অন্তর্গত সীমাব অধীন। নিকটেই মহকুমা। শাসন, রক্ষণ, সমুদায় বাজহস্তে। প্রজাব পক্ষে থাকিলেও নীলকরের অত্যাচার নাই। নীলকরের পক্ষে গেলেও প্রজার অত্যাচার নাহ। যাহার যে পক্ষ অবলম্বন শ্রেয় বোধ হইতেছে, প্রয়োজন বোধ হইয়াছে, স্বসাব বোধ হইয়াছে, সে সেই পক্ষে যাইতেছে। মাঝে মাঝে পরিবর্তনও হইতেছে। প্রজায় নীল আর বুনিবে না, কেনীও নীলচাষ ছাঁড়িবে না। জমিদার—জমিব অভাব নাই। চাষকারকিঁদেব জগুই প্রজাব দরকার। বিলাত হইতে কলেবলাঙ্গল আনিবেন, ইনজিনে লাঙ্গল চলিবে। কলেই আবাদ, কলেই বুনানী, কলেই কর্তন। কলেই মাই, কলেই জাঁত; দেশীয়লোকের আর সাহায্য লইবেন না। দেশীয়লোককে আর ডাকিবেন না। খাজনার জগু তাগাদা করিবেন না। দশ আইন করিয়া রাজসহায়ে খাজনা আদায় করিবেন, ইহাই সংকল্প। এই যুক্তি স্থির করিয়া, আপন কর্তব্যকাধ্যে মন দিয়াছেন। কিন্তু মজুত তহবিলে হাত পড়িয়াছে। আয়ের অঙ্ক প্রায় শূন্য। মজুত তহবিল হইতে অকাতরে ব্যয় করিয়া উদ্দেশ্যসাধনে তৎপর হইয়াছেন। নায়েব, মুচ্ছিদি, দেওয়ান, সাহেবের পূর্ব আস্থাস অনেকেই আবার আসিয়া জুটিয়াছেন। কিন্তু সকলেই রূপান্তর। পূর্ব্বেভাব কাহারও নাই। এখন প্রজা-শাসন আইনের মারপেঁচে বড় বড় মাথাল মাথাল প্রজার নামে সত্যমিথ্যা অনেক নালিশ রুজু করিয়াছেন। উকিল-মোস্তার খুব জুটিয়াছে। কথায় কথায় নালিশ, কথায় কথায় আরজি দাখিল হইতেছে। থানায় এজাহার পড়িতেছে, মাজিস্ট্রেটে দরখাস্ত দাখিল হইতেছে। বলা বাহুল্য যে, প্রজাগণই আসামী। মন্দ নয় এ দৃশ্য—মন্দ নয়। পাঠক! মনের কথা যদি মনোযোগ করিয়া পাঠ করিয়া থাকেন, তবে এ দৃশ্যে চক্ষু শীতল না হউক আনন্দ জন্মিবে। কোথায় সর্দার লাঠিয়ালের

যমযাতনা, আর কোথায় সমন ওয়ারেন্টে তলবের তাড়না। কোথায় নিজেই হুঁশ-কর্তা—বিধাতা, রাঁখা, মারা আপনহাত, আর কোথায় করজোড়ে বিচারপ্রার্থী হইয়া, সেই অধীনস্থ প্রজার সহিত সমশ্রেণীভাবে বাঙ্গালী বিচারকের নিকট দণ্ডায়মান। কুঠির সীমায় পা রাখিতে যাহাদের প্রাণ কাঁপিয়াছে, এখন বাজ-বিচারগৃহে সেই শ্রামচাঁদ আঘাতি প্রজাগণ উচিত কথা কহিতে একটুকুও ক্রটি করিতেছে না। তিনি জমিদার, তিনি নীলকর, তিনি ইংরেজ, একথা বলিয়া একটুকুও খাতির করিতেছে না। বিশ্বাসের পাত্র সকলেই সমান। যে কথায় সামান্য কুলীমজুবকে রাজসমক্ষে শপথ করিতে হয়, মে: টি. আই. কেনীকেও তাহাই করিতে হয়। রাজদ্বাবে সকলেই সমান! আবার প্রজার ভাবটাও একবার ভাবিয়া দেখুন—দেখুন কি চমৎকাব দৃশ্য! কি চমৎকার পবিবর্তন!

বাকি খাজনার মোকদ্দমা বাতীত, প্রজা শাসন, প্রজা সোজাকবার বাবদে যে সকল মোকদ্দমা কেনীরপক্ষ হইতে উপস্থিত হইতে লাগিল, প্রায়ই ডিসমিস। বিচারভ্রমে, কি বিভ্রাট। যে যে মোকদ্দমায় প্রজাগণ শাস্তি পাইল, আপীল-আদালতে পবিপক্ষ বিচাবকের নিরপেক্ষ বিচারে নীলকরের চক্র ছাপা বহিল না। মোকদ্দমাও টিকিল না। আসামীগণ বেকসুর খালাস পাইতে লাগিল।

এদিকে কলের লাস্কল বিলাত হইতে আসিয়া পড়িল। নীলমাই জগু নীলহুঁজেও বিলাতী কলকৌশল বসান হইল। নীলজমি চাষ, নীলকর্তন, নীল-মাই ইত্যাদি সমুদায় কলের কৌশলে, ইনজিনের বলে সম্পন্ন হইবে, প্রজার সাহায্য কিছুতেই লওয়া হইবে না। ইহাই কেনীর আন্তরিক সঙ্কল্প। করিলেনও তাহাই। কিন্তু তাহাতে আরও বিপরীত ফল ফলিতে লাগিল। নীলবিদ্রোহীর প্রধান পাণ্ডা সা গোলাম। কলের লাস্কল প্রথম চালাইবার দিন কেনী সকলকে ডাকিয়া বলিলেন যে, তোমরা জান, আমি এই লাস্কলের নাম সা গোলাম রাখিলাম। গায়ের জ্বালায়, মনের ক্ষোভে, যাহাই বলুন, কিন্তু কলের লাস্কলে ভালরূপ চাষ হইল না। সে লাস্কলে দুই এক বিঘা জমি চাষ করা যায় না। এক স্থানে এক শত দুই শত বিঘা সমতল এবং সমশ্রেণীর জমি হইলে চাষ হয় বটে, কিন্তু দেশীয় লাস্কল অপেক্ষা অধিক পরিমাণে জমি কাটিয়া নীলবুনানির উপযুক্ত করিতে বড়ই নাজেহাল হইতে হইল। কলে ঢিল ভাঙ্গা হয় না, মই দেওয়া যায় না। মাত্র জমি কাটিয়া মাটি উল্টাইয়া দেয়। ঢিল ভাঙিতে, মাটিবুনানির উপযুক্ত করিতে

দেশীয় লাক্সলেব বিশেষ আবশ্যক হইল। তখন বাধ্য হইয়া গরু, মহিষ, ক্রয় করিলেন। লাক্সল, জোয়াল, বিদে, কাস্তে, কোদালী চাষকার্যের যাবতীয় সরঞ্জাম কেনীকে প্রস্তুত করিতে হইল। এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে বুন, বাগদী আনাইয়া মাসিক বেতন ধার্য্যে ঐ সকল কাৰ্য্য কবিত্তে লাগিলেন।

গুদাম ঘবে এখন আর কয়েদী থাকে না, আমলাগণের বাসা হইয়াছে। মাঝ-ধর, ধর-পাকড—এসকল নামও আর শুনা যায় না। যাহা কিছু সকলি আদালতে। প্রজাকর্তৃক অগ্ন্যস-অত্যাচারের বিচারসমুদায়ই রাজদ্বারে। কিস্তি কিস্তি প্রজাব নামে খাজনার নালিশ। একখানা, দুইখানা খাজনার দাবিতেও প্রজার নামে নালিশ হইয়াছে। অবশ্যই ডিক্রিও হইতেছে। কিন্তু খাজনা আদায়ের চেষ্টা হইতেছে না। কেনীর ইচ্ছা যে, কিস্তি কিস্তি নালিশ করিয়া খরচা ইত্যাদিতে প্রজাকে নাঞ্জেহাল করা। পবে একত্রে ডিক্রি-জারির টাকা আদায় করিতে বসিবে। প্রজা মোকদ্দমায় অথবা অর্থব্যয় করিয়া জেরবার হইবে। সেসময় আসল ডিক্রির টাকা দিতে অপাবগ হওয়াবই কথা। দায় ঠেকিয়া বিশেষ বাধ্য হইয়া তাহাব আশ্রয়তা স্বীকাব করিবে।

যেমন নূতন মহকুমার সৃষ্টি, তেমনি মোকদ্দমার সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি। মহকুমায়, জিলায় কেনীর মোকদ্দমার অন্ত নাই। খরচেরও অন্ত নাই। কিন্তু আয়ের অঙ্ক একেবারেই শূন্য। ইতিপূর্বে নৌন-বীজসহিত ছোলা-বুনানি হইত, ছোলা উঠিয়া যাইত নৌল বাড়িতে থাকিত। বৎসব সালের ঘোড়া, গরুর দানা সেই উপবিলাভেই চলিত, এফণ ঘোড়ার দানা, চাকরের মাহিয়ানা, মামলা-মোকদ্দমাব খরচ সমুদায় মজুদ তহবিল হইতে খরচ হইতে লাগিল। বিশেষ সত্য-মিথ্যা মোকদ্দমা সাজাইয়া উপস্থিত করিতে ত্রাস্য ব্যয়ে কখন পার পায় না। অনেক স্থানে অপব্যয়ে হস্ত প্রসারণ করিতে হয়। থানাদার, জমাদারকে বসে রাখিতে হইলেও ছালায় ছালায় টাকা ঢালিতে হয়। উপস্থিত পরিবর্তনে কেনীর অর্থের শ্রাদ্ধ হইতে লাগিল। কলকারখানায় জমিচাষ ইত্যাদি কাৰ্য্যেও অনেক অর্থ জলে পিয়াছে, লাক্সল, গরু, মহিষ করিতেও দশ বার হাজাব নামিয়াছে, কিন্তু অত গরুর আহাৰ কোথা হইতে জোগাইবেন। সহজ কথা নহে। ক্রমে অনাহারে অশক্ত গরুগুলি মারা পড়িতে আরম্ভ করিল। কেনীর বোক কিছুতেই পড়ে না। দশ গরু মারা পড়িল, বিশ গরু খরিদ হইয়া আসিল। দেশওয়ালী,

পাঁড়ে, দোবে অনেক বাথিতে হইয়াছে, আমলা, মোক্তার, উকীল, তদবিবকারক, মিথ্যা মাফ্য দিবার জ্ঞাত চাকর, নানা স্থানে রাখিতে হইয়াছে। ক্ষেণীব সংসারে পূৰ্বাপেক্ষা নিয়মিত ব্যয়বৃদ্ধি হইয়া দশ গুণেব উপর উঠিয়াছে। ইহার পর খাজানা-আদায় বন্ধ। নীলকাষো লাভ কিছুই নাই। বায়চতুগুণ; অধঃপতনের পূৰ্ব লক্ষণ।

দ্বাচতুঃশ তরঙ্গ

শেষ অঙ্ক

কাহাব কপালে কে থায়? ঈশ্বর ললাটফলকে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই সৰ্বতোভাবে ফলিয়া থাকে। বিশ্বাসীমাত্রেবই এই বিশ্বাস। কিন্তু এক দৌলতনেনেসাব অভাবে সে পুরী ক্রমে জনশূণ্য হইয়া উঠিল। দাসদাসীগণ কিছুদিন থাকিয়া, আপন আপন পথ দেখিতে লাগিল। খাওয়াপবাব কষ্ট না হইলেও নানা কারণে বাড়ি ছাড়িতে বাধ্য হইল। কারণ কৃ-কথা কয়দিন গোপন থাকে, কানাঘুসায় কথাটা একপ্রকার কাথেরাথাতুনেব কানে গিয়া পড়িল যে, এইসকল দাসীবাঁদীই কৌশল করিয়া কি ঐষধ খাওয়াইয়া দৌলতনেনেসাকে মারিয়া ফেলিয়াছে। কে সেই ঐষধ খাওয়াইয়াছে, কি স্বার্থে এমন নেমকহারামী করিয়াছে তাহাব কোন সন্ধান হইল না। কিন্তু কাথেরাথাতুনের অন্তর হইতে দাসদাসীগণ একেবারে সবিয়া গেল। মনিবেব আদর, যত্ন, ভালবাসা না পাঠিলে কয়দিন অধীনস্থ তাবেদাব টিকিতে পারে? তিনি কাহাকেও কিছু বলিলেন না, অথচ ক্রমে অনেকে যাইতে আরম্ভ করিল। সৰ্বপ্রথম সবজা তাহার কন্যা দুৰ্গতিকে লইয়া বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া গেল। দেখাদেখি পব পর অনেকেই যাইতে আরম্ভ করিল। তিনি কাহাকে যাইতে নিষেধ করিলেন না, বা বাথিতে যত্নও করিলেন না। যে চলিয়া গেল কোনদিন তাহার সন্ধানও লইলেন না। দৌলতনেনেসা চারটি পুত্র রাখিয়া ইহলোক পবিত্যাগ করিয়াছেন। মীরসাহেবও স্ত্রীশূণ্য ষষ্ঠ্যালয়ে সৰ্বদা বাস করিতে আব ইচ্ছা করিলেন না। তাঁহার পূৰ্বপুরুষের আদি-বসতিস্থান পদমদী গ্রামে বাসকবাই মনন করিলেন। পুত্রগণ মাতামহীর নিকটেই থাকিবে। মাঝে মাঝে এখানেও আসিবেন, সে বাড়িতেও থাকিবেন। সংসারে সুখ নাই—জীবন শেষ না হওয়া পর্যন্ত সাংসারিক কাৰ্য্যও ইতি নাই। প্রধান শত্রু সা গোলাম। অধিকন্তু নীলকর পক্ষে থাকায় দেশের লোকের চক্ষেও

একপ্রকার চক্ষুশূল। মনও ভাল নহে। সাংসারিক কার্যোও একপ্রকার উদাসীন।

আব কিছুই ভাল বোধ হয় না, জীবনের অবশিষ্টকাল নির্ঝিল্লি ঈশ্বরের নাম করিবেন স্থির করিয়াই এ স্থান পরিত্যাগ করিবেন মনে মনে স্থির করিয়াছেন। সেও পূর্বপুরুষের বাড়ী। যৎকিঞ্চিৎ বিষয় আছে। কোন গোলযোগেব মধ্যে না গিয়ে শুধু ঈশ্বরের নাম করিয়া জীবন কাটাতে আর কষ্ট পাইতে হইবে না। ঘব-সংসার এখন তাঁহাব কিছুই নাই বলিলেও হয়। কিন্তু লাহিনীপাড়ায় শশুবালায়ে থাকিলে সর্বদা শান্তুডাব ক্রন্দন শুনিয়া আবও মন চাঞ্চল্য হইবে, ঘব-সংসার নাই, অথচ কেনীব পক্ষ, প্রজাব বিপক্ষ থাকিয়া সংসারচক্রে ঘূর্ণিতে হইবে, এইসকল ভাবিয়া কিছুদিনেব জ্ঞান পরিত্যাগ কবাই মনে মনে স্থির করিলেন। পুত্রগণের জ্ঞানও কোন চিন্তা নাই, কাবণ কাথোবাখাতুন বাঁচিয়া থাকিতে তাহাদের কোন বিষয় তাঁহাকে ভাবিতে হইবে না। একখানি বস্ত্রের জ্ঞানও চিন্তা করিতে হইবে না, তাহা তাঁহাব মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এই সকল ভাবনা-চিন্তা-যাট গীবসাহেব শশুবালায় পরিত্যাগ করিলেন। চিবসঙ্গী বসৌকদ্দিন সঙ্গেই চলিল। আব যাটাব ইচ্ছা হইল, সেও গীবসাহেবের সঙ্গী হইল। মনের কথায় উদাসীন পথিক গীবসাহেবের জীবনের শেষ অঙ্গ এইখানেই তিতি করিল।

পাঠক! পথিকের মনের কথাব আদি আছে, ইতি নাই। স্তবে স্তবে বিচ্ছেদ আছে কিন্তু কথাব তিতি নাই। জীবন শেষ হইবে, জীবনলীলা সাক্ষ হইবে, কিন্তু কথা ফুরাইবে না। মনের কথা মনেই বহিয়া যাইবে। আক্ষেপ ভিন্ন এজীবনে আব আশা কি? জগতের কাণ্ডই এইপ্রকার। এক আসিতেছে আব যাটিতেছে। পথিকের কথায় কতজনের সংযোগ হইল, কতজনের সংশ্রব ঘটিল, ঘটনাক্রমে কতজনকে পরিত্যাগ করিতে হইল। স্তবের সীমা যতই নিকটবর্তী হইতেছে, ততই সংশ্রব, সংযোগ কমিয়া আসিতেছে।

মা গোলামের কার্যো বাধা দিতে এখন আব কেহই রহিল না। মা গোলাম মনে মনে আব একপ্রকার চালে চলিতে এখন মহাবাস্ত হইয়াছেন। চিরশত্রু দেশ-ছাড়া হইয়াছে। গীবসাহেবের জীবনের লীলাখেলা এদেশ হইতে একপ্রকার জীবনের মত উঠিয়া গিয়াছে। আর চিন্তাব কি? চারিদিকেই মঙ্গল! প্রজাব পক্ষে থাকিয়া আশাব অতিরিক্ত অর্থের মুখ দেখিতেছেন। দেশের লোকে

সা গোলামের প্রশংসা শতমুখে কবিতেছে। বুদ্ধিবৈবেচনায় ছশ বাহবা দিতেছে। কেনী আপন জেদ বজায় রাখিতে দিন দিন ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। যাহার ঘৃণাবোধ আছে, সে টাকার মায়া বোঝে না। যে রোগী, সেও টাকার মায়া করে না। যে লাজুক সেও টাকা রাখিতে জানে না। সংসারে যে সত্যবাদী এবং পর-ভুঃখে কাতর, তাহার হাতেও টাকা থাকিতে পারে না। কেনী সত্যবাদী না হউক, লাজুক না হউক, দয়াল না হউক, রাগ আছে, ঘৃণাও আছে। লজ্জা যে একেবারেই নাই তাহাও নহে। কাজেই মজুত টাকা ক্রমেই হাতছাড়া হইতে লাগিল। আবার বাতাস উট্টা করিয়া বহাইবেন, আবার প্রজাকে শাসনদণ্ডে পেষণ করিবেন, এই ছশ্চিন্তাতেই সর্বদা অর্থের আশ্রয় করিতেছেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না। দিন দিন ভাণ্ডার খালি হইতেছে। কিছুদিন পরেই কথা হুডাইয়া পড়িল যে, কেনী ঋণী। কলিকাতা কোম্পানীর হোসে অনেক টাকা ঋণী! প্রজার নামে খাজনার ডিক্রি হইয়াছে, আদায় নাই। নিজ আবাদে নীল-বুনানি হইতেছে, আয়ের নামও নাই, ব্যয়ের চতুর্থাংশের এতংশ ঘরে আসিতেছে না। মনিবের ঋণদায়ের কথা অধীন চাকরগণও জানিতে পাবিলেই স্বভাবত ভক্তির হ্রাস হয়, বিশ্বাসেও বাধা জন্মে। মুখে প্রকাশ না হউক মনে মনে নানারূপ সন্দেহের কারণ হইয়া উঠে। অধীন বেতনভোগী আমলা সামান্য চাকর পর্যন্ত আপন আপন পাওনা কড়ায়ক্রান্তিতে বুঝিয়া লইতে প্রস্তুত হয়। ঋণদায়, মহাদায়! যে সংসারে ঋণপাপ প্রবেশ করিয়াছে সে-সংসারের কল্যাণ আশা আর নাই। তবে পুণ্যের জোর বেশী থাকিলে পাপ কাটিয়া যাইয়া আবার ভাল সময়ের মুখ দেখা—সে সকলের ভাগ্য ঘটে না। ঘর-কন্না বিষয়-সম্পত্তির বিসর্জনেরই সুপ্রশস্ত পথ ঋণদায়। কেনীর ভাগ্য তাহাই ঘটিল। লাখে লাখে টাকা কোন পথে কোথায় উড়িয়া যাইতে লাগিল, কেহ চক্ষেও দেখিল না। আসিবার সময় অনেকেই দেখে, কিন্তু যাইবার সময়, কোন পথে সরিয়া যায়, বহু অশ্বেষণেও সে পথের সন্ধান হয় না। অর্থ-চিন্তার স্থায় মহাচিন্তা জগতে আর কিছুই নাই। অতিবিচক্ষণ পণ্ডিত সে চিন্তায় বিহ্বল —মহাজ্ঞানী হতজ্ঞান। মহাবলশালী মহাবীর ম্রিয়মাণ। বুদ্ধির বিপর্যয় দেখিলে, আত্মবিশ্বস্তির লক্ষণ বুঝিলে সর্বদা অন্তমনস্কের ভাব থাকিলে যাহা থাকিবার তাহাও থাকে না। কেহ রাখেও না। যে যে পথে সুবিধা পায় ছ'হাতে লুটিতে থাকে। দায়ীকের হঠাৎ অধঃপতনের অর্থই অর্থচিন্তা ও চিন্তিতা—

কেনী পীড়িত হইলেন। মলত্যাগদ্বারের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে, পুরুষ-শরীরের কিঞ্চিৎ নিম্নে অতিকোমল স্থানে বৃহৎ একটি স্ফোটক হইয়া তাহাকে ধরাশায়ী করিল। তিনি বাধ্য হইয়া চিকিৎসার্থে কলিকাতায় গমন করিলেন। মিসেস কেনী কুঠিতেই বহিলেন। স্বামীর দুর্বস্থা হইলে স্ত্রীর মনেও যে কিছু না হয় তাহা নহে। কেহ মনের কথা মনেই বাথে, কেহ উদ্ভাসীন পথিকের ত্রায় মনের কথা ব্যক্ত করিয়া ফেলে। 'হায় রে জগৎ'। যদিচ কেনী ঋণী, কিন্তু তাহার স্বাবর-অস্বাবর সম্পত্তি পূর্বেও যাহা ছিল, এখনও তাহাই আছে, নাই কেবল টাকা। সোনারূপাব অলঙ্কার তাহার আলমারীপোরা। পাঠক! ভুলিয়াছেন? না মনে আছে? ঐসকল অলঙ্কার কি কেনী নিজে প্রস্তুত কবাইয়াছিলেন? তাহা নহে—মনে হয় কি? ঐসকল সেই অলঙ্কার নিবীহ কৃষক-প্রজার পরিবারের ব্যবহাৰ্য্য অলঙ্কার—স্লুটের মাল। মিসেস কেনী অনেক সরাইলেন। আমলাগণও হক না হক খবচ লিখিয়া আপন আপন জমাখরচ দুরন্ত করিলেন। সে সকল খাজানার ডিক্রি প্রজার বিক্কে করিয়াছিলেন, প্রজার নিকট কিছু কিছু সেলামী লইয়া কতক চাপা দিলেন, কতক তামাদী কবিলেন, কতক বাড়ি চুরি, বাসা চুরিও ভান করিয়া, কেহ আচ্ছা একহাত মাঝিয়া আপন জিনিসপত্র সরাইয়া বাসায় আশ্রয় জালিয়া দিলেন। ছারপোকা-মশার বংশ একেবারে শেষ হইল। আর যাহা পুড়িবার পুড়িয়া ছাট হইয়া গেল। অর্দ্ধ-পোড়া কুড়ি পঁচিশ বস্তা বাকী খাজনার কয়লা সাধারণকে দেখাইয়া একবারেই শেষ করিয়া ফেলা হইল। কেনী পীড়িত, এখনও জীবিত। তাহাতেই এই দশা। আমলা, নেগাহবান, কার্যকারক, বিষয়সম্পত্তি, দালানকোঠা সকলি আছে। শবীরের অর্দ্ধাংশ যে স্ত্রী তিনিও বাঁচিয়া আছেন, তব্রাচ এই দশা। জগতের কাণ্ডই এইরূপ।

কেনী আরোগ্য হইলেন। ভালমতে আরোগ্য হইয়া কুঠিতে আসিলেন। আবার কাজকর্ম চলিতে লাগিল। কিন্তু ঋণের ভাগ ক্রমেই বেশী হইতে চলিল। নির্বাকোন্মুখ প্রদীপের ত্রায় শেষদীপ্তি দেখাইয়া চির নির্বাকোন্মুখ রূপ ধারণ করিল।

শ্রোতস্বতীর স্বরতর গতি আর ঘটনাস্রোতের অবিশ্রান্ত পতি বোধ করিতে কাহারই সাধ্য নাই। দৈবের নিয়োজিত কাণ্ডো বিপদ্য ঘটাইতেও কাহারও ক্ষমতা নাই। কেনী আবার পীড়িত হইলেন। জননেদ্রিয়ের নিম্নে বেষ্টানে

ফোটক হইয়াছিল, কলিকাতা হইতে ভালমত আবাম হইয়া আসিয়াছিলেন। হঠাৎ সেই স্থান হইতে রক্তপাত হইল। শেষে দেখা গেল যে, সংযোগস্থানের জোড়া খসিয়া গিয়াছে। যেস্থানে ঘা শুকাইয়া, জোড়া লাগিয়া উপরেব চামড়া পর্যন্ত হইয়াছিল, সেই স্থান ফাটিয়া গিয়াছে। বন্ধ পড়িতেছে। কেনী তখন কলিকাতা যাইতে প্রস্তুত হইলেন। যত শীঘ্র শীঘ্র পারিলেন কলিকাতা রওয়ানা হইলেন। কুষ্টিয়া মহকুমা স্থাপনের পর—বেলওয়ে লাইন খুলিয়াছে। কলিকাতা যাওয়া-আসা যতদূর সহজ হইতে থা হইয়াছে। কোনরূপ খেজালত নাই। কেনী বেলওয়েযোগে প্রভাত হইতে না হইতে কলিকাতা পৌঁছিলেন। সঙ্গে মিসেস কেনী আর সোনাউলা খানসামা।

কেনী গতবারে পাড়িত হইয়া দাতব্য চিকিৎসালয়ে ছিলেন, এবারেও কলিকাতাব সেই প্রধান দাতব্য চিকিৎসালয়ে স্থান লইলেন।

কতদিন পরে কুষ্টিয়া অঞ্চলে একটি কথা প্রকাশ হইল। সকলেরই শুনা কথা, নির্দিষ্ট খবর কেহই বলিতে পাবে না। মুখে মুখে কথাটা এতদূর ছড়াইয়া পড়িল যে, কুষ্টিয়া অঞ্চলে সকলেই মুখেই সেই কথা। “কেনী নাই”। দাতব্য চিকিৎসালয়ে কেনীর জীবনপ্রদীপ ইহজীবনের মত নির্বাণ হইয়া গিয়াছে। আশা-ভরসা, শত্রুদমন, পুনরায় নীলকার্ঘ্যের প্রচলন, প্রজ্ঞাশাসন ইত্যাদির সমুদায় কার্য পড়িয়া রহিল। মনের আশা মনেই বাখিয়া গেল। কেনীর সংশ্রবে যতপ্রকার মোকদ্দমা বিচারালয়ে উপস্থিত ছিল সমুদায় মূলতবী হইল। কয়েকদিন পরে নীট খবর পাওয়া গেল যে, “কেনী যাথার্থই নাই।” মবণেব কিছু পূর্বে একখানি উইলপত্র লিখিয়া সমুদায় সম্পত্তি রিসিভাবেব জিয়া কবিয়া গিয়াছেন। দেনা পাঁচলক্ষ টাকা। সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া পাওনাদাবগন টাকা পাইবেন। দেশেব লোক যেন মহাকালের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইল। মাথার উপর হইতে ভারি একটা বোঝা সরিয়া গেল। সকলের শরীবত যেন পাতলা পাতলা বোধ হইতে লাগিল। কেনীর দৌরাভ্যা, কেনীর অত্যাচাব, কেনীর কথা মনে হইলে সত্য সত্যই চঞ্চল। কিন্তু কিছুদিন কাহারও বিশ্বাসই হইল না যে কেনী ইহসংসার ছাড়িয়া গিয়াছে। হিংসা, ষ্ণে, ক্রোধ, মায়ামমতা, আশা-ভরসা হাত হইতে ছুটিয়া শাস্তিধামের অধিবাসী হইবে। খবর নিশ্চয় আদালতের ঘর পার্যন্ত খবর, পাকা খবর কেনীর ঠেটের কাষ্যকর্ম-সমুদায় হাইকোর্টের অর্ডার অনুসারে বন্ধ। স্তত্রাচ বিশ্বাস নাই।

বুঝি মবে নাই। কোন সময় হটপাট কবিয়া আসিয়া পড়িবে। সাধারণের মনেও এই বিশ্বাস। কেনীব জীবন-অন্তের পর অনেকেই কেনীব সেই দুর্দান্ত চেহারা, শরীরের ভীষণ গঠন স্বপ্নাবেশে মানসচক্ষে দেখিয়া—যথার্থই দেখিয়া যেন আতঙ্কে চমকিয়া উঠিয়াছিলেন।

মিসেস কেনী কুঠিতে আসিলেন। আপন জিনিসপত্র যাহা ছিল, তাহা লইয়া পুনরায় কনিহাত্য চনিয়া গেলেন। বিস্মিতকর্তৃক কেনীব সন্ধান হেট নীলাম হইল। কিন্তু নিলাম ডাকিবাব লোক নাই বলিলেই হয়। চাবলক্ষ টাকা মূল্যে অল্প আব এক কোম্পানী খরিদ কবিলেন। তিনিও বেশীদিন বাসিতে পারিলেন না। অত্ আব এক কোম্পানীর নিকট বিক্রয় কবিলেন। তিনিও সম্পত্তি শাসন কবিয়া কব-আদায়ে সমর্থ হইলেন না। বাধা হইয়া দেশীয় লোকেব নিকট থণ্ড থণ্ড কবিয়া বিক্রয় কবিত আবস্ত কবিলেন। দেশেব লোকেই ভাগবটন কবিয়া কেনীব সাবভীষ সম্পত্তি খরিদ কবিয়া লইল। নীলকবের নাম দেশ হইতে একেবারে লোপ হইয়া গেল।

পরিণাম

কেনীব জমিদারি থণ্ড থণ্ড হইয়া বাঙ্গালাব দখলে। শালঘর মধ্যাব কুঠি একজন বাঙ্গালী ক্রয় কবিলেন। আঙ্গিনা, প্রাঙ্গণ, উগান আব রহিল না। পাটাব আবাদ, ধানের আবাদ আবস্ত হইল। যে কুঠিব সীমায় জমিদাব, তালুকদার লক্ষপতি মহাজনের পা ধবিত গা কাঁপিগাছে, ঘটনাস্রোতে, নিয়তিব বিধানে, সেই স্বরম্য দ্বিতল বাসগৃহেব চতুস্পাঞ্চে সাধারণ প্রজার কোষ্ঠাব আবাদ, সিঁড়ি পর্যন্ত কোষ্ঠাব আবাদ, ধানের আবাদ আবস্ত হইল। যাহারা খরিদ করিয়াছেন, তাহাদের বাসেব জগ্, সময় সময় বসিবাব জগ্ ঘব নিদিষ্ট হইগাছে। অল্প অল্প দালানকোঠা পড়িয়া রহিগাছে। চন্দ্রচটিকা, আবঙলা, ঈদুর, শূগাল ইত্যাদি মনের আনন্দে দিবাবাত্র খেলা কবিতছে—ছুটাছুটি কবিতছে। এখন তাহারাই কেনীব স্বরম্য বাসগৃহেব অধিকারী—আপিস দালানের অধিকারী।

কিছুদিন পর গোয়ালন্দ লাইন খুলিল। গোয়ালন্দ স্টেশন এবং কোম্পানীর বাজার রক্ষার জগ্ স্রোতস্বতী পদ্মাব সহিত রেলওয়ে কোম্পানীর বিশেষ লড়াই বাধিল। তাহাদের ইচ্ছা যে, পদ্মাবস্রোতের বেগ অল্প পথে ফিরাইয়া স্টেশন, বাজার,

স্টিমার-ঘাট তাহার গ্রাস হইতে রক্ষা করেন। বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার, বড় বড় বুদ্ধিমান কর্মচারী চিন্তা করিয়া সাব্যস্ত করিলেন যে, বুদ্ধির অসাধ্য কি আছে, একটি নদীর স্রোতই যদি বুদ্ধিকৌশলে দশহাত তফাত দিয়া ফিরাইয়া না দেওয়া যায়, তবে বিলাতী-গোবর কি? স্টেশন, বাজার, স্টিমারঘাটই যদি পদ্মার স্রোতবেগ হইতে রক্ষা না কবা যায়, তবে আব রেল কোম্পানীর ক্ষমতা কি? বাংলাদেশের নদীর সহিত যদি বিলাতী বিজ্ঞান পরাস্ত হয়, তবে এ লঙ্কা রাখিবার স্থান কোথায়? হয় এসপার নয় ওসপার! পদ্মার স্রোত ফিরাইয়া দিতে হইবে। দেও আড়াআড়ি বাঁধ! ফেল ইটপাথর, দেখি পদ্মাব জোর কত? দেখি পদ্মার স্রোতের তেজ, তরঙ্গের আঘাত? বাঁধ আরম্ভ হইল। তাহার নাম হইল ‘স্পার’। বিলাতী বুদ্ধির আশ্চর্য্য ক্ষমতা, ‘স্পার’ প্রস্তুত হইল। একটি পাকা রাস্তা গোয়ালন্দের ঘাট হইতে পাকারূপে পদ্মার বুকের উপর চড়িয়া বসিল। স্রোতের গতি ফিরিয়া গেল! শীত-কাল, পদ্মা নীলব। যেপ্রকাবে ইচ্ছা সেইপ্রকারে বড় বড় বাহাতুরী পুড়িয়া স্পারের মাথা ঠিক রাখা হইল। স্পারের উপর রেললাইন পর্য্যন্ত বসান হইল। আশ্চর্য্য দৃশ্য! নদীর সিকিভাগ পর্য্যন্ত পাকা রাস্তার দক্ষিণ-বামে স্রোতবেগ কমিয়া গিয়া স্পারের মাথা ঘেঁষিয়া স্রোত চলিতে লাগিল। ধন্য বিলাতী বুদ্ধি! স্টেশন, স্টিমার-ঘাট, বাজার সকলি রক্ষা হইল। কোম্পানীর আনন্দের সীমা নাই। কালস্রোতে বধাস্রোত আসিয়া উপস্থিত। পদ্মার শ্রী অন্তরূপ। স্রোতের বেগ ঘণ্টায় ঘণ্টায় বৃদ্ধি—ভীষণ কলকল বব চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল। স্পার আর টেকে না, প্রায় তিনলক্ষ টাকা ন্যয় করিয়। যে বাঁধ বাঁধা হইয়াছে, তাহাই একেবারে জলে ভাসিয়া যায়, ডুবিয়া যায়, ভাসিয়া যায় বড়ই লঙ্কার কথা। স্পার রক্ষা করাই কোম্পানীর মত হইল। আরও দুইলাখ টাকার ববান্দ হইল। যে উপায়ে হয় স্পার রক্ষা করিতেই হইবে। কোম্পানীর ইটপাথর যেখানে যাহা ছিল সমুদায় ট্রেনে আসিয়া স্পারে ঢালিতে লাগিল। কিছুতেই আর টেকে না। পদ্মা বিষম বিক্রম প্রকাশ করিয়া ভীষণরবে ছুটিয়াছে। কার সাধ্য বাঁধ বাধিয়া আটকাই? বিলাতী ক্ষমতাও কম নহে। দ্বিবারাত্র ইটপাথর ফেলিয়া স্পারের আয়তন বৃদ্ধি করা হইতেছে। যেখানে একটু দমিয়া যাইতেছে, মুহূর্ত মধ্যে ইটপাথর ফেলিয়া পূর্ণ করিয়া দিতেছে। চকিণ ঘণ্টা অনবরত লোক খাটিতেছে। কোম্পানীর ইটপাথর যাহা যেখানে ছিল সমুদায় স্পারের কল্যাণে পদ্মার জলে নিষ্কিপ্ত হইল। এখন আর রক্ষার উপায় নাই! ইটপাথরের জোগাড় করিতে পারিলেও-বা আশা ছিল।

টাকার অসাধ্য কি আছে ? বেলগুয়েলাইনের নিকট পুরাতন বাড়ি, নীলের কুঠি ইউজ, জাঁতধর যেখানে ঘাহা ছিল, দ্বিগুণ চতুগুণ মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া ভাস্কিয়া যতসত্তর সম্ভব হইল পদ্মার বুকে ফেলিয়া স্পারের আয়তন বৃদ্ধি করা হইল। ঈশ্বরের মহিমা বৃদ্ধিতে সাধ্য কার ! কেনৌর বাসগৃহ, কুঠি; ইমারতসমুদায় বেল কোম্পানীর দ্বাৰা আনীত হইয়া পদ্মাগর্ভে নিষ্ফিষ্ট হইল, কিন্তু স্পার টিকিল না। শ্রোতে কোথায় উড়িয়া গেল তাহা ভাবিয়া নির্দিষ্ট করিতেও ক্ষমতা রহিল না। কেনৌর দালানের ইট পর্যন্ত জগতেব চক্ষে থাকিল না, যে স্পারে প্রায় সাত আট লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল, সে স্পারসমেত পদ্মাব শ্রোতে উড়িয়া গেল।

পথিকের মনের কথার প্রথম স্তর কেনৌর প্রসঙ্গ-পরিণাম-ফলের সহিত শেষ হইয়া সমাপ্ত হইল।

— সমাপ্ত —

বসন্তকুমারী নাটক

নাট্যকাক্ত নর-নারগণ

পুরুষ

বীরেন্দ্র সিংহ	—	—	ইন্দ্রপুত্রের রাজা
নবেন্দ্র সিংহ	—	—	বাজপুত্র
বৈশম্পায়ন	—	—	রাজমন্ত্রী
প্রিয়ংবদ	—	—	বিদূষক
শরৎকুমার	—	—	রাজপুত্রের সহচর
বিজয় সিংহ	—	—	ভোজ পুরাধিপতি

স্বয়ম্বরসভায় মিলিত বাজগণ, কঙ্কণী, প্রতিহাবী, নগরপাল,
প্রজাগণ, ভূতা প্রভৃতি ।

বমণী

রেবতী	—	—	ইন্দ্রপুত্রের রাণী
বসন্তকুমারী	—	—	ভোজপুত্রের রাজকন্যা
বিমলা } সরলা }	—	—	প্রতিবেশিনীদ্বয়
মেঘমালা	—	—	বসন্তকুমারীর সহচর
মালতী	—	—	রেবতীর সহচর

বসন্তকুমারী নাটক

প্রস্তাবনা

(নটের প্রবেশ)

নট—(স্বগত) আহা ! কি অপূর্ণ সভা ! এ সভার শোভা নয়নগোচর কোরে আমার অন্তঃরাগ্না যেন সন্তোষ—সাগবে সন্তুষ্ট দিচ্ছে । অগ্ন আমার জনম সফল হলো । নয়ন চরিতার্থ হলো । এই ক্ষুদ্রায়তন স্থানে বহুগুণ-সম্পন্ন-গগনীয় মহোদয়গণের আগমনে কি অপূর্ণ শোভাই হয়েছে, স্থানটি কি মনোহর রূপই ধারণ কবেছে । চমৎকার শ্রেণীবদ্ধ দীপমালা যেন অসংখ্য তাবকামালার ন্যায় শত থেকেই সভাতলস্থ অন্ধকার একেবারে হরণ কবেছে । কিন্তু এক-চন্দ্রের নিকট যখন গগনস্থ অগগনীয় তারকাশ্রেণী দীপ্তি পায় না, তখন দীপমালা যে, এই উপস্থিত মহাত্মাগণের মুখচন্দ্রমাব কাছে মলিনভাব ধারণ করবে, এতে আব আশ্চর্য্য কি ? তবে প্রেয়সীকে ডেকে দেখি, যদি কিছু উজ্জ্বল করতে পারি । (নেপথ্যাভিমুখে) প্রিয়ে ! যদি বেশ-বিচ্যাস হয়ে থাকে, তবে একবার এদিকে সভাতল সমুজ্জল কর ।

(নটীর প্রবেশ)

নটী নাথ ! আমারে আবার কেন ডাকলেন ?

নট—প্রিয়ে ! দেখদেখি, কেমন চমৎকার সভা হয়েছে, ইন্দ্রাজেব দেব-সভার শোভাও এ সভার শোভায় পরাজয় হয়েছে । তবে অনর্থক বাকচাতুর্বীতে সময় নষ্ট না করে কোনপ্রকার আমোদ-প্রমোদ দ্বারা উপস্থিত মহোদয়-গণের চিত্তবগ্নন কর ।

নটী—নাথ ! আপনিও আমোদ-প্রমোদ নিয়েই আছেন । তা বাহোক আমায় কি করতে হবে, আজ্ঞা করুন ।

নট—আজকাল ভঙ্গসমাজে নাটকের অভিনয়ই প্রধান আমোদ বলে গণ্য হয়েছে ।

অতএব প্রিয়ে ! তোমায় আজ্ঞা একটি নূতন নাট্যাভিনয় করতে হবে ।

নটী—আজকাল নব্য-সমাজে নাটকের সমাদর হয়েছে বটে, কিন্তু এই সকল বিজ্ঞ-জন-মণ্ডিত-সভায় নাট্যাভিনয় করা সহজ নয় ।

নট—তাতে ভয় কি ? গুণীগণ কি মূৰ্খজনের দোষ গ্রহণ করেন ? তোমার এত

ভয় কি ? তুমি একথানা নাটক মনোনীত কব, আমরা অভিনয়ে প্রবৃত্ত হই।

নটী—নাথ ! আপনিই মনোনীত করুন। আপনি উপস্থিত থাকতে কি আমি অগ্রে কোন কথা বলতে পারি ?

নট—(কিঞ্চিত নিস্তব্ধ থাকিয়া) কিছুদিন হলো শুনিছি বসন্তকুমারী নামে একখানি নাটক প্রকাশ হয়েছে, অতঃপরই অভিনয় করা যাক।

নটী—বসন্তকুমারী ! কার রচিত ?

নট—কৃষ্টিয়া নিবাসী মৌব মশাবুরফ হোসেন রচিত।

নটী—ছি ছি ! এমন সভায় মুসলমানের লিখিত নাটকেব নাম কলঙ্কন।

নট—কেন ? মুসলমান বলে কি একেবারে অপদস্ত হলো ?

নটী—তা নয়, এই সভায় কি সেই নাটকেব অভিনয় ভাল হয় ? হাজ্জাব হোক মুসলমান !

নট—অমন কথা মুখে আনিও না ! ঐ সর্ব্বনেশে কথাতেই ভাবতেব সর্ব্বনাশ হচ্ছে।

নটী—নাথ ! ক্ষমা করবেন। আপনার আস্থা আমার শিরোধার্য্য। কিন্তু বসন্তকুমারী নাটকেব অভিনয় কোবে শেষে মনস্তাপ পাবেন, গঞ্জনার ভাগী হবেন। সভাস্ত মহোদয়গণের মনোবঞ্জন করা দূবে থাক বরং তাঁদের বিরক্তিরই হবে।

নট—প্রিয়ে মনোরঞ্জন না করতে পারি, রহস্ত তো হবে ? সে-ও-এক আমোদ। তুমি আর বিলম্ব করনা। একটি গান গেয়ে অভিনয় আরম্ভ কোরে দাও।

নটী—সে কি নাথ ! আমি জ্ঞানলোক, এই সভার মাঝখানে গান গাবো ?

নট—তাতে লজ্জা কি ?

নটী—আপনি তা বলবেন বটে, কিন্তু আমি তা পারি না, আমার ভারি লজ্জা।

নট—(হাস্ত করিয়া) দেখ প্রিয়ে ! এটি তোমাদের স্বভাব। পারো সব, করো সব, কেবল লোকে বললেই লজ্জা জানাও।

নটী—(ঈষৎ হাস্তমুখে লজ্জিতভাবে) আচ্ছা আপনি বলছেন তবে গাই।

গীত

বসন্ত বাহার—আড়া।

ফুটিল বসন্তফুল মোহনকাননে। (সই)

দাঁহছে বিরহী-প্রাণ বিচ্ছেদ দহনে ॥

পিক বঁধু শাখী পরে,

কৃহকে পঞ্চম হরে,

শুনে প্রাণ ছ-ছ করে,

বিয়েগী মরে জীবনে ॥

ফুলশরে ফুলবান,

হাসিতেছে পঞ্চবাণ,

ঋতুরাজ বধে প্রাণ,

প্রমোদিত উপবনে ।

এ বসন্তে কান্তাহারা,

ঋষি বলে তারা কারা,

কোথারে নয়নতারা,

সতত বলে বদনে ॥

নট—বেশ ! বেশ ! প্রিয়ে তোমার স্নকণ্ঠ বিনির্গত তান-লয় যুক্ত সঙ্গীত শ্রবণে
বোধহয়, সকলেই মোহিত হয়েছেন । (নেপথ্যে সভাভঙ্গ বাজ)

প্রিয়ে—শুনছ ! রাজা বীবেন্দ্র সিংহের সভাভঙ্গ হলো । চল আমরা যাই ।

(উভয়ে প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(ইন্দ্রপুর ; রাজা বীবেন্দ্র সিংহের বহিস্থ শয়ন মন্দির—রাজা আসীন)

রাজা—(স্বগত) মনটা বড়ই চঞ্চল হয়েছে, কিছুই ভাল লাগছেনা, মন্ত্রীই বা
এখনো কেন আসছেন না, প্রতিহারীও তো অনেকক্ষণ গিয়েছে । (চতুর্দিকে
অবলোকন করিয়া নিকটস্থ পালঙ্কে শয়ন ও বিবিধ চিন্তা) (প্রিয়বদের
প্রবেশ)

প্রিয়—(গ্রীবাউন্নত করিয়া মহারাজের আপাদ-মস্তক দৃষ্টি এবং স্বগত) মহারাজ
তো ঘুমিয়েছেন, এই অবসরে রাজ-বিছানার বসে মনের সাধটা মিটিয়ে
নিই । অহংকারের সহিত উপবেশন) বা ! বা ! কি নরম ! বালিসে

ঠেক দিলে, মন আব কিছুই চায় না ; কি সখ ! (দক্ষিণ-ব্রামে ফিরিয়া)
 উছ কি মজা ! সাধে কি বডলোকে বালিস নিমে গড়াগড়ি যায় । রাজ-
 তন্ত্রে বসিলে মনেব গতিও ফিরে যায় । এখন দে'ই হুকুম । মা'বি গর্দান !
 না না এই সোনার নলে টান দিয়ে ববাদনা বাক্স ভাবা, ফবসী, শুড-
 শুডি, সেতো আছেই এর ভিতবেব মা'বপেঁচটা কি ? মরি আর বাঁচি এ
 সোনার তুকোয় একটান দিবই দিব । নল হাতে করিয়া টানিতেই) ।

রাজা—ববস্ত ! ও কি কর ?

প্রিয়—(চমকিত হইয়া বিছানা ছাড়িয়া গড়াইয়া দূরে যাওয়া ষোড়হাতে) না
 মহারাজ ! বিছানায় কেমন সোনারূপাব কাশ, তাই দেখছিলুম ।

রাজা—ওহে ! আজকাল চলছে কেমন ?

প্রিয়—(একটু সাঁঝিয়া গিয়া) চলবে কি ? বলব কি ? মহারাজ ! কবব কি ? য
 তাই । সেই ফাঁক-ফাঁক । তবে আপনি যদি পুনবাস বিবাহ কবতেন, তাহলে
 একরকম,—জানতেই পাচ্ছেন, আপনি তো আর সে নামটিও কববে-
 না । দেখুন, কেমন সখ । এই তো, বিছানায় একা শুয়ে কেবল মনে মনে
 সাত সাগরের ঢেউ শুগছেন । আমার যদি ক্ষমতা থাকতো, তবে দেখাতেন,
 শর্মারাম কখনো গৃহশূন্য হতো না—কখনই হতেন না—মুহূর্তকালের
 জগাও ঘবখালি থাকতো না । এক যেতো আর এক আসতো । মহারাজ !
 যে ঘরে জ্বীলোক নাই, সে ঘবে লক্ষ্মী নাই ; সে ঘর নরক বললেও হয়,
 শাশান বললেও হয় । (পশ্চাৎ দৃষ্টিপাত করিয়া) মহারাজ ! চললেম,
 আর বসা হলো না ।

রাজা—কেন ? এত ব্যস্ত কেন ? কথা শেষ হলোনা যে ?

প্রিয়—(গাভোথান করিয়া বিরক্তভাবে) আর থাকতে পাগ্লেতো শেষ হবে ?
 ঐ দেখুন, ও বেটার মুখ দেখলেই আমার প্রাণ উড়ে যায় । যাই মহারাজ !
 (বেগে প্রস্থান)

(মন্ত্রী বৈশম্পায়ন এবং প্রতিহারীর প্রবেশ ও অভিবাদন)

বৈশ—(করযোড়ে দণ্ডায়মান)

রাজা—মন্ত্রীবর ! রাজ্যের সমস্ত কুশল তো ?

বৈশ—মহারাজ ! সর্বাংশেই মঙ্গল । জয়পুর অধিপতি বৃষ্ণগর্কে গব্বিত হয়ে যে

মস্তক-উত্তোলন করেছিলেন, তিনিও এক্ষণে ষোড়কের কর প্রদানে বাধ্য হয়েছেন। অল্প রাজ্যবা বিনাযুদ্ধে অধীনতা স্বীকার করেছেন। প্রজারাও মহাস্বখে আছে। মহামার, জলপ্রাবন, দুর্ভিক্ষ এ সকল নামও শুনা যায় না। সর্বস্টি হওয়ায় শস্যও অপয্যাপ্ত হয়েছে, প্রজাদের পরস্পর দ্বৈষ, হিংসা-বিবাদ, বিসম্বাদ কিছুই নাই, দস্যাদল আর হিংস্র জন্তুগণ রাজ্য থেকে বহিস্কৃত হয়েছে, প্রজাগণ এখন নিশাকালেও নির্ভয়ে বিমুক্তভাবে স্বখে নিদ্রা যাচ্ছে। কোন বিষয়েই রাজ্যের বিশৃঙ্খলতা নাই।

রাজা—বাজ্যের উত্ত-সমাচার শুনে বড়ই সন্তুষ্ট হলেম। মন্ত্রীবর্গ! আমি মনে মনে একটি সঙ্কল্প করেছি, এতে আপনাব কি অভিপ্রায়? দেখুন, আমার তো এই শেষ দশা, ভগবান কোনসময় কি ঘটান কে বলতে পাবে? রাণীর লোকান্তর হওয়াবধি সর্বদাই দুঃখিত মনে কাল কাটাচ্ছি, বলতে কি তিলান্বিতকালের জন্মও আমি স্থখ নই। বল, বীণা, সাহস অনেক লাঘব হয়েছে, দিন দিন যেন ক্ষীণ ও বলহীন হয়ে আসছি। কুমার নরেন্দ্র এক্ষণে পূর্ণ বয়স্ক, বিজ্ঞাবুদ্ধিতেও বিশারদ হয়েছেন। আপনার ইচ্ছা যে তাঁকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্তকরে আমি গুরুকাৰ্য্য থেকে একেবারে অবসর লই এতে আপনার মত কি?

বৈণ—(ষোড় করে) মহারাজ! এ অতি সংস্কারক! যুবরাজ নরেন্দ্রকুমার যেমন শাস্ত্র প্রকৃতি তেমনই দয়ালু চিত্ত, বিজ্ঞাবুদ্ধিতেও বিচক্ষণ, বল-বীণা, সাহস, পবাক্রমেও অদ্বিতীয়, স্ববশেও অচল্য শক্তি। তিনি রাজ্যাভিষিক্ত হন, এটি আমার একান্ত মত। প্রজারাও তাতে সন্মত হবে। যুবরাজ প্রজাবঞ্জন করে বাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করবেন, তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু যৌবনকাল অতি ভয়ানক কাল। আমি মনেও করি না যে, দুর্জয় রিপুদল তাঁকে পরাস্ত্র কববে, তবু কি জানি এই বিস্তৃত বাজ্যের অধীশ্বর হয়ে চাটুকারদলের কুমন্ত্রণায় কোন অসঙ্গত-কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হলে পরিণামে কলঙ্কের ভাজন হতে পারেন, তখন আপনিও অন্ততাপ করবেন, তিনিও দুর্নামের ভাগ্য হবেন। আমি জানি, বটে, অল্প অল্প কাৰ্য্যে চাটুকারদল তাঁর সং-প্রবৃত্তিকে কোনমতেই অসং—পথের অন্তরঙ্গী করতে পারবে না, কিন্তু ভূপতিগণের—ভূপতিগণের কেন,

মহন্ত মাঝেরই প্রধান শত্রু কামরিপু। ঐ ভয়ানক শত্রুর দ্বারা জগতে কেন, স্বরলোকের কত কত কাণ্ড সংঘটন হয়েছে। দেখুন, সে ভয়ানক শত্রুদমনে অক্ষম হয়ে স্বরপতি ইন্দ্র গুরুপত্নী হরণ করে কেমন দুর্দশায় পতিত হয়েছিলেন।—কেবল এই অদমনীয় বিপুর ছলনায় লঙ্কাধিপতি দশানন সবংশে বিনাশ হয়েছেন। এ সকল তো মহারাজের অবদিত নাই।

রাজা—আপনি কি বিবেচনা করেন?

বৈশ—মহারাজ! অগ্রে যুবরাজকে উপযুক্ত পাত্রীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করুন, শেষে বাজ্যাভিষিক্ত করবেন।

রাজা—উত্তম যুক্তি বটে। অগ্রে বিবাহ দেওয়াই কর্তব্য। কুমার এক্ষণে কোথায়?

বৈশ—দ্রাবিড় থেকে যে বিচক্ষণ পণ্ডিত বাজধানীতে আগমন করেছেন, তারই সঙ্গে শাস্ত্রের তর্ক-বিতর্ক করছেন; দেখে এসেছি। (যুবরাজের প্রবেশ)

নরেন্দ্র—(প্রণাম করিয়া ঘোড়কবে) পিতঃ। আজ আমার মুগয়ায় যেতে বাসনা হয়েছে,—অনুমতি হলে মন্দুবা থেকে অশ্ব আব জনকতক পদাতিক সৈন্য-লয়ে মুগয়ায় গমন করি।

রাজা—বৎস! তুমি মুগয়ায় যাবে মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, সৈন্যসামন্ত অন্তশস্ত্র যা ইচ্ছা নিয়ে যাও, এতে আমার আদেশের অপেক্ষা কি? (যুবরাজ প্রণাম করিয়া প্রস্থান)

মন্ত্রী—মহারাজ! তবে রাজকুমারের বিবাহের নিমিত্ত পাত্রী অন্বেষণে ভাট পাঠানো কর্তব্য।

রাজা—তা তো পাঠাবেই। আর আজ থেকে বিবাহের আয়োজনও কর। (রাজা মন্ত্রী এবং তৎপশ্চাৎ প্রতিহারীব প্রস্থান)

দ্বিতীয় রঙ্গভূমি

পুষ্পোচ্চান

(রাজা ও প্রিয়ংবদের প্রবেশ)

প্রিয়—মহারাজ আপনি যে শত শত টাকা ব্যয় করে এই সকল ফুলগাছ ভিন্ন-দেশ থেকে এনে নন্দনকাননের চেষ্টেও সাজিয়েছেন, এতে লাভ কি?

রাজা—এতে কি লাভ, তা তুমি বুঝবে কি? মনোরম পুষ্প নয়নের ক্রীড়-সাধন,

চিত্তের সন্তোষ-সাধন, আর স্বাস্থ্যে হৃদয়ে আনন্দ জন্মে। এর চেয়ে লাভ আর কি আছে ?

প্রিয়—(পদচারণ করিতে করিতে মাথা নাড়িয়া) মহারাজ ! ও কথা শুনলেম না, ও কোন কথাই নয়। ও শুনবার যোগ্য কথা নয়। ফুল দেখলে মন খুসী হয় এও কি একটি কথা ! কোথায় ফুল আর কোথায় মন ! সখস্বপ্ন ভারি। কি মজার কথা, ছোব না, দেখেই খুসী এমন মনকে আর কি বলবো মহারাজ। মহারাজ ! পেটভবে আহারটি না করলে হাজার শৌক হাজার দেখো, কিছুতেই মন খুসী নন। (উদবে শত দিয়া) দেখুন, এই উদর এই অর্থভাগ্য, ইনি পূর্ণ থাকলে ফুল না ও ফলেও মন খুসী হয়, চক্ষুর প্রীতি—জন্মে তবে রাজারাজড়ার মন কেমন বলতে পারি না। তা যাই বলুন মহারাজ ! ও সকল ফলগাছের চেয়ে আম, কাঁঠাল, নারিকেল, জাম, জামরুল, পিচ, লিচু আর সাককচূর্ণ গাছ হলে, বড় আনন্দের বিষয় হত। আহা ! যদি এই সকল গাছই থাকতো তাহলে কি শমারাম কক্ষপেটে খালিহাতে ফিরে যান ? (দীর্ঘ নিশ্বাস) ।

রাজা—ওহে সে সকল গাছও তো আছে।

প্রিয়—আছে তো বটে, কিন্তু কাছে পাই কই এ বাগানে যেমন প্রত্যহই সন্ধ্যার সময় এসে পড়েন, সেও তো আপনারই বাগান, কই জন্মাবচ্ছিন্নে তো একদিনও পদার্পণ করতে দেখাশুম না। তা সেখানে যাবেন কেন, ফুলগাছই যে আপনারে খেয়েছে।

রাজা—বয়স্ক। দেখ দেখি, এই বসন্তকালে উদ্যানস্থ সরোবরে কমলমালা কেমন ভঙ্গিতে প্রস্ফুটিত হয়ে নয়নের প্রীতি সাধন করছে। পুষ্পের মধুগন্ধে উদ্যান কেমন আমোদিত হয়েছে। (নিকট শিমুল বৃক্ষ হইতে কোকিলের স্বর)

প্রিয়—(চমকিত) ও কি ডাকে ? মহারাজ ! ও কি ?—

রাজা—(জ্বলন্ত হস্ত করিয়া) আরে ভয় কি ? ও যে কোকিল। বসন্তকালের কোকিলের ডাক শুন নাই ?

প্রিয়—(নিতান্ত আগ্রহে) মহারাজ ! অল্পগ্রহ করে যে গাছে ডাকছে, সেই গাছটি আব পাখিটি আমায় চিনিয়ে দিন।

রাজা—(অঙ্গুলির দ্বারা দর্শান) ঐ দেখ, শিমূলবৃক্ষ দেখেছ, যার পুষ্প সকল
প্রস্ফুটিত হয়ে লোহিতবর্ণ সূর্য্যকেও লজ্জা দিচ্ছে ; সেই বৃক্ষের দক্ষিণ-
শাখায় বসে পাখিটি ডাকছে। দেখেছ ?

প্রিয়—(আনন্দে রাজাকে জড়াইয়া পরিষা)—দেখেছি দেখেছি, ও তো দেশী-
কাক মহারাজ !

রাজা—(জীবৎ হস্ত করিয়া) কাকট বটে ! তোমাকে সাক্ষাৎ পাচম্পতি বললেই
হয়। যাহোক ফলফুলে সমস্ত বৃক্ষ কেমন মানিয়েছে। বসন্তকালটি কি
মনোহর !

প্রিয়—মহারাজ ! এইসব দেখে আমারও মন যেন থসী হলো। আমি আর
ধাকতে পারি না অম্মতি করেন তো একটা গান গাতি।

রাজা—আচ্ছা। তাতে আর আপত্তি কি ?

প্রিয়—(গানাবধ)

গাগিনী জংলা—তালজং

কোথায় রহিল আমার যতনেব ধনবে।

যার লাগি ঘর ছাড়ি—

যার লাগি ঘর ছাড়ি—

তাবে নারে নাবে বে !

মনে হলো না। পেটে কিছু নাঈ চাই মনে হবে কি ?

—সে যতনেব ধনবে।

যার লাগি ঘর ছাড়ি,—

রাজা—হে নটবর ! ব্যাপাব কি ?

প্রিয়—কষ্ট কিছুই নয়।—

যাব লাগি ঘর ছাড়ি কোথায় না যাইবে।

হেবিমে কুস্তম্বন, মন হল উচাটন,

কোকিলেব স্বরে প্রাণ, আর—

মহারাজ ! অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উদর খালি রয়েছেন, এতে কি আর গান

মনে হয়, ক্ষুধা হলে কথা আড়িয়ে যায় তার আবার গান—

রাজা—না—না বেশ হয়েছে। অতি উত্তম হয়েছে। চমৎকার গেয়েছ।

প্রিয়—আমিও ভালই গেয়েছি। আপনি এর অর্থ বুঝেছেন ?

রাজা—বুঝবো না কেন ?

প্রিয়—না, আপনি কখনই বুঝতে পাবেন নি, যদি এর অর্থ বুঝতেন তাহলে কি আর এই স্তম্ভসময়ে স্ত্রী-বিহীন হয়ে একা থাকতেন ? আমি বৎসরাবধি বলছি যে, মহারাজ বিয়ে করুন—বিয়ে করুন। আপনিও স্তম্ভী হবেন, শশ্মাও পেটটি পুরে আহারটি করবেন !

রাজা—তুমি পাগল হয়েছ। আমার কি আর বিবাহের সময় আছে। নবোদ্র পূর্ণ-বয়স্ক হয়েছেন, তাবই বিবাহ দিতে মনঃ কবেছি। এতেই তো তোমার আহারেব যোগাড় হচ্ছে।

প্রিয়—সে তো গডানই রয়েছে। ছেলে থাকলেই বিয়ে দিতে হয়। দশজনার আশীর্বাদও লইতে হয়। আপনি বিয়ে কললে ছাই মনেও হয় না। একেবারে ছক্কাপাক্সা মেবে নিতুম। রাজ্য বিষে খেতে খেতেই যুবরাজের বিয়েব পালা আসতো।

রাজা—না হে ! আব বিবাহ করতে বাসনা নাই। এ বয়সে বিবাহ কবলে দেশ-ভুদ্ধ লোকে আমায় নিন্দা কববে।

প্রিয়—ফেলে বাখুন নিন্দে কার নিন্দা কাব কাছে। আপনি বাঁচলে—বাপমায়ের নাম—লোকেব নিন্দায় কি হয়। নিন্দুকেব মুখ বন্ধ করতে কতক্ষণ লাগে। আজকাল ষথার্থবাদী উচিত বক্তা কে আছে মহারাজ ? যিনি একটু মাথা তুলবেন, রাজ্যবিধি খাটাতে হবেনা, শাসনদণ্ডেব সাহায্য লইতে হবে না। সেউ খেউ খেউ, হেউ হেউ ববের সঙ্গে সঙ্গে কিছু বসাল গোচের (দক্ষিণ চক্ষু বুজিয়া) ফেলে দিলেই মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। সে ভার এ-শশ্মার।

রাজা—তাতো মানলেম। কয়সেব কি ? এ বয়সে কি আব বিবাহ সাজে ?

প্রিয়—সে কি মহারাজ ? বলেন কি ? কিসের বয়স ! আপনার চুল পেকেছে ? কই ? আমি তো একটিও পাকা দেখতে পাঈ না। একটিও তো কাল হয় নাই। যেমন সাদা, তেমনি শব ধব করছে। তবে আপনি বিয়ে করবেন না কেন ? কিসেব বয়স ? আপনার যে বয়স এর চেয়ে কত অধিক বয়সে কতশত লোক বিয়ে করে বংশরক্ষা করছে। সামান্য কথায় বলে থাকে যে, স্ত্রীমলে ঘরশূন্য হয়। আপনার কোটাঘর বলে কি আর শূন্য

হবে না ? আমি ষোড়হাতে বলছি মহাবাজ বিয়ে করুন । আপনিও স্ত্রী হবেন, গরীব বামুনের ছেলেও পেটভরে খেতে পাবে ।

রাজা—(কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) ওহে, মনে কর যেন আমার বিবাহ করতে ইচ্ছা হতো, উপযুক্ত পাত্রী কোথা পাবো ?

প্রিয়—মহাবাজ কি কথাই বললেন, হাসী রাখবার স্থান আর নাই । ঘরের লক্ষ্মী ঘরে না থাকলে বুদ্ধির স্থির থাকে না । মহারাজ যত্ন করলে কিনা হয় ? যত্ন করে লোকে সাগর থেকেও মণিমুক্তা তোলে, আর একটা মেয়ে পাওয়া যাবে না ? এতো তুচ্ছ-কথা । আর মহাবাজ ! চিবকালটা রাজা-রাজড়ার সহবাসেই কাটালেম, আপাগোড়া বেধে বডলোকের কাছে কথা বলতে হয়, তা আমি বেশ জানি । শ্রদ্ধা কি তার যোগাড় না করে প্রকাশ করেছেন ?

রাজা—কি রকম যোগাড় ?

প্রিয়—মহারাজ ! অর্থাৎ কি ? আপনার যে ষাণী মবে গেছেন অবিকল সেই রকম মেয়ে পাওয়া গেছে বৎ তার চেয়ে সবস বহু নিরস হবে না ।

রাজা—তবু কোথায় ?

প্রিয়—মহারাজ ! মনে পড়ে ? সেই আপনি একদিন নগর ভ্রমণে আমার সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন, স্মরণ হয় ? আমি কত-কৌশলে আপনারে দেখিয়েছিলুম । আপনি অনেকক্ষণ পর্যন্ত স্থিরভাবে দেখতে দেখতে বললেন, এই কমলটি প্রস্তুতিত হয়ে যে মহাআর হস্তে পড়বে, তিনিই জগত স্ত্রী, তারই জীবন সার্থক । মনে পড়ে ?—ঐ যে—

রাজা—হাঁ হাঁ মনে হয়েছে । সে কি রকমে হবে ?

প্রিয়—হা ! হা ! কি রকমে হবে এই বুদ্ধিটুকু এখন রাজ-রাজেশ্বরের মাথায় নাই । হায়রে গৃহলক্ষ্মী, মহারাজ ! আপনি অল্পমতি কললে আবার হবে না, অধীনে থেকে তার এত ক্ষমতা যে মহারাজের সঙ্গে বিয়ে দেবে না ?

রাজা—মহারাজ হলে কি হবে ? তার বয়স অতি অল্প, তার মা, বাপ স্বীকার হবে কেন ?

প্রিয়—মহারাজ বুঝেছি । আর বলতে হবে না, মাতৃ-পিতৃ-বিয়োগে আজীবন দুঃখী—রাজ-মস্তক স্ত্রী-বিয়োগ ভারে অবনত । বুদ্ধির বিপর্যয় । হায়রে

লক্ষ্মী! হায়রে গৃহলক্ষ্মী! গৃহভূষণ। কি পরিতাপ, কি পরিতাপ, রাজা
বীরেন্দ্র সিংহের মতিভ্রম মহারাজ। আপনার সঙ্গে বিয়ে দেবে না বলেন
কি? প্রস্তাব মাত্র সম্মত। যদি না হয় তবে এ গলার এ সাদাস্তত আর
গলার রাখবো না ছিঁড়ে অগ্নিদেবে উপহার দিয়া যা ইচ্ছা তাই করবো।

রাজা—তবে তুমিই কেন ঘটকালি কর না? ঘটকালি পাবে।

প্রিয়—(হাস্ত মুখে) মহারাজ। আমি কিছুই চাই না। আমি আপনার (পেটে
হাত দিয়া) এই হলেট হগ।

রাজা—আচ্ছা তাই হবে।

প্রিয়—তবে শমা বায় চলেন। প্রস্থান।

রাজা—(স্বগত) যুবরাজের বিবাহের আয়োজন হচ্ছে। এ দিকে প্রিয়ংবদও
আয়োজনে প্রবৃত্ত হল। কি কবি প্রিয়ংবদ কৃতকাৰ্য্যই হয়; তবে বিশেষ
গোপনে এ কাৰ্য্য সম্পন্ন করা চাই। এ বয়সে আর লোক জানাজানি করে
আবশ্যক নাই। যুবরাজের বিবাহের আয়োজন হতে হতে যদি এ দিকে
ঘটে যায়, তাতেই বা এমন ক্ষতি কি? দেখি কোথাকার জন কোথায়
গড়ায়, কাঁব মেয়ে তাঁর জীবনের ভাব হয়েছে যে দেখে শুনে আমার সঙ্গে
বিয়ে দেবে। কপালে কি আছে বলা যায় না। (প্রস্থান)

তৃতীয় রক্তভূমি

(ভোজপুর; বসন্তকুমারীর—বাসগৃহ)

বসন্তকুমারী—(শয্যা হইতে উঠিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে) হায়! কোথা গেল?
এত কথা, এত ভালবাসা, এত প্রেম, শেষে সকলি ফাঁকি। শুধু ফাঁকি নয়
—প্রাণ মারিয়া ফাঁকি! কি নিষ্ঠুর। কি নিষ্ঠুর। না—না তাই বা বলি
কিসে? ধর্ম সাক্ষী করে কণ্ঠহাব বদল হয়েছে, (হারের প্রতি চাহিয়া)
একি? কি সর্বনাশ! এ কার হার? এ হার কার? এ যে আমারই হার।
কথা কি? হায়! হায়! এব অর্থ কি? না না আমি দেখলাম কি? একি
স্বপ্ন? না না তাই বা কি করে হয়। আমি স্বহস্তে তাঁর গলায় হার
পরাইয়াছি। তিনি ও তাঁর গলার হার খুলে আমার গলায় পরিয়েছেন।
সে হার কই? এ যে আমারই হার। (কণ্ঠ হইতে হার খুলিয়া) এই যে

আমারই হার আমার গলায় এ হার কেন ? তবে কি যথার্থই স্বপ্ন না চিত্ত-
বিকার। অসম্ভব ! সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমি তখন নিদ্রিত ছিলাম না।
আমার চক্ষুও বন্ধ ছিল না। আমি স্পষ্ট দেখেছি, কথা বলেছি, কথা
শুনেছি ; কাছে বসেছি, স্বপ্নে কি এত কথা হয়, এত ভালবাসা জন্মে,
আর এত ভাল দেখায়। হা ! নাথ ! কোথা গেলে ?

(বসন্তকুমারীর পশ্চাদ্দিগেদ দাব দিয়া মালার প্রবেশ এবং নিঃশব্দে দণ্ডায়মান)
হায় হায় ! এমন কথা সকলি মিছে হলো। মত্যা মত্যাই কি স্বপ্ন ? (কণ্ঠ-
হার দূরে নিক্ষেপ) এ হার আমার গলায় পরবে না, না তা হবে না, হার
আমার যত্নেব, এ হার আমার আদরের, যে পবিত্র গলায় উঠেছিল, স্পর্শ-
গুণে হারও পবিত্র হয়েছে, এ হার আজীবন আদরে গলায় রাখব। (হার
আনিয়া পুনরায় কণ্ঠে দাব এবং পূর্ববৎ উপবেশন । আমার একি হলো !
আর সহ্য হয় না ! কেন হৃদয়ে আঘাত লাগে ? কেন প্রাণ কান্দিয়া উঠে !
একি জ্বালা ! হায় ! হায় ! কেন চক্ষু— অধোবদনে চিন্তা এবং মেঘমালা
অতি সাবধানে বসন্তকুমারীর পশ্চাদ্ তটতে যাইয়া দুই গুলে চক্ষু আবরণ)
বসন্ত—(চমকিত ভাবে) আর কেন জ্বালাও ছু-খানি পায় ধরি, অবলা বালা,
অস্তরে আব আঘাত দিও না। —নাথ ! আমি বালিকা এ চাতুরীর মন্ত
কি বুঝবো। । মেঘমালা বসন্তকুমারীব চক্ষু ছাড়িয়া সম্মুখে আগমন
বসন্তকুমারীব—বোধ, ক্রোধ, অভিমান, দুঃখ-লজ্জায় অধোবদনে চিন্তা)
মেঘমালা—(নিকটে বসিয়া)

ও মথি কেন কেন অধোবদনে।

কি কথা হল কাবই মনে ॥

ছল ছল দুটি জাঁখ,

ভাবিছ কি বিদুমুখী,

বল, বল, প্রাণসখী ।

কি আছে মনে ॥

(চিবুক ধরিয়া : ও মথি : কেন অধোবদনে, কি হয়েছে ? সহি। তোমার
ছু-খানি পায় ধরি, বল কি হয়েছে । (পায় ধরিতে উত্তত)

বসন্ত—আমার কিছু হয় নাই : আমি তোমার পায় ধরি, তুমি আমার মাথা

খাপ, আমাকে বিরক্ত করো না ।

মেঘ—কি বিরক্ত কলপুম ভাই ? বিরক্তেব মধ্যে একটি সামান্য গান গেয়েছি ।
আর এই কাছে বসে জিজ্ঞাসা করছি কি হয়েছে ? এতেই কি বিরক্ত করা
হলো ?

বসন্ত—(বিরক্তির সহিত) আমি তোমার গান শুনতে ইচ্ছা করি না । কথা
শুনতে ভালবাসি না । • তোমার পায় ধরি তুমি আমাকে ক্ষমা কর—বক্ষা
কর ।

(পূব-বক্ষিণী প্রবেশ এবং রাজকুমারীকে অভিবাদন করিয়া বোডকবে)

পূব-বক্ষিণী—মহাবাজ আপনাকে দেখতে আসছেন ।

বসন্ত—আসছেন ভালই । (রাজা বিজয় সিংহের প্রবেশ ও পূব-বক্ষিণীর প্রস্থান ।
বসন্তকুমারী, মেঘমালা উভয়ে শশবাস্তে উঠিয়া রাজচরণ বন্দন এবং নত-
শিরে দণ্ডায়মান)

রাজা—(বসন্তকুমারীর প্রতি) মা ! আমি তোমার দাসীর মধ্যে শুনলেম, কি
অস্থখ হয়েছে মা ?

বসন্ত—(মৃদুস্বরে) আমার কোন অস্থখ হয় নাই ।

মেঘমালা—(নমন্যবে) অস্থখ হয় নাই কি কথা ? যা কখনও দেখি নাই তাই
দেখছি, একি অস্থখ নয় ?

রাজা—(মেঘমালায় প্রতি চাহিয়া) মা কি দেখেছ ? অস্থখের কি লক্ষণ দেখলে
মা ?

মেঘমালা—আপনি সখী, মুখের ভাব, কথাব আভাষ, চক্ষের চাউনি দেখে কি
বুঝতে পাচ্ছেন না । আমার কথায় বিবক্ত, আমাকে মনের বলি ? একি
দেখতে অনিচ্ছা—ইহাতে কি বলি ? একি মনের বিকাব নয় ? একি
অস্থখের লক্ষণ নয় ? বিপদের আশঙ্কা নয় ?

রাজা—(বসন্তকুমারীর আপাদ-মস্তক দৃষ্টি করিয়া স্নেহ-সহকারে বলিলেন) মা
তুমি আমার সর্বস্ব ভোজ্যপুত্র রাজ-বংশে তুমিই একমাত্র মহি, মা ! যথার্থ
কথা বলো তোমার কি অস্থখ হয়েছে ?

বসন্ত—(মহাবাজের পায় ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে) পিতঃ । আমার কোন অস্থখ
হয় নাই ।

রাজা—কোন অস্থখ হয় নাই, তবে একি মা ? তোমার চক্ষে জল কেন ? তোমার মুখ মলিন কেন ? তোমার সেই একপ্রকার চঞ্চল ভাব, অস্থির-মন কেন মা ? তোমার অভাব কি ? তুমি আমার একমাত্র কণ্ঠা, এ-রাজ্য, ধন, সকলি তোমার । তোমার মনে কোন দুঃখের কারণ না হইলে চক্ষে জল আসবে কেন মা ! আমাব যে একটু সন্দেহ ছিল তা মেঘমালার কথায় আর নাই । মা । তোমার মনের কথা বলো । কোন দাসী কি অণ্ড কেত নোমাকে কিছু বলে থাকে, কি তোমার অবাধ্য হয়ে থাকে, তোমাকে অবজ্ঞা করে থাকে, বল । এখনই তাব সমুচিত শাস্তি বিধান করছি ।

বসন্ত—(কান্দিতে কান্দিতে) পিতঃ ! আমাব কোন অস্থখ হয় নাই । আমাকে কেউ কোন কথা বলে নাই । কোন কথায় অবজ্ঞা কবে নাই । আমার মনেও কোন কষ্ট হয় নাই (ক্রন্দন) !

রাজা—মা ! বৃদ্ধ বয়সে আর আমাব অন্তরে ব্যথা দিও না । মা । তুমি তোমার মনের কথা স্পষ্টভাবে বল । যে প্রকার অস্থখই হয়ে থাকে গোপন করো না । মা । আমি তোমাব পিতা, আমার কাছে মিথ্যা বলিলে মহাপাপ । তুমি অবাধ্য নও, মনেব কথা বল । বৈজ্ঞ, গণক, রাজপুত্রীতে সকলি উপস্থিত আছেন । কোনপ্রকার লোকের অভাব নাই এই মুহূর্তেই তাহা-দিগকে আনিয় তোমার চিকিৎসায় নিযুক্ত করিতেছি ।

বসন্ত—পিতঃ । আমার কোন পীড়া হয় নাই । বৈজ্ঞ, চিকিৎসক, গণকের কোন আবশ্যক নাই । আমাব কোনপ্রকার ঐষধের প্রয়োজন নাই । আমি—(ক্রন্দন)

রাজা—(সজল নয়নে) হা ! এ পুত্রীও আর মঙ্গল নাই । বাজলক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গে সকলি চলিয়া গিয়াছে ; (মেঘমালাকে সঙ্কেতে ডাকিয়া মুহু মুহু স্বরে) বসন্তের হাবভাব দেখে আমার বড়ই সন্দেহ হচ্ছে, উন্মাদের পূর্ব-লক্ষণ ।

মেঘ—আমি ভেবে কিছুই স্থির করতে পাচ্ছি না ।

রাজা—মা তুমি বসন্তের কাছ ছাড়া হয়োনা : আমি মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করে বৈজ্ঞ, জ্যোতিষবিদ, বোজা সংগ্রহ করে এখনি আসছি । সাবধান বসন্তের কাছছাড়া হয়োনা । মা । আমার বসন্তের কেউ নাই । (রাজার প্রস্থান)

মেঘ—সই ! সেধে সেধে গান শুনেছ । কত মাথার ক্লিরে দিয়ে কথা বলি-

য়েছ। আজ আমি মিনতি করে তোমায় শুনাতে চাচ্ছি তুমি শুনবে না!

একি কথা? আর সখী! আমি তোমার বাল্যকালের সখী, আমার কাছে

এত গোপন কেন? কি হয়েছে?—কার জন্তে এত,—

বসন্ত—দেখ ভাতি! আমার মন ভাল নাই তুমি আমায় ক্ষমা করো। কোন-
কথা আমার ভাল বোধ হচ্ছে না।

মেঘ—আর একটি গান কবছি।—

বসন্ত—না সখী। আমি বিনয় করে বলছি। তোমার গানে আমার মন আরো—

(হাসিতে হাসিতে বসন্তকুমারীর দাসীর প্রবেশ)

মেঘ—ওলো! তোব আবাব কি হলো! এত হাসি কেন? হতভাগিনী স্থির হয়ে
কথা বল, কথা নাই বাস্তা নাই শুধুই হাসি। কথাটি কি।

দাসী—(পুনরায় হাসি)

মেঘ—(দাসীর হাত ধরিয়া) খেপি! আবার হাসবি তো মার খাবি। রাজ-
কুমারীও অস্থির, তোর হাসি ধবে না।

দাসী—(হাসিতে হাসিতে) ঐ অস্থিরের জগত তো গণকঠাকুর গণে বলেছে।
রাজদরবারে কি কমলোক জুটেছে? রাজা অস্থির হয়ে গিয়েছিলেন,
মন্ত্রীরা মুখে কথা ছিল না। এখন সকলেই হাসিখুসিতে আছেন।

মেঘ—আরে! ভেঙ্গে বলনা আমিও একটু স্থস্থির হই। সখীকেও স্থস্থির করি।

দাসী—(হাসিতে হাসিতে) না না আমি বলতে পারবো না।

মেঘ—(কৃত্রিম-বোঝে) তোকে বলতেই হবে। বলবি না?

দাসী—কিন্তু কানে কানে অথচ একটু সরে গিয়ে।

(মেঘমালার কানে প্রকাশ এবং হাসিতে হাসিতে বেগে প্রস্থান)

মেঘ—সখী! জ্যোতিষ-শাস্ত্র বড় কঠিন! কোনকথা গোপন রাখবার ক্ষমতা
নাই। সাতপুরু চর্ম-মাংস-অস্থির মাঝের কথা জ্যোতিষে প্রকাশ করে।
ধরা পড়েছো, আর বলব কি? মনের কথা আমাকে বললে না। এখন
রাজসভায় কথা ভাস্কর হচ্ছে।

বসন্ত—(মুদ্রস্থরে) কি কথা সখী? কি কথাও ভাস্কর হচ্ছে বল!

মেঘ—তুমি বললে না! আমি বলব কেন?

বসন্ত—তখনও পায়ে ধবেছি, এখনও পায়ে ধরছি বল ?

মেঘ—তুমি আমার সখী! প্রাণের সখী বলছি। ভেঙেচুরে বলছি কিন্তু একটু বিলম্বে।

বসন্ত—না—না বিলম্ব সহ্য হয় না—এখনি বল !

মেঘ—আব কি “ফুল ফটিল” !

বসন্ত—ও কি কথা ? যাও ! আমি তোমার কোন কথা স্মরণে চাই না। কিসের ফুল ফটিল ?

মেঘ—যে ফুল দু’ডিম্ব ছিল গাছ ফোঁট-ফোঁট হয়েছে শীঘ্রই ফটবে চিন্তা নাই ; ও দিকে আয়োজনের আদেশ হয়েছে।

বসন্ত—তুমি যা ইচ্ছা বলে যাও আমি স্মরণ না।

মেঘ—আব বাকি রাখলে কি ? আচ্ছা আমি চললাম। যা হতেই বসন্তকুমারী মেঘমালাব বস্ত্রধারণ আব পর্বাদার কেন গণকে গুণে বলেছে স্বয়ম্ভব সম্ভাব ঘোষণা দেওয়া সাংস্কৃত হয়েছে এখনও মন ভাল হয় নি—(মেঘমালা যা হতে উদগত বসন্তকুমারী মেঘমালাব বস্ত্র ধরিয় উভয়ে প্রস্থান)

পটক্ষেপণ

চতুর্থ রঙ্গভূমি

পঞ্চমধ্য

(কল-কলস কক্ষে সন্ধ্যা এবং অগ্নিদিক হঠতে বিমলার প্রবেশ)

সন্ধ্যা—দিদি ! ভাল আছিস তো ? আজ যে তারি ফিটফাট ! সেজেগুজে কোথা গিয়েছিলে ? আবাব কি দিন ফিরেছে ?

বিমলা—(হাস্তমুখে) তুই যে অবাক কলিলি। দিনকাল নেই বলে কি সাধ নাই ? দাঁত পড়ে, চুল পাকে কত লোকের, প্রাণ যেমন, তেমনই থাকে। লোকে নিন্দা কববে বলে বুড়িরা ছুঁড়িদের মত সাজগোজ করে না বটে, কিন্তু আশাটুকু সমানই আছে।

সন্ধ্যা—দিদি ! কাঞ্চনের তো কিছু হয় নাই ?

বিমলা—(মস্তক বক্র করিয়া) হয়েছে।

সন্ধ্যা—ক-মাস হলো ?

বিমলা—এই সেদিনে সাধ খেয়েছে।

সরমা—ও মা ! সেদিনের মেয়ে, দেখতে দেখতে ছেলের মা হতে গেল !

বিমলা—এ কালে ছুঁড়ি-বুড়ি কিছুই চেনা যায় না । আব এক কথা শুনেছ ?

সরমা—কি কথা দিদি ?

বিমলা—বলবো কি কিছু, কিছুদিন হলো, শুনেছিলেম যে, যুবরাজ নরেন্দ্রের বিষের
আয়োজন হচ্ছে, মহারাজ স্থানে স্থানে ঘটক পাঠিয়েছেন ।

সরমা—হাঁ, আমিও শুনেছিলেম ! দিদি ! যুবরাজ নরেন্দ্রের মতন আর ছেলে
নাই । রাজারাজ্যের ঘরের ছেলে যে এমন লাড়ুক হয় তা বোন কখনও
শুনিনি । পাড়াপড়সাঁব মেয়েগুলো নজবে পড়লে অমনি মাথাটি হেঁট কবে
চলে যান । এত বড় হয়েছেন, তবু উচু-নজবে কারো পানে চান না ।

বিমলা—সে যাহাঁহোক, আমরা পাড়া-পাড়ার যুবরাজের বিষের কথাই বলাবলি
কবতুম, সকলেই আশা কবে বয়েছি যে যুবরাজের বিষে দেখবো । এব
মধ্যে হঠাৎ একদিন শুনেলুম, মহারাজ আপনিই বিষে করেছেন ।

সরমা—(আশ্চর্য হওয়া অবাক) বলিস কিবে ? (জল-কলস কক্ষ হইতে
নামাইয়া) দিদি ! বলিস কি ?—মাঠবি ? বড়ো বাজার ! বিষে হয়েছে ?

বিমলা—আমি কি মিছে কথা বলছি ?

সরমা—মাগো কোথা যাব ! আমবা তো কিছুই টের পাঠনি । যুবরাজের বিষে
হবে তাই জানি । এব মধ্যে বুড়োব বিষে হয়ে গেল ! দিদি ! তুই যা
বললি যথার্থ ! একালে বুড়োও চেনা যায় না, ছেলেও চেনা যায় না ; কই,
রাজবাড়িতেও তো কোন ধুমধাম হয়নি !

বিমলা—এ কাজটি চুপেচুপে সারা হয়েছে । দুমদামে বিসে করতে অবশ্যই কিছু
লজ্জা হয়, সেও বিবেচনা করেই বোধহয় কারোও জ্ঞানানি ।

সরমা—(মুখভঙ্গী করিয়া) কি লজ্জা ! আরে-আমার লজ্জা ! বিষে কবে ঘরে
আনতে পারলেন, তাতে লজ্জা হলো না, লোক জানলেই লজ্জা হতো ; এ-
কথা গোপন থাকবে কিনা ? হি হি ! মহারাজ বড় অত্যাচার করেছেন ।
এই বয়সে লজ্জার মাথাখেঁষে বরষা সাজলেন কি করে ? চুলে, গৌফে বুন্থি
কলপ দিয়েছিলেন ? হি হি ! বড় লজ্জার কথা !

বিমলা—আরো শোন ! আরো মজা আছে । সেইদিন শুনে নতুন রাজবানী দেখতে
বড় সাধ গেল, তাই আজ দেখতে গিয়ে একেবারে অবাক হয়েছি ।

দেখতে বড় সুন্দরী। এলোচুলে বসে সখীদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, চুলগুলি পিঠের উপর দে পড়ে মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে, সে দিকে তাকাচ্ছেনও না। নাক, কান আব সেই জোড়াভুরুতে মুখখানি চতুর্দিশী টাদের মত দবদব কবছে। ঠিক ভুঝর মাঝখানে একটি ছোট টিপ কেটেছেন থেকে থেকে চাদের আলো ফুটে সেইটি যেন তারার গায় টিপটিপ করছে। চক্ষের ভাবভঙ্গি আর থেকে থেকে মুচকে মুচকে হাসি দেখে আমি একেবারে অজ্ঞান হয়েছি। ঠোট দুখানি জবাফুলের মত লাল, দাঁতগুলি বড় পরি পাটি, কথাও বড় মিষ্টি বয়স অতি অল্প,—এখনও চোন্দ পেরোয়নি। রাজার সঙ্গে ছাইও মানায় নি। যদি যুবরাজের সঙ্গে এই বিবাহটি হতো, তা হলে স্ত্রের সীমা থাকতো না। যেমন বর, ঠিক তেমনি কনে মিলে যেতো।

সরমা—ছি ছি! রাজাকে বিয়ে করতে কে পরামর্শ দিয়েছিল?

বিমলা—রাজার সঙ্গে সঙ্গে যে একটা পাগলা গোছেব বামন থাকে, সেই নাকি এর ঘটক।

সরমা—তার কি? সে পেটপুরে যেতে পেলই বড় খুশী। বাজার ভো চোখ ছিল?

বিমলা—চোখ থাকলে কি হবে? মন যে এখনও হামাগুড়ি দেয়; তা তো আগেই বলেছি।

সরমা—দিদি! রাজার বিয়ে করতে যদি এত সাধই হয়েছিল, কিছুদিন খুঁজে একটি বড়মেয়ে দেখে কেন বিয়ে কললেন না? এ বিয়ে তাঁর মনস্তাপের কারণ হবে। বুড়ো বয়সে অমন মেয়েকে বশে রাখা বড় ছোটকথা নয়। শত শত জায়গায় দেখতে পাচ্ছি, বয়সের মিল না হলে কোনকালেই মনের মিল হয় না। তুমি দেখো! রাজা আমাদের নতুন বোয়ের মন যোগাতে যোগাতে একেবারে নাজেহাল হবেন। তবুও তার মন উঠবে না। রাজাই হন, আর প্রজাই হন, যুবতী নারী ঘরে পুরে মুখফুটে বলতে পারবেন না যে, আমার স্ত্রী আমাকে বড় ভালবাসে। যিনি একথা বলেন, তিনি পাগল।

বিমলা—সত্যি কথা, বুড়ো বয়সে কখনই সোমন্ত মেয়ের ভালবাসা পাওয়া যায় না। বুড়োরা কত করে মন যোগায়, তাতে কি সে ভোলে? শুধু কথায় কি হয়! পোড়া কপাল! কথা বলতেও থুথু পড়ে। **

(দুই যুবরাজ নবোদিত ও শবৎকুমারের প্রবেশ)

সরমা—চুপ কব দিদি ! চুপ কব ! ঐ যুবরাজ আসছেন । মন্ত্রীপুত্র শবৎকুমারও সঙ্গে আছেন । আমরা যে সকল কথা বলাবলি করবেছি, বোধহয় আড়াল থেকে শুধা সকলই শুনেতে পেয়েছেন ।

বিমলা—(পশ্চাৎদিকে দৃষ্টি করিয়া জিহ্বা দংশন এবং ঘোমটা দিয়ে বেগে প্রশ্নান, সরমা ও জল-কলস লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন)

শবৎ—যুবরাজ ! শুনলেন তো । পাড়ার মেয়ে দুটি কি বলে গেল । শুধু আমিই যে বলি, তা নয়, মেয়েবাও মহারাজকে ধিক্কার দিচ্ছে । বাজ্যের অপর-সাধারণ সকলেই মহারাজের নিন্দা করছে ।

নরেন্দ্র—মিত্র ! গুপ্তজনের কথায় কথা কণ্ঠে আমাদের ভাল দেখায় না, পিতা অবস্থায় অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করেই পুনরায় দাব্যপরিগ্রহ করেছেন ।

সামান্তলোকে তাব ভাবটা কী বুঝবে ? আব আমরাই বা কি বুঝতে পারি ?

শবৎ—না—না—আমি যে কেবল বিবাহের জন্মেই বলছি তা নয় । দেখুন !

অমাত্যগণ, সভাসদগণ, প্রজাগণ, সকলেই মহারাজের প্রতি অসন্তুষ্ট, মহারাজ মাসাবধি রাজকাণ্ড একেবারে পবিত্রাগ করছেন । প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তো সাক্ষাৎ পয়াস্ত হয় না । সিংহাসন শূন্য থাকলে যে বাজ্যের কি দশা ঘটে, তা বুঝতেই পাচ্ছেন, দুর্জনেরা নিরীহ প্রজাগণের প্রতি দৌরাভ্যা করে তাদের সর্বস্বান্ত করছে । কক্ষচারীরা খোলা মহল পেয়ে, দেদার লুট আরম্ভ করছে । প্রভুত্ব প্রকাশ করতে কেহই ত্রুটি করছে না । প্রজাগণ কাতব হয়ে, বিচারের প্রার্থনায় রাজবাটিতে প্রত্যাহই আসছে ; সমস্তদিন অনাহারে থেকে স্নানমুখে সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরে যাচ্ছে । বিশেষ অল্পসঙ্কানে জেনেছি, বিপক্ষ রাজারা যুদ্ধসজ্জার উপক্রম করছেন । 'রাজা সর্বদাই অন্তঃপুরে নববিবাহিতা বাণীর মন্দিরে থাকেন, রাজকাণ্ডে মনযোগ নাই ; দেশে দেশে এই ঘোষণা হয়েছে । অত্যাচারী রাজারা মহারাজের রহস্য নিয়েই আমোদ করছেন ।

নরেন্দ্র—মিত্র ! এতদূর হয়েছে ? —আমি এর কিছুই শুনেতে পাইনি । শুনবোই বা কি করে ? আমি তো প্রায় মাসাবধি রাজধানীতে ছিলাম না ।

শবৎ—বড়ই অত্যাচার হয়েছে ।

নবরঙ্গ—প্রধানমন্ত্রী'ব কেন এ সকল বিষয় বাজাকে জানান না ?

শব্দ—মহারাজ সর্বদাই অন্তঃপুরে থাকেন, তাঁর নিকটে যেতে কা'ব' অসম্ভব নাই।

নবরঙ্গ—তবেই তো বিভ্রাট। (কয়েকজন প্রজাব প্রবেশ)

প্রথম প্রজা—বলি ও বেয়াই ! বাজাবেটা বুড়োকালে বিষয় করে একে দাবে যাচ্ছে-
তা'ই হয়ে গেছে। দাতদিন অন্তঃপুরেই থাকে, আর কানন আসবে, প্রত্য-
হই আসছি যাচ্ছি, একদিনও কেবো'য় না, না বিচার কববে কি ? যেতে
আসনে পায়ের মলা ছিড়ে গেল। প্রতাহ দিনেববেলা না খেয়ে থাকতে
হয়, আর বাচি না। বেটা উচ্ছে যাক, এমন মাগী-পাগলা বাজাব বাজো
কি থাকতে আছে ? সে মা'ত' ময়েমা'ত'বের গোলাম সে কি মা'ত' ?

দ্বিতীয় প্রজা—ওহে ! তুমি বুঝতে পাবো নি, রাজা কি মা'দে ও ব'স' হয়েছেন ?
রাজা বুড়ো, বাগী কঁটা, একেবাবে ভেড়া বা'নিসে দিয়েছে, কাজেই পাগল
হয়েছেন। বুড়ো ব'স'ে ব'সে কললে সকলো'ই 'দ'ব' ছা' 'দ'মি'ও তো
কিছু কিছু বোঝ ?

প্রথম প্রজা—এতনা ?

দ্বিতীয় প্রজা—বডলোকে আর ছোটলোকে অনেক ভা'ব' !

প্রথম প্রজা—যাবে তাই খাম আমবা বাজাব মত পাগল নই। সোনার চাদ ছেলে
থাকবে নিজে বিষ কবে বসলো। পাগলেও এমন কবে না। বডমা'ত'বের
দো'ব' নাই, আমাদের ডো'ব'লো'কে'ব' ঘবে হলে ঢাকচোলে কা'টি বাজতো !

দ্বিতীয় প্রজা—ঐ ভুলেই তো বলছি, বডলোকে যা কবে, তাই শোভা পায়।
(বাজপত্ৰকে দেখিয়া) বেয়াই ! এইবাবেই গেছি ; আমবা যা যা বলেছি
সকলই বাজার ছেলে শুনেতে পেয়েছে। (সভয়ে কম্পিত কলেবরে সকলের
প্রণাম)

নবরঙ্গ—বাপুসকল ! তোমরা কোথা গিয়েছিলে ?

প্রথম প্রজা—কর্তা ! আমরা বাজার-দববারে নালিশ করেছি, কা'ব'ও এক মাস,
কা'ব'ও দু'মাস যায়, তবুও বিচার হয় না। শুনেতে পাই যে' তিনি অন্দরে
আছেন। বোজ রোজ হাঁটাইটি করে আমরা সারা হলেম। সারাদিন
না খেয়ে এই সজ্জার সময় বাড়ি ফিরে যাচ্ছি, আমাদের দুঃখের সীমা
নাই। আপনি রাজা হলে আমরা বাঁচি।

নরেন্দ্র—বাপুসকল ! (হস্ত বন্দ্য হইয়া) আমি এই কায়কটি ঢাকা দিচ্ছি, তোমরা
জল খাওগে !

প্রজা—(হস্ত বন্দ্য হইয়া) টাকার গ্রহণ) যুবরাজের জয় হউক—যুবরাজের জয়
হউক !

(যুবরাজ নবেঙ্গকুমার ও শবৎকুমারের প্রস্থান । এবং প্রজাগণ প্রত্যেকে
আপন আপন ঢাকা কাপড়ে বান্ধিতে বান্ধিতে গান)

এমন বিচাবক রাজ্যের রাজ্যে মরি অবিচাবে ।

আমাদের ভাই সাধা নাহি,

আমরা বাজার কাড়ে যাই,

বলি সব মনের কথা তুটি পাশ ধবে ॥

বিড়াল, কুকুর, শৃগাল মাত, বপে প্রাণ এসব কত,

জোবে ধবে নিশে কার সন্ধানীশ কবে ॥

আমাদের বক্ষা তেতু, আছে যত ধুমকেতু

মন যোগালে মনের মত পোষে তাবা সকলি পারে ।

যাব যা ইচ্ছা সে তাই কবে,

ওবে ! রাজা থাকতে প্রজা মবে, হায় ! হায় !

এ দুঃখের কথা আমরা বলি কালে ॥

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম রক্তভূমি

চন্দ্রপুৰ ; রেবতীর শয়ন-মন্দির

(রেবতী ও মালতী আমোদ)

রেবতী—(হস্তে দর্পণ লইয়া) মালতী ! দেখ দেখি, আজ কেমন বেশ করেছি ।

ভাল হয় নি ?

মালতী—বেশ হয়েছে ! রাজা একেই পাগল হয়েছেন, আবার এই নূতন সাজ-
গোজ দেখলে ঘর থেকে আর নড়বেন না । বাছা ! তুমি আচ্ছা মেয়ে
জন্মেছিলে । রাজা বীরেন্দ্রের নাম শুনে ভয়ে মাটি কঁপে উঠে,
সে বীরকে একেবারে নাটি করে ফেলেছ । সাবাস মেয়ে জন্মেছিলে !

বেবতী—(দর্পণ ফেলিয়া) রাজা আমায় দেখে একেবারে ভুলে গেছেন, কিন্তু আমায় ভুলতে পারেন নি। তিনি আমায় না দেখে এক নিমিষ স্থির থাকতে পারেন না, কিন্তু আমার তা নয়, সে মুখ নজবে পড়লেই যেন গায়ে ঝেঁটার-বাড়ি পড়ে। মন ঘাবে ভালবাসে না, চোখ নাবে ভালবাসবে কেন? এ তো আমারি চোখ।

মালতী—এদিকে তো বড় মিল দেখা যায়।

বেবতী—তুই যেমন মিল দেখতে পাস, কিসেব মিল? হেসে হেসে দুটো মিস্ট-কথা বলি, তাতেই কি মিল হলো? মুখে মিল থাকলে কি হয়, মনে যে মেলে না।

মালতী—মিল করতে কতক্ষণ লাগে? কললেই পাবে!

বেবতী—পোড়া কপালি! তুই কিছুই বুঝিস নে, মিল কি কথায় হয়? মনে মনে মিললেই তবে মিল হয়। বলতে হাসিও আসে, কান্নাও পায়, তার সঙ্গে আমার মনোবিল কেন হবে? তাব যৌবন-অবস্থা মধ্যম-অবস্থা গিয়ে এখন শেষ অবস্থারও শেষে ঠেকেছে; আমার অবস্থা, তো দেখতেই পাচ্ছ। এতে মনের মিল হবে কেন? আমিই বা তাকে ভালবাসবো কেন? মণিমুক্তা আর ভাল ভাল গয়না, ভাল ভাল কাপড় দিলেই যে ভালবাসা হয়, তা নয়, ভালবাসার অঙ্গ অনেক। তবে মা বাপে জীব করে ধরে রাজ্যরাণী করে দিয়েছেন, ভেবেছেন আমি স্বামী হলে তাঁরা স্বখে থাকবেন, তাঁরা ভাগ্যবন্ত হবেন, রাজার কুটুম বলে সমাজে আদর পাবেন, বাবা মহারাজের শ্বশুর, নিজ-ক্ষমতাতেই উচ্চাসনে বসে চারপাশে নজর করবেন, মনে ভাববেন যে, সকলেই আমাকে নজর করে। মা তো একেবারে আফ্লাদে আটখানা হয়েছেন, বাজার শান্তড়ী হয়েছি, আমার ভাবনা কি? সকলেই স্বখের ভাগী হলেন, হত-ভাগিনীই কেবল চিবড়-খিনী হলো! (দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) মালতী! আমি যে যাতনা ভোগ করছি, তা সেই ভগবানই জানেন? অদৃষ্টে বিধাতা যাহা লিখেছিলেন তাই হয়েছে, তা বলে আর দুঃখ কললে কি হবে?

মালতী—রাজমহিষী! আর দুঃখ করো না! কেবল আপনাই যে গুরুত্ব

হয়েছে, তাও নয়, অনেকেরি এই দশা ?

বেবতী—না—না—আমাব মত হতভাগিনী আর কেউ নাই। আমি যেমন জন্মিছি, শত্রুও যেন এমন না জন্মে।

মালতী—তা যাই বল, রাজা কিন্তু তোমায় বড় ভালবাসেন, প্রাণের সঙ্গে ভালবাসেন। শুনেছিলাম, যুবরাজকে এক মুহূর্তও চক্ষের আঁড়াল করতেন না, তোমায় বিয়ে করে অবধি তাঁকে মনেও করেন না, একটিনাও নামও করেন না।

বেবতী—(বাস্তবের চতুর্দিক অবলোকন করিয়া) মালতী ! ভালকথা মনে করেছিলি। নবেন্দ্রকে যেকথা বলতে বলেছিলুম, বলছিলি তো ?

মালতী—তুমি যে কথা বলতে বলেছিলে, আমি তাব দর্শণ বাড়িয়ে বলেছি, তিনি শুনে হুটি চক্ষু পাকল করে আমার পানে চেয়ে রইলেন। আমি সেই ভাব, ভক্তি দেখেই পালিয়ে প্রাণরক্ষা কললেম। মাগো ! ও আমাব কাজ নয়।

বেবতী—(চক্ষু হঠাৎ জল পতন) এখন চক্ষে জল পড়ছে, যখন যুবরাজকে একদৃষ্টে দেখেছিলি, তখন আগপাছ ছিল না। মালতী ! যুবরাজকে সেই অবধি দেখে আহারনিদ্রা কিছুতেই স্থখ নাই। সন্ধ্যাটী যেন সেই কথা মনে পড়ে : তুই আজ আবাব যা, আমার এই যেন সেই কথা মনে পড়ে তুই আজ আবাব যা, আমার এই সব দুঃখের কথা ভাল কবে বোলগে ?

মালতী—না—না আমি আর যেতে পারবো না। আমাব ওসব কথা বোলো না। বাজকুমারের চোখ দেখলেই ভয়ে আমাব গা কাঁপতে থাকে। আমি কি আর তাঁব কাছে যাই ? গেলেই বা কি হবে ? তিনি তোমাব নামও শুনেতে পারেন না।

বেবতী—(দুঃখিত স্বরে) আমিই যেন তারে দেখে একেবারে পাগল হয়েছি, তিনি তো আমায় দেখেন নি, চার চোখ একত্র হলে তবে বোঝা যাবে। মনের কি ভাব, তাও জানা যাবে। হায় ! পিতামাতার বধার্থই চক্ষু ছিল না। বাজাকে চোখে দেখতে পেলেন, আর যুবরাজকে চোখে দেখতে পেলেন না। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) যুবরাজ ! তুমিই আমার হয়েছিলে। যুবরাজ ! তুমিই আমার—

(বাজার প্রবেশ)

বেবতী—(ত্রস্তভাবে চক্ষের জল মুছিয়া হাস্তমুখে) এই যেতে যেতেই যে ফিরেছেন ?

বীবেন্দ্র—কেন ?

বেবতী—আবার কেন ? মাসান্তরে যদি বা দরবাবে গিয়েছিলেন, মুহূর্তকাল অতীত না হতেই আবার এলেন ?

বীবেন্দ্র—প্রিয়ে ! কেন যে এলেম,—শেষে বলবো ! আজ যে চমৎকার রূপ দেখতে পাচ্ছি ? আজ অমানিশা, আকাশে চন্দ্র নাই, কিন্তু আমার গৃহে একেবারে অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রের উদয় ! আমি যথার্থই আজ তোমায় যেন পূর্ণ-চন্দ্র দেখছি ! বেশ মানিয়েছে !

বেবতী—মানিয়েছে, ভাল হয়েছে । তোমায় আর সটাক করতে হবে না ! আমি একটা মাস্ক, আমার আবার মানিয়েছে, ওদর পুবনো কথা ভাল লাগে না, যেতে যেতে ফিরে এলে কেন, তাই বলে !

বীবেন্দ্র—তুমি কি পাগল হয়েছে ? দেখ কি কখনো আত্মা ছেড়ে থাকতে পারে ? না ছায়াই কখনও কাব্যব অন্তর হতে পারে ? অলি কি কখন নবকলি ফেলে থাকতে পারে ? দেখ প্রিয়ে ! চকোর কি করে স্বধাকরের পূর্ণ কলেবর হবে স্বধাপানে বঞ্চিত থাকবে ? তুমি স্ত্রীনেও আজ ভুলছো ! আর কেই বা না জানে যে বাবি বিহনে যেমন মীন বাঁচে না, তেমনি তোমা বিহনে আমি বাঁচি না ! আর এও কি কখনও হয় যে, সর্বস্ব-ধন বেবতী, বীবেন্দ্র তাবে নয়নের অন্তরাল করে দরবাবে বসে থাকবে ?

বেবতী—যাও যাও, আব বাড়িও না, মাথা খাও, আর জালিও না ! (মূহু হাস্তে)
ও মুখে অত ভাল লাগে না । মিনতি কবে বলছি, দরবাবে যাও ।

বীবেন্দ্র—আজ আবার দরবার ? যে দরবার পেয়েছি, এব কাছে আবার দরবার ?

বেবতী—তুমি যাই কেন বল না, দেশভ্রম লোক আমাবই নিন্দা করে । তা'বা এই কথা বলে, রাজা নতুন রাণীব কাছে একেবারে চাকরের মতন বয়েছেন রাণী যা বলেন, তাই করেন । ক্ষণকালও রাণীকে ছেড়ে থাকতে পারেন না । রাজকাৰ্য্য নাই, কারো সঙ্গে আলাপ নাই, দেখা নাই, দিবারাত্রি অন্তঃপুরেই রাণীর চরণ সেবা কচ্ছেন ! ছি ছি ! বড় লজ্জার কথা ।

বৌরেন্দ্র—এতে আবার তোমার লজ্জা কি ? এ লজ্জা একপ্রকার আমাকেই অর্শে ।

যাহোক, তাতেই বা ক্ষতি কি ? এমন রূপবতী সতী যার ঘরে, তার চিন্তা কি ? ছাই রাজ্য থাক বা যাক তাতেই বা ক্ষতি কি ? তাদের কি চক্ষু নাই, তাদের কি কর্ণ নাই,—কখন কাৰ মুখে শুনেও নাই যে, তৃতীয়াব চন্দ্র তার ললাটের সমতুল হতে পাবেনা । আর অনেকেই বলে থাকে যে, স্ত্রী জাতির ক্র-ভঙ্গী দেখেই ইন্দ্রধনুঃ গগনাত্মক বাদেছে, তা আমিও স্বীকার করি । এখনও যে, বৃষ্টিজলে সৃষিকরণ পড়লেই স্তম্ভময় ইন্দ্রধনুঃ দেখা পাওয়া যায়, সেটিও যথার্থ । কিন্তু বিনা ঘোষে বিনা সঙ্গীত তৃতীয়াব চন্দ্রকিরণে একেবারে যে যুগল-বামধনু সৰ্বদা বিবাজ কচ্ছে, তা কি তাবা শুনেও নাই ? (বেবতীর নয়নের নিকট হস্ত লইয়া) এই নানের ঈর্ষাতে কুবঙ্গিনী যে বনবাসিনী হযেছে, তা কে না জানে ? এই দন্তের আভা হেবে যে দামিনী অতিমানিনী হতে কাদস্থিনীৰ আশ্রয় লযেছে, তবু তোমাব যুগ্মগামিতে দন্তরাজি ক্ষণে ক্ষণে হেবে সময় সময় ক্ষণপ্রভা কণে দেখা দিচ্ছে, দেখা দিয়েও তো স্থির নাই । তাবা যাউ কেন বলুক না, আমি এ মুখে এ নামাব তুলনা তিলকলেব সঙ্গে দিব না —হা ! সকলেই কি অন্ধ হযেছে ? যার চিকুরেব শোভা দেবে কাদস্থিনী ভাবে যে, কোথাও পালাবে, তারই স্থান উদ্দেশ্যে একবার পূৰ্বে, একবার উত্তরে, একবার পশ্চিমে, শেষে নিকপায় বৃষ্টিজলে আনন্দ শিলাজলে অঙ্গ-বিসৰ্জন করছে ; যথার্থই তাবা অন্ধ । যার কটির শোভায় বসুবাজ গরি মানভয়ে কোনস্থানে আশ্রয়হান না পেয়ে শেষে যে পদেৰ অংশ্রম মিলে কাহারও ভয় থাকে না, একেবারে সেই অভয়াৰ পদাশ্রয় গ্রহন করছে । আমার গৃহে এ রূপ রূপ-মারুরা বমণী থাকতে কি প্রকারে তার চক্ষের আড়াল হতে পারি ? ক্ষণকাল আমার নয়নের অন্তর-হলে চতুর্দিকে যেন অন্ধকার বোধহয় ! কাজেই প্রিয়ে । তোমায় সম্মুখে তোমারি ঐ লোহিতবর্ণ গুঠ দুখানির প্রতি চেয়ে থাকি । পূৰ্বে নরেন্দ্র ক্ষণকাল চক্ষের আড়াল হলে যেমন কষ্ট বোধ হতো, তুমি চক্ষের আড়াল, হলে, তার চেয়ে এখন শতগুণ কষ্ট বোধহয় ।

বেবতী—(অবগুণ্ঠন খুলিয়া) নাথ ! তোমার বিবেচনা নাই । দেখ দেখি ! আমি তোমায় কদিন বলছি যে, যুবরাজ নরেন্দ্রকুমারের মূখখানি দেখতে বড়ই

সাধ গেছে। আমার গর্ভজাতই না হলো, আপনার সন্তান তো, তা মহাবাজ! আমাকেও আপনার মত দেখতে হয়। একটিবার কি দেখা দিতে নাই? আমারও সাধ আছে তো?

বীরেন্দ্র—প্রিয়ে! তুমি নরেন্দ্রকে দেখবে, তাতে আমার অস্বস্তি কি? তার মা নাই, তুমি আপন পুত্রের জায় স্নেহ কব, তাহলে নরেন্দ্রও তোমায় যথেষ্ট ভক্তি করবে, দেশপুত্র নোকেও তোমার স্তখ্যাতি কববে। সকলের মনে বিশ্বাস আছে যে, নারীজাতি স্বপত্নী-পুত্রের পবন শত্রু, তাকে একেবারে চক্ষুশূল-জ্ঞান করে, তুমি যদি নরেন্দ্রের প্রতি জননী গাণ ব্যবহাব কর, তা হলে লোকের মনে কোন সন্দেহ থাকবে না।

বেবতী—মহাবাজ! আমি বুঝি। —ছেলেবেলা থেকে অনেক বই পড়েছি, তাতে হিতকথাও অনেক দেখেছি, যে যেমন পাত্র, তাতে কেমনি আদব করতেও শিখেছি। আপনার পুত্র তো, আমার গর্ভেই না হলো, তাইতে কি আমি তাব স্নেহ করবো না, ভালবাসবো না? —কেমন কথা বলছেন?

রাজা—(বাস্তব হইয়া) না—না—আমি তোমায় বলছি না, তবের যুগ-যুগান্তরে এইরূপ হয়।

বেবতী—মহাবাজ! আপনি একবার যুবরাজকে অস্ত্রপুবে ডেকে পান।

রাজা—কিন্তু এখানে প্রতিহাবী তে' কেউ নাই।

বেবতী—মালতীই আজ আপনার প্রতিহাবী।

রাজা—আচ্ছা, মালতী! নরেন্দ্রকে একবার ডাক তো? (মালতীর প্রস্থান)

বেবতী—মহাবাজ দেখুন! এখনও একটু বেলা আছে, কিন্তু বোধ নাই। সময়টি অতি মনোহব, বসন্তকালের এই সময়টি সকলের পক্ষেই মনোহব, এই সময় একবার প্রমোদবনে গেলে হয় না?

রাজা—না প্রিয়ে! নরেন্দ্রকে আসতে বলা হলো, হয়তো এখনই আসবেন, এখন আব প্রমোদউদ্যানে গিয়ে কাজ নাই। চল, প্রদোষগৃহে গিয়ে বস। যাক। (উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

ষষ্ঠ বঙ্গভূমি

(নরেন্দ্রকুমারের বিশ্রামগৃহ—যুবরাজ ও শরৎকুমার আসীন)

নরেন্দ্র—(সংস্কৃত কাদম্বরী হস্তে অলম্বনস্ব)

শবৎ—পড় ! —তাবপব কি হলো ?

নরেন্দ্র—(সমভাবে অলম্বনস্ব)

শবৎ—কি যুববাজ ! হঠাৎ এমন হলে যে ? এখানে এমন কি কথা আছে ?

নরেন্দ্র—(সচকিতে) কথা এমন কিছুই নাই, তবে এইটি ভাবছি, সংস্কৃত কবি-
দের কতদূর ক্ষমতা !

শবৎ—না,—শুধু তা নয়, তুমি হঠাৎ ভাবছেন না,—ভিতরে কিছু কথা আছে ।

কবির ক্ষমতা আর মনের ক্ষমতা কে কেমন করে ভাবে, তা লক্ষ্য দেখে
স্পষ্টই জানা যায় । তুমি আমার কাছে গোপন করো না, আমি কতক
বুঝতেও পেয়েছি । কাদম্বরীর বিবাহের আর চন্দ্রপীড়ের সেই লজ্জা,—
কেমন এই নয় ?

নরেন্দ্র—হাঁ । এক বকমই বটে, বলছি যে, সংস্কৃত কবিদের কি আশ্চর্য ক্ষমতা !

দেখ ! কাদম্বরীর এখন যে অবস্থা, তা দেখ, যে কিছুই জানে না, সে ব্যক্তিও
বাজপুত্র চন্দ্রপীড়ের স্মরণশীল অবস্থায় বুঝতে পাচ্ছে । কবিও এমন কোশল,
লজ্জায় মুখফুটে কাউকে কিছু বলতে দিচ্ছেন না । কাদম্বরী এখানে নাই,
চন্দ্রপীড় এখানে নাই,—সে লতামণ্ডপে নাই,—তাব ছবিও নাই,—তবু
খচনাকোশলে সকলেই যেন ঠিক চক্ষের উপর বিবাজ্য করছে । আহা !
গন্ধর্বকুমারী কাদম্বরী কি লজ্জাশীল ।

শবৎ—এই এতক্ষণের পব ঠিক হলো । আচ্ছা বলুন দেখি, যদি কোন কুলবালী

ঠিক অমনি কবে আপনার কাছে প্রণয়ভাব জ্ঞানায়, আর মুখে কিছু না বলে
তাহলে আপনি কি কবেন ? একথা কি বলতে পারেন যে, প্রেয়সী ! তুমি
আমার প্রতি বড় অনুরাগিনী, আমি তোমার প্রতি বড় অনুরক্ত এখনই
আমায় বিয়ে কর ! একথা কি বলতে পারেন ? আর সেই কামিণীই কি
পারে ?

নরেন্দ্র—বয়স ! এই তোমার রহস্য করবার সময় ? (দীর্ঘনিঃশ্বাস)

শবৎ—রহস্য ক'ছি না । মহাকবি বাণভট্ট ষথার্থ প্রণয়ের লক্ষ্য কাদম্বরীর ঐ স্থানে
বর্ণন করেছেন কেন, অঙ্কুর দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন । স্বভাব যেন চক্ষের
উপর নৃত্য করছে । এই আপনিই তো বললেন, কাদম্বরী নাই, চন্দ্রপীড়

নাই, লতাম গুপ্ নাই, অথচ যেন সকলই চক্ষের উপর দেখতে পাচ্ছি।

কবিদের ঐ তো প্রশংসা।

নবেন্দ্র—(পুস্তকখানি বন্ধ করিয়া তিব্বনেত্রে দীর্ঘনিঃশ্বাস)

শবৎ—আবার কি ভাবছেন, যুবরাজ? বঝেছি আপনার মন অস্থির হয়েছে।

আচ্ছা, ও সকল কথাই আন্দোলন ছেড়ে দিন! এখন একটি গান গান।

নবেন্দ্র—নূতন বকম আমোদ হলে এনব কথা চাক পড়ে বটে, কিন্তু আমার তে:

ভাই সে-অভ্যাস নাই। তুমিই একটি গাও।

শবৎ—আচ্ছা, তবে গাও।

বাঁগীয়া-গায়ক :—তাল একতাল।

বমণী বতনে, বিধি সম্মতনে,

নিবন্ধনে পড়িয়াছে

‘হাঠি যত মনি, হয়ে অভিমানী,

মানব গুণমানে এত বাঁড়িয়াছে।

মুনি, ঋষি বাক যে শিবসাধনে,

তিনিও আশ্রিত বমণীচরণে,

ব্রজে কেলোসোণা, নিকুঞ্জকাননে,

বমণীপ পায়ে পড়িয়াছে।

ধিকবে শবৎ, বিষ্কার জীবন,

এহেন বতনে কব অযতন,

সাধনের ধন, সংসার রতন,

সোযাতী জীবনবথে চড়িয়াছে ॥

নবেন্দ্র—না বয়স! আজ কিছুই ভাল লাগছে না।

শবৎ—(তানপুরা বাজিয়া) তবে অত্র আলাপ করা যাক। ভালকথা মনে হলো।

মহারাজ যে আপনার বিবাহের জন্ত স্থানে স্থানে ঘটক পাঠিয়েছিলেন, তার কি হলো?

নবেন্দ্র—ঘটক পাঠিয়েছেন এইমাত্র জানি, কি হয়েছে কিছুই জানি না।

শবৎ—যতদিন আপনার বিবাহ না হচ্ছে, ততদিন কিন্তু রাজকাণ্ডের শৃঙ্খলা হচ্ছে না।

নরেন্দ্র—বিলক্ষণ ! আমার বিবাহ হলে বাজার শুজলা কি হবে ?

শরৎ—(সভয়ে) তার মানে আছে । আগে মহারাজ আপনার বিবাহ না দিয়ে বাজার অভিযুক্ত করবেন না । জ্বালাভ না হলে বাজারলাভ হবেন । আপনি বাজার হলে সকলদিকেই মঙ্গল হয় । প্রজাবাও সুখী হবে, আমিবাও মনের আমোদে থাকবো ।

নরেন্দ্র—সখে ! বাজার শুজলা কবো সহজ ব্যাপার নয় । বিবাহটিও কম কথা নয় । লোকে লৌহশঙ্কল ভগ্ন কবতে পারে, কিন্তু প্রণয়শঙ্কল ভগ্ন কবো নিতান্ত অসাধ্য । শাকী জ্বালা শাও বহু বলে, বহু সাগর ছেঁচে তুলতে হয়, তুলে আবার বেড়ে নিতে হয় । সে কাবনের সঙ্গিনী, স্থখ-দুঃখেব ভাগিনী, প্রথমেই তার গুণাগুণ পরীক্ষা কবো উচিত । নারী অতি অভিমানী । যেমনই কেন হোকনা, আমি বড় সন্দেহী, আমার মত কেউ নাই, এইটি নারী-জাতিব স্বভাবসিদ্ধ গৰ্ব্ব । সে গৰ্ব্ব নাই, এমন জীবন্ত যদি মিলে, তবে বিবাহে স্থখ আছে । নইলে নয় ।

শরৎ—এত খঁজতে হলে আর বিবাহ হয় না । এও কি কোন কাজের কথা ?

নরেন্দ্র—সখে ! তুমি যাও বল, অমন গুণবতী বমণী যদি হয় তবে তার পানিগ্রহণ কবো, নচেৎ যেভাবে আছি, চিবজীবন সেইভাবেই থাকবো ।

শরৎ—তবে আর বিবাহই কববেন না ?

নরেন্দ্র—কেন করবোনা ? উপযুক্ত পাত্রী পেলেই বিবাহ কবো । সখে ! তোমাকে তাও বলি, তুমিও শুনেছ, বাজার বিজ্ঞ সিংহেব কণ্ঠ্য বসন্তকুমারী বমণী-কলের ঈশ্বরী । অবলাজাতিব স্বতন্ত্র থাকা আবশ্যক, বিধাতা সে সকলই বসন্তকুমারীকে অর্পণ কবেছেন । তাঁর পানিগ্রহণ কবাই আমার নিতান্ত বাসনা । এইটি আমার মনের কথা । (মালতীর প্রবেশ)

মালতী—(করযোড়ে) যুবরাজ ! মহারাজ আপনারে ডাকছেন ।

নরেন্দ্র—(সরোষ নয়নে) রাজা কোথায় ?

মালতী—মহারাজ অন্তঃপুরেই আছেন ।

নরেন্দ্র—আচ্ছা ! তুমি যাও, আমি যাচ্ছি । [মালতীর প্রস্থান]

(স্বগত) রাজা আজ আমার হঠাৎ অন্তঃপুরে ডাকলেন কেন ? (শরৎ-কুমারের প্রতি) সখে ! মহারাজ যখন আমারে যে আজ্ঞা করে থাকেন,

সে তো সভার মধ্যেই প্রকাশ করেন। জননীৰ মৃত্যু অবধি স্নান অস্ত্রপূৰ্বে
ডাকেন না, আজ হঠাৎ কেন ডাকলেন ?

শরৎ—পিতা ডেকেছেন তাতে আর কেন ডাকলেন, কি বুঝাস্ত, তার তর্কবিতর্ক
কেন ? বোধহয় কোন আবশ্যক আছে।

নরেন্দ্র—তবে তুমি এখন বিদায় হও, আমি অস্ত্রপূৰ্ণ থেকে একবার আসি।

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় রক্তভূমি

বাজাপ্রদোষগৃহ

(বীরেন্দ্র, নরেন্দ্র, বেবতী ও মালতী হাসান)

রাজা—বৎস ! এতক্ষণ পর্যন্ত যে সব কথা বললেম, তাতে কখনই উপেক্ষা
করনা। তুমি বিবিধ শাস্ত্রে সুশিক্ষিত হয়েছ, তোমায় আর কি উপদেশ
দিব, চতুর্দিকে তোমার যশোখ্যাতি-ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। অপরের
মুখে তোমার সুখ্যাতি শ্রবণ কবে আশ্রাদে আমার চিত্ত নৃত্য করচে।
রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র যেমন বংশ উজ্জ্বল করেছিলেন, তেমনি তুমি আমার
কুলতিলক। তিনি যেমন কৈকেয়ীর আজ্ঞা প্রতিপালন করে জগতে চিব-
স্বরণীয় হয়েছেন। বাপু ! তুমিও তোমার বিমাতার আদেশ প্রতিপালন
করে ভূমণ্ডলে সেইকপ কীর্তি স্থাপন কর। মধ্যে মধ্যে অস্ত্রপূৰ্ণ এসে
বাণীকে মা বলে সম্বোধন করে তাঁর আজ্ঞা প্রতিপালন কর, সন্তানের
কর্তব্য-কাষে যেন কোন অংশে ত্রুটি না হয়।

বেবতী—মহারাজ ! আমি বিমাতা বটে, কিন্তু আমার মন তেমন নয়। ভগবান
আমায়—কবেছেন, কাজেই নরেন্দ্রের মুখপানে চেয়ে থাকতে হয়। মহা-
রাজ ! যুবরাজ আমায় ভালবাসুন আর না বাসুন, আমি তাঁকে আপনার
প্রাণের চেয়েও ভালবাসি।

মালতী—(করষোড়ে) মহারাজ ! মন্ত্রী বৈশম্পায়ন কতকগুলি কাগজপত্র নিয়ে
দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন।

বীরেন্দ্র—কি আপদ ! যদি ক্ষণকাল অস্ত্রপূৰ্ণ এসেছি, এখানেও প্রধানমন্ত্রী !
ক্ষণকাল স্থির থাকতে দেননা। ওরাই আমাদের পাগল করলেন।

বৈবর্তী—এ কেমন কথা ! কাজ থাকলে আসবেন না । মন্ত্রীবর যখন অন্তঃপুর পর্যন্ত এসেছেন, তখন বিশেষ কোন দরকার না থাকলে কখনই আসতেন না । আপনি না যেতে পাবেন, মন্ত্রীবরকে আসতে অন্তমতি করুন ।

বীবেন্দ্র—(আগ্রহপূর্বক) মালতী ! তবে মন্ত্রীকে ডাক ।

(মন্ত্রী প্রবেশ)

বৈবর্তী—(কবযোভে) বাজা বিজয় সিংহ দূতের দ্বারা মহাবাজের কাছে এই পত্র পাঠিয়েছেন ।

বীবেন্দ্র—পত্র শেষে শেনা যাবে, দূত মুখে কি বললে ?

বৈবর্তী—বিজয় সিংহের কথা বসন্তকুমারী—(নবেন্দ্র মন্ত্রীকে দূতপানে দৃষ্টি করলেন)
স্বয়ম্বরা হবেন, অন্য দেশীয় বাজপুত্রগণ সেই সভায় আহৃত হবেন, বিজয়-
সিংহ বসন্তকুমারীর একখানি ছবি আন এত পত্র মহাবাজের নিকট পাঠি-
য়েছেন ।

বীবেন্দ্র—আচ্ছা, পত্র পড় ।

বৈবর্তী—(পত্র পাঠাবস্ত) প্রিয়তম রাজন !

আমার প্রাণাধিক। চাহিতা বসন্তকুমারীর স্বয়ম্বরসভা । কথা আপনার ইচ্ছানুসারে স্বয়ম্বরা হইয়াছেন । অতএব তাঁহার চিত্রিত প্রতিমূর্তি আপনার সমীপে প্রেরণ করিতেছি, অধীনস্থ রাজকুমারগণকে স্বয়ম্বরসভায় প্রেরণ-
পূর্বক বঞ্চিত করিবেন । আর প্রাণাধিক কুমার নরেন্দ্র এবং আপনিও সভাস্থ হন, এই আমার নিতান্ত অভিলাষ ।

একান্তই আপনার

বিজয় সিংহ ।

বীরেন্দ্র—ভোজপুর অধিপতি এইবারে অতি সুবিবেচনার কার্য্য করেছেন, এতে কোনপক্ষেরই আপত্তি থাকবে না । মন্ত্রীবর ! আমার শরীর তো সর্ব্বদাই অস্থস্থ ; তুমি লোকজন সঙ্গে দিয়ে নরেন্দ্রকে ভোজপুরে প্রেরণ কর ।
(কুমারের প্রতি) বৎস নরেন্দ্র ! সকলি তো শুনলে, ভোজপুর অধিপতির কথা স্বয়ম্বরা হয়েছেন ।

(নরেন্দ্র পিতৃচরণে প্রণাম করিয়া অধোবদনে প্রস্থান)

বীরেন্দ্র—তবে এক্ষণে চলুন, সভায় গিয়ে সভাস্থ সভ্যগণ সহিত অন্য বিষয়ের

পরামর্শ কবা থাক'। নরেন্দ্রকুমারকে বিশেষ জাঁক-জমকেব' সহিত ভোজ-
পুরে পাঠাতে হবে।। বাজার গাত্রোথান—মন্ত্রীকে দিকে ফিবিয়া। মন্ত্রীর!
চিত্রপটখানি কুমার নরেন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দেও।

বেবতী—না না মহারাজ! তা হবে না, পটখানি আমার কাছেই থাক। যদি
বিধাতা একেই (পটের প্রতি নির্দেশ করিয়া) আমাদের পুত্রবধু করেন,
তাহলে আমি সেই চাঁদমুখ দেখে মাগেই মাপ মিটিয়ে নিই। পটখানি
আমার কাছেই থাক, আমি যত্ন করে তুলে রাখি। আর মাঝে মাঝে
বুকে বেখে প্রাণ ছুঁড়ি।

বীবেন্দ্র—আচ্ছা! তবে তোমার কাছেই থাক, কিন্তু নরেন্দ্রের নাকদান দেখালে
আমি বোধকরি ভাল হত।

বেবতী—না মহারাজ! দেখলে ভাল হত না, শুনেই ভাল হবে।

বীবেন্দ্র—আচ্ছা মন্ত্রী! আমারকে নিয়ে বন, রাজকুমারী বনভ্রমণে আসি
সুন্দরী, তাঁর স্বয়ম্ভবদেউ। অন্যত্রই যেন বাতাসা হয়।

বেবতী—(মন্ত্রীর প্রতি) না মন্ত্রী! তা বলাই নাই। কেবল এই কথা বন, ভোজ-
পুরের বাজা নিমন্ত্রণ করেছেন, তেমনই নিমন্ত্রণ বজা করতে যেতে হবে।

বীবেন্দ্র—মন্ত্রীর! তবে চল, আমায় যাও। (রাজা ও মন্ত্রীর প্রস্থান)

বেবতী—বাঁচলুম, অগ্নি গেল! বাজা যে স্বয়ম্ভব ও চক্ষের আড়াল করতে চান
না, সে যে ভালি বিপদ। কেবল কথায় ভুলাতে চান, এও কি কখনো হয়।
আমি কি কথায় ভুলি। মুখের কথাতে কিবা হয় অবলা-সরলা কোথা, শুধু
কথায় ভুলে বয়।

মালতী—রাজমহিষী! একটু স্থব কবে বলো।

বেবতী—হতভাগি! এখন কি আমার স্তবের সময় আছে। স্থব কবে বলতে
আমার লজ্জা কবে।

মালতী—বলই না কেন, এখানে আর তো কেউ নাই, আর কেই বা কি বলবে?

বেবতী—তবে বলি, কিন্তু সেও না বলার মত।

রাগিনী সুরট—তাল কাওয়ালী।

সজনী লো মুখের কথাতে কিবা হয়।

প্রাণে আর কত সময়, অবলা-সরলা কোথা

শুধু কথায় ভুলে'রয় ॥

নবীন যুবকী আমি,
অন্ত, দন্ত-হাবা স্বামী,
অন্ত জানেন অন্তরামী,
মধু-প্রেম বিসময়ী।
মনো যাণে নাহি চায়,
বিধি মিলাহল ভাগ,
কবি দাখী কি উপায়,

প্রেমানলে প্রাণ দয় ॥

মালতী—(গালে হাত দিয়া অদোবদনে) হাঁ, তাই তো । (চিন্তা)

বেবতী—তুই আবাব ভাবডিম কি ? (বসন্তকুমারীর পাট লহনা) দেখ দেখি, এ
পাটখানি কেমন ?

মালতী—এ কাব ছবি ? তোমাব ছবি ?

বেবতী—দুব হতভাগী ! একক্ষণ কি শুনলি ?

মালতী—আমি কিছুই শুনতে পাটিনি । যাবও যাও শুনেছি, দোতাই বন্দর,
কিছুই বুঝতে পারিনি । যাইরি । পাবিনি :

বেবতী—(হাস্য করিয়া) কিছুই বুঝতে পাবিস নি ? ও আমার দশা । কিছুই
বোধশোধ নেই ! তোব সমখে এককথা হলো, কিছুই বুঝতে পাবলিনে ।
মবণ আব কি

মালতী—ঠাকরণ ! তোমাব পাণে ধরি, এ ছবিটি কাব বল ।

বেবতী—ভোজপুবেব রাজ্য বিজয় সিংহেব মেয়েব ছবি ।

মালতী—বল কি ? ঐ ! —মাতুষে কি অমন স্বস্ত্রী হতে পাবে ? আমার তো
বিশ্বাস হয় না । তুমি যাও বল, আমি বলছি, এ ছবিটি ঠিক নয় ।
লোকের মন ভুলাবার জন্তে মিছে করে এঁকেছে । যদি সত্য হয় তবে সে
মেয়ে কখনই মাতুষ নয়, কখনই না, নিশ্চয় দেবকণা । তা যাতোক মহা-
রাজ তোমায় এ ছবিখানি কেন দিলেন ?

বেবতী—দিলেন সাধে ? সহজে দিয়েছেন ? আমি জোর করে বেখেছি । রাজা
বিজয় সিংহের ইচ্ছা মেয়েটি নরেন্দ্রকেই দেন । ঠিক জানি না ; ভাবে
বুঝতে পারছি, আর আমাদের রাজারও যেন ইচ্ছা তাই । সেইজন্তে

ছবিখানি নব্বেন্দ্রের কাছে পাঠাচ্ছিলেন। আমি দেখি, বিষম বিভ্রাট ; নব্বেন্দ্রের বিয়ে হলে সে এই রাজ্যেব রাজা হবে, তাহলে আর আমার মান, গৌরব কিছুই থাকেনা, আর যা হবে, বুঝতেই পারছ।

মালতী—কেন থাকবেনা মহিষী ? কুমার তোমায় যে বকম মাগ্ন করেন তাতে তিনি বিয়ে করলেই যে একেবারে দয়া, মায়া কাটাবেন, এ তো আমাব কখনই বিশ্বাস হয় না।

বেবতী—তুই যা বলিস মালতী ! কিন্তু আমার তো সন্দেহ যুচ্ছে না।

মালতী—এত সন্দেহ কি তোমাব ?

বেবতী—সে আমার আত্মাই জানে, আর আমিহ জানি।

মালতী—বাজমহিষী ! তাতেই বা বিশ্বাস কি ? বসন্তকুমারী স্বয়ম্ববা হয়ে কার গলায় মালা দেবে, তা কে জানে ? নেজতো তোমাব এত সন্দেহ কেন ? হাঁ, তবে যদি জানতেম, সন্দেহ টিক হয়েছে, যুবরাজই বর হয়েছে, এ বিয়ে হবেই হবে, তবেই যাগোন। এ তো তা নয় ! এটি বারোয়ারি বিয়ে, কার কপালে কি আছে, বসন্তকুমারী যে কার হবে, আমি আন্দাজ করি বসন্ত-কুমারীও তা জানে না। এর জন্তে তোমাব এত ভাবনা কেন ? এখনই কি ?

বেবতী—তুই বলিস কিবে ! শত শত বাজপুত্রের মধ্যে নব্বেন্দ্রকুমার যদি অতি মলিনবেশেও সভাগ একপাশে বসে থাকেন, আর এই মেয়েটি যদি (পটের প্রতি নির্দেশ করিয়া) যথার্থই রমণীকুলে জন্মগ্রহণ করে থাকে, মুনিকতাই হোক, আর দেবকতাই হোক, বিধি যদি উপযুক্ত নয়ন দিয়ে থাকেন, তাহলে সভা মধ্যে নব্বেন্দ্রকুমার ভিন্ন আর কাউকেই চক্ষে দেখবে না ; যুবরাজকে মালা পরাতে হবে। পটে যে রূপ দেখা যাচ্ছে, এব চেয়েও যদি সে শতগুণে রূপবতী হয়; নব্বেন্দ্রকুমারের মুখপানে একবার নয়ন পড়লে যে ফিরে উলটে পলক ফেলবে, সে পথ আর থাকবে না। যতই কেন লজ্জাশীলা হোক না, একদৃষ্টে সেই মুখপানে চেয়ে থাকতেই হবে।

মালতী—দেখবো যুবরাজ তো ভোজপুরে যাবেন, কি করে আসেন, শেষেই দেখো—এখন আর কিছুই বলবনা, ছদ্মিনের চাঁদ হলে স্নের বসেই দেখতে পাব।

রেবতী—চুপ কর, ও কোন কাজের কথা নয়, তুই দেখিস! যদি নরেন্দ্রকুমার ভোজপুরে যান, তবে সে বসন্তকুমারীর ক্ষমতা কি বে, নরেন্দ্রকে ফেলে অগ্র পুরুষের গলায় মালা পরাতে পারে, ওলো! তুই দেখিস, দেখিস! যদি নরেন্দ্রকুমার ভোজপুরে যায়, (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হা! আমি ধর্মের দিকে ফিরেও চাইলেম না? লক্ষ্মীর মাথা খেয়ে সত্যীত্বকে বিসর্জন দিয়ে, কলঙ্কভার মাথায় বহন করতে হবে, লোকের গল্পনা সহ্যেতে হবে, অর্ধশ্রমে নরকে পুড়তে হবে। এ সকল ভেবেও রাজকুমারের প্রতি মন সমর্পণ করলেম, কিন্তু তিনি আমার পানে একবারও চাইলেন না। আমার সমুখে বতক্ষণ ছিলেন, আমি একবারও চক্ষুর পলক উলটাতে পারিনি, কিন্তু তিনি তো মুখ তুলেও চাইলেন না। ধিক আমার জীবনে। যদি এই রমণী (পটের প্রতি নির্দেশ করিয়া) তাঁর প্রণয়িনী হয়, তাহলে আমার আশা পূর্ণ কবা দূরে থাক ফিরেও চাইবেন না। দিনান্তে কি মাসান্তে আমার কথা মনে আর করবেন না। হা! সকল আশাই নিরাশ হল। মালতী! এর উপায়? আমি তো আব বাঁচিনা।

মালতী—উপায় আছে কি? একেবারে ক্ষান্ত দেওয়াই উপায়। কেন দুদিনের তরে গঙ্গনার ভাগিনী, পাপের ভাগিনী, কলঙ্কের ভাগিনী হতে চান; মলেও যে এ কলঙ্ক যাবে, তা মনে করোনা, বেক্ষাপ্ত যতদিন থাকবে, ততদিন এ কলঙ্ক যাবার নয়।

রেবতী—তুই যা বলিস, প্রাণ কোনমতে ধৈর্য্য মানে না। ভাগ্যে যাই থাক, যুব-রাজকে পত্র লিখে মনের ভাব জানাব, এতে বিধি কপালে যা ঘটান, তাই স্বীকার—ভয় কি? একদিন তো মরতেই হবে, তাতে আর এত ভয় কি?

মালতী—কি বলে পত্র লিখবে?

রেবতী—যা মনে হয়, তাই লিখবো। তুই শীঘ্র আমার লিখনের উপকরণ নিয়ে আয়। (মালতীর প্রস্থান এবং কিঞ্চিৎ পরে লিখনের সমস্ত উপকরণ লইয়া উপস্থিতি)

মালতী—এই নিন। (রেবতী পত্র লিখিতে আরম্ভ)

রেবতী—(স্বগত) কি লিখি? (কাঁচি লইয়া লেখনী কাগজে স্পর্শ) যা মনে হয়েছে, তাই লিখি। (লেখনী দ্বারা স্পর্শ করিয়া চিন্তা) লিখবই,

অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে, (লিখিতে আরম্ভ—তিন-চারছত্র লিখিয়া কাগজদ্বিখণ্ড করে মুচড়ে নিক্ষেপ এবং পুনরায় লিখিতে আরম্ভ)

মালতী—(হেঁচে বাধা দিল)

রেবতী—দূর হতভাগী ! সব নষ্ট করলি । বাধা মানাই চাই । (কিঞ্চিৎ পরে লিখিতে আরম্ভ, দুই-তিনছত্র লিখিতেই লেখনী ভাঙ্গিয়া গেল, লেখনীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া) তুই আজ ভেঙ্গে গেলি ? (সক্রোধে লেখনী দুই খণ্ড করিয়া নিক্ষেপ) আর লিখব না. এত বাধা পড়ছে আব লিখব না । (দণ্ডায়মান) মালতী ! এ সব কাগজপত্র নিয়ে যা, আজ আর লিখব না ।
কি জানি—

মালতী—(লিখনের উপকরণ লইতে অগ্রসর)

রেবতী—বাথ ! রাথ ! (উপবেশন, পুনরায় কাগজ লইয়া লিখিতে আরম্ভ, ক্ষণ-কাল পরে পত্রলেখা শেষ হইল) দেখি কোন পথে ।

মালতী—কি লিখলেন, আমায় একটু শুনান ।

রেবতী—শুনবি ! তবে শোন ।

(পত্র পাঠারম্ভ)

যুবরাজ ! চিনিতে কি পারিবে আমার ।
যেদিন প্রমোদবনে দেখেছি তোমায় ॥
শরতকুমার সনে গলাগলি করি ।
বেড়াইতেছিলে করে হাত-ধরাধরি ॥
সেদিন নয়নকোণে হেরিয়ে তোমায় ।
একেবারে মজিয়াছি প্রণয়-মায়ায় ॥
পার কি না পার তুমি চিনিতে এখন ।
মনে মনে জানি আমি তুমি প্রাণধন ॥
মোহন নয়নবাণে বিঁধিয়ে নয়ন ।
কোথা লুকাইয়া গেলে নাহি দরশন ॥
এঁকেছি হৃদয়পটে প্রতিমা তোমার ।
ভুলিবনা কভু তাহা ভুলিবনা আর ॥
সে রূপমাধুরী প্রাণ ভুলিতে কি পারি ॥

লহরী খেলিছে যেন সাগরের বাবি
 দূরে যায় ফিরে আসে লহরী যেমন
 তেমনি তোমায় আমি জানি প্রাণধন ॥
 বলে কি জানান যায় মনেব বেদন ।
 যে ভুগেছে সেই জানে যাতনা কেমন ॥
 তদবধি ভুগিতেছি আমি অভাগিনী ।
 খেতে শুতে স্তখ নাই দিবস যামিনী ॥
 হেরিয়ে মোহনরূপ ভুলিয়াছে মন ।
 হৃদয়ে রয়েছে গাঁথা মুরতিমোহন ॥
 ভুলেছ, কটাক্ষশবে হরে নিয়ে যন ।
 মনে মনে জানি আমি তুমি প্রাণধন ॥
 বিরহিণী একাকিনী ছিলাম কাননে ।
 যে দিন ভ্রামতেছিলে শরতের সনে ॥
 মালতী আমাব সনে ছিল সে সময় ।
 সাক্ষী দিবে কটাক্ষের মিথ্যাকথা নয় ॥
 চুরি করিয়াছ মন হইয়াছ চোব ।
 তদবধি মনচুরি হইয়াছে মোর ॥
 জপিতেছি কতদিনে হইবে মিলন ।
 বাঁচাও বাঁচাও প্রাণ প্রিয় প্রাণধন ॥

তোমারই প্রেমভিলাষিণী
 রেবতী ।

মালতী—বেশ হয়েছে । এখন দেখব যুবরাজ আমার উপর কেমন করে চোখ
 রাজান । (রাজার প্রবেশ)

মালতী—(নিঃশব্দে দূরে দণ্ডায়মান)

বীরেন্দ্র—(রেবতীর হস্তে পত্র দেখিয়া) প্রিয়ে ! কোথায় পত্র লিখছ ?

রেবতী—(সক্রোধে) সে কথায় তোমার কাজ কি ?

বীরেন্দ্র—বল না কোথায় লিখছ, বল, আমার মাথা খাও বল । কোথায়
 লিখছ ?

রেবতী—আমি বলবনা, যাও আমি বলব না, যে কথা বলবনা, সে কথায় তোমার
আবার কথা কেন, আর মাথা খাওয়াই বা কেন ?

বীরেন্দ্র—(হঠাৎ রেবতীর হস্ত হইতে পত্র গ্রহণ) কেমন এইতো নিয়েছি ।

রেবতী—(স্নান মুখে রাজার মুখ দর্শন)

বীরেন্দ্র—(ভয়ে) প্রিয়ে ! বিরক্ত হলে ?

রেবতী—(দুঃখিত হরে) বিরক্ত হব কেন ? হাত থেকে পত্রখানা কেড়ে নিলেন
আপনি চাইলে আর আমি দিতুম না ! (অশ্রুপতন)

বীরেন্দ্র—বড় অশ্রায় করোঁছি । তোমার অসম্মতিতে পত্রখানা হাতে থেকে কেড়ে
নেওয়া বড়ই অশ্রায় হয়েছে । প্রিয়ে ! ক্ষমা কর, পত্র নেও । (পত্র
দিতে হস্ত অগ্রসর)

রেবতী—(সক্রোধে রাজার হাতে আঘাত করিয়া) আমি পত্র চাইনে । আপনি
আমার হাত থেকে পত্র কেড়ে নিয়েছেন, ঐ পত্র আবার আমি হাতে
কবব ?

বীরেন্দ্র—তোমার পায়ে ধরি । পত্র ধর, আমার অপরাধ হয়েছে । (পত্র রেবতীর
সম্মুখে লইয়া) ক্ষমা কর, আর কোনদিন এমন হবে না । প্রিয়ে ! মার্জনা
কর ।

রেবতী—(পত্র লইয়া দূরে নিক্ষেপ) আমি আবার—কখনই—

বীরেন্দ্র—(অতিদ্রুত পত্র আনিয়া রেবতীর পদধারণ) প্রিয়ে ! তোমার পায়
ধরি, ক্ষমা কর, আমি যদি আগে জানতুম যে, এতদূর পর্য্যন্ত থাকবে, তা
হলে পত্র নেওয়া দূরে থাকে, তুমিও না । পায় ধরি—নেও, আর মনে বাধা
দিও না ।

রেবতী—(রাজার হস্ত হইতে পত্র গ্রহণ)

বীরেন্দ্র—তোমার পায়ে শত নমস্কার, বাপরে ! একমুহূর্ত্ত মধ্যে আমার একেবারে
ত্রিভুবন দেখিয়েছ ।

রেবতী—(হাস্ত মুখে) পত্রের কথা শুনবে ।

বীরেন্দ্র—না না, আমি আর শুনতে চাইনে । তোমার পায়ে ধরি গো আর শুনতে
চাইনে ।

রেবতী—না না শুনুন । আপনি মনে মনে দুঃখিত হবেন, তা আর কাজ কি,
শুনুন !

বীরেন্দ্র—তোমার ইচ্ছা হয়, ক্ষতি নাই ; কিন্তু আমি আর কিছু বলব না ।

বেবতী—আমার যে ছোট ভগ্নী আছে তা আপনি জানেন তো ?

বীরেন্দ্র—জানব না কেন ?

বেবতী—আমার বিবাহ হওয়ারধি তার সঙ্গে আর দেখা নাই । অনেকদিন হলো, কোন সংবাদও পাই নাই, মনটা আজকে ষড়-অস্থির হয়েছিল, তাই এই পত্র লিখেছি ।

বীরেন্দ্র—প্রিয়ে ! তুমি যদি বিরক্ত না হও, তবে আর একটি কথা বলি ।

বেবতী—বলুন ।

বীরেন্দ্র—তোমার ঐ কমল-কর-বিনির্গত পত্রখানি পাঠ করে আমার শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রীতি সাধন কর ।

বেবতী—তা আর হানি কি ? আপনি শুনবেন, তাতে ক্ষতি কি ? আপনার কাছে আমার গোপনীয় কিছু নহে । শুভুন । (মনঃকল্পিত রূপে হস্তস্থিত পত্র পাঠারম্ভ)

প্রিয় ভগিনী,

দীর্ঘকাল তোমার কুশল সমাচার অ-প্রাপ্তে যাবপরি নাই দুঃখ ভোগ করিতেছি । আমি পরাধিনী । রাজার বিনামত্মিতে পদ সঞ্চালনেরও ক্ষমতা নাই । তুমি অবশ্যই মনে কবেছ যে, দিদি রাজরাণী হয়ে সুখে কাল কাটাচ্ছেন ! সে কথা মনেও করো না । আমি সুখী হই নাই । কারণ তুমি যদি আমার নিকটে থাকতে তা হলে যথার্থ সুখভোগিনী হতেম । ভগিনী ! সেই যখন আমার বিবাহ হয় নাই, দুজনে একত্রে কত খেলা করিয়াছি । পুতুল বিয়ে দিয়ে তুমি আমি কত সম্বন্ধ পেতেছি, সেই সকল পূর্বকথা মনে হলে কিছুতেই সুখবোধ হয় না । এ অতুল্য সুখও যেন সে সময় বিষময় বোধহয়, রাজভোগ তখন আমার বিষয় বোধহয় । রাজা অত্যন্ত ভালবাসেন বলেই কিঞ্চিৎ স্নেহ আছে । নচেৎ আমার যে কি দশা হত, তা বিধাতাই জানেন । যত শীঘ্র শীঘ্র পার, তোমার শুভ সংবাদ লিখিয়া আমায় সুখী করিবে ।

তোমারই—বেবতী ।

বীরেন্দ্র—বেশ লিখেছ ! খাশা কেন হবে না ? প্রিয়ে ! তুমি যে এমন লিখতে পার আমি স্বপ্নেও জানতাম না । ঝাহোক, শুনে বড় সুখী হলোম । তুমি

বস আমি আসছি। [প্রস্থান]

মালতী—প্রণাম করি ! তোমার পায় দণ্ডবৎ হই ! তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।

রাজা যখন তোমার হাত থেকে পত্র কেড়ে নিলেন, আমার প্রাণ তখনই উড়ে গিয়েছিল—মনে করলেম আজ সর্বনাশ হলো।

রেবতী—ওলো ! (হাসিতে হাসিতে) সেকলে বুড়োরা কি একেলে মেয়েদের চাতুরী বুঝতে পারে ? দেখলি তো রাজাকে কেমন জঙ্ক করেছি, কেমন ঠকিয়েছি ? তা যা-হোক, পত্রখানা আজকেই যুববাজকে দিবি। মালতী ! সাবধান ! একটি প্রাণীও যেন টের না পায়। তাহলে তোমাবই মাথা আগে কাটা যাবে। (শিবোনামা দিয়ে মালতীর হস্তে প্রদান)

পটক্ষেপণ।

(নেপথ্যে গীত)

বাগিণী স্বরট—তাল কাওয়ালী

যুবরাজ দেখা দিলে রাখ মোর প্রাণ।

যায় যায়, যায় প্রাণ।

সহেনা সহেনা আব তব অদর্শন বাণ ॥

হেরিয়ে প্রমোদবনে,

মরিতেছি মনোপুণে,

মনে করি ত্বরা আসি, কব প্রেম বাঁধি দান।

তোমাবি মিলন আশে

স্তম্ব নীরে প্রাণ ভাসে,

ভাসায়োনা দুঃখ নীরে, দুঃখিনী বেবতীর প্রাণ ॥

তৃতীয় রঙ্গভূমি

ভোজপুর—রাজা বিজয় সিংহের বাটি

বসন্তকুমারীর শয়নমন্দির—বসন্তকুমারী আসীন।

বসন্ত—(স্বগত) আজকেই আমার জীবনের শেষ। আজই আমার—ভগবান !

তুমিই রক্ষাকর্তা ! তুমিই অগ্নির আশ্রয় ! সতীত্ব রক্ষার তুমিই একমাত্র

উপায়। নাথ ! তুমি রূপানেত্রে অবলোকন না করলে দাসীর আর উপায়

নাই। যারে স্বপ্নে দেখেছি, তাঁরে সভায় যদি দেখতে না পাই। তবে এ প্রাণ আব রাখবো না। (মেঘমালাব প্রবেশ)

মেঘ—তুমি একলা বসে কি ভাবছ? চুপেচুপে কি বলছ? এখানে তো কেউ নেই। কাকে কি বল? তোমার রকম সকম দেখে আমি অবাক হয়েছি, ছি! তুমি তো আর অবোধ নও। আজ তোমার বিয়ে, তোমার এ দশা কেন? বলতো তোমার এ বেশ কেন? ছি ছি! বড় ঘণার কথা! বেশ করে সাজগোজ করবে, সর্বদাই হাসিমুখে আমাদের সঙ্গে মন খুলে মনের আমোদে কথা কইবে; হাসিখুশী করে ক্রমে দিন কাটাবে। তা নয়, আজ যেন চিরদুঃখিনী, বিবহিণী সেজেছ।

বসন্ত—সখী! আমি সাধে একুপ হয়েছি আমার আহার নাই। নিদ্রা নাই, মনে স্থখ নাই। কেবল দিবানিশি চিন্তা সাগরেই ডুবে বয়েছি। 'দেখনা ভাবতে ভাবতে আমি একেবারে সারা হলেম। আমি কি আর আমাতে আছি।

মেঘ—এতও জান! তোমার কিসের চিন্তা? আর ভাবছই বা কি? তোমার রঙ্গ দেখে আব বাঁচিনে বিয়ের মুখ দেখতে না দেখতে আগেই চিন্তাসাগরে ডুব দিলে?

বসন্ত—(দুঃখিত স্বরে) বিবাহই আমাব কাল হয়েছে বিবেচনা কব, আমি স্বপ্নে যারে বরণ করেছি, কর্ত্তহার গলায় পরিয়েছি, তাঁর দাসী হব, তাঁর চরণ সেবা করবো, এই বলে এতকাল পর্য্যন্ত দেবতার আরাধনা করছি, এই পোড়া চক্ষের আড়াল হবে বলে প্রেম-তুলিকায় চিত্তপটে লিখে রেখেছি, সেই জীবন-সর্বস্ব পতিভ্রমে যদি অন্ম পুরুষের গলে মালা অর্পণ করি, তবে তো সতীত্ব-গৌরব একেবারে গেল! সখী! তুমি নিশ্চয় জেন, যদি আমার সেই চিত্ত-অঙ্কিত-রূপ সভায় নয়নগোচর না হয়, তবে সেই-খানেই আমি প্রাণ পরিত্যাগ করব। জীবন থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল।

মেঘ—তুমিও যেমন পাগল হয়েছ! কাকে কবে স্বপ্ন দেখেছিলে, না জেনে না শুনে তাকে মন দিয়ে বসে রয়েছ। স্বপ্নও কি কখন সত্য হয়? স্বপ্নে কর্ত্তহার বদল করেও কি কেউ বিয়ে করে? এও কি একটা কথার মত কথা? ওসব কথা ছেড়ে দেও, আমার কথা শুন ও চিন্তা দূর কর, কত

রাজপুত্র সভায় উপস্থিত থাকবেন, যাকে তোমার চক্ষে দেখতে ভাল বোধ হয়, তাঁর গলে মালা দিও। এ তো আর কেউ ধরে বেঁধে দিয়ে বিয়ে দিচ্ছে না, তোমারই হাত, তোমারই চক্ষে যাকে ভাল দেখায় তারই গলে মালা দিও।

বসন্ত—(বিরক্তভাবে) বাও। ও সকল কথা মুখে এনো না, ও কথায় আমি বড় ব্যথা পাই। আমি যার দাসী, তাঁরি গলায় মালা দিয়েছি। তিনিই আমার প্রাণ তিনিই আমার জীবন যৌবনের অধিকারী, তিনিই আমার প্রাণের ঈশ্বর, তিনিই আমার সর্বস্ব, তাঁর করে জীবন সমর্পণ করেছি। তা নেয় স্বপ্নেই বা হলো, তাতে ক্ষতি কি? তাঁবেই আমি পতি বলে সম্বোধন করেছি যদি তাঁকে সভায় না দেখতে পাই, যা মনে আছে তাই করবো।

মেষ—দেখব! দেখব! বলতে সহজ গড়ে উঠা কঠিন। আচ্ছা! তুমি যে স্বপ্নে কর্তৃহারা গলে পরিবেছ কবম্পর্শ করেছ, পতি বলে সম্বোধন করেছ, তোমায় কিছু পরিচয় দেন নাই?

বসন্ত—কেন দিবেন না? অবশ্যই পরিচয় দিয়েছেন তুমি শুনতে চাও, আমি এত-কাল পর্যন্ত সে নাম কাবো কাছে ফুটিনি মনের কথা মনেই আছে, আজ নাচারে পড়ে তোমার কাছে ভাঙছি। সখী! আমি যেমন যত্নে রেখেছি, তুমিও আমার হয়ে প্রাণনাথের নাম সযত্নে হৃদয় ভাণ্ডারে রাখবে।

মেষ—তুমি এত সন্দেহ করছ কেন? আমি কোনদিন কোন কথা জিজ্ঞাসাতেও আনব না। যদি ভগবান তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, তখন প্রকাশ করব।

বসন্ত—সখী! আমার জীবন-সর্বস্ব এই প্রকারে পরিচয় দিয়েছেন। সত্য-মিথ্যা তিনিই জানেন। রাজা বীরেন্দ্র সিংহের পুত্র, নাম নরেন্দ্রকুমার। (অশ্রুপতন)

মেষ—এও তো ভাবি জ্বালা। আমি কেন নাম জিজ্ঞাসা করে তোমায় কঁাদালেম। এ কি! নাম বললেই কঁাদছ কেন? আজ আনন্দাশ্রু নির্গত হবে, না অনি-বায় দুঃখের বারি দ্রব করে পড়ছে। এ বড় দুঃখের কথা! আমি মিনতি করে বলছি, তুমি আর কঁাদনা। (অঞ্চল দ্বারা বসন্তকুমারীর চক্ষু মার্জন)

বসন্ত—বলব কি সখী। প্রাণনাথের নাম মনে পড়লে কোথা থেকে হু-হু শব্দে চক্ষে জল এসে পড়ে। কষ্টরূপে মিথারণ চেষ্টা করি, সকলই বিফল

হয় ! (বিজয় সিংহের প্রবেশ)

(বসন্তকুমারী পিতৃচরণে প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান)

বিজয়—এ কি ! আজ তোমার মলিন বেশ কেন ! আজ তোমার মলিন বদন দেখে মনে বড়ই বেদনা হচ্ছে । আজ তুমি স্বয়ংস্বর গ্রহণ করবে, তোমায় কি এই বেশে থাকতে হয় ? অপর সাধারণ তোমার জ্ঞাত সন্তোষ হৃদয়ে উত্তম উত্তম বেশভূষা কবছে, মা তুমি কেন স্নানমুখে মলিন বেশে রয়েছ ? তোমার কিসের দুঃখ মা ! আজ তুমি ভাল কাপড় পরবে, মণিময় অলঙ্কারে ভূষিতা হবে, কেশ বিজ্ঞাস করবে না—তোমার সকলি বিপরীত দেখতে পাই । সহচরীবা ! তোরা কোথায় ? আমাব বসন্তকুমারীকে সাজিয়ে দে । এই সমস্ত কারুকার্য খচিত বসন, এই সমস্ত মণিময়-অলঙ্কার এনেছি, তোরা সকলে মনের মত করে আমাব বসন্তকে সাজিয়ে দে ।

বসন্ত—পিতঃ ! ও সকল বসন-ভূষণে আমার কাজ নাই । কৃত্রিম-রূপ অপেক্ষা ঐশ্বর্য-দত্ত-রূপই প্রশংসনীয় । শত খণ্ড হীরা মাথায় দিলেই যে গৌরবিণী হলো তা নয়, নারীজাতিব সত্যতাই যথার্থ গৌরব, পতি ভক্তি ভূষণই রমণীর প্রধান ভূষণ । মণিমুক্তা, অলঙ্কারে স্বরূপাকেই অধিক সুন্দরী দেখায়, কিন্তু পতি ভক্তি অমূল্য-ভূষণে স্বরূপা—কুরুপা উভয়েই সুন্দরী । যে অলঙ্কারে কুরুপাকেও স্বরূপার সমান করে, সেই অলঙ্কারই অলঙ্কার । দেশীয় রমণীগণ যে কেন স্বর্ণ-অলঙ্কারকে এত আদর করে, তার ভাব আমি কিছুই জানি না । পিতঃ ! লজ্জাই অবলার অমূল্য-বসন । এ সকল জেনেও যে, রমণীগণ কারুকার্য খচিত বসনে অবগুষ্ঠন দ্বারা লজ্জা প্রকাশ করেন. এ বড় লজ্জার কথা । আমার অপরাধ মার্জনা করুন । আমি ও সকল অলঙ্কারপূর্ণ বসন—ভূষণ অঙ্গে ধারণ করে গৌরবিণী হতে বাসনা করি না । ষিষ্টভাষিণী, নম্রস্বভাবা, সত্যবাদিনী, ধীরা এবং স্বামীর অমুবর্তিনী হলেই যখন তাঁর প্রণয়িনী হওয়া যায়, তখন কৃত্রিম-বেশভূষা স্বামীর ভালবাসা হতে ভালবাসি মা ।

বিজয়—বাছা বসন্ত ! তোমার এই মধুমক্ষা কথা শুনে আমার শ্রবণেন্দ্রিয় জুড়াল । প্রাণাধিকা হেমন্তকুমারীর আর রাণীর মরণ হঠাৎ মনে পড়েছিল, তোমার এই স্তম্ভাবা কথাটি শুনে এতদূর অশ্রী হয়েছি যে, সে সকল কথা কিছুই

মনে নাই। মা ! তুমি আমার কুলের গৌরবিনী কন্যা, তুমি আমার বংশের
উজ্জল-মণি, মা ! তুমি আমার শতপুত্রসম এক কন্যা জন্মেছ। তোমা হতে
বিজয় সিংহের বংশ দ্বিগুণ উজ্জল হবে। দেখ মা ! আমি তোমার পিতা,
আমার কথাও তুমি রক্ষা করতে হয়। মা ! আমি বায়ে বায়ে বলছি, তুমি
বেশভূষা কর। সখীবা ! তোরা কোথায় ? বসন্তকে সাজিয়ে দে।

[প্রস্থান]

মেঘ—রাজকুমারী ! অলঙ্কার তো পবন হলে ? আর না বলতে পারবে না।

বসন্ত—কি করি, পিতার আঙ্গা।

পটক্ষেপণ

চতুর্থ রক্তভূমি

ভোজপুর রাজপ্রাসাদ, অতিত যুবরাজগণ এবং কাশ্মীর

নর্তকী-দ্বয়ব নৃত্য ও হিন্দি গান

(কঞ্চকীর প্রবেশ)

কঞ্চকী—(কিঞ্চিত উচ্চস্বরে)

জয় হোক মহারাজ ইন্দ্রপুর পতি
ভুবনে বিখ্যাত বীর-বীরেন্দ্র কেশরী !
তোমারি শোভনে আজ শোভে রাজসভা—
অপূর্ব শোভার হাব শোভে যথা নভে ।
দেবরাজ পুরন্দর স্রব সিংহাসনে
রাজিছে রাজন তব ভাতি মনোহর,
এ মহীমণ্ডলে আজি, রতন ঘেমতী
বাঞ্জে রত্নাকর-করে, বিপিন মাঝারে ।
অপূর্ব শোভায় শোভে মরকত মণি !
রহ রহ রাজগণ রহ ক্ষণতরে,
ভঙ্গদেহ প্রেমানন্দে আজিকার মত ।
অগ্নি ! সুরঙ্গিনীবালা নাচিও না আর,
বাজনা বিরাম দেও রাজ-বাগ্গকর,
আসিছেন রাজবালা সভা মধ্যখানে ।

সহচরীদ্বয় জগতমোহিনী,
 যেমন বিদ্যুৎ লতা বাসন্তী গগনে !
 সাজায়ে বরণ ডালা অগুরু চন্দন,
 মনোহর ফুলমালা স্ববাসিত জল,
 তৃপ্তাবী চামর সেবি, সহাস্রা আনন ।
 শুই দেখে আসিছেন বসন্তকুমারী ।
 নখন খেলিছে যেন যুগল খঞ্জন,
 নীল শতদলে যথা যুগল ভ্রমর ।
 তেমনি শোভিছে তাব মুখ শতদল ।
 আমাবি, আমারি যেন প্রকৃতি আপনি
 জগতের যত শোভা একঠাই করি
 এনেছেন শোভিবारे বাজ তনয়ায় ।
 নবীন যৌবন বাল্য বসন্তকুমারী ।
 বহু রহু বাজগণ দেখে নেহাবিয়া,
 আসিছেন বাজকরা বিকাশি-বদন,
 অকলঙ্ক চাঁদ যেন উদয় মহাতে
 হঠল, মোহিত হৈল তোমা সবাকার ।

[প্রস্থান]

(সহচরীদ্বয় সঙ্গে বসন্তকুমারীর সভায় প্রবেশ—প্রথমে মলিন বদনে চতু-
 স্পার্শ্বে দৃষ্টি—হঠাৎ নবেন্দ্রে নখনগোচর কবিতা পূর্ণানন্দে নরেন্দ্রকুমারের
 গলায় মালাদান—এবং সভাস্থ সকলের সন্তোষ-স্বচক করতালি) (বিজয়
 সিংহের প্রবেশ)

বিজয়—মা ! আমি মহা স্তব্ধ হইলাম । উপযুক্ত পাত্রের গলাতেই মালা অর্পণ
 করেছি । আজ আমাব আশা পূর্ণ হল । বৎস নরেন্দ্র ! (সর্বোদনে)
 আমার সর্বস্ব-ধন, আমাব যত্নেব রত্ন, বসন্তকে তোমার হস্তে সমর্পণ
 করলাম । আমার বসন্ত—(বসন্তকুমারীর হস্ত ধরিয়া নরেন্দ্রের হস্তে দান,
 সভাস্থ সকলে সহস্র করতালি এবং নেপথ্যে বিবিধ বাজ ও উল্লুধনি)

পটক্ষেপণ

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম রঙ্গভূমি।

ইন্দ্রপুর ; রাজবাটি—বেবতীর শয়ন মন্দির ;

(বেবতী ও মালতী দাসী আগীন।)

বেবতী—মালতী ! মনে পড়ে ? কেমন, হয়েছে তো ? আমি যা বলেছিলুম তাই হয়েছে কি-না ?

মালতী—হয়েছে। আপনি যা বলেছিলেন, ঠিক তাই হয়েছে। পটে যে রূপ দেখেছিলেম, এখন তাব চেয়ে শতগুণ সুন্দরী দেখতে পাচ্ছি। বেশ হয়েছে, যেমন যুবরাজ, তেমনি বসন্তকুমারী। যথার্থ রাজমহিষী ! বেশ মিলেছে। মহারাজ এই বিবাহে বড়ই খুশী হয়েছেন। আবার শুনলুম যুবরাজকে বাজা করবেন। তাই নিয়ে পাড়াব মেয়েবা শুদ্ধ আমোদ কবছে। যুব-রাজ রাজা শুনে আরও খুশী হয়েছে। সকলেই বলাবলি কবছে, কাল আমাদের যুবরাজ নরেন্দ্রকুমার বাজা হবে।

বেবতী—তুই বসন্তকুমারীকে ভালকবে দেখেছিস তো ?

মালতী—দেখছি, এমন সুন্দর মেয়ে আর কখনও দেখি নাই। পাড়ার মেয়েবা তো বসন্তকুমারীকে দেখে আহ্লাদে গলে গলে পড়ছে। মহিষী ! তোমায় কেন এমন দুঃখিত দেখছি ? তোমার কিসেব দুঃখ ? তুমি রাজরাণী, তোমার কিসের দুঃখ ?

বেবতী—মালতী ! তুই আমার মনের ভার জেনেও যে এমন কথা বলছিস ? আমার প্রাণে আর সঘনা। নরেন্দ্র বিবাহ করে এসে মনেব আনন্দে নব-যুবতীর সঙ্গে সখভোগ করবেন, আর আমি তাই দেখব, আমার প্রাণে তাই সহ হবে, আমি মনে মনে গুড়ে মরব ? এ কখনই হবেনা। (নিস্তক হইয়া ক্ষণকাল পরে) আমি আজ এর একখানা করবই করব। যুবরাজ বাজা হলে আর কোন উপায় থাকবেনা। যে আমার হল না তার উপর এত মায়া কেন ? তার জন্ত এত দুঃখই বা কেন ? বসন্তকুমারী, তুই আমার সখতরী ডুবালি। আচ্ছা, তোমার এ সখের বাসা আজই ভাঙব,—ভাঙেইব—ভাঙব। তখন দেখবে, বেবতী কেমন মেয়ে। যুবরাজ, তুমি আমার শত্রু, আজ তুমি আমার শত্রু ! † বলিতে বলিতে ঐঙ্গের আভরণ তাগ

এবং আলুলায়িত কেশে ধুলিশয্যায় শয়ন ।

মালতী—এ কি ? এ কি কর ? ওমা ! তুমি এ কি কর ? কথা বলতে বলতে এ
আবার কি ?

রেবতী—তুই চূপ করে থাক । তোয় এত কথায় কাজ কি ?

মালতী—না, না, না, তুমি উঠ, মহারাজের অন্তপুরে আসবার সময় হয়েছে, তুমি
উঠ ।

রেবতী—না, আমি উঠবনা, তুই চূপ করে থাক । রাজা এলে কোন কথা বলিস
নে, যা বলতে হয়, আমিই বলব । (রাজা বীরেন্দ্রের প্রবেশ)

মালতী—(সভয়ে দূরে দণ্ডায়মান)

বীরেন্দ্র—এ কি ? (কিঞ্চিৎকাল নিস্তব্ধে) বলি এ কি ? মালতী ! এ কেমন ?
(নিকটে যাইয়া) প্রিয়ে ! তোমার কি হলো, তোমার এ দশা কেন ?
আমার প্রাণ ধূলীয় গড়াগড়ি যাচ্ছে, আমি এখনও দাঁড়িয়ে আছি ! কোন
পীড়া হয়েছে ? না, না, তা নয়, অঙ্গের অভরণ যখন মাটিতে পড়ে আছে,
তখন এ ভূতের চিহ্ন ? তোমাকে কি কেউ মন্দ বলেছে ? না তাই বা কি
করে হবে, কার জীবন ভার হয়েছে, বাঁচবার সাধ নাই যে, তোমায় মন্দ
বলেছে । আমি তো কিছু বলি নাই । আর কাবই বা এমন সাধা যে
রেবতীকে কটু উক্তি করে বেঁচে যাবে । যথার্থই কি তার প্রাণের মায়া
নাই ? এমন সাধা কার ? প্রেমসী ! উঠ, তুমি আমার—(নিকটে যাইয়া)
প্রিয়ে ! (হস্ত ধরিয়া) ছি ! এখনও চক্ষের জলে মাটি ভিজ়ে যাচ্ছে ।
বীরেন্দ্র সিংহ বর্তমান থাকতে তোমার চক্ষের জল পড়ছে ? বীরেন্দ্র
সিংহের মহিষীর চক্ষে জল পড়ছে ? যদি যথার্থই তোমার কেউ কোন
কথা বলে থাকে, তবে তুমি তার কেবল নামটি মাত্র বল । দেখ, তোমার
সম্মুখেই এই দেওই এট অসি দ্বারা সে হুয়াস্মার, শিরচ্ছেদন করব ! প্রিয়ে !
উঠ, আর আমায় কষ্ট দিও না ।

রেবতী—(ক্রন্দন করিতে করিতে) আমি দেহে আর প্রাণ রাখব না । তুমি
দেখ, তোমার সম্মুখেই প্রাণত্যাগ করছি, দাঁড়াও ! তোমার সম্মুখেই
প্রাণত্যাগ করি ।

বীরেন্দ্র—তোমার পায় ধরি, তোমার জীবনে এত স্থগা কিসে হল ? স্পষ্ট করে

বল। আমি বীবেক যদি তাব কোন প্রতিফল না করতে পারি, তবে তুমি একা মরবে কেন, আমিও তোমার সহগামী হব। তুমি আমার—তুমি মরবে কেন ?

বেবতী—মহারাজ ! সে বড় ভয়ানক কথা। আমি সে কথা মুখে আনতে পারিনা।

আমার মরণ ভাল। পুত্রের এই কাজ ! আমি নয় বিমাতাই হলমে !

তাইবলে কি তিনি আমায় কোন মন্দ কথা বলতে পারেন ? এই কি ধর্ম ?

তুমি কোথায় ! আমি এ প্রাণ বাখবনা ! পুত্র হয়ে আমায় এমন কথা বলতে

পাবে ? ছি ছি প্রাণে ধিক ! নাবীকুলে ধিক ! তোমাব মত রাজার শত

ধিক ! আমি তোমাব বাণী হয়ে আবার তোমারই পুত্র মুখে—গুনতে

হল ! হায় ! হায় ! প্রাণ বেরও, আর কষ্ট দিওনা। নরেন্দ্রের দুই-অভি-

সন্ধির কথাব ভাব গুনেও কি তোমাব ঘৃণা হয় নাই ? তোমায় শত ধিক !

তুমি এতক্ষণ যে দেখে আছ সে দেহকেও ধিক !

বীরেন্দ্র—প্রিয়ে ! আর বলনা। আর বলতে হবেনা। আমি বেশ বুঝতে পেরেছি।

এখনই চক্ষে দেখতে পাবে, বীবেকের ক্ষমতা আছে কি না ? তুমি স্থির

হও। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, এই অসি দ্বারা তোমাব সম্মুখেই দুর্ভৃত

কুলাঙ্গারকে এখনই দুই খণ্ড করব। বড় লজ্জার কথা ! পুত্রের এই কাজ ?

(ক্রোধ স্বরে) নগরপাল ! নগরপাল !

বেবতী—মহারাজ ! অন্তঃপুর মধ্যে নগরপাল কোথায় ?

বীরেন্দ্র—আমি হতজ্ঞান হয়েছি ! মালতী ! তুমি শীঘ্রই নগরপালকে ডেকে আন।

(মালতীর প্রস্থান)

বেবতী—হায় হায় ! আমার অদৃষ্টে এই ছিল। রাজরাণী হয়ে এই হল। সকলের

কাছে মাননীয় হব, লোকের নিকট আদরিণী হব, স্তম্ভে থাকব বলেই

পিতামাতা রাজরাণী করে দিয়েছিলেন, হায় হায় ! শেষে অদৃষ্টে এই হল।

মহারাজ ! (রোদন-স্বরে) আমাব বাঁচবার আর সাধ নাই।

বীরেন্দ্র—কেন এত দুঃখ করছ। দেখ ! তোমার সম্মুখেই দুরাচার উচিত শাস্তি

করছি। আর কেঁদনা, আমার মাথা খাও, আর কেঁদনা। তোমার চক্ষের

জল আমি আর দেখতে পারিনা।

বেবতী—(কিঞ্চিৎ উচ্চস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে) মহারাজ ! ছি ছি ! বড় ঘৃণার

কথা ! আপনার কোন অপরাধ নাই, আমার মাথা^১ আমিই খেয়েছি।

নরেন্দ্রকে অন্তঃপুরে ডেকে এনে শেষে এই ফল হল ! মহারাজ ! ও দুৰাচা-
রের মাথা কেটে তুমি তোমার হাত অপবিত্র কবনা, কখনই করনা, আমি
বলছি, আমাব সম্মুখে কুলাস্তাবকে জলন্ত-অনলে প্রবেশের অত্মমতি কর ।
ওর মৃতদেহ যেন আব চক্ষে দেখতে না হয় । যদি আপনার আজ্ঞা অবহেলা
কবে, তবে হাত-পা বেঁধে আঁগুনে ফেলে দেও, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত অস্ত্র
হবেনা, জলে হবেনা, কিছুতেই হবেনা, অনলই এব যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত । এই
যদি পারেন, তবে অমায় পাবেন, নচেৎ আমার মায়া ত্যাগ করুন ।

বীরেন্দ্র—ছি ! তুমি একথা মুখেও এনো না, তুমি আমার প্রাণ, তোমার মায়া
ত্যাগ করলে আমার শূন্যদেহে ফল কি ? আর আমিই বা কি করে বাঁচব ?
তুমি কখনও অমন কথা মুখে এনোনা । অমন দুৰাচার কু-সন্তানের মুখ
দেখতে আছে ? আমি কি পুনরায় ওকে পুত্র বলে সন্মান করব ? স্পষ্টই
বলছি, যাতে তোমার দুঃখ নিবারণ হয়, আমি তাইই করব ।

(নগরপালের সহিত মালতীর পুনঃ প্রবেশ)

মালতী—(করষোড়ে কাঁপিতে কাঁপিতে) মহারাজ ! নগরপাল উপস্থিত ।

বীরেন্দ্র—(ক্রোধযুক্ত স্বরে) নগরপাল ! নরেন্দ্রকুমারকে যে অবস্থায় দেখবে, সেই
অবস্থাতেই হস্তপদ-বন্ধন করে আমার কাছে নিয়ে এস । [নগরপালের
প্রস্থান]

পটক্ষেপণ

দ্বিতীয় রক্তভূমি

ইন্দ্রপুর ; যুবরাজ নরেন্দ্র ও বসন্তকুমারীর শয়ন ঘর ; —যুবরাজ ও
বসন্তকুমারী আসীন ।

নরেন্দ্র—প্রিয়ে ! তুমি যে বাসর-গৃহে বলেছিলে মনের কথা বলব, কই আর কিছুই
বলেনা ? এখনও কি সময় হয় নাই ?

বসন্ত—নাথ ! আমি যে বলবো বলেছি, সে তো বলবই ; আপনাকেও একটি কথা
বলতে হবে । আপনি না বললে আমি বলব না । কখনও বলব না ।

নরেন্দ্র—প্রিয়ে ! দেখ দেখি, এ কেমন কথা ; তোমার কাছে কোন কথা আমার
চাপা আছে ? মনের কথা এমন কি আছে যে, তোমায় গোপন করব ?

বসন্ত—কি জানি, পুরুষের মন।

নরেন্দ্র—আমি তেমন পুরুষ নই যে, উপযুক্ত স্ত্রীর নিকট কোন কথা গোপন রাখব।

বসন্ত—বলবে তো সত্য কললে? বলি, এই যে পত্রখানি আমি তোমার বাস্ত্রে পেয়েছি, এখানি কার লেখা? সই দেখছি রেবতী; সে কোন রেবতী যুবরাজ? লেখার ভাবে বোধ হচ্ছে সে রমণী আমা হতেও আপনার যত্ন করে—মনের সহিত ভালবাসে। আপনি যে দিন যাব হাতে পত্রখানি পেয়েছেন, তাও লিখে রেখেছেন। (নরেন্দ্র মস্তক হেঁট করণ) মাথা হেঁট কললে যে? বলোনা, সত্য করেছে; সে কোন রেবতী? আর কোন মালতী।

নরেন্দ্র—আমি মিনতি করছি ও কথা তুমি আমায় জিজ্ঞাসা করো না, আর অণু বা জিজ্ঞাসা করবে তাই বলব।

বসন্ত—না না, তা হবে না; আপনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, বলুন, না বলে কি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবেন?

নরেন্দ্র—যথার্থই শুনবে।

বসন্ত—শুনবই, না শুনলে ছাড়বনা।

নরেন্দ্র—আর কোন রেবতী, বৃদ্ধতাই পাবে! মালতী দাসীকেও চিনেছ, আর বেশী বলতে পারিনা।

বসন্ত—(আশ্চর্য হইয়া) সে কি? কি কথা! এমন! ছি ছি! নারীকুলে এখনও এমন আছে? দিক নারীর জীবনে! (গালে হাত, নিস্তব্ধ)

নরেন্দ্র—প্রিয়ে! পত্রখানা খণ্ডখণ্ড করে ভস্মসাৎ করে দেও, কি জানি, দৈবাৎ আর কারো হাতে পড়লে একেবারে জীবন্মৃত হতে হবে। পত্রখান দেও। আমি পুড়িয়ে ফেলি।

বসন্ত—(প্রদান) পত্র নিন কিন্তু পুড়িয়ে ফেলবেন না। ছিড়েও ফেলবেন না। আমার কথা রাখুন, পত্রখানা বাস্ত্রের মধ্যে পুরে রেখে দিন, কি জানি—কি হবে।

নরেন্দ্র—আচ্ছা! তবে তোমার কথাই শুনলেম এখন থাক, পরে সাবধানে রাখব। প্রিয়ে! এখন তুমি তোমার কথা বল।

বসন্ত—আমার আরো কথা আছে। আমি অবাক হয়েছি।

নরেন্দ্র—হাসিরথের রে পরস্তু বলেছি, তা বেশ মনে আছে ?

নরেন্দ্র—যাও ! ওসকল কথা মুখে এনো না, আর মনেও করো না, তুমি কি বল-
ছিলে তাই বল ।

নরেন্দ্র—সে কি আর ভুলি ?—বস্তুরে গোধে রেখোছ ।

বসন্ত—তারপর মনে এই স্থির কললেম, যদি আমার চিন্তা-আঙ্কিত, রূপ সভায়
নয়নগোচর না হয়, তবে সেইখানেই আত্মহত্যার দ্বারা প্রাণত্যাগ করব ।
এদিকে বিবাহের দিন উপস্থিত হলো । আমি ভাবতে ভাবতে একেবারে
সারা হলেম । সখীরা, প্রতিবেশীরা, শেষে পিতা এসে কতমতে প্রবোধ
দিলেন, বসন ভূষণ পরতে অনুরোধ কললেন আমার যে কেন বিরসভাব,
কেন যে দুঃখিত মনে আছি, তা তো কেউ জ্ঞানতেন না । মনের কথা কেবল
মনেই জানে । বেশভূষা করতে আমার ইচ্ছা মাত্র ছিল না—পিতার
অনুরোধে বেশভূষা কবে সভায় যেতে হলো । কিন্তু আমি তখন যে কি অব-
স্থায় ছিলাম, তা কিছু মনে নাহ ; কে আমার সঙ্গে করে যে কোন পথে
উপস্থিত করেছিল তাও জানি না, পরে যখন আপনার প্রতি দৃষ্টি পড়েছে,
(মুখপানে চাহিয়া) এই বদনকমল দর্শন করেছি, আহ্লাদে সে সময় যে,
কি করি, কিছুই ভেবে উঠতে পারি নাহ ।

নরেন্দ্র—তাবপব ?

বসন্ত—তারপব, এখন বলতে হাঁসি পাচ্ছে, তখন কেদেছি । শেষে আর অপেক্ষা না
করে কণ্ঠহার—(নগবপালের প্রবেশ, —যুবরাজকে বন্ধন)

বসন্ত—নাথ !—নাথ ! আমার প্রাণনা—(মূর্ছা)

নরেন্দ্র (কাতর স্বরে) নগরপাল । এ কি ? কি কর মলেম !—প্রাণ গেল !

নগর—চোপরাও ! মহারাজকা হুকুম ।

নরেন্দ্র—উহ । উহ । আব সয়না—বন্ধন আলা আর সয় না । নগরপাল !—পিতা
কি অপরাধে আমার প্রতি এমন নিষ্ঠুরতা কললেন ! প্রাণ যে গেল ! বন্ধন
খুলে দেও, আমি তোমার সঙ্গে^{সহ} যাচ্ছি । আমি পালাব না । যাতনা
আর সহ্য হয় না ।

নগর—(ক্রোধযুক্ত স্বরে) মহারাজকা হুকুম, তোমাকে বাঁধকে লে বাগা ।

নরেন্দ্র—(কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া বন্দনকুমারীর প্রতি) প্রিয়ে ! সর্বনাশ করেছে ।

আমার অদৃষ্টে কি আছে—বলতে পারি না। কি জানি, যদি আরও
না হয়। একবার ওঠো।

বসন্ত—(নেত্র উন্মীলন করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে) নাথ ! তোমার এ-দুর্দশা
কেন ? তোমায় কে বেঁধেছে ? (নগরপালের প্রতি দৃষ্টি করিয়া পুনরায়
মূর্ছা)

নরেন্দ্র—হায় হায় ! এ দুর্দশা আর প্রাণে সয় না। নগরপাল ! আমি মিনতি
করছি ক্ষণকাল-জগৎ বন্ধন মুক্ত কর—আমি বসন্তকুমারীকে সাধনা করি।
বসন্তকুমারীর দশা আমার আর সহ হয় না।

নগর—(কর্কশ স্বরে) সো হোগা নেই।

নরেন্দ্র—(দণ্ডায়মান হইয়া বসন্তকুমারীর প্রতি) প্রিয়ে। তবে আমি বিদায় হই।

বসন্ত—(ক্ষণকাল পরে) মনে করি, এইবার দেখলে বুঝি আঁধার বোদন-বদনও
দেখব না—বন্ধন দশাও দেখব না। নাথ ! —সেই আশায কবাব চোখ
বুজ্জলেম—চাইলেম, তবু বন্ধনদশা !—সেই বোদন-বদন ! বলো তো তুমি
কি অপরাধে অপরাধী ? হে বাজপুত্র ! তুমি কার কি মন্দ কবেছ ? তুমি
কার কি ধন চুপি কবেছ ? তোমাতে চোরের চেয়েও যে, কঠিন বেঁধেছে।
(উপবেশন) সত্যি সত্যি যদি কোন অপরাধে অপরাধী হয়ে থাক, তবে
তার প্রতিশোধ কি ধনে হয় না ? তোমার পাব ধরি খুলে বল। তার
প্রতিশোধ কি হবে না। আমার সমস্ত অলঙ্কার দিচ্ছি, বহনুলা পটবসন
দিচ্ছি, আমার যে সম্পত্তি আছে, তাও দিচ্ছি, তাও যদি শোধ না হয়,
আমার প্রাণ দিচ্ছি, তোমায় কেউ যেন কিছু বলে না। (নগরপালের প্রতি)
তোমার কি কিছুমাত্র দখা নাই ? যার নয়নজল পড়লে হৃদয় বিদৌর্ণ হয়
—পাষাণও গলে যায় তোমার প্রাণ কি পাষাণের চেয়েও কঠিন ? বক্ত-
মাংসের শবীর যে এমন এ আমি কখন দেখি নাই। কারো মুখেও শুনি
নাই। হঠাৎ বন্ধনে নাথের বিরস-বদন দেখেও কি তোমার অন্তরে দয়া
হল না ? ঐ মুখের কাতর স্বর শুনেও কি তোমার মন যেমন তেরনি
খাকল ? কিছুই মায়া হলো না ? ঐ চক্ষের জল দেখে এখনও যে বিশাল-
নয়নে চেয়ে রয়েছ, যন্ত তোমার কঠিন প্রাণ ! (বোদন)

নরেন্দ্র—রাজার আজ্ঞা, নগরপাল কি করবে ?

বসন্ত—কি ? —রাজার আজ্ঞা ! তুমি এমনই কি অপরাধ করবে যে, পিতা হয়ে পুত্রের প্রতি এমন নিষ্ঠুর আজ্ঞা কলঙ্কিত ?

নগর—(হস্ত-স্থিত রজ্জু ধরিয়া যুবরাজকে আকর্ষণ) আর দেরি করণে নেহি সাকতা ।

বসন্ত—হায় হায় ! প্রাণ যে গেল নগরপাল ! তোমার পায়ে ধরি । আর অমন করে টেন না । এই কণ্ঠহার তোমায় দিচ্ছি, ক্ষণকাল অপেক্ষা কর আমিও নাথের সঙ্গে যাব । (হার প্রদান)

নগর—মহারাজ কা হুকুম, কা করোগা, (হার গ্রহণ, যুবরাজের বন্ধন মোচন)
নরেন্দ্র—না—না, তুমি আমার সঙ্গে যেওনা, এ হতভাগার সঙ্গে গিয়ে তুমি কেন অপমানা হবে ! আমার অদৃষ্টে যা থাকে, তাই হবে । তুমি ঘরে থাক ।

বসন্ত—তোমার এই দশা দেখে আমি ঘরে থাকব ? তোমার মান চেয়েও কি আমার মান অধিক ? তুমি যেখানে যাবে, আমিও সেখানে যাব । আমা-
দের দুজনকে দেখেও কি মহারাজের মনে একটু দয়া হবে না ?

নরেন্দ্র—(কাতর স্বরে) তুমি রাজার নিকটে যেওনা, আমিই একা যাই ।

বসন্ত—মিনতি করে বলছি, এই দুটি চরণ ধরে প্রার্থনা করছি, (পদধারণ) আমায় নিয়ে চলুন ।

নরেন্দ্র—যদি একান্তই যাবে, তবে চল । [সকলের প্রস্থান]

(নেথথো গান)

রাগিনী বেহাগ—তাল আড়া ।

মিছে কেন মিছে তবে এত অহঙ্কার ।

ভাবিতে কি হবে তবে হেন সাধা কার ॥

ছিলাম রমণী মনে,

প্রেমরসে আলাপনে,

মিছে প্রণয় বন্ধনে,

করি হাহাকার ।

মনে ছিল মত আশা,

সকলি হলো নিরাশা,

জড়িল আগর দ্বারা,

হেরি অন্ধকার।

আমার যুগল করে.

কঠিন বন্ধন করে,

পরান কেমন করে.

বাঁচিনে যে আর ॥

তৃতীয় রঙ্গভূমি

ইন্দ্রপুর, বেবতার শয়নমন্দির.—বেবতা, খালতী, বৌবেন্দ্র সিংহ, বৈশম্পায়ন, নবেন্দ্র, বসন্তকুণ্ডাবী, নগরপাল, প্রতিহারী প্রভৃতি উপস্থিত।

বৌবেন্দ্র—(ক্রোধযুক্ত স্বরে) বে ভায়া! রে কুলাঙ্গার! তুই এখনও আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছিস? তুই না পণ্ডিত হয়েছিলি? নানা শাস্ত্রে বিশারদ হয়েছিলি? তার ফল বুঝি এই ফললো? তোর এতবড় আত্মপক্ষা, ধন্য বলেও তোর ভয় হলো না? রে পাণ্ডা! তোর মুখ দেখলেও প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। এই অসি দ্বারা (অসি প্রদর্শন) স্বহস্তেই তোর মস্তক ছেদন করতেন, তা করবো না। তুই যে পাপ করেছিস, তোর মাথা কেটে কি পবিত্র হস্তকে অপবিত্র করবো? তোর শোণিতাক্ত শিরমুক্তিকায় লুপ্তিত হয়ে কি ইন্দ্রপুরের গৌরব লোপ করবো? বৌবেন্দ্র সিংহের রাজ-পুরীয়ে মহত্ব যাবে? তোর পক্ষে এই দণ্ডাজ্ঞা যে, ঐ প্রজ্জলিত অনলে প্রবেশ করে আত্মবিসর্জন কর। যদি আমার আজ্ঞা অবহেলা করিস, তবে এই দণ্ডেই তোর হস্তপদ বন্ধন হবে এই জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করবো।

নবেন্দ্র—পিতঃ। আমার হস্তপদ বন্ধন করে আগুনে ফেলতে হবে না। আপনি যখন আজ্ঞা করেছেন: তখন সে আজ্ঞা শিরোধার্য। তবে আসন্নকালে এই নিবেদন, আমি কি অপরাধে অপরাধী, সেইটি স্তনতে চাই! যদি কোন অপরাধও না করে থাকি, আর আপনি ইচ্ছা করে আমায় অনলে আত্ম-সমর্পণ করতে অঙ্গুমতি করছেন, তাও বলুন। আমি সন্তোষ হৃদয়ে আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করে পুত্রের কাজ করছি।

বৈশম্পায়ন—যুবরাজ! আপনি রাজমহিষীর পবিত্র সতীত্বের নিকট অপরাধী, হতবাক আপনি দণ্ডনীয়! মহারাজ রাণীর নিকট প্রতিজ্ঞা করেছেন, অতীত আপনার প্রাণবিনাশ করে সমুচিত দণ্ডবিধান করবেন।

নরেন্দ্র—(নিস্তব্ধ) হা ভগবান ! (বসন্তকুমারীর প্রতি) প্রিয়ে ? আর কেঁদো না ।

এ কাঁদবার সময় নয় । কাঁদলে আর কি হবে পিতার আজ্ঞা ! তুমি আমার জন্মশোধ বিদায় দেও । পিতা : ! আমি বিদায় হলেম ! —মা রেবতী ! আমারে জন্মেব মতন বিদায় দিন !

বসন্ত—(সরোদনে) নাথ । আমি যে চিরসঙ্গিনী, যেখানে যাবেন আমিও সেখানে যাব ! (বোদন)

নরেন্দ্র—প্রিয়ে ! সে কি কথা ? তুমি এখনও বুঝতে পার নাই ? আমি জন্মেব মত বিদায় হচ্ছি ।

বসন্ত (উচ্চবোদনে) তা কখনই হবে না । —বসন্তকুমারী তোমারে কখনই প্রাণ থাকতে অসহায় হয়ে অনলে প্রবেশ করতে দেখবে না । আপোঁ আমিই আগুনে ঝাঁপ দিব । এও কি কখনও হয়, যে, পতির মরণ স্বচক্ষে দেখে সত্য-স্ত্রী জীবনধার করে থাকে ? নাথ । এই দেখুন সেই বিবাহের রাত্রে । অলঙ্কার অঙ্গেই আছে, পায়েব আলতা পায়েই আছে, সিতার সিঁচবও মলিন হয়নি, এই বেশেই পতির সঙ্গে অনলে প্রবেশ করবো । মিনতি কবে বলছি চিরসঙ্গিনী অভাগিনীয চক্ষের পথে একবার দাঁড়াও, আমি তোমার সম্মুখে ঐ জলন্ত অনলে প্রবেশ করি ।

নরেন্দ্র—তবে প্রস্তুত হও ।

বসন্ত-- আমি প্রস্তুত আছি । কেবল আজ্ঞার অপেক্ষা !

নরেন্দ্র—(পিতৃচরণে প্রণাম করিতে উত্তত) পিতা : ! বিদায় হলেম ।

বীরেন্দ্র—পায়র ! তুমি আমার স্পর্শ করিস না । কখনই করিস না !

নরেন্দ্র—(স্নান মুখে) মন্থীবর ! নরেন্দ্র অত জন্মেব মত বিদায় প্রার্থনা করছে । মন্থীবর ! আপনি শৈশবকাল হতে আমার বে এত স্নেহ করেছেন, হস্তভাগা দ্বারা তার প্রতিশোধ কিছুই হলো না । সমস্ত অপরাধ মার্জনা করবেন, আব প্রিয়বন্ধু শরৎকুমারকে বলবেন, নরেন্দ্র শিষ্টআজ্ঞা পালনে অনলে আত্মবিসর্জন করেছে । (শরৎকে উদ্দেশ্যে) প্রিয়মিত্র শরৎ ! মরণ সময় তোমার সঙ্গে দেখা হলো না ? মনের কথাও বলতে পারিনি না । মিত্র ! আজ্ঞাতে যদি কোন অপরাধ করে থাকি, মার্জনা করো । বন্ধু ভেবে কোনদিন যদি কিছু রূঢ় কথা বলে থাকি, মার্জনা করো । পুষ্পাসিগদ !

জননী মৃত্যু সময় তোমাদের হাতেই আমার সঁপে দিয়ে গিয়েছিলেন, আমি তোমাদের কিছুই উপকার কবতে পারলেম না মার্জনা করো! মা বেবতী! বিদায় হই! জন্মের মত বিদায় হই। (পাশে! মাতৃহীন নরেন্দ্র আজ জন্মশোধ বিদায় হলো। (পদদ্বয় গমন এবং পুনরায় পশ্চাৎদিকে ফিরিয়া রাজার প্রতি) পিতঃ! --(বসন হঠতে পত্র লইয়া) এই পত্রখানা একবার পাঠ করবেন। পত্র দান বসন্তকুমারীর হস্ত ধরিয়া উভয়ে খনলে প্রবেশ)

বীরেন্দ্র—(পত্র হস্তে করিয়া) নরাদমের পত্র পড়ব? না, পড়ব না। ও পাপাত্ম্য পত্র হাতে করাই অগ্নায় হয়েছে। (ছিন্ন করিতে উত্তত)

বৈশ—(করষোড়ে) মহারাজ! পত্রখানা নষ্ট করবেন না। যুবরাজ আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য করে অনলে আত্মসমর্পণ কললেন। তাঁর প্রতি আর কোপ কেন? তাঁর পত্র পড়তে হানি কি? একবার দৃষ্টি করুন। অবশ্যই কোন কারণ থাকতে পারে।

বীরেন্দ্র—(পত্র খুলিয়া মনে মনে পাঠান্তে মালতীর প্রতি দৃষ্টিপাত) মালতী!

মালতী—(ক্রন্দন করিতে করিতে রাজার পদধারণ) দোহাই ধর্মাবতার! আমি কিছু জানি না। আমার কোন অরাধ নাই। রাণী এই পত্র লিখে যুবরাজের হাতে আমার দিতে বলেছিলেন, তাই আমি দিয়েছি। দোহাই ধর্মের! আমি আর কিছু জানি না। যে দিন বাণী পত্র লেখেন, সেই দিন আপনি এই পত্র রাণীর থেকে কেড়ে নিয়েছিলেন। আমার আপনি ফিরিয়ে দিলেন। আমি আর কিছু জানি না। আজ যুবরাজ রাণীর সঙ্গে কোন কথা কওয়া দূরে থাক, অন্তঃপুরেই আসেন নাই। মিছামিছি একটা ছল করে গায়ের গহনা খুলে মাটিতে পড়ে ছিলেন।

রাজা—(আতঙ্কে) নরেন্দ্র! —আমার নরেন্দ্র! —বিনা অপরাধে! —আমার নরেন্দ্র! নরেন্দ্রের কোন অপরাধ নাই! হায়! হায়! চুস্চারিণী বেবতীর ছলনায় আমার নরেন্দ্রকে! —প্রাণের নরেন্দ্র! —ওরে পাপীয়সি! রে পিশাচী! —তোয় শাস্তি—(সজোরে তরবারি আঘাত)

নরেন্দ্র—(ভূতলে পড়িয়া) যুবরাজ! আমিই তোমার জীবন-নাশের মূল। আমার সমুচিত শাস্তি হয়েছে। —হ-য়ে-ছে—যুব-রাজ! (প্রাণত্যাগ)

বীরেন্দ্র—(মরোদনে) মস্ত্রীবর ! পিশাচীর শাস্তি হয়েছে ! হায় হায় ! আমার কি হলো ! আমি কোথা যাব ! আমার নরেন্দ্র ! নরেন্দ্র ! আমি তাকে আশুনে পুড়িয়ে মেরেছি হায় হায় ! কি অধ্যক্ষের কাজ করেছি ! বিনা-অপরাধে, বিনাদোষে আমার কলতিলককে,—আমার বংশের শিরোমণিকে,

—আশুনে পুড়ে মারলেম ! হায় হায় ! আর্ ! কি পাষণ্ড,—কি নিষ্ঠুর,—প্রাণাধিকারী বসন্তকুমারীর প্রতি ফিবেও চাইলাম না ! মা আমার নরেন্দ্রের সঙ্গেই এখনো প্রবেশ কললেন ! আমি সেদিকে ফিরেও চাইলাম না ! ধিক আমার জীবনে ! (মস্ত্রীর হস্ত ধরিয়া ক্রন্দন করিতে কবিতো) মস্ত্রীবর ! আমার কি হবে ? আমি কোথা যাব ? আমি দুর্দ্যুতি রেবতীর কথায় ভুলে প্রাণাধিক সন্তানের প্রতি এগন নিষ্ঠুর আচরণ কললেম ! মায়াবিনীর মায়ায় ভুলে পুত্রের মায়া বিসর্জন কললেম ! হায় হায় ! দুঃচারিণীর হাত থেকে পত্রখানা কেড়ে নিয়ে পাঁচ নাই, আমার মত নরাদম নির্বোধ আর কে আছে ? আমার মত পামাবর মুখ দেখতে নাই ! মস্ত্রীবর !
—আমার নরেন্দ্র কি যথার্থই আশুনে পুড়েছে ! নরেন্দ্র ! (পতন ও মুচ্ছা)

মস্ত্রী—(জল সেচন) এখন দুঃখ করলে আর কি হবে ?

বীরেন্দ্র—(কিঞ্চিৎপরে চেতন পাইয়া) হা ! আমার প্রাণ এখনও পাপদেহে রয়েছে ! নরেন্দ্রই যদি প্রাণত্যাগ কলনো, তবে আমার জীবনের ফল কি ? এ পাপাত্ম্য জীবনে ফল কি ? হায় হা ! কি বলেই বা দুঃখ করি ! কোন মুখেই বা নরেন্দ্রের নাম উচ্চারণ করি ! মস্ত্রীবর ! যথার্থই কি আমার নরেন্দ্র জীবিত নাই ! সত্য সত্যই কি আশুনে পুড়ে মরেছে ! আমি সেই আশুনে দেখব ! আর সহ্য হয় না ! (শিবে কণাঘাত করিতে করিতে গমন) হায় ! হায় ! এই আশুনে পুড়ে আমার নরেন্দ্র মবেছে ! (অগ্নির দিকে দৃষ্টি-পাত কবিয়া উচ্চস্ববে । অগ্নিদেব ! আমার নরেন্দ্র দাও ! —প্রাণাধিক নরেন্দ্র ! —নিরপরাধী শিশু ! —আমার নরেন্দ্রকে ফিরিয়ে দাও ! নরেন্দ্র প্রাণের নরেন্দ্র ! বিনাদোষে বিনা-অপরাধে প্রাণের নরেন্দ্রকে আশুনে—হায় ! হায় ! প্রাণের সন্তানকে আশুনে পুড়িয়ে মাললেম ! উহ ! কি নিদারুণ কথা—দুঃচারিণীর পত্রখানা হাতে করেও সে সময় পড়ি নাই, কি ক্লেশক —সত্যই ক্লেশকিনী আমাকে ক্লেশকজালে আবদ্ধ করেছিল ! ধিক

আমাকে ! দিক আমাকে ! বাছা নবোত্তম । কোলে আয় ! আর মঙ্গল হই
না, বাপ ! কোলে আয় ! (অস্তিতে প্রবেশ) ।

মন্ত্রী—হায় ! হায় ! একি হইল । সৰ্বনাশ হইল (শিবে কবাঘাত কবিত্তে কবিত্তে)
হায় ! “বুদ্ধস্ত তকুণী ভাষা” “বুদ্ধস্ত তকুণী ভাষা” শিবে কবাঘাত
কবিত্তে সকলেব প্রস্থান ।

সম্পূর্ণ ।

গো-জীবন

প্রথম প্রস্তাব

গো-কুল নির্মূল আশঙ্কা

ভারতের অনেক স্থানে গোবধ লইয়া বিশেষ আন্দোলন হইতেছে। সভা সমিতি বসিতেছে, বক্তৃতা শ্রোত বহিঃ নছে, ইংরেজী বাঙ্গলা সংবাদ পত্রিকায় হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধসকল প্রকাশ হইতেছে, কোন কোন স্থানে হিন্দু মুসলমান একত্রে, একপ্রাণে, একযোগে গোবধ বন্ধাব উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। কোন কোন ইংবেজী পত্রিকায় আবাব প্রতিবাদও চলিতেছে। এ সমস্ত আর নিরব পাকা উচিত মনে কবিলাম না।

আমি মোসলমান—গোজাতিও পরম শত্রু। আমি গো-মাংস হজম করিতে পারি। পালিয়া, পুখিয়া বড় বলদটির গলায় ছুবি বসাইতে পারি। ধর্মের দোহাই দিয়া দুগ্ধবতী গাভী, দুগ্ধপায়ী গো বংশের প্রাণসংহাব করিয়া পোড় উদর পরিপোষণ করিতে পারি, কিন্তু ন্যায় চক্ষে যাহা দেখিতেছি যুক্তি ও কারণে যাহা পাইতেছি, তাহা কোথায় ঢাকিব? স্বাভাবিক ভাব কোন ভাব বেশে গোপন করিব? মনে এক মুখে আর হইল না। প্রিয় মৌলবী সাহেব! মার্জনা করিবেন। মুন্সী সাহেব! ক্ষমা করিবেন। স্ত্রী সাহেব! কিছু মনে করিবেন না। কি করি, জগত পবানীন—কিন্তু মন স্বাধীন। যদি কোন মোসলমান ভ্রাতা এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করেন, অল্পগ্রহ কবিয়া আহমদী পত্রিকায় প্রকাশ করিলে বিশেষ বাঞ্ছিত হইব।

আমাদের মধ্যে “হালাল” এবং “হাযাম” দুইটি কথা আছে। হালাল গ্রন্থীয়, হারাম পরিত্যাজ্য। একথাও স্বীকার্য যে—গোমাংস হালাল, খাইতে বাধা নাই। অগ্নিমাংস ও অন্তমতে (সাকি) হালাল। আমার মতে (হানিকি) হালালও বলিতে পারি না, স্পঃ হারামও বলিতে পারি না। মাঝামাঝি একটা নামও আছে (মকরুহ) আরো এই সাকি মতে জলদ্রব্য মাদ্রাই হালাল। দুইটি জলে একথা বলিতে পারি যে বজ্রকেব পদ যতটুকু জলের মধ্যে বস্তু ধৌত সমস্ত

ডুবিয়া থাকে সার্বি মতের দায় দিয়া সে মনুষ্য পদটুকুও জল মধ্য হইতে কাটিয়া লইয়া কলসা, পোড়া, সিদ্ধ, স্তব্ধা, যাহার যেক্রপ অতিক্রম হয় করিয়া উদরে মেল, কোন চিন্তা নাই, কখনই পরে খাওয়া নাম উঠিবে না।—ইহাও শাস্ত্রের কথা। কিন্তু শাস্ত্রে একথা লিখা নাই যে গোহাড কামড়াতেই হইবে, গোমাংস গল্লেখ করিতেই হইবে, না করিলে নরকে পচিতে হইবে। বরং যাহা অথাত্ত—যথা বরাহ সে বিষয় পবিত্র কোরান শরিফে স্পষ্টভাবে বরাহ নাম উল্লেখ “খাইওনা” (হারাম) লিখা আছে। খাইলে প্রধান নরক “জাহান্নাম”, তাহাতেই চিরবাস করিতে হইবে, আর নিস্তার নাই। খাত্ত সম্বন্ধে বিধি আছে যে খাওয়া খাইতে পারে, খাইলেনই হইবে, গোমাংস না খাইলে মোসলমানি থাকিবে না, মহাপাপী হইয়া নরক যন্ত্রণা ভোগ কবিত্তে হইবে—এ কথাও কোথাও লিখা নাই।

খাইবার অনেক আছে। ঘোড়া খাইতে পারি;—খাইনা। ফড়িং ধরিয়া স্বতে ভাজিয়া টপাটপ্ গিলিতে পারি—শাস্ত্রের কথা,—গিলি না। গোমাংস উদরমাৎ করিতে পারি—বিধি আছে, ভয়ে তাহার নিকটেও যাই না। ছাগলের মধ্যে পাঁঠাও খাত্ত, সে পাঁঠার দিকে তও ঘোঁষনা, যে ছাগিতে দুগ্ধ দেয় তাহাকেই “আল্লাহ আকবা” শুনাই। পাঁঠার সঙ্গে একেবারেই যে সম্বন্ধ নাই তাহা বলিতে পারি না। রসনা পরিতৃপ্ত আশ্রয়ে তাহার বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা রহিত করিয়া দিয়া দিকি মোটাগোটা চাকদার জিনিস বানাইয়া কোরমা, কালিয়া, কাবাবে পেট পুরিয়া থাকি। উট এদেশে নাই, থাকিলেও তাহার কাছে যাওয়া যাইত না। কারণ শরীরের গঠন দেখিয়াই পাকস্থলী ঠাণ্ডা হয়। মহিব খাত্ত, তাহার কাছে ছুরি হাতে করিয়া যায় কে? কাজেই নিরীহ গোজাতির গলায় ছুরি বসাইতে আর এদিক ওদিক চাহি না। এত খাত্ত থাকিতেও কি গোমাংস না খাইলেই চলে না? ঘোড়া, মহিব, বনগরু, মেঘ, ছাগল, মৃগ, খরগোস সকলি তো চলিতে পারে? এ সকল খাইলেও তো ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়। এত থাকিতে গরুর মাংসে জিহ্বার গুল পড়ে কেন? ইহার উত্তর কে দিবে?

গো হুজ্জেই আমাদের জীবন। দশ মাস মায়ের উদরে বাস করিয়া জগতের মুখ দেখিতেই যেমন ক্ষুধায় কাতর হইয়া কাঁদিতে থাকি, সে সময়,—হায়! অমন কঠিন সময়ে কিসে আমাদের প্রাণরক্ষা হয়? মনে মনে একটা কথা উঠিতেছে—মায়ের তো দুগ্ধ আছে? আছে। কিন্তু গোরুস মায়ের উদরকে গলে মায়ের

স্তনে দুগ্ধ পাই কই ? মাগেব স্তনে দুগ্ধ থাকা সত্ত্বেও অনেকেই গোরসে জীবন রক্ষা করিয়াছে । মিষ্টান্নে, পক্ষান্তে সত্ত্বজাত নব শিশুর প্রাণরক্ষা হয় না। দুগ্ধই জীবের জীবন । জগতে দুগ্ধ ছাড়া এমন কোন একটি খাজ নির্দিষ্ট নাই যে শুধু সেই খাজটি খাইয়া জীবনধারণ কবা যায় ।

গোরসই বঙ্গের উপাদেয় খাজ । শুধু অল্পস্থ শরীরে, এমন কি প্রাণসঞ্চার হইতে বিয়োগ পর্যন্ত দুগ্ধের প্রয়োজন ; সেই দুগ্ধের মূল গোধনকে উদরসাৎ করিয়া ফেলিলে আব কি রক্ষা আছে ! কালের মাংসাত্ম্য যদি দুগ্ধের উপকারিতা অস্বীকার কবি, মাংস খাইতে শিথিয়াছি বলিয়া যদি দুগ্ধেব কথা মনে না করি, তজ্জাত উপকারী পশু প্রতি সদয়ভাবে সদবাবহাব করিয়া তাহাদের জীবনরক্ষা করিবার চেষ্টা করিলে তাহাতে ক্ষতি কি ? বড় হইয়াছি আর দুগ্ধের ধার কে ধারে ? কিন্তু এদেশে গো জাতিয় সাহায্য ব্যতীত বলুন তো কোনরূপ খাজ প্রস্তুত হইতে পারে ? কখন না । বে খাজই প্রস্তুত কবিলে গো জাতির উপাসনা কবিতাই হইবে । এদেশে অল্প কোন পশুর দ্বারা ভূমি কৰ্ষণের প্রথা প্রচলিত নাই । কাজেই বলদেব দণ্ডকার । প্রথম কৰ্ষণ, কার্যকিত, মাড়াই করিতে কাহার সাহায্য আবশ্যক ? গ্রহন গোরত্বকে মারিয়া, কাটিয়া, গলায় ছুরি বসাইয়া উদরসাৎ করিলে অল্প খাজেব আশা আর থাকে কোথা ? মানিলাম—বৃদ্ধি খাটাইয়া বিনা বলদে ভূমি আবাদ করিতেও ক্ষমতা আছে—কল কৌশল খাটাইয়া খাজাদি প্রস্তুত করারও উপায় আছে, কিন্তু একাধারে এত শুণ আর কাহাব ? সে অপরিমীম গুণ সকল কি কাঁবয়া ভুলিয়া যাই । কোন পণে মুগ্ধ হইয়া গোজাতির অসীম গুণ ভুলিব । ভ্রাতাগণ ! আমি তো কিছুই দেখিতে পাই না । দ্রাতঃ ! জগতে কাহার বিষ্ঠার কে কবে আদর করিয়াছে ? আমবা গোবিষ্ঠা অপবিত্র মনে করি কিন্তু যথার্থ হিন্দুগণ ঐ বিষ্ঠাবই বা কত আদর করেন । শুধু বিষ্ঠা কি আর আমাদের আদরের নহে ? গোবৃত্তেও উৎকট ব্যাধি আরোগ্য হয় । পুত্র, কন্তা, ভ্রাতা-ভগ্নীর সহিত জীবনেই সম্বন্ধ । যত উপকার, যত সাহায্য, যত লাভ, দেহে প্রাণ থাকিতেই সম্ভবে,—মানব জীবনে আশাও তাহাই । কিন্তু ভাই ! গোজাতি মরিয়াও আমাদের উপকার সাধন করিতেছে । আহা ! প্রথম দুগ্ধ দিয়া প্রাণ বাঁচাইল, পরে শরীর খাটাইয়া তোমার সংসার চালাইল, মরিয়াও তোমার সহস্র প্রকার উপকার করিল,—গায়ের চামড়া দিয়া তোমার পথসেবা করিল—আর

চাও কি ? তাহার শরীরের শিবাই কি ফেলিবার জিনিস। অস্থির দ্বারা তোমারই প্রয়োজন সাধিত হইতেছে। অকস্মাৎ অস্থিগুলির কথাই কি ভুলা যায়। নিজে চূর্ণিত হইয়া চিনি, লবণ পরিষ্কার কবিয়া তোমারই খাওয়ার সুবিধা করিতেছে। এত উপকারী যে তার গলায় ছুরি দিতে মনে কি একটুকুও দয়ার সঞ্চার হয় না ? উদর পরিপূর্ণ করিবার বিস্তর জিনিস আছে। নানাবিধ মাংস আছে, মৎস্য আছে, সব ইচ্ছা তত খাও, কিন্তু উপকারী পশুর প্রতি নির্দয় ব্যবহার করিও না। ভাইরে ! তাহার জীবনের কষ্টক হইও না।

আর একটি কথা। এই বঙ্গরাজ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিই প্রধান। পরস্পর এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, ধর্মে ভিন্ন, কিন্তু মর্মে এবং কর্মে এক—সংসার কার্যে ভাই না বলিয়া আর থাকিতে পারি না। আপদে বিপদে, সুখে দুঃখে, সম্পদে পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন উদ্ধার নাই। স্বপ্ন নাই, শেষ নাই, বন্ধার উপায় নাই। এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সাহাদেব সঙ্গে এমন চিরসঙ্গি বাহারা, তাহাদের মনে ব্যথা দিয়া লাভ কি ?

ধর্মে আঘাত লাগে না, গোমাংস পরিত্যাগ করিলে ঘরকন্নারও ব্যাঘাত জন্মে না। উন্নতির পথেও কাঁটা পড়ে না। প্রাণের হানিও বোধহয়—হয় না। এ অবস্থায় গো হিংসা পরিত্যাগ করিলে হানি কি ? পরিত্যাগে নিজের কোন ক্ষতি নাই, অথচ চির সহযোগী ভাতার মনরক্ষা, ধর্মরক্ষা, আব বাহা রক্ষা, তাহা বার বার বলিব না। যাহাতে সকল দিক রক্ষা হয় সে তাগে ক্ষতি কি ? ভাইরে ! এই বঙ্গরাজ্যে হিন্দুর সহিত গাঙ্গ না হইয়া যদি খুঁটানের সহিত এসবাস হইত আর তাহাদের প্রতি ঘরে ঘরে—আমোদে, আশ্লাদে, বিবাহে, শ্রাদ্ধে, পণে-ঘাটে, মাঠে, বাজারে—প্রকাশ্য স্থানে শূকর বধ হইত, তাহা হইলে আমাদের দশা কি ঘটিত ? ঐ মহানগর কলিকাতায় নিউমার্কেটে এখন যে প্রকার গোমাংস বিক্রয় হয়, ঐরূপ যদি শূকর মাংস বিক্রয়ের দোকান খুলিত তবে আমাদের মনে কি ভাব হইত ? কি কথা মনে উঠিত ! তাহা কি ভাবা যায়,—না মুখে বলা যায়। তবে রাজবিধিতে সকলের মাখাই নওয়াইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু মনের আশ্রয় মনেই জলিতেছে, পূর্বেই বলিয়াছি জগত পরাধীন—মন স্বাধীন। আমাদের রাজার চক্ষে শূকর গরু উভয়েই সমান। কাজেই তাহাদের মনে হিন্দু মুসলমানের মধ্যস্থিত কোন বিষয় ধারণা নাও হইতে পারে। তাই বলিয়া কি

আমরা বুকের ছাঁতি ফুলাইয়া রাজবিধিতে বারণ নাই—গোবধে দণ্ড নাই বলিয়া
 দ্বাতার মনে মর্মান্তিক আঘাত করিব ? আমার মতে একথা কথাই নহে । কালে
 আমবা বাজাকে পরিত্যাগ করিতে পারি । বাজাও আমাদিগকে পরিত্যাগ
 করিতে পাবে । কিন্তু হিন্দু মোসলমানে কেহই কাহাকে পরিত্যাগ করিতে
 পারে না । —পরস্পর কেহই কাহাকে ছাড়িতে পারে না । জগত যত দিন—
 সম্বন্ধে ততদিন । এমন গুরুতব সম্বন্ধ যাহাদের সঙ্গে তাঁহাদের মনে বাধা দিতে
 আমাদের মনে কি একটুক বাধা লাগে না ।

প্রস্তাব উপসংহার কালে আর একটা কথা মনে পড়িল । তাহার মীমাংসা
 না করিয়া কিছুতেই এ প্রস্তাব শেষ করিতে পারিলাম না । মোসলমান ভ্রাতাগণ
 যদি বলেন, উপকারীজনের উপকাৰ মনে করিয়া, কি হিন্দু ভ্রাতাগণের মর্মান্বাহতেব
 কথা শ্রবণ করিয়া গোবধ যেন বন্ধ করিলাম, কিন্তু জগতের একমাত্র সহায় বল,
 আশ্রয় যাহা কিছু বল—সকলি ধর্ম । ধর্ম সার-ধর্মই মূল । সেই ধর্ম, সেই
 এসলাম ধর্মে বলিতেছে কোরবানি কর । মানিলাম বিধি আছে, সে বিধি লঙ্ঘনের
 উপায় নাই—তাহা যথার্থ । কিন্তু ভাই । সে তো বৎসবের মধ্যে একদিন মাত্র ।
 তাহা হইলেও অনেক মঙ্গল । অতি কম হইলেও সমগ্র ভারতে প্রতিদিন পঞ্চাশ
 হাজার গোবধ পাকস্থলিতে মজিয়া বাইতেছে । অতি কম হইলেও হাজার গোবৎস
 কেবল স্বক্ৰিয়ায় উড়িয়া বাইতেছে, এগুলি তো রক্ষা পাইবে । অমুমানের কথা
 নহে, কল্পনাবও চিত্র নহে, আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি নির্দয় কসাইগণ যে সময় সেই
 একক্ষ, কি মাসেক বয়সের গোবৎসগণের পা বাঁধিয়া ঝাঁকায় তুলিয়া মাথায়
 করিয়া বধ্যভূমিতে লইয়া যায়, তখন মানুষ মাত্রেই চক্ষে জল আইসে, হৃদয়ে
 ভয়ানক আঘাত লাগে । আহা ! গোবৎসগুলির সেই সময়ের কাতর রব শুনিলে
 মনে যে কত কথারই উদয় হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না । সাধ্য নাই, ক্ষমতা
 নাই—কি করি ! যাক সে চিন্তা, সে কথা বৃথা ! যে কথা বলিতেছিলাম, বৎসবে
 একদিন কোরবানি না দিলেই নহে । ইহা স্বীকার্য্য । মোসলমান মাত্রেই একথা
 স্বীকার্য্য । কিন্তু কোরবানির কারণ কি ? কেন কোরবানি (বলি) প্রথা প্রচলিত
 হইল, ইহার গুঢ়তম প্রতি আমাদের অর্থাৎ ভারতীয় মোসলমান সমাজের একে-
 ন্নারে দৃষ্টি করা আবশ্যক । সাধারণ জ্ঞানে যে ‘ইদজ্জহায়’ গরু কোরবানি না
 করিলে ধর্ম বজায় থাকে না, মোসলমানিচ্ছ রক্ষা পায় না—এটি সম্পূর্ণ ভুল ।

আমি শাজ্জ দ্বাধা দেখাইব, প্রমাণ করিব যে, গরু কোরবানি না দিয়াও ধর্ম রক্ষা হইতে পারে। মোসলমানিত্ব অটলভাবে থাকিতে পারে।

অতি প্রাচীনকালে হজরত এবরাহিম খলিলল্লাহ এক রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন যে, স্বয়ং ঈশ্বর আদেশ করিতেছেন 'এবরাহিম! আম'র নামে বলি দাও'—প্রাতে এবরাহিম একশত উট বলি দিলেন। রাত্রে পুনরায় স্বপ্ন দেখিলেন যে, ঈশ্বর বলিতেছেন, এবরাহিম! তোমার বলি গ্রহণ করি নাহ। বলি দও। শব্দদিন মহাশয়ি এবরাহিম পুনরায় শত উট বলি দিলেন। বিধাতার লীলা বুঝিতে সাধ্য কার? তৃতীয় রাত্রে পুনরায় স্বপ্ন দেখিলেন ঈশ্বর বলিতেছেন, এবরাহিম তোমার বলি গ্রহণ হয় নাহি; বলি দও। যোর তপস্বী এবং ঈশ্বর ভক্ত এবরাহিম স্বপ্নাবেশেই মহা নীত হইয়া বলিলেন, প্রাতে। এ দাস আজ্ঞাব তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিতেছে না। তিনদিনে তিনশত উট বলি দিয়াছি, গ্রহণ হইল না। এইক্ষণে আমি কি বলি দিয়া আজ্ঞা প্রতিপালন করি। বলির উপযুক্ত আমার আব কি আছে? উত্তর হইল, এবরাহিম! তোমার বিশেষ ভালবাসা যে, তাহাকে বলি দাও, অর্থাৎ তোমার সন্তানকে বলি দাও। চিবভক্ত এবরাহিম প্রাতে উসিয়া প্রথম জীব নিকট, শেষ ইসমাইলের (পুত্র) নিকট ঈশ্বরের আদেশ প্রকাশ করিতেই তাহা বা মহানন্দে ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালনে সম্মত হইলেন। তখনি এবরাহিম ইসমাইলকে স্থান করাইয়া ধৌত-বস্ত্র পরাইয়া গায় স্বগন্ধি দ্রব্য লেপন করিয়া এক স্নানীক্স ছবিকা হস্তে পুত্রনহ কোরবানি ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। এবং পুত্রের গলায় ছুরি বসাইতেই দৈববাণী হইল, এবরাহিম! তুমি ধন্য—তুমি যথার্থ ভক্ত। কিন্তু এবরাহিম! জগত বড় কঠিন স্থান, মায়া বসে সকলেই মোহিত। পুত্রের গলদেশ বিনির্গত রক্তের ধারা দেখিয়া—সে বদনমণ্ডলের বিরক্তভাব চক্ষু দেখিয়া তোমার মনে অন্য কোন ভাবের উদয় হইলেও হইতে পারে। তোমার অটল ভক্তির কথঞ্চিত পরিমাণ টলিলেও টলিতে পারে। তাহাতেই আদেশ হইতেছে যে, তুমি বস্ত্র দিয়া চক্ষু ঢাকিয়া আমার আদেশ প্রতিপালন কর। তোমার এ কীর্তি জগতের অক্ষয়কীর্তি স্বরূপ জলন্তভাবে চিবকাল দেদীপ্যমান থাকিবে। এবরাহিম তাহাই করিলেন বলিব পর দেখিলেন যে, ইসমাইল মহাজ্যোতি স্বরূপ পার্শ্বে দণ্ডায়মান, সম্মুখে একটি "দোহা" পড়িয়া আছে, রক্তের ধার ছুটিযাছে। সেইদিন হইতে কোরবানির সৃষ্টি। এ পর্যন্ত মোসলমান জগতে প্রচলিত, ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ, স্মরণীয় কর্তব্যার্থ্য্য পরিগণিত।

ঘটনা স্থান 'মক্কা' হজরত মহম্মদের কবরের পূর্বে। এখন কথা এই যে প্রথম কোরবানি দোষা। আরবদেশে আজ পর্যন্ত দোষাই অধিক পরিমাণে বলি হয়, উটও বলি হইয়া থাকে। আবাবে কেহই গরু কোরবানি করে না। ধর্মেয় গতি বড় চমৎকার। পাহাড়, পর্বত, মরুভূমি, সমুদ্র, নদনদী ছাড়াইয়া মোসলমান ধর্ম ভারতে আসি-
 যাছে সঙ্গে সঙ্গে কোবানিও আসিয়াছে। এদেশে দোষা নাই—দোষার পরিবর্তে ছাগল, উটের পরিবর্তে গো, এই হইল শাস্ত্রকারদিগের ব্যবস্থা। এখন বুঝিলেন পার্টিকগণ! বুঝিলেন কেন এ কথাটা এই প্রস্তাবে সংযোগ করিলাম। গরু কোব-
 বানি না হইয়া ছাগলও কোবানি হইতে পারে। 'শাহাতেও ধর্ম রক্ষা হয়। ইহার পবেও একটি কথা আছে যে, এক গরুতে সাতটি লোকের কোরবানি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, একটি ছাগ একজন ভিন্ন দুইজন নিষেধ। কাজেই ব্যয় লাখে গরুই অগ্র-
 গণ্য। কিন্তু ভাই! এ কথাব আশ্রয় তুলিয়া আমাব মুখবন্ধ করিতে পারিবেন না। কোবানির গরুর সমস্ত শাস্ত্রে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, সে প্রকার একটি গরুর মূল্য ২৫টি ছাগল পাওয়া যায়তে পারে। তুমি বৎসব বৎসব ২।৩ টাকার মধ্যেই সারিয়া থাক। আবার সে ২।৩ টাকার ক্ষতি চানডা বিক্রয় করিয়াই পূরণ কর। বিনাবায়ে ধর্ম রক্ষা। লাভের লাভ তন্তুলাভ মাংস। একযাত্রায় তিন লাভ—ধর্ম রক্ষা, অর্থ রক্ষা, উদর রক্ষা। যাহা হউক, আব বেশী বলিতে ইচ্ছা করি না; সকাতেব প্রার্থনা যে, গোকুল বিনাশক, এবং গো খাদক নামে যেন আব আমবা অভিহিত না হই। চেষ্টা করিলে উভয়-কুলই রক্ষা হইতে পারে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

গোধন কি সামান্য ধন ?

গোধন কি সামান্য ধন ? চতুষ্পদ শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত বলিয়া কি গো-
 জাতিকে সামান্য পশু বলিয়া মনে করিব ? অকর্মণ্য পশুগুলিকে যে চক্ষে দেখিয়া
 থাকি, সেই চক্ষে কি গোজাতিকে দেখিব ? মনে কি বলে ? মোসলমান ভাতা-
 গণ ! মনের দ্বার খুলিয়া নিরপেক্ষভাবে বলুনতো—মনে কি বলে ? দোষাই
 আপনাদের পিতা মাতার, মনে এক, মুখে আর বলিয়া স্ব-সম্মতের পোষকতা
 করিবেন না। চর্ম চক্ষে যাহা দেখিতেছেন, গোজাতির দ্বারা যত প্রকার উপকার
 পাইতেছেন, একে একে সেই কথাগুলি মনে করিয়া মনের কথা বলুনতো, গোধন
 কি সামান্য ধন ? গোজাতি কি সাধারণ পশুর মধ্যে পরিগণিত। আমাদের শাস্ত্রে

গোজাতির গুণের কোন কথা উল্লেখ নাই। অগ্রাণ্ড “হালাল” পণ্ড শ্রেণী মধ্যে কেবল নাম মাত্র রাখিয়াছে। শাস্ত্রে গোজাতির গুণাগুণ বর্ণন নাই বলিয়া কি সামান্য পণ্ড ছাগল, ভেড়ার সহিত গোধনের তুলনা করিব। হরি! হরি! সেই দীর্ঘকায় উটের সহিত কি ইহার সামনজন্তু দেখাইব? যদি ইসলাম ধর্ম রবি প্রথমে ভারতেই উদয় হইত, যদি মোসলমান ধর্ম জ্যোতিঃ প্রথমে বঙ্গেই প্রকাশ হইত, যদি নূরনবী হজরত মহম্মদ মুস্তফার অভ্যুদয় ভারতের কোন অংশে হইত, তবে বোধহয় গোজাতি সামান্য পণ্ড শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হইত না। তিনি বিড়ালকে আদর করিয়া গিয়াছেন, আজ পর্যন্ত মোসলমান সমাজে সেই আদর অতি আদরের সহিত রহিয়াছে। কুকুরকে ঘৃণা করিয়াছেন, আজ পর্যন্ত কুকুর ঘৃণিতই রহিয়াছে। আরবে উটের যত আদর ভারতেও গোকুল সেই প্রকার আদরের ও যত্নের বলিয়া বর্ণিত হইত; —পবিত্র কথাটাও সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। কে ভাবিয়াছিল লোহিত-সাগর পার হইয়া ভারত গগনে মোসলমান ধর্ম-পতাকা অক্ষয় রূপে উড়িতে থাকিবে? কে ভাবিয়াছিল যে মোসলমান ধর্ম সমস্ত ভারতে বিস্তারিত হইয়া পড়িবে? কে ভাবিয়াছিল যে মোসলমান জাতি ভারতের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় হিন্দুর সহিত একত্রে বাস করিবে? —পরস্পর আত্মীয়তা ঘটিবে? —একের মুখাপেক্ষী হইয়া অত্ৰকে থাকিতে হইবে? একাত্ম এক প্রাণ হইয়া কাষাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে? বিশ্বামদায়িনী নিশার অবসান হইলেই পরস্পর দেখাশুনা ঘটিবে? তাহা হইলে বিধি হইত, ব্যবস্থা হইত, গোজাতির উৎকার বিষয় বর্ণিত হইত। দেশভেদে শাস্ত্রের প্রভেদ, জল-বায়ুর গুণাগুণে আহারবিহাও পরিচ্ছদের বিভেদ, যদিও ইহাশাস্ত্রের কথা নহে। কিন্তু যুক্তির আয়ত্ত এবং কারণের অন্তঃস্কৃত, তাগাতে সন্দেহ মাত্র নাই। শাস্ত্রে যেমন গোজাতির বিষয় বিশেষ রূপে কোন কথা লিখা নাই, অগ্রাণ্ড পণ্ড সম্বন্ধেও লিখা নাই; —আছে কেবল উট আব দোষাণ কথা যাহা ভারতের নিম্প্রয়োজন, যাহা বঙ্গের অপুচ্ছ ও তুচ্ছ। ইহাতেই উপলব্ধি হইতেছে, সহজ জানে ইহাতেই তো বুঝা যাইতেছে, প্রয়োজনানুসারে বর্ণনা, আবশ্যকানুসারেই পবিত্রতা।

দৃষ্টান্তস্থলে আরও কিছু বলিব। শাস্ত্রে কোন কথা নাই, বর্ণনা নাই, নামটিও নাই, করিলে শাস্ত্রমতে বোধহয় পাপও নাই এমন শাস্ত্র বহির্ভূত কাষ্য কি আমরা করি না? সকলই করিয়া থাকি। খাজাদি সম্বন্ধে কো প্রথম প্রস্তাবেই

বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় বার বলা নিশ্চয়োজন। পাঠক! অতঃপর বিষয়ে দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখাইতেছি, ভ্রাতা মোসলমানগণ! বলুন তো মোসলমান হইয়া ধুতি চাদর ব্যবহার করা কোন হাদিসে আছে? একি দেশ প্রথা নহে? গুড়গুড়ি কি পেঁচাও-নলেব বাহাব দিয়া স্বগন্ধিযুক্ত তামাকের ধূমপান করা কোন বিধি সম্মত? লাল রঙ্গের নাগবা জুতা কি কাল রঙ্গের চডাতোলা জুতা ব্যবহার করা এটা কি? বাষ্পীয় শকটে, বাষ্পীয় পোতে গমনাগমন করার বিষয় কি শাস্ত্রে উল্লেখ আছে? টেলিগ্রামে, টেলিফোনে সংবাদ আদান-প্রদান করা কি শাস্ত্রের বাহিরের কার্য্য নহে? বিলাতি দেশলাই বুঝি কোন মোসলমান ভ্রাতা ব্যবহার করেন না? কি পবিত্রাপ! হায়! হায়! কি দুঃখের কথা! মানচেষ্টারের বস্ত্র দ্বারা লজ্জা নিবারণ করিতে হইলে একথা কি শাস্ত্রে লিখা আছে? কেবল শাস্ত্রে গোজাতির কোন প্রকার উপকারের কথা লিখা নাই বলিয়া কি তাহার উপকারিতার বিষয় স্বীকার করিব না? যাহা পুরুষ, পুরুষানুক্রমে ভোগ করিতেছি, চক্ষে যাহা দেখিতেছি, অন্তরের শিবায শিবায যাহার প্রমাণ পাইতেছি, প্রতি শোণিত বিন্দুতে যাহাব সাক্ষ্য দিতেছে, তত্রাচ বলিব যে গোজাতির বিষয় শাস্ত্রে কোন গুণের কথা লিখা নাই। গরুব গুণ কেন স্বীকার করিব? কেন গোবধে ক্ষান্ত হইব? আমাদের পক্ষে, গো, বৃষ, ছাগ, মেঘ, হবিণ, সকলি সমান। কি ঘৃণা! কি লজ্জা! আমি শাস্ত্র বহির্ভূত কোন কার্য্য করিতে বলিব না।—বলিতে সাধ্যও নাই। শাস্ত্র রক্ষা করিয়া উপকারীজনের প্রতাপকার কবা মনুষ্যেরই কার্য্য। পশুরাই প্রতাপকার করিতে সহজে স্বীকার হয় না। হিংস্রক জন্তুরাই প্রতাপকারের পক্ষপাতী। মনুষ্যে কেন প্রতাপকারের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে?

নব্বাধম কসাইগণই গোহত্যা করে। “কাচ্ছাব” শব্দ হইতে কসাই হইয়াছে, কাচ্ছাব শব্দের ভাবার্থ ব্যবসাদার। বেশ তো, কসাইগণ ব্যবসা করে, শাস্ত্রসম্মত কার্য্য করে, তবে সে কসাই নামে অভিহিত হয় কেন? সে কথা আমাদের মনে আঘাত লাগে কেন? আজ হইতে মনের ভার ফিরাইতে হইল। কারণ কসাই শাস্ত্র বহির্ভূত কার্য্য করে না, ব্যবসাদার—ভাল কথা, বড় মিষ্টি সম্ভাষণ। পাঠক! মোসলমান কবিগণ পারস্ত ভাষায় কসাইয়ের বর্ণনা কিরূপ করিয়াছেন? যে গোহত্যা করে তাহাকেই কি কসাই বলিয়াছেন? তাহা নহে। যাহার অন্তরে দয়া, মায়্যা, মমতা, কিছুই নাই, পর দুঃখে যাহার হৃদয় কাতর নহে, ব্যথা বোধ না করে,

তাহাকেই কসাই বলিয়াছেন, সে সঙ্গেই পাপ হৃদয়ের, কসাই হৃদয়ের তুলনা করি-
 যাছেন। মোসলমান কবিদিগকে সহস্র ধন্যবাদ! শান্তসঙ্গত কার্য্য বলিয়া তাঁহারা
 কসাইকে উচ্চাসনে বসাইয়া যান নাই। মহাশ্মি, ঘোণী, ঘোর তপস্বী বলিয়া
 সম্ভাষণ করেন নাই। কসাই নীচ, অতি জঘন্য, কসাইকে মনুষ্য দলের মধ্যে পরি-
 গণিত করেন নাই। গো-জীবন হত্যা করে বলিয়া এত অপমান, এত শাস্তি
 আজ পর্য্যন্ত ভোগ করিতে হইতেছে। কিন্তু গোখাদককে কেহ কিছু বলেন নাই।
 কি ভ্রম! কি ভ্রম! আহা! কসাই কি নিজ উদর গোমাংস দ্বারা পরিপূর্ণ করিতে
 গোহত্যা করে? আপন সন্তান-সন্তানী, পবিত্রাবগণের বসনা পবিত্রপি হেতু কি
 নিরীহ গোজাতিব গলায় ছুরি বসাইয়া থাকে? যাহাদের জিহ্বা গোমাংসের
 জ্ঞান লালিয়াত, যাহারা গরু হজরম করিতে পট্ট, তাহারা কসাইয়ের মত বদাঙ্গ।
 যদি খাদক না জোটে, তবে খাচ্ছে আমদানি কে করে? নিজে খাচ্ছে কে বলে
 মহিষ ভাড়া! মোসলমান ভ্রাতাগণ! অপরাধ সাজনা করিবেন, কথ্যতেই কথা
 বাড়ে, তর্কস্থলে অনেক কথা আসিয়া পড়ে, এই নো-এখনি একটি কথা আদিনি।
 যদি মোসলমান কবি কি লিখক মহামতিগণ কসাইকে মনুষ্য প্রকৃতি হইতে দূরী-
 ভূত না করিতেন, তবে আজ এই অধমেব সামান্য লিখনি গোখাদক ভ্রাতা-
 গণের মস্তকেব উপর সঞ্চালিত হইত না। কাঁচা কথা লিখিয়া স্বজাতিয় ভ্রাতা-
 গণেব মনে বাধা দিতাম না। তাঁহারা গোমাংস পোড়া উদবেব সেবায না লাগা-
 ইলে কসাই মস্তাশয় কখনি গোহত্যা করিতেন না। কসাই নামেব মদোষিত
 হইতেন না।

পাঠকগণ! মোসলমান শাস্ত্রে গোজাতিব গুণেব ব্যাখ্যা নাই—স্বতবাং
 সাধাবণ পশু মধ্যে পবিগণিত।—উদরে পোষণে দোষ কি? একথাটা আমি
 হাতগড়া করিয়া উপস্থিত করি নাই। অত্রস্ত কোন মৌলবী মহামতিব কথাব
 আভাষে বুঝিয়াছি যে, একথা ভিন্ন আর তাঁহাদের কোন কথা নাই। ঐ কথাটুকু
 আশ্রয় কবিয়াই গোধনের জীবন সংহার করিতে বাধা। ধর্ষেব দায় দিয়াই
 গোজাতিব সর্বনাশ করিতে অগ্রগণ্য।—প্রতিবাদ করিবেন। ভ্রাতাগণ! আমিও
 প্রতিবাদ প্রার্থনা করি। কিন্তু ঐরূপ প্রতিবাদ, কি সভা-সমিতির ভয়ে, এ অত্যা-
 চার, অত্যাচার, হৃদয় বিদারক, মর্শাহত, ভীষণ—মহাভীষণ ব্যাপারস্বরূপ—গো-
 হত্যা নিবারণ বিষয়, প্রস্তাব লিখিতে অধমেব লিখনি ক্ষান্ত হইবে না। সেই রূপা-

ময় ভগবান রূপায়, গোকুল রক্ষা কবিত্তে লিখনি যে স্থাপনিত হইয়াছে যতদিন ইহাব শেষ না হইবে ততদিন সমানভাবে চলিবে। আজ যদি সেই প্রাচীন নগর ইন্দ্রপ্রস্থব সিংহাসনে গোখাদক সমাটকে দেখিতে পাইতাম, কাজীসাহেবের দোরবাব (চারুক) ভয় আমার থাকিত তাহা হইলে এ প্রস্তাব জনসাধারণের গোচর করা দূবে থাকুক, মুখে আনিতেও পারিতাম না। এ ব্রিটিশ রাজ্য, ব্রিটিশ-সিংহ ইহাব শাসনকর্তা, ল্যাখ্য কথা বলিতে কোন বাধা নাই—ভয়েরও কোন কারণ নাই। স্তবরাং লিখনি ক্ষান্ত হইবার নহে। আমাব বোধ হইতেছে স্থানীয় মোসলমান ভ্রাতাগণ ঐ এক কথা বলিয়াই সবিস্ময় পড়িবেন, আমাব প্রস্তাবের সত্যাসত্য বিষয়ে কোনকথা আলোচনা বোধহয় না কবিলেও কবিত্তে পাবেন। যাহা হউক গোজাতিব উপকাপিতা বিষয় হিন্দুশাস্ত্র সংগত মাত্র দুইটি বচন সহস্রে সাধাবন সম্মুখে উপস্থিত হইয়া গলবস্ত্রে এবং কবযোডে সবিনয়ে প্রার্থনা কবিত্তেছি যে, ভ্রাতাগণ আপনাপাও কি এ সময় নাব থাকিবেন? আমাব প্রস্তাবে পোষকতায় লিখনি স্থাপন কবিবেন না? অগাধ্য প্রদেশে হিন্দু মোসলমান একত্র হইয়া গোবন রক্ষাব জগ কত কি উপায় কবিত্তেছেন। টাঙ্গাইল মহকুমাব হিন্দু ভ্রাতাগণ! এ বিষয়ে কি একেবারেই নাব থাকিবেন? অগাধ্য স্থানে হিন্দু মহোদয়গণই ইহাব প্রধান নেতা হইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, টাঙ্গাইলের শুভভাগে তাহাব বিপরীত। লিখক মোসলমান, পত্রিকাখানিও মোসলমানের, এমন স্বেযোগ কি আর পাওয়া যাইবে? হিন্দু ভ্রাতাগণ! ইহা কি আমাব আক্ষেপের বিষয় নহে? খাদক রক্ষাব কান্না কাঁদিতেছে, ‘আহমদী’ অঙ্গ চালিয়া দিয়াছে, মোনায সোহাগা মিশিয়াছে। কিন্তু আপনাব নাব! দেখুন তো আপনাব শাস্ত্রে কি বলে।

“লোকে হম্মিনমঙ্গলানন্তো ব্রাহ্মণো গোহর্ভাশনঃ

হিবণাং সগি বারিত্তা আপোরাঙ্গা তথাষ্টমঃ ।

এতানি সত্যং পশ্বেন্ন সোবর্চ্ছায় চক্ষয় ।

প্রদহিণঞ্চ কুর্কত তথা চামুর্গ হীয়তে ॥”

‘ব্রাহ্মণে, গো, অগ্নি, স্ববর্ণ, ঘৃত, সূর্য্য, জল এবং রাজা—এই অষ্ট প্রকার মঙ্গল পদার্থ সর্বদাই ইহাদিগকে দেখিতে হইবে, নমস্কার কবিত্তে হইবে, অর্চনা কবিত্তে হইবে, আর প্রদক্ষিণ করিতে হইবে। সমান যত্ন করিতে হইবে, আদর করিতে হইবে, কেননা সকলেই আমাদের মহোপকারী ।’

আবার দেখুন !

“গোমুত্রঃ গোময়ঃ ক্ষৌরঃ সপিদধিরোচনা ।

ষড় মেতদধি মাঙ্গল্যং পবিত্রং সর্বদা গবাং ॥”

“গোমুত্র, গোময়, গব্যামৃত, দধি এবং গোচনা এই অষ্ট প্রকার গব্য দ্রব্যই শুভ । হিন্দুর সকল প্রকার শুভকর্মে ইহার প্রয়োজন ।”

এইরূপ বচন হিন্দুশাস্ত্রে শত সহস্র রহিয়াছে । সে সমুদায় বিবৃত করা আমার অনধিকার চর্চা । তবে নিতান্তই দুঃখের বিষয় যে, মোসলমান তাহার শাস্ত্র বজায় রাখিয়া গোবধ জন্ত চাঁৎকার করিতেছে, টাঙ্গাইলের হিন্দু ভ্রাতাগণ নীরব ! ভ্রাতাগণ ! জানিবেন ভারতে হিন্দু মোসলমান একত্র হইয়া একযোগে কোন কাৰ্য্য না করিলে কখনই তাহা সিদ্ধ হইবে না । একপক্ষ শতবর্ষ কথা কুটিলেও ঈশ্বর সদয় হইবেন না । অতএব এই পরামর্শ !

তৃতীয় প্রস্তাব

গোমায়স

খাত্ত অখাত্ত স্তখাত্ত । —যাহা সকলেই খায় তাহাই সাধারণ খাত্ত । যাহা কোন মানুষে ভক্ষণ করে না । —তাহাই অখাত্ত । কচি ভেদে, কাহারও অখাত্ত, কাহারও স্তখাত্ত । কুকুর, বিড়াল, শূগল, ভেক, ব্যাঘ্র, ছাবপোকা কাহারও স্তখাত্ত কাহার অখাত্ত । গরু কাহারও খাত্ত, কাহারও অখাত্ত । ছাগ, মেঘ, মহিষ, বরাহ প্রভৃতি কাহারও অখাত্ত আবার কাহার কাহার উপাদেয় খাত্ত । এই সকল গোলযোগে, যাহা সকল মানুষেই খায়, কি খাইতে ঘৃণা না করে, কোন প্রকার অন্তর্থেও কারণ না হয়, তাহাকেই খাত্ত বলিয়া নির্দিষ্ট করিতেছি । অখাত্ত যাহা কোন মানুষে খায় না । স্তখাত্তের কথাতো পূর্বেই বলিয়াছি । এইক্ষণে কথা এই— দেশ, কাল, পাত্র, বিবেচনা করিয়া খাত্তের ব্যবস্থা করা আবশ্যিক । পাকস্থলির পেষণশক্তির শক্তি বুঝিয়াই উদ্ভব পূর্ণ করা উচিত । আমরা বঙ্গবাসী । আমাদের সাধারণ খাত্ত কি ? দশে পাঁচে একদিন কি কুটুন্ড স্বজন, বন্ধু বান্ধবদিগের আগমন উপলক্ষে আমরা যে খাওয়া-দাওয়া করি তাহাকে সাধারণ খাত্ত বলিতে পারি না । সদা সর্বদা যাহা খাইয়া থাকি, সেই খাত্তই যথার্থ খাত্ত । বঙ্গের জল, বায়ু, তাপ এবং যুক্তিকার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যথার্থ খাত্ত নির্দেশ করিতে হইলে, স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া খাত্ত নির্বাচন করিতে হইলে, একেবারে তেলেবেগুনে জলিয়া না উঠিয়া,—গরু খাইতে বারণ

কবে, এত বড় কথা ? —ইহাতেই আগুন না হইয়া শাস্ত এবং শান্তি চাই।
 যদিও আমরা বলি কল্প কল্পিত জীবন না থাকিলে না চলে, আমরা তো
 খাটয়াই থাকি—আব কথা কি ? যাহারা এই বঙ্গরাজ্যে গোমাংস ভক্ষণ করে না,
 তাহাদের ও আমাদের কোন বিষয়ে যদি তারতম্য কি পার্থক্য থাকে, কি গোমাংস
 প্রভাবে আমরা তাহাদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ পবিমাণে লাভবান বা বলবান হইয়া থাকি,
 কি কালে হইতে পারিব, তবে গোমাংস কেন ছাড়িব ? এইক্ষেণে দেখা আবশ্যক,
 বর্তমান জলবায়ু, তাপসম্বৃত বঙ্গরাজ্যে আমাদের খাওয়া কি গোমাংস ?—না একথা
 স্বীকার করিতে শাবিল্যম না। যে মৌলবী সাহেব গোমাংসের জ্ঞাত এত লালসিত,
 এক টুকরা গোমাংসের জ্ঞাত যাহাদের এত জেদ এত প্রতিবাদ, পর্যন্ত বলুন তো
 প্রতিদিন দুবেলা কি তাঁহারা নাহা খাটয়া থাকেন ? প্রতি সন্ধ্যাই কি গো-
 মাংসে ক্ষুধা নিবৃত্তি করেন ? না প্রতি সন্ধ্যাতেই গোমাংস বানজনে অন্ন রনজিত
 করিয়া থাকেন ? না সমুদ্রাহে তুদিন কি একদিন গোমাংসের স্বাদে রসনা পরিতৃপ্তি
 করেন ? না প্রতি সন্ধ্যা খাইতে ইচ্ছা করেন ? ধর্মের দোহাই—মিথ্যা বলিবেন
 না। প্রতি সন্ধ্যা গোমাংস বানজন পূর্ণ বাটী সম্মুখে দেখিলে মনে কি বলে ?
 চক্ষু কি দেখিতে ইচ্ছা করে ? না হাতে তুলিয়া মুখে দিতে ইচ্ছা হয় ? প্রতিদিন
 যে খাওয়াইছেন, যথা ভাত, ডাইল, তরকারী, দুধ, মৎস্য ইত্যাদি। ইহা তৃপ্তি-
 কব এবং কৃতিকব। প্রতি সন্ধ্যা না হয় প্রতিদিন এই সকল খাওয়া উদ্ভব পবিপূর্ণ
 করিয়া জীবন বক্ষা করিতেছেন। বলুন তো কোনদিন কি ঘুমা হইয়াছে ? না
 হইবে ? যদি গোমাংস খাওয়া হইত, যদি গোমাংসই জীবনোপায়ের একমাত্র
 উপায় হইত, যদি বঙ্গবাসীরা খাওয়া হইত, তবে প্রতিদিন রন্ধনশালায় দেখিতাম,
 প্রতি সন্ধ্যায় অন্নের সহিত প্রতিযোগিতায় একত্র দেখিতাম, প্রতি গ্রামে হস্তে
 দেখিতাম, পাতে দেখিতাম, মুখে দেখিতাম। চক্ষুও জুড়াইত, মনও ভাল-
 বাসিত। ইহাতেই তো বলি মন স্বাধীন। সে না লিখকের লিখনিকে ভয় করে,
 না মৌলবী সাহেবের অথবা ক্রোধে ভয় করে—প্রকৃতি কাহারও নিকট কোন
 উপদেশ লইয়া কোন কার্য করে না। স্বভাবের বৈপরিত্ত্যেও সহজে ঘটে না।
 জোর জব্বাবে ঘটাইবার চেষ্টা করিলেও টেকে না। যিনি আহাবদাতা, যিনি
 আমাদের রক্ষাকর্তা, যিনি খাওয়াখাওয়ার সৃষ্টিকর্তা, তাঁহার বিবেচনায় ভুলভ্রান্তির
 অতি ক্ষুদ্র অংশের ক্ষুদ্র অংশও যে আছে, আমি একথা বিগম করি না। মনযোগ

সহকায়ে একটুকু চিন্তা করিবা। দেখিলে সহজেই বোঝা যায়, তাঁহার অভিপ্রেত তাঁর অতি সহজেই জ্ঞানগোচর হই। তিনিই দেশভেদে খাণ্ডের প্রভেদ কবিয়াছেন। প্রচুর পরিমাণ খাজ আমাদিগকে অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার নিয়োজিত খাজাই আমাদিগের কচিকর ও তুস্তিকর। গোমাংস খাওয়াই যদি আমাদের কর্তব্য হইত, তবে এত স্বাস্থ্য ফলমূল শস্তাদি দ্বারা বঙ্গক্ষেত্র পরিপূরিত করিতেন না। —নদী জলেও এত মৎস্য জন্মিত না। যে দেশে যাহা প্রয়োজন, সে দেশের স্ত্রী কৰুণাময় ভগবান তাহা অপব্যাপ্তরূপে দান করিয়াছেন। বঙ্গধাকিগা কি ইউরোপীনের খাণ্ডের অনুকরণ করা উচিত? না আরববাসীদিগের আহাবের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া উদ্ভব পূর্ণ করা বিধেয়? দেশভেদে আহাবের প্রভেদ—ইহা অবশ্য স্বীকাৰ্য্য।

কাল--অর্থাৎ সময়। বঙ্গবাসী মোসলমানদিগের এমন দুঃসময় কি উপস্থিত হইয়াছে যে, গোমাংস না খাইলে আর জীবন রক্ষা হয় না? এমন কোন সময় কি উপস্থিত হইয়াছে যে, অনাহারে মরি মরি হইয়া, না খাইতে পারিয়া প্রাণপাথি দেহদিনজর হইতে উড়ি উড়ি হইয়া, গোমাংসে শুধু গোমাংসে প্রাণ রক্ষা হইয়াছে, জীবনীশক্তির শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে? দুৰ্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে আমরা কিসের অভাও মনে করি? কোন জিনিসেও অভাবজনিত আমাদের কষ্ট বোধহয়? অন্নের—না গোমাংসের? বৎ কোন কোন সময় দুই একজন অর্গ-শালী ভোগবিলাসী মহোদয়ের মুখে শুনা যায় যে, এবারে জলে মাছ নাই। ডাক্তার গোমাংস নাই,—একথা বলিয়া কোন মোলবী সাহেব কবে আক্ষেপ কবিয়াছেন? কোন ভাতা গোমাংসের অভাবে দুঃখ প্রকাশ করে? রাজদ্বারে সাহায্য প্রার্থনা করেন? ইহাতেও কি বলিব যে গোমাংস আমাদের খাজ। এ সময়ে, এ দুঃসময়ে গোমাংসই জীবনের জীবন, শবীর পোষক, এবং দুৰ্ভিক্ষ নিবারক?

এখন পাত্র হইয়া বড়ই বিপদে পড়িলাম। খাতি গঙ্গা, পদ্মা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, পচা বিল কি পাতকুয়ার জল! বায়ু সেবন করি খাড জঙ্গলের, পাট ক্ষেত্রের, না হয় ধানের মাঠের। থাকি খডো ঘরে। চলাফেরা করি সৈতসৈতে ভিজ-মাটি, জল কাদার উপরে। শরীরের গঠন ও আয়তন তেমনি। অস্থি, পেশী-শক্তিও তথৈবচ। সাহসের তো কথাই নাই। পাকযন্ত্রের অগ্নির তেজ, ধারণা ও ক্ষমতার কথা আরকি বলিব। চাল ভাল করিয়া সিদ্ধ না হইলেই মাথা গিয়াছি।

—হাতেব জল আন শুষ্ক হয় না। দুগ্রাস বেশী গলাধ করিলেহ পেন ফাঙ্গি প্রাণ
 আই-মাই কুবিতে থাকে পাখরচুণী'র পাতা আব লবণেব দ্রবকার হওয়া হুডে।
 ক্ষমতানুসারে হজমিগুণলিও আশ্রয় লইতে হয়। এমন জীৱ শক্তি-বর্ষণ মহা-
 পুরুষেরা গোমাংস ভক্ষণেব উপযুক্ত পাত্র না হওয়া আর কে হইবে? গোমাংস
 সহজে পরিপাক হয় না। অল্প জ্বলেও সিদ্ধ হয় না। সিদ্ধ হইলেও টানিয়া ছেঁড়া
 যায় না। ছিঁড়িলেও আবার দন্তে এমন শক্তি নাই যে, উপযুক্ত মত পিষিয়া
 সহজে পরিপাকের উপযুক্ত করিয়া দেয়। পাকযন্ত্রেবও পেষাশক্তি এত প্রবল নহে
 যে, যথার্থ খাণ্ডেব জায় উহাকে যথা সময়ে পরিপাক করিয়া কেলে। গোমাংস
 খাইলেই পেটের অস্ত্র, দাঁতেব অস্ত্র, তাহাব পর গায়ের জ্বালা, মুখকান্তির,
 বিরক্তি শব্দেব লাবণ্যহীন,—এতো ধরাবঁধ কথা। তাহার উপর মহাব্যাধি।
 আব চাই কি? দশটি কুষ্ঠ বোগাক্রান্ত লোকের পরিচয় লইয়া দেখিবে তাহার
 মধ্যে কয়জন হিন্দু আর কয়জন মোসলমান? দেখুন দেখি কেমন লাভ। এত
 উপকাব সাহায্যে, তাহা কি প্রাণ বর্ষণ ছাড়া যায়? আর একটি কথা বলিয়াই
 প্রস্তাব উপসংহার করিব। বঙ্গদেশে বাস কাব বঙ্গের চিকিৎসা-শাস্ত্র কাকেবের
 শাস্ত্র—তাহা তো স্পর্শই কবির না। ভাক্তারি মতশ তাহাই! —এপিট আর
 ওপিট। হাকিমি মতে অবশ্যই ভক্তি আছে। ইউনান (গ্রীস) নিকটে না ইউক,
 জলবায়ব সহিত সমতা না থাকক, তত্রাচ আমবা বাদশার জাত বাদশাই
 দার, বাদশাই মতের গ্রন্থেই মাননীয়। ভাল কথা—আমিও স্বীকার করি। ইউনানে
 হাকিমি মনের স্রষ্টা, স্ত্রবাস মেহমতের চিকিৎসা-শাস্ত্রই সর্বাগ্রে গণ্য। মানিলাম
 তাহাই মানিলাম। আত্মগণ। সেই হাকিমি মতের বস্ত্রবিচার গ্রন্থে গোমাংসের
 গুণাগুণ কিরূপ বর্ণিত হইয়াছে অনুগ্রহ করিয়া একবার পাঠ করিয়া দেখিবেন।
 যদি মূর্খতা দোষে সে গ্রন্থ পাঠের শক্তি না থাকে তবে কোন হাকিমকে জিজ্ঞাসা
 করিয়া দেখিবেন, গোমাংসের গুণাগুণ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন তিনি কি
 বলেন। মলাধারে হাবগাঁথা এক প্রকার কুমি, কোন মাংসে জন্মিয়া থাকে? বাত-
 রোগেব জন্ম কোন মাংসে বেশী হয়? স্বভাবে বাধা দিতেছে, রসনা অকুচির কথা
 কহিতেছে, মহাপ্রাণী অস্বীকার করিতেছে, চক্ষু দেখিতে বিরক্ত হইতেছে, দন্ত-
 ব্যাধিগ্রস্থ হইতেছে, পাকস্থলি পরিপাকে অশক্ত হইতেছে। —মনের বিকারেই
 ভগবানের আভাস পাওয়া যাইতেছে। তবু বলিব? তবু স্বীকার করিব যে

গোমাংস বন্ধ করার খাণ্ড ? ভুগিতেছি, মরিতেছি, স্বচক্ষে ফলাফল দেখিতেছি, গোমাংস ভক্ষণের বিষময় ফল প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতেছি, তবু গোমাংস জন্ত যে জিহ্বা লক লক করে, যে জিহ্বায় রস পড়ে, দিক তাহাকে ! শতধিক ।

আবার আমার কার্যকটী কথা

বিগত পৌষ মাসেব আখ্ বাবে এসলামীয়া পত্রিকায় “গোমাংস” প্রস্তাবেব যে প্রতিবাদ প্রকাশ হইয়াছে তাহা গো-জীবনে গৃহীত হইল । সমুদায় প্রস্তাব ও প্রতিবাদ পুস্তকাকাবে মুদ্রিত হইয়া বিনামূল্যে বিতরিত হইলো । নাগ-অনাঘ সাবাস্তে বিচারেব ভার পাঠকগণের হস্তে । লিখকেব নাম, ধাম, পরিচয়েব জ্ঞান কেহ বাস্তব হইবেন না । শীঘ্রই স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইবেন ।

যে প্রতিবাদে হিংসাব আভাস, দ্বেষেব অপছায়া, অপকথাব স্প? আভা দেখা যায়, সেখানে লিখক নীরব । কিন্তু এক্ষেত্রে নহে । প্রতিবাদেব প্রতি কথার উত্তর পাইবন । ঈশ্বর ইচ্ছায় প্রতি ছুত্রে ছুত্রে নক্ষত্র দেখিবেন । এ ব্রিটিশ রাজ্য, ব্রিটিশ বিচার, ধর্ম্মাসনে ত্যাগদণ্ডের নিবপেক্ষ, প্রতিভা প্রভাবে প্রমত্ত ক-নজরকেও ক্ষুদ্রপ্রাণী মশার হস্তে পবাস্ত হইতে দেখা যায় কে বলিতে পাবে কাহার ভাগ্যে কি আছে । ঈশ্বর মহাশয়, এলাহী ভবসা, ভগবান ক্ষমক ।

গো দুগ্ধ

দুগ্ধ জীবের জীবন । বিশেষ মানব জীবনের জীবনীশক্তিব উপকরণ । দুগ্ধের সহিত মানুষেব এমনি সম্বন্ধ যে দুগ্ধ নামেই ভক্তির উদয়—দুগ্ধ নামেই মহা-প্রাণী শীতল । দুগ্ধই যেন প্রাণ, দুগ্ধই যেন জীবনের জীবন,—ভারতবাসীর স্বর্গীয় স্তম্ভ । কোন কোন দেশে ছাগ, গর্দভ, মহিষ, উষ্ট্র, প্রভৃতিব দুগ্ধও উদরে স্থান পায়, কিন্তু গো দুগ্ধ আমাদের যত প্রয়োজন, যত প্রকার সুখাণ্ডের স্থল ও মূল উপকরণ, অন্য দুগ্ধ সে প্রকার নহে । বিশেষ গর্দভ দুগ্ধ সর্বজন মুখপ্রিয়, কি সর্ববাদী সম্মত নহে । কোন কোন পীড়ার মহৌষধ হইলেও শাস্ত্র বর্জিত ! স্বতরাং গো দুগ্ধই সর্বগ্রগণ্য । যে দিন ভারতসম্ভান জননীৰ উদয় হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া জগতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে, সেইদিনে, সেই সদ্যপ্রসূত সম্ভানের জীবনীশক্তিব বৃদ্ধি-হেতু গো দুগ্ধেরই আশ্রয় লইতে হইয়াছে । জীবন পর্যন্ত প্রায় প্রতিদিন প্রাতি সন্ধ্যা আহারের উপাদেয় উপকরণ হইয়া, নানা আকাবে, নানা প্রকারে অথবা কাহার সঙ্গে মিশিয়া আত্মার বল, হৃদয়ের বল, শরীরের বল, মস্তিষ্কের বল, সবল-

রূপে পরিবর্তিত করিতেছে : রাজাধিরাজ মহাবাহুর নৃবনজিত বন্ধনশালা হইতে, দরিত্রের পূর্ণ কুটিবস্ত্র ক্ষুদ্র পাঁকপাত্র পর্য্যন্ত বিবিধ প্রকারে, গো দুগ্ধ প্রবেশ করিতেছে। ইহার নিকট জ্ঞাতিভেদ পরাস্ত, পুণ্য অ-কুচি লজ্জিত, হিন্দু মোসলমানের নিকট সমভাবে সমাদৃত। সম্প্রদায় প্রভেদে ভারতে খাদ্যাদির বিশেষ বিভেদ আছে, কিন্তু দুগ্ধের নিকট বিধানকর্তার হস্ত সঙ্কোচিত, মস্তিষ্ক অবনত। যে হিন্দু গোমাংসের কথা শুনিলে কর্ণে হাত দিতেছেন, তিনি গোরসে মস্ত। আবার যে মোসলমান গোমাংস জল জিহবার জল ফোঁটায় ফেলিতেছেন, তিনিও গোরসে লালায়িত। দয়াময় ভগবান সাব অংশ, তৈল অংশ, মধুর অংশ এবং জল অংশ—এই কয়েক অংশ ছাড়া দুগ্ধের সমষ্টি করিয়া অপাণ লীলা দেখাইয়াছেন। শুধু মাংস আহাব কবিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। এমন কোন খাদ্য নাই যে সেই একমাত্র খাদ্য গলাদ কবিয়া শরাব বক্ষ্য হইতে পারে, প্রাণ বাঁচাইতে পারে। সে গুণ, সে ক্ষমতা কেবল একমাত্র দুগ্ধে। পবিত্রতার গুণই বা কত বলিব, —কাফেবের হস্ত হইতে মৌলবী গ্রহণ করিতেছেন, চণ্ডালের হস্ত হইতে ব্রাহ্মণে লইতেছেন। কাহারও মনে দ্বিধা নাই, কোনরূপ ঘণার কথা মুখে নাই। গোমাংস যেমন, সম্প্রদায় বিভেদে ঘণাই, তেমনি গোদুগ্ধ মনুষ্য মাত্রেই স্বাদরের। ভারতের একপ্রান্ত হইতে অণুপ্রান্ত যাপ্ত, খাদ্যাখাদ্যের বিভিন্নতা অর্গাৎ গ্রহণ বর্জন এবং কুচি-অকুচি, সকলি দেখিতে পাইবে, কিন্তু দুগ্ধ সহস্রক্ষে সেই এককথা, সেই একমত, সেই একভাব। কেহই দুগ্ধের বিরোধী নহে, কোন সম্প্রদায়েবই পরিত্যাজ্য নহে। স্বাস্থ্যে অস্বাস্থ্যে, শীত গ্রীষ্মে, সর্বকালে সেই স্বর্গীয় স্রষ্টা কচিকব ও তপ্তিকর। যে সকল সাহেবগণ গোকুল নিমূল করিতে স্তম্ভাক্ষ ছুরিকা হস্তে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তাঁহারও দুগ্ধকে পবিত্র খাদ্য মনে কবিয়া সাদরে গ্রহণ করিতেছেন, অন্ত-রাত্মা শীতল হইতেছে। শাস্ত্রে দায়দিয়া দুগ্ধের বাটটি পর্য্যন্ত ধুইয়া উদরে ঢালা হইতেছে। শাস্ত্রে আছে—সে সময় “হজ্জবত নৃবনবী মোহাম্মদ মুস্তফা” সেই অনন্তকৌশলীর অনন্তলীলায় মর্ত হইতে সপ্ততল বিমান অতিবাহিত কবিয়া পবিত্র অনন্তধামে দয়াময়ের দরবাবে স্ব-শরীরে বিঘোর নিশীথ সময়ে “বোরাক আবোহণে” (স্বর্গীয় বাহন) অতি মুহূর্ত্তে নীত হইয়াছিলেন—বলিতেও অশ শিহরিয়া উঠে—সে মহাপবিত্র পূণ্যধামেও দুগ্ধেরই প্রাধাত্যের কথা শুনা যায়। প্রিয় প্রণয়ীর অভ্যর্থনা হেতু পাত্র পূর্ণ দুগ্ধই সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল। আশ্চর্য্য! স্বর্গমর্ত্তে সমান আদর? বহু ভগবানেব লীলা ও মহিমা!

গো-খাদক কসাইগণ, গোমাংস পূর্ণ বাটী প্রতিদিন অন্নের সহিত দেখিতে নারাজ। আবার কিন্তু দুগ্ধ পূর্ণ বাটী প্রতি সন্ধ্যা আহারের সময় সম্মুখে পাইলে আব রক্ষা নাই—বাটী বৌত জল পর্য্যন্ত উদবে স্থান পায় ও মহা-পবিত্রোষ জন্মে। শয্যাধাবা অব্যবহারি যেমন দুগ্ধেব প্রয়োজন, বলবীর্ষাশালী বণমত্ত বীরপুরুষেবও সেইরূপ আবশ্যক। প্রতিদিন এক বানজন, এক মাংস, এক ডাইল, এক তবকারী একই খাদ্য দ্বারা জীবাত্মা কখনই সন্তোষ জন্মে না,—কিন্তু দুগ্ধ দ্বাৰা বিপবীত। অনেক মণ্ডোদয়কেই এক সন্ধ্যা দুগ্ধের অভাবে দুঃখ প্রকাশ করিতে দেখা যায়, গোবস উদবে না গেলে অপরকারেব কথাও সময় সময় শুনা যায়। সামান্য কথায় বলে যে, সাত সন্ধ্যা দুগ্ধ না দুগ্ধ সংযুক্ত কোন দ্রব্য না খাইলে চক্ষের জ্যোতিঃ হ্রাস এবং উদবতন্ত্রী স্তনীরও প্তিহে পবিণত হয়। উদব সেবায়, বন্ধু সেবায়, দেব সেবায় সৰ্ব্ব সেবাইতেই গৰা বসের আয়োজন ও প্রয়োজন। বোগী বোগশয্যায় শায়িত, মুহুর্ত মধ্যেই ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইবে, যমদূত দণ্ডায়মান।—চক্ষু জ্যোতিঃহীন।—হারায় নাশিমা বেথা,—জিহ্বা জড, হস্তপদ অবশ, নিঃশ্বাসেই আশা,—পারজন শিয়রে এবং পাশে স্নানমুখে। ঔষধে ক্ষান্ত। যম তাড়না অস্তিব। হৃদয় শুষ্ক, কণ্ঠ নারস।—হাযবে! সে সময়েও দুগ্ধ স্বাদ গ্রহণে ইচ্ছুক। জগত ছাড়িয়া যাইতেছে, প্রাণবিহীন দেহপিঞ্জর হইতে উড়িয়া পলাইতেছে, প্রাণীনেরা ঈশ্বরের নাম করিতেছে, আত্মীয়-স্বজনদেরা সে নিদারণ সময়েও বোগীব মুখে দুগ্ধপাত্র ধরিতেছে। গলাধ কবিবার শক্তি নাই, গণ্ড বহিয়া পড়িতেছে। বাট, বাটী গোমাংস হবে খাকা সঙ্গেও চৈতন্য শূন্য শয্যা ধরা, প্রায় মরা বোগীর মুখে কেই এক টুকরা গোমাংস তুলিয়া দিতেছে না। গোরসই ধারক, বিবেচক এবং শেষ তৃষ্ণা নিবাবক। ভ্রাতাগণ! বলুন তো: মূলে দূর্ভাবাঘাত করিলে কি আর ফল লাভের আশা থাকে? গোকুল নিমূল করিলে কি আর দুগ্ধেব দ্বারা জীবনের ঐশ তৃষ্ণা নিবাবনের উপায় থাকে?

আখবাবে এসলামীয়া—মাসিক পত্রিকা। টাঙ্গাইলের অন্তর্গত করটায় আহমদীয়া প্রেস হইতে প্রকাশিত। প্রিন্টার মীর আতাহার আলী, সম্পাদক মৌলবী নইমদ্দীন। ১২২৫ সনের শ্রাবণ মাসেব পঞ্চম ভাগ চতুর্থ সংখ্যায় নিম্নলিখিত প্রতিবাদ প্রকাশ হইয়াছে

গোকুল নির্মূল আশঙ্কা প্রবন্ধের প্রতিবাদ

আমাদের গোতুল নির্মূল নদ্যে একটি প্রবন্ধ পড়িয়া আমরা নীরব থাকিতে পারিলাম না। আমরা চাহে এ সম্বন্ধে পৃথকরূপে কিছু লিখিব, এবার এন্সলামীয়ার একটি প্রিয়বন্ধু প্রেরিত প্রবন্ধটি প্রকাশ করিলাম।

সম্পাদক মহাশয়।

গৌবধ সম্বন্ধে ভাবতব নানা স্থানে বাস্তবিকই আন্দোলন চলিতেছে, তাহাতে আপনি বলেন 'কোন সম্প্রদায়েব মধ্যেব সহিত সংযোগ স্বতবাং আমি নীবব' কেবল আহমদাব কোন প্রিয়বন্ধুব অন্তবোধে প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেছেন। গৌবংশ-বক্ষক মহাশয় যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত তাহা আপনি বিশেষ অবগত আছেন। যদি তিনি খ্রীষ্টিয়ান এবং মুসলমান না হন, তবে আমরা তাহার প্রবন্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী নহি। যদি বাস্তবিকই তিনি মুসলমান হন তবে তাহার প্রত্যেক কথাব উত্তর না দিলে আমরা শাস্ত্রানুযায়ী অপবাদী। অতএব তাহার প্রত্যেক কথাব ক্রমশঃ প্রতিবাদ করিতে পারা হইল।

১। গৌবংশবক্ষক মহাশয় আদৌ গোকুল নির্মূল আশঙ্কা শীর্ষক স্থলে ব্যবহার করিতে পারে না। তাহার মনে রাখা কর্তব্য যে ভাবতবাসীর উপজীবিকা এবং ধনপ্রাপ্তি অবিকার্য গোজাতিব প্রতি নির্ভর, সেহ গোজাতিকে সম্প্রদায় বিশেষে যে একেবারে নির্মূল করণ ইচ্ছা আছে তাহা কখনও সম্ভবে না। কোন কোন জাতি গোমাংস ভক্ষণ করে বলিয়াই যে গোজাতি সমূলে নির্মূল হইবে তাহার কথা কি? গো নিম্নে আজকাল নূতন আবস্থা হইয়াছে, বহুকালাবধি গো নিধন চলিয়া এখনকাল মধ্যে যখন গোধনেব কিছুমাত্র অপচয় হয় নাই তখন তাহার আশঙ্কাই বা কেমন? কে গোজাতিকে পরম শত্রুজ্ঞানে বংশ নিপাতার্থে বধ করে না। যেমন মাঝে মাঝে গৌবধ হইয়া থাকে তেমনই অনবরত গো বর্ধনও গোজাতিব উন্নতিব জন্য শত শত চেষ্টাও হইয়া থাকে। একদিকে আংশিক ক্ষয় অপবদিকে প্রচুর বৃদ্ধি।

২। গৌবংশবক্ষক মহাশয় যে স্বয়ং মুসলমান নহেন তাহা তাহার আপন কথাতই সম্প্রমাণিত হইতেছে। তিনি বলেন, "আমি মুসলমান, গোজাতিব পরম শত্রু, গোমাংস হজম করিতে পারি ইত্যাদি" এই ভান করিয়া মহৎ আত্মার পরিচয় দিতেছেন। যিনি মুসলমান হইবেন তিনি কখনও আপন শাস্ত্রমোদিত হালাল বস্তুর প্রতি ব্যঙ্গজনক উক্তিতে মূগ ও উপহাস বাক্য প্রয়োগ দ্বারা

জাতিসত্তা পুনরায় কাকের শ্রেণীতে গণ্য হইবেন না। অতএব তিনি মুসলমান নহেন।

৩। তিনি বলেন, “পালিয়া পুষ্টিয়া বড় বলদের গলায় ছুরি বসাইতে পারি।” তিনি মুসলমান হইলে অবশ্যই অবগত থাকিতেন যে তাঁহারা কোন প্রকারের বলদের গলায় ছুরি বসাইয়া থাকেন। তাঁহারা বলিষ্ঠ কার্য্যপাযোগী বড় বলদের গলায় ছুরি বসান না।

৪। মুসলমানগণ কখনই দুগ্ধবতী গাভী ও দুগ্ধপায়ী বৎস জবাহ কবে না, প্রয়োজন মতে তাহারা বন্ধা গাভী অথবা দুগ্ধ দেওয়ার অল্পপযুক্ত গাভী জবাহ করিয়া থাকে। গোবংশ বক্ষক মহাশয় যদি মুসলমান হইতেন বা মুসলমানের সন্নিহিত বাস করিতেন তবে গোমাংস ভক্ষণের প্রণালী বিশেষরূপে অবগত থাকিতেন। কোরাণে অনেকস্থলে ‘কোরবানি’ শব্দ উল্লেখ আছে, তৎপরিবর্তে তিনি ‘বলি’ শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। বোধকরি আশৈশব তাঁহার বলি এবং কাটাছিড়ার অভ্যাস, অতএব তিনি যে মুসলমান নহেন তাহাতে সংশয় কি?

৫। তিনি বলেন, যাহা ন্যায় চক্ষু দেখিতেছি, যে ব্যক্তি মুসলমান শাস্ত্রে ও ধর্ম্ম দীক্ষিত বলিয়া আপনিই স্বীকার করিতেছেন ও আবার তিনি সেই ধর্ম্ম শাস্ত্রানুমোদিত বিষয় বিশেষের অগ্নায় প্রতিবাদে প্রবেশ করিয়াছেন এবং যাহার আপন ধর্ম্মের প্রতি আস্ত্রা নাই তাঁহার আবার ন্যায় চক্ষু কোথায় ধর্ম্মের সহিত ন্যায়ের নৈকট্য সম্বন্ধ।

৬। লিখক বলেন, “প্রিয় মৌলবী সাহেব মার্জনা করিবেন।” মৌলবী সাহেব! আমি আপনাকে মার্জনা করিতে পারি না। আপনি যে বিষয়ের আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহার সহিত ধর্ম্মের অনেক যোগাযোগ বহিয়াছে। অতএব আপনি সম্পূর্ণ মার্জন্যের অযোগ্য। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যদি আপনি মুসলমান না হন তাহা হইলে আপনার প্রবন্ধের উত্তর দিতে বাধ্য নই। যদি মুসলমান বলিয়া দাবি করেন তবে আপনার প্রকৃত মুসলমানীয় দাবির কি সত্ত্ব আছে অগ্রে প্রমাণ করিয়া বলুন তাহাতে যদি আপনাকে প্রকৃত মুসলমান বলিয়া প্রতিষ্ঠা জন্মে তবে এ সম্বন্ধে ক্ষত ওষা (পাতী) প্রদান করিতে বাধ্য নতুবা আমার নিরব থাকাই ভাল। মুন্সীসাহেব যাহা বলিতেছেন তাহাই একটুক মনযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

৭। লিখক বলেন, “প্রিয় মুন্সীসাহেব ক্ষমা করিবেন।” মুন্সীসাহেব! আপনাকে ক্ষমা করা যাইতে পারে না। “আমাদের মধ্যে হালাম হারাম ইত্যাদি”—এ-কথা আপনে ব্যবহার করিতে পারেন না। বোধহয় আপনে গোমাংস ভক্ষণার্থে মুসলমান ধর্ম নূতন গ্রহণ করিয়াছেন এবং কয়েকদিন পর্যন্ত গোমাংস ভক্ষণ করিয়া হজম করিতে সাধ্য হয় নাই, তাই বুদ্ধি গোমাংসের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছেন। এমন ব্যক্তিকে কখনই মুসলমান জগৎ প্রতিনিধিত্বে বরণ করেন নাই যে তিনি যাহা বলিবেন তাহাই লোকসমাজে সমস্ত মুসলমান জাতির উক্তি বলিয়া নির্দেশিত হইবে।

৮। গো বংশরক্ষক মহাশয়! আপনে মুসলমান বলিয়া দাবি করুন তাহাতে আমার কোন ক্ষোভের কারণ নাই। “রাফিজী” সম্প্রদায়ও মুসলমান বলিয়া দাবি করিয়া থাকে, কিন্তু সাফি, হানিফি শব্দ উল্লেখ হালাল হারামের বিচারের প্রয়াস পাওয়া আপনাব ত্রায় লোকের পক্ষে শোভা পায় না।

৯। “সাফি মতে জলজন্তু মাংসেই হালাল”—এই শাস্ত্র আপনে কোথায় পাইলেন আমাকে দেখাইয়া দেউন। অনেক শ্রেণীস্থ জলজন্তু সাফি মতেও হারাম। বোধকবি আপনিই প্রথম মাংস ভক্ষণ আরম্ভ করিয়া যখন যে জন্তু সম্মুখে পাইতেন তাই ভক্ষণ করিয়া তাহার বিষময় ফলও ভোগ করিয়া থাকিবেন। শেষ বজ্রকের পায় পড়িয়াছেন।

১০। “সাফি মতে বজ্রকের পদ যতটুকু জলে থাকে কাটিয়া লইয়া ইত্যাদি,”—এমন কথা কোরাণ হাদিস এবং মহাম্মদীয় কোন ধর্মগ্রন্থে নাই। আপনে কোথা হইতে আনিয়া যোগ কবিতেন বুদ্ধিতে পাবি না। কোরাণ হাদিস এবং মহাম্মদীয় ধর্মগ্রন্থে যে বিষয় নাই সেই সব বিষয় আছে বলিয়া যাহারা প্রচাৰ করেন তাহারা কোরাণের আয়েত অল্পসারে ফাছেক, জালেম, কাফের এবং মহাম্মদীয় ধর্মগ্রন্থ হইতে বর্জিত বলিয়া নির্দেশিত। বোধকরি আপনিই কখন সাফি মতের দায় দিয়া বজ্রকের পায়ের সিদ্ধ পোড়া গুরওয়া, ঝলসা প্রভৃতি পাক আহার করিয়া স্বাদ পরিগ্রহ করিয়া থাকিবেন।

১১। “শাস্ত্রে একথা লিখা নাই যে গোহাড় কামড়াইতেই হইবে, গোমাংস গলাধ না করিলে নরকে পচিতে হইবে, বরং যাহা অথাচ্ছ তাহার নাম উল্লেখ স্পষ্ট নিষেধ বাক্য, থাইও না, লিখা আছে!” —শাস্ত্রে লিখা আছে কি না তাহা

আপনার গায় লোকে কিসে জানিবে ? আমাদের জ্ঞান গোমাংস হালালই আছে, আমরা তাহাই আহাৰ কবিতা বসনা পরিতপ্ত কৰিতে পাৰি। আপনাব ভাগ্যে ঘটে না বিধায় বুঝি আপনে যে স্থানে যে হাড় পান তাহাই চিৰাইসা দস্ত পরিতপ্ত করেন। বিশেষ কোন কাৰণবশত কোৰাণে তীব্রভাবে গোবধের আদেশ আছে। আপনাব তদ সন্মুখে জ্ঞাতবা থাকিলে বারান্তে জানাইব। গোজাতি পৰম উপকাৰী জন্তু বলিয়া ভক্ষণ নিষেধ হইলে কোৰাণে ও হাদিসে তাহাব স্পষ্ট নিষেধ আজ্ঞা থাকিত। বিশেষ সম্মানি জন্তু মধো গণ্য হইলে কোৰাণে উটের গায় উহাবও প্রশংসা থাকিত।

১২। “খাইবার অনেক আছে খাইতে পাৰি খাইনা।” -- খান না কেন ? আপনাকে কে নিষেধ কৰিতেছে ? আপনাব মন তো স্বাধীন, যাহা ইচ্ছা তাহাই কৰিতে পাবেন : আপনাকে আমবা হাত দিয়া নিষেধ কৰিতেছি না। আপনাব গায় দুই একজন আজকাল ঈশ্বৰাজ হইতেও বাহিব হইতেছেন, তাহাদেব যাহা অভিপ্ৰায় তাহাই করেন। কামাজেব তাহাবা বড় একটা ধাব ধাবেন না।

১৩। আপনাব বিজ্ঞা এত শাস্ত্রজ্ঞানেব বুঝি এই পর্যন্ত দৌড় “ফডিং ধৰিয়া ঘূতে ভাজিয়া টপাটপ গিলিলে পাৰি।” এই বুঝি শাস্ত্রের কথা ? শাস্ত্রে টিডি খাওয়াও বিধান আছে, আপনে টিডি ভয়ে ফডিং ব্যবহাব কবিতা শাস্ত্রেব প্রতি দোষাবোপ কৰিতেছেন। শাস্ত্রই দোষী না আপনিই দোষী ? যখন আপনাব ঘোড়া এবং ভেড়া, ফডিং এবং টিডি, পৰ্বত এবং সমভূমিতে যে কি বিভিন্ন তাহাব জ্ঞান নাই তখন আপনে কোন মুখে মহাম্মদী শাস্ত্র সমালোচনা কৰিতে অগ্রসর হইতেছেন ?

১৪। “গোমাংস উদবস্ত্র কৰিলে পাৰি, ভয়ে তাহাব নিকটেও যাইনা।” পয়গম্বব সাহেব স্বয়ং কখন গোমাংস খান নাই এবং তাহাব বংশাবলীৰ মধোও কেহ কখন ব্যবহাব করেন নাই, তাহাব সময়ে আববেব কোন সম্প্রদায় গোমাংস আহাব কৰিত, পয়গম্বব সাহেব তাহাদিগকে প্রচলিত পথ অনুসারে গোমাংস ভক্ষণ নিষেধ করেন নাই এবং কোথাও স্পষ্ট আদেশ প্রচাব করেন নাই।

১৫। গোকুল ছাড়িয়া যে আবার ছাগল লইয়া বসিলেন ? আপনে কোথায় দেখিয়াছেন যে মুসলমানগণ দুগ্ধবতী ছাগল জবাহ কৰিয়া মাংস ভক্ষণ কৰিয়া থাকে ? কোৰাণে নিষেধ আছে যাহাবা জাহেল (মূৰ্খ) এবং ধম্ম-বিষয়

অনভিজ্ঞ তাহাদের সহিত শাস্ত্র প্রসঙ্গে বাদানুবাদ করা কর্তব্য নহে ।

১৬। “ছাগলের মধ্যে পাঁঠা তো খাদ্য—তাহার দিকে বড় ঘেঁষি না।”
পাঁঠার দিকে ঘেঁষিতে নিষেধ নাই, কেন যে তাহার দিকে ঘেঁষি না তাহা কেনা
জানে? পাঁঠার মাংস বড়ো ভয় অতি তুর্গন্ধযুক্ত অথচ এক পাঁঠার মূল্যে তিন
ছাগল পাওয়া যায় বলিয়া আমরা তাহার দিকে ততদূর ঘেঁষি না। কিন্তু অপব
ন্যমমে শাস্ত্রানুসারে তাহার দিকে ঘেঁষিতে নিষেধ নাই। পাঁঠার দিকে আমরা
ঘেঁষি না বলিয়া কি পাঁঠাকুল বক্ষা পাইবাছে? কোন সম্প্রদায় যে পাঁঠাকুলের
অনববত সংহার কবিয়া আসিতেছেন তাহা কি আপনার চক্ষে উঠে না?

১৭। “উষ্ট্র এদেশে নাই, থাকিলে তাহার কাছেও যাঠিন না। শবীবের
গঠন দেখিয়াই পাকস্থলি ঠাণ্ডা হয়।” উট অতি পবিত্র জন্তু, তাহার মাংস অতি
পবিত্র ও হালাল, কিন্তু তাহা দেখিয়া যে পাকস্থলি ঠাণ্ডা হয়, পবিত্র বস্তু প্রতি
এই ঘণাকরূপ মহাপাপ মক্তি লাভার্থে অগত্যা একবার তাহার মাংস ভক্ষণ কবা
আপনার প্রতি ওগাজেব (কর্তব্য)। যে বস্তু যে দেশে সহজলভ্য সে দেশে
তাহার ব্যবহার অধিক। উষ্ট্র আমাদের দেশে নাই সুতরাং তাহার ব্যবহারও
বিবল। ভাই বলিয়া মাথা ঠকিয়া যাবেন কেন? গোজাতি এদেশে অপরিাপ্ত
পরিমাণ পাওয়া যায়, কাজেই তাহার ব্যবহার অধিক।

১৮। “মতিষ খাদ্য, তাহার নিকট ছবি হানে কবিয়া যায় কে?” ছবি
হাতে কবিয়া কেহ যায় না বটে কিন্তু কোমর বান্ধিয়া জগন্মন্দির পবাকষ্ঠা
দেখাইয়া অলৌক আমাদের জন্ম শত শত দর্শকমণ্ডলীর সাক্ষাতে অসিহাস্ত ধারণ
পূর্বক যে শত শত লোক তাহার দিকে ধাবিত হয় আব বাদ্য যন্ত্র বাজিতে
থাকে ও উল্লুধনি পড়িতে থাকে তাহা বোধকরি লিখক মহাশয়ের চক্ষে বেশ
সহ হয়।

১৯। “মহিষ, ঘোড়া, বনগরু, ছাগল, মৃগ, খরগোশ—সকলি তো চলিতে
পারে, এ সকল খাইলে ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়, এত থাকিতে গোমাংসে শিহ্নার জল
পড়ে কেন?” ঘোড়া, বনগরু, ছাগল, মৃগ প্রভৃতি কোন কোন জন্তুর মাংস যে
ব্যবহার না হয় এমন নহে। যাহাদের সংখ্যা অল্প ব্যবহারও অল্প। গোমাংস দেখিয়া
শিহ্নার জল পড়ে বলিয়া ব্যবহার হইতেছে—এটি আপনারই মনগড়া কথা।
গোজাতির সংখ্যা অত্যধিক, মাঝে মাঝে তাহার বধ হইলে গোবংশ নিশ্চল

হওয়ার সম্ভাবনা নাই ; তদজ্ঞাই বধ হইয়া থাকে । ছাগ প্রভৃতির সংখ্যা অতি অল্প, তাহাদের অনবরত ধ্বংশে বংশ নিপাত হওয়ার আশঙ্কা । সৃষ্টি নিপাত করা কাহার তো উদ্দেশ্য নহে ।

২০। “এপর্যন্ত মুসলমান জগতে প্রচলিত ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ, স্মরণ্য কর্তব্য মধ্যে পরিগণিত । ঘটনাস্থল “মক্কা” হজরত মহাম্মদের জন্মের পূর্বে,”— লিখক মহাশয় ! কোরবানির উৎপত্তির মূল কারণ কিছুই উল্লেখ করেন নাই, কেবল ঘটনাটি মাত্র প্রকাশ করিয়া নানা বাঙ্গলজনক উক্তি করিয়াছেন । মুসলমান ধর্ম সৃষ্টি অবধি বর্তমান সময় পর্যন্ত ইহার বিরোধীগণও ইহাকে এমন তীব্রভাবে আক্রমণ করেন নাই । তবে লিখক মহাশয় স্বয়ং মুসলমানী দায় দিয়া কেন যে এসলামকে বিদ্বেষ এবং উপহাস করিয়া ধর্মচ্যুত হইতেছেন, তাহার বিচার মুসলমান সমাজ করুন ।

“এ পর্যন্ত মুসলমান জগতে প্রচলিত,” লিখক মহাশয়ের মনে বিশ্বাস যে ইহাব মূলে কিছুই নাই, কেবল প্রচলিত প্রথা অনুসারে চলিয়া আসিতেছে, বাস্তবিক তাহা নহে, মূল অতি দৃঢ় । “ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ,” তাঁহার লিখার ভাবে বুঝা যায় যে তিনি একথাটি সহজে স্বীকার পাইতেছেন না, কেহ যেন তাঁহাকে বলপূর্বক স্বীকার কবাইতেছে । কোরাণ ও হাদিসে যে কোরবানির কথা উল্লেখ আছে তাহা কি কখন তিনি কণ্ঠেও গুনেন নাই ?

২১। “ধর্মের গতি বড় চমৎকার, পাহাড়, পর্বত, মরুভূমি সমুদ্র, নদ-নদী ছাড়াইয়া মুসলমান ধর্ম ভারতে আসিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে কোবানিও আসিয়াছে”, ধর্ম বাস্তবিকই ধর্ম, তাহার গতি অতি চমৎকার না হওয়ার কথা কি ? যে ধর্মের নেতা একজন মাত্র সহায় লইয়া আপনাব সৃষ্টি বহু সংখ্যক প্রতিবাদীর মুখের উপর ধর্ম প্রচার করিতে ভীত ও কুণ্ঠিত হন নাই, সে ধর্মের গতি চমৎকাব বৈকি ? যখন তাহার গতি চমৎকাব তখন তাহাকে পাহাড়, পর্বত, মরুভূমি, সমুদ্র, নদনদী ছাড়াইয়া ভারতে আসিতে বাধা দিতে পারে এমন সাহসী কে ? ধর্ম যখন আসিতে সাহসী হইল তখন তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমস্ত অবশ্য তাহার সঙ্গে আসিবে, তাহাতে কোবানি দৃষ্টি কিসে ?

গোরক্ষক মহাশয় ! নয়ন মুদ্রিয়া মননিবেশ পূর্বক একটুকু চিন্তা করিয়া দেখিলেই অনুধাবন করিতে সমর্থ হইবেন যে, তাঁহার আপন মতানুসারে দিনদিন দশ সহস্র গোবধ হওয়া সত্ত্বেও গোবংশের কিছুমাত্র ধ্বংস বা বিলুপ্তি হয় নাই !

জাতিতে গোজাতি ভিন্ন আরও অনেক রকমের গ্রাম্য জন্তু আছে (যাহা কোন সম্প্রদায়ের আহাৰ্য্য নহে)। তাহার সহিত গোপালের তুলনা করিলে কোন জাতির সংখ্যা অধিক হইবে? অনিবার্য্য গোবধ হওয়া সত্ত্বেও ঘাটে, হাটে, মাঠে শত শত গোপালই দক্ষিত হইয়া থাকে, অন্য প্রকারের দশ বারটি পশু বোধকরি লিখক মহাশয় একত্রে একস্থানে পান কিনা সন্দেহ। সম্ভাব্যবহের বস্ত্র কখনই নষ্ট হয় না, বরং উহা উন্নতি এবং বৃদ্ধি হইয়া থাকে। গো দুগ্ধেই আমাদের শরীর পোষণ হইতেছে, গোজাতির পরিশ্রমের উপর এ দেশের কৃষিকাৰ্য্য নির্ভর, সেই গোজাতির উন্নতির এবং বৃদ্ধির জন্ত ভারতবাসী মাত্রই সচেতিত। মুসলমানগণ শুধু মাংসাশ্বে গোজাতিকে সমাদর করিয়া থাকে না, তাহা বহুবিধ প্রয়োজনানুসারে গোজাতির সমাদর করিয়া থাকে। আপনার বিচক্ষণ বুদ্ধিতে কেমন করিয়া প্রবেশ করে যে, মুসলমানগণ শুধুই গোজাতির শত্রু। কোরাণে যে ভাবে ও যে চক্ষে গোজাতিকে লক্ষ্য করার বিধান আছে সে চক্ষে দেখিলে কবে গোজাতি নির্মূল হইত। ভারতবাসীর অপর সম্প্রদায়গণ ঘরে ঘরে প্রতিপালন করিয়াও সে ক্ষতি পূরণ করিতে সমর্থ হইতেন না। “স্তফি সাহেব কিছু মনে করিবেন না।”

স্তফি সাহেব! আমি কিছু মনে না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমি মোল্লা মাহুদ, স্বভাবত বিবাদ প্রিয় নহি, কাজে কাজেই ক্ষান্ত না থাকিয়া উপায় কি! একটি কথা হঠাৎ মনে পড়িল, তাহাই জনসমাজে প্রকাশ পূর্বক প্রস্তাব উপসংহার ও মনের খেদ নিবারণ করি। প্রথম এদেশে যখন খৃষ্টিয় ধর্মাবলম্বীদিগের হস্তগত হয় তখন তাঁহাদের আপন ধর্ম বিস্তার জন্ত পালে পালে মিশনারীগণ দেশ-দেশান্তর বহির্গত হইয়া স্মিট বাক্য ও গন্তীর স্বরে ধর্মোপদেশ দিতে লাগিলেন। তাহাতে অনেক নিচাশয় পামরচেতা হিন্দু আপন ধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক খৃষ্টিয় ধর্মে দীক্ষিত হইয়া হেটকোট পরিধান করত সাহেব সাজিলেন। ইহাতেই কি সাহেব হওয়া যায়?—না তাহারা এখন এদিকে মিশিতে পারেন না ওদিক বাইতে পারেন! অন্নবস্ত্রের উপায়াস্তর না দেখিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহার্থে পুনরায় মিশনারীদিগের নিকট আবেদন করায় তাঁহারা বলিলেন যে, তোমরা আপন আপন ধর্মে নিগুঢ়তত্ত্ব উদ্ঘাটন পূর্বক প্রচার করিতে থাক। সরকার হইতে তোমাদের জন্ত বন্দোবস্ত করা যাইবেক। তদানুসারে তাহারা আদাজল খাইয়া তাহাই করিতে লাগিলেন। এখন দেখা যাইতেছে যে, তাহাদের ধর্ম বিনাশের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও হিন্দুধর্মের কিছুমাত্র অনিষ্ট ঘটে নাই, সেইরূপ আজকাল কোন কোন

মুসলমান সম্প্রদায়ের হক্কাত ধর্ম ছাড়া হক্কাত মুসলমান ধর্মের মূল উদ্দেশ্য মানতে
 যে: তাহাৎ, নিশ্চয়ই উদ্ঘাটন করিতে, রসিয়াছেন তাহাতে সত্যধর্মের কিছু মাত্র
 অপচয় হইবেক না। সত্যের জয় মিথ্যার পতন!

মহাশয়! সমাজের গ্রহি অতিশয় দৃঢ়, একটুক সাবধান হইয়া লিখনি ধরি-
 বেন; সমাজকে চটাইলে বড় প্রমাদ ঘটবার সম্ভাবনা। উপসংহার কালে একটি
 হিতোপদেশ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। আপনে তওবা করিয়া পুনরায়
 মুসলমান ধর্ম দীক্ষিত হউন। তাহা না হইলে আপনার মুক্তিলাভের কোনই
 উপায় নাই।

ভারতে গোবধ

আজকাল ভারতে গোবধ সম্বন্ধে প্রচুর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। এই
 আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গাভিঘাতে সমগ্র ভারতবর্ষ তবঙ্গায়িত। স্থানে স্থানে
 সভা-সমিতি সংস্থাপিত হইয়া এই তরঙ্গের মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতেছে। অধুনা
 ভারতীয় হিন্দুসম্প্রদায় গোহত্যা-জনিত দুঃখে বিষম দুঃখিত ও মর্ম্ম-পীড়িত।
 গোখাদক জাতির অত্যাচারে গোকুল নিম্ন হইল, ইহাই তাহাদের আত্মনাশের
 মূলমন্ত্র। খৃষ্টিয়ান ও মুসলমানদিগের নিষ্ঠুরতাই গোবংশ ধ্বংশের একমাত্র
 প্রধান কারণ, এইটি তাহাদের যুক্তি। উক্ত ধর্ম্মধ্বজীগণের যুক্তি কুরুপ ন্যায়সঙ্গত
 নিম্নে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

গোখাদকদিগের অত্যাচারে গোকুল নিম্ন হইতেছে - কোন যুক্তি বলে
 গোকুল রক্ষণগণ একপ অসার তর্ক উপস্থিত করিতেছেন, তাহা আমবা স্থির
 করিতে পারিতেছি না। জগতের অধিকাংশ জাতিই গোখাদক; সমগ্র ইউরোপ,
 আফ্রিকা, আমেরিকা এবং পশ্চিম দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার সমস্ত অধিবাসীগণই
 গোমাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। কি আশ্চর্য্য! ঐ সকল দেশের গো বংশ তো ধ্বংস
 হয় নাই। আর ভারতবর্ষে প্রায় আটলত বৎসর পর্য্যন্ত মুসলমানগণ গোমাংস
 ভক্ষণ করিয়া আসিতেছেন, খৃষ্টিয়ানগণও শতাধিক বৎসর পর্য্যন্ত গোমাংসে উদর
 পূর্ণ করিতেছেন, কিন্তু কোথাও এই দীর্ঘকালের মধ্যে গোকুল উন্নয়নে যার নাই।
 আর উন্নয়ন শতাব্দীর প্রবল তরঙ্গে গোকুল যেন ভাসিয়া চলিয়াছে। মুসলমান
 ও খৃষ্টিয়ানগণের গোমাংস ভক্ষণের মাত্রা পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইলে আমবা এই যুক্তি-

কতকটা সঙ্গত বলিয়া মনে করিতাম। বরং মুসলমানদিগের মধ্যে ‘নিবামিষ ভোজী’ নামে এক শ্রেণীর নব্যজীব আবির্ভূত হইয়াছে, তদ্বারা গোবধের মাত্রা অবশ্যই কিছু না কিছু কম হওয়া সম্ভব। যদি গোবধের আধিক্য দৃষ্ট হয়, তবে তাহার কারণ অগ্ৰপ্রকার, ধর্ম্মধ্বজী হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকেই গোমাংস ধ্বংসকারী। যদি কেহ একবার সত্যতা উপলব্ধি করিতে চান, তবে সন্ধ্যার সময় কলিকাতাস্থ ফৌজদারী বালাখানায় মোড়ে কুটি ও কাবাবের দোকানে এবং বোম্বাইদিগের “প্রাইভেট কুমে” দুই এক ঘণ্টা কাল দাঁড়াইলে দেখিবেন। তুংথেব বিষয় ষাঁহাদের পেটে এখনও গরুর “হাষা” রব শ্রুত হওয়া যায়, তাহারাও ধর্ম্মধ্বজী নাম ধারণপূর্বক গোবধের প্রতিকূলে দৃশ্যমান। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমবা অবাক হইয়াছি। মারোষাবী প্রভৃতি জৈন ধর্ম্মাবলম্বীগণের মুখে এসব কথা শোভা পায়। মাংস প্রিয় বাঙ্গালী ভায়াদেব মুখে একরূপ অযথা চাঁৎকাব শোভা পায় কি? হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীগণ আইন দ্বারা গোবধ নিবারণ করিতে গবর্নমেন্টকে উপদেশ দিতেছেন, তাঁহাদের একরূপ গুণ্ডতা দেখিয়া আমরা হাস্য সম্বরণ কবিতে পারি না। বাপুহে! আমাদের খাওয়া জিনিস আমবা খাই। তাহাতে তোমাদের বুখা চাঁৎকাব এবং গলাবাজী কেন? আমরা তো তোমাদের গরুগুলি জোর করিয়া আনিয়া বধ করিতেছি না? নিজেরা পালিয়া, পুখিয়া আবশ্যক মত তাহার মাংস ভক্ষণ করিতেছি, তাহাব বিরুদ্ধে চিৎকার করিয়া তোমাদের কি হইবে? যদিও আমবা জানি ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট হিন্দুদিগের এই অযথা অনুরোধ সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিবেন, তবুও তাহাদের বিদ্বেষ বৃদ্ধির পরিচয় পাইয়া মন্থাহত হইয়াছি। গোড়া হিন্দুদিগকে বলি, তোমরা গোজাতিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিবে বলিয়া আমাদের তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি? সর্ব্বল মনে বন্ধুভাবে একথা বলিলেও কতকটা ভাল শুনায, আইনকার্টন ও জোর জবাবদস্তির কথা শুনিলে আমাদের মনে বিজাতীয় ঘৃণা ও রোষের সঞ্চারণ্য! উরূপ কথা শুনিলে আমরা স্পষ্টই অশুভব করিব, ইহা মুসলমানদিগের সাহিত্য বিবাদ-বিসম্বাদের কারণই—আর কিছুই নহে। ষাঁহারা গোকুল ধ্বংস হইল বলিয়া গগনভেদী চাঁৎকার করিতেছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি আপনারা গোকুল বৃদ্ধির জন্ত কি উপকার করিতেছেন? পূর্বকালে আপনাদের মধ্যে রাজাধিরাজ হইতে সামান্য ধিবাসী পর্যন্ত সকলেই গোপালন করিতেন, এমন ভয় নামধারী কয় ব্যক্তি

গোপালন করিতে তৎপর ? আজকাল শিক্ষার প্রভাবে এদেশে যে দ্বিপন্থ্য কাণ্ড ঘটিয়াছে, গোজাতির অবনতির তাহাই একমাত্র কাৰণ। আজকাল অনেক চাষার ছেলে খোদাভ্যুত্রে “বিদ্বান” তৎসঙ্গে সম্মান্য শ্রেণীতে উন্নীত। তাহারা গোপালন করিতে বা কৃষিকাৰ্য্য করিতে কখনও কি সম্মত হইতে পাবেন ! বিদ্বানের সংখ্যা যতই বাড়িতেছে, দেশেব অবস্থা উন্নত না হইয়া ততই অবনত হইয়া দাঁড়াইতেছে। গোপালনে বীতাত্তর্য্যগ ও কৃষিকাৰ্য্যে অনাস্থা দেশেব সর্ববংশের প্রধান কারণ। দেশে দরিদ্র হইবার যত কারণ নির্দেশ করা যায়, ইহা অপেক্ষা তাহার কোনটিই সমীচিৎ নহে। যাহাদের চৌদ্দপুরুষ কৃষিজীবী, তাহারাও অনেকে এখন গোপালন এবং কৃষিকাৰ্য্যের নাম শুনিয়া নাসিকা কুঞ্চিত কবেন। এদেশে শিক্ষাকাৰ্য্যের যতই উন্নতি হইতেছে গোবংশের এবং তৎসঙ্গে কৃষি কাৰ্য্যেব ততই অবগতি হইতেছে। ইউরোপ প্রভৃতি স্তম্ভ্য জনপদে শিক্ষার ফল ঠিক ইহার বিপরীত। চাকুরীই যে-দেশের বিদ্যাশিক্ষাব একমাত্র উদ্দেশ্য সে দেশের অবনতি যে অবশ্যম্ভাব্য একথা কে না স্বীকার কবিবে ? কোন সৌখীনবাবু একটি গাভী প্রতিপালন করিয়াই মনে করেন যে আমি গোকুল বক্ষা কবিলাম। দুইটি ইংরেজী বর্ণমালা তা দুইগং বাঙ্গলা ভাষা যাহাব কণ্ঠস্থ তিনিই গোপালন বা কৃষিকাৰ্য্যকে অতীব ঘৃণিত কাৰ্য্য মনে করেন। একপস্থলে গোবংশেব উন্নতির আশা কিরূপে করা যাইতে পাবে তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। নগবের দ্বিতল, ত্রিতল অট্টালিকায বসিয়া যাহারা গোকুল বক্ষার জন্ত জাগ্রত স্বপ্ন দেখেন, সভা-সমিতিতে বৃথা গলাবাজী করেন, তাহাদের জ্ঞান ও বিবেক শক্তিকে ধ্বংস। গরু দ্বারা মুসলমানদিগের দুইটি প্রধান উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে, একটি কৃষিকাৰ্য্য দ্বিতীয়টি গো-মাংস ভক্ষণ, যেখানে গরুতর দুইটি স্বার্থ বহিয়াছে, সেখানে জাতির উন্নতির জন্তও তাহাদের চেষ্টা অনেক পরিমাণে বেশি। ইহার প্রায়গ সংগ্রহেব জন্ত আর অধিক দূরে যাইতে হইবে না। বঙ্গদেশে হিন্দুদিগের অপেক্ষা মুসলমানদিগের গোপন যে অধিক তাহাই এ বিষয়ের জলন্ত দৃষ্টান্ত স্থল।

যাহারা বলেন, গোখাদকদিগের অত্যাচারেই গোকুল নিম্ন হইতেছে তাহাদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, কুকুর, কিড়াল, শূকর, শূগাল, ইত্যাদি যেসকল জন্তুর একবার একাধিক সন্তান প্রসব করে, আবার বৎসরে একবার যাহাদের সন্তানোৎপাদন হয়, অথচ যাহারা ভারতবাসীগণের অখাদ্য, তাহাদের বংশ বৃদ্ধি হয় না কেন ? গরু তো একেবারে একটি মাত্র সন্তান প্রসব করে, কিন্তু উহার মাংস

বহুল পরিমাণে ভক্ষিত হয়, অথচ উহাদেরই বা বংশের এত উন্নতি কেন? ইহার অভ্যন্তরে কি কোন বৈজ্ঞানিক রহস্য নাই? ষাঁহার যুক্তিমার্গ বিচরণ করেন তাঁহাদের একবার এসব বিষয় চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।

কোন কোন বিজ্ঞ সংবাদপত্র সম্পাদক একরূপ প্রস্তাবও উত্থাপন করিয়াছেন যে ভারতের হিন্দু রাজা ও জমিদারগণ তাঁহাদের অধিকারে গোবধ নিবারণ করিয়া দিলে গোবংশ অনেক অংশে রক্ষা পায়। আমবা বলি, আমাদের গ্রাম পরায়ণ সদাশয় ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট কি হিন্দুরাজা ও জমিদারদিগকে একরূপ অবধা ক্ষমতা প্রদান করিবেন? যদি একরূপই হয়, তাহা হইলে মুসলমান নবাব ও জমিদারগণ হিন্দুদিগের মধ্যে গায়েব ছোরে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিতে পারেন। গোকুল রক্ষা অপেক্ষা হিন্দু বিধবাদিগকে পাপকার্য্য হইতে রক্ষা করা এবং ম্রগ হত্যা নিবারণ করা কোনরূপেই অল্প পুণ্যের কাৰ্য্য নহে। আমাদের হিন্দু ভ্রাতাগণের বর্তমান গতিমতি দেখিয়া স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে, ইহারা কিঞ্চিৎমাত্র রাজ্য প্রাপ্ত হইলে প্রথমেই মুসলমানদিগকে গোমাংস হইতে বঞ্চিত করিবেন। তারপর মুসলমানদিগের অগ্রাণু ধর্ম্ম কার্য্যগুলিও বন্ধ করিয়া দিবেন। ইহার স্পষ্ট প্রমাণ কাশ্মির এবং অগ্রাণু হিন্দুরাজ্যে বর্তমান। হিন্দুদিগের এই সমস্ত অবধা আন্দোলন ও আবদার দেখিয়া স্পষ্টই অনুমান হইতেছে যে, মুসলমানদিগকে নির্যাতন করাই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

উপসংহারকালে আমরা আর একটি কথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, দেলদুয়ার হইতে একখানি মোসলমান সংবাদপত্র (আমরা কিন্তু মুসলমান সংবাদপত্র বলিতে প্রস্তুত নহি) বাহির হয়। কাগজখানির নাম “আহমদী”, সম্পাদক আবদুল হামিদ খান ইউজ্জয়ী মুসলমান নামে পরিচিত। কিন্তু কাগজখানির ভাব, ভঙ্গি ও সম্পাদকের লিখন ভঙ্গি দ্বারা আমরা কোনরূপেই সম্পাদককে মুসলমান বলিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। বর্তমান বর্ষের আহমদীর প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় “গোকুল নিম্নলিখিত আশঙ্কা” নামক একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, লেখক কে তাহা জানি না, কিন্তু তিনি আপনাকে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছি একরূপ যাহার মনের ভাব, তিনি মুসলমান নহেন। মুসলমান বলিয়া তিনি কোনরূপেই দাঁড়াইতে পারেন না। একরূপ প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি খোদাতালার সত্যধর্ম্ম প্রচারকের আদেশ অমান্য করত নিশ্চয়ই কাফের হইয়াছেন। যদি তিনি ইহার প্রমাণ

আমাদিগকে দর্শাইতে বলেন, তবে খোদাতালার ফজলে আমরা নিশ্চয়ই তাহা প্রদর্শন করিব। আর যুদ্ধি তিনি প্রবন্ধ লিখিয়া ‘তওরা’ করিয়া থাকেন, তবে খোদাতালার নিকট প্রার্থনা করি এই গুরুতর অপরাধটী যেন পরম দয়ালু খোদাতালার ক্ষমার পাত্র হন। আর মুসলমান ভ্রাতাদিগকে আমরা বলি যে আপনারা এই প্রবন্ধকে মুসলমানের লিখা বলিয়া কোন ক্রমেই গ্রহণ করিবেন না এবং তাহাতে আস্তা প্রদর্শন কবিবেন না। লেখকের হৃদয় সংপথে চালিত হউক ইহাই কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করুন। আমিন! আমিন!

প্রস্তাব লিখক আহমদীর বন্ধু আপনি যে উচ্চদরের লিখক, বাঙালী ভাষায় যে আপনার অধিকার আছে তাহা স্বীকার করি, তাই বলিয়া আপনার কলমে বাহাই আসিবে তাহাই লিখিবেন? অত্যাধিক কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। এসলামী ধর্ম বিগর্হিত আপনার প্রস্তাবের প্রতিবাদ সম্বন্ধে আমাদের গোটাকত কথা লিখিতে হইল। ক্রটি মার্জনা করিবেন। মহোদয়! আপনি পাঁচ ছয় মাসের যোগাড়ে আবার গোকুল নির্মূল আশঙ্কা সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়া বিগত ১৫ই পৌষ আহমদী মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে আপনি যে সত্যবাদীও ধার্মিক তাহা বেশ প্রকাশ হইয়াছে।

প্রস্তাব লিখক!

আপনি লিখিয়াছেন, “আমাব লিখিত প্রস্তাব আহমদীতে প্রকাশ হইলে “কোন কোন” সহযোগী উক্ত প্রস্তাবটি অবিকল উদ্ধৃত করিয়া গোকুল রক্ষার সহায়ভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। কোন কোন সহযোগী উদ্ধৃত করিতে না পারিয়া আক্ষেপ সহকারে প্রস্তাবের পোষকতা করিয়াছেন।” মহাশয়! যাহা আপনি লিখিয়াছেন যদি উহা সত্য হয়, তবে আপনি ও তিনি এক ধর্মাবলম্বী সন্দেহ নাই।

প্রস্তাব লিখক! আপনি লিখিয়াছেন, “কোন মহোদয় আহমদী সম্পাদককে অথবা গালি দিয়া পত্র লিখিয়াছেন। কেহ আহমদী পত্রিকাতেই বাহাই ইচ্ছা বলিয়া মনের আবেগ সান্ত্বনা করিয়াছেন।” মহাশয়! এসলামী ধর্ম বিগর্হিত অত্যাধিক কথা ও নিয়া কোন মুসলমান গৃহ করিতে পারিবে? যাহাদের ইমান আছে, যাহাদের মুসলমানী ধর্ম বিশ্বাস আছে ভক্তি আছে, তাহারা আহমদী সম্পাদককে ও আপনাকে গালি না দিয়া থাকিতে পারিবে না। অধিক কি বলিব, ধর্ম সম্বন্ধে মুসলমানগণ প্রাণকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া থাকে ইহা তাহাদের

স্বভাবসিদ্ধ যদি মুসলমানের রাজ্য হইত তাহা হইলে আত্মদী সম্পাদকের ও আপনার জীবন তিন দিবসের ছিল।

প্রস্তাব লিখক! আপনি লিখিয়াছেন, “কেহ লেখকদের প্রতি সন্দেহ করিয়া হিন্দু সাব্যস্তে কত কি ছাইভস্ম লিখিয়া সম্পাদকের নিকট কৈকত তলব করিয়াছেন।” মহাশয়! আপনি সত্য বলিয়াছেন, ঐ প্রবন্ধ লিখককে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বই কোন মুসলমান এসলামী ধর্মাবলম্বী বলিতে পারেন কিনা সন্দেহ। এতাদৃশ এসলামী ধর্ম বিগর্হিত প্রবন্ধ মুসলমানের কলমে কথানি আসিবে মী এবং কোন মুসলমান লিখিতেও সাহসী হইবে না। এবারের প্রবন্ধেও আপনে ক্রটি করেন মীই। এমন কি প্রকারান্তরে হিন্দুধর্মের পিছেও লাড়িয়াছেন। গুরু জবহ করা যে এসলামী ধর্ম সঙ্গত তাহা অনেকেই পবিত্র কোরাণ শরীফের আওতা (প্রবচন) দ্বারা সপ্রমাণ করিয়া আপনাকে দেখাইয়াছেন, পবিত্র কোরাণ শরীফের দ্বারা যে কথা প্রমাণিত হয়, তাহা মুসলমান মাত্রেই শিরোধার্য্য, ভরসা করি আপনি ও আপনার বন্ধু ব্যতীত জগতের কোন জাতি কোরাণ শরীফের প্রমাণকে ছাইভস্ম বলিতে সাহসী হইবেন না। যাহারা মুসলমান হইয়া পবিত্র কোরাণ শরীফের প্রমাণকে ছাইভস্ম বলিবেন তাঁহারা শবাব বাবস্তাহুসারে সে কাফের ইহাতে অহু-মাত্র সন্দেহ নাই।

প্রস্তাব লিখক! আপনি বিগত ১৫ই শ্রাবণের প্রবন্ধে এসলামী ধর্মশাস্ত্রে যে আপনার বিশেষ অধিকার আছে, এ বিষয় আপনি একটি ছোটখাট দর্প করিয়াছিলেন, তজ্জগুই কোন কোন মুসলমান আপন আপন দাওয়া কোরণাদ্বী দ্বারায় সপ্রমাণ করিয়াছেন। এবং আপনাকে তোরা করার কথা বলিয়াছেন যদি সেই প্রমাণ আপনার নিকট এসলামী ধর্ম বিরুদ্ধ বিবেচনা হয় তবে আপনি এসলামী শাস্ত্রসঙ্গত প্রমাণ তাহাদিগকে দেখাইয়া দিলে তাঁহারা উহা অবশ্য সাদরে গ্রহণ করিবে, সত্যপ্রকাশ হয় এই তাঁহাদের ইচ্ছা। অন্তিতে পাইলাম আপনি নাকি তাঁহাদের প্রতিবাদ পড়িয়া রাগান্বিত হইয়া উহাদ উত্তর লিখার কারণ কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াছি লন এবং অনেক মৌলবী সাহেবের নিকট নাকি গুরু জবহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া নিরাশ হইয়া রিক্ত সম্মলে পুনঃ দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। দীর্ঘকালের পর আবার আপনার লিখা ধর্ম বিগর্হিত দ্বিতীয় একটি প্রবন্ধ বিগত ১৮ই পৌষের আহমদীতে দেখিতে পাইলাম। উহা দুটে

আমার শিশুকালের একটি গল্প স্মরণ হইল দেখুন তো ছায়া সঙ্কত কিনা? উহা এই—কোন পথের ধারে ঝুটপুটাক এক ব্যক্তি বাছে বসিয়া থিরা খাইতে-ছিল। ঐ পথ দিয়া একটি চিকিৎসক যাইতেছিলেন। তিনি উহা দেখিয়া বলিলেন, ভাই! বাছকালে কিছু খাইতে নাই। সে ব্যক্তি উহা শুনিয়া রাগান্বিত হইয়া বলিল, তুই এতবড় শক্ত কথা বলিলি। দেখ! আমি গু দিয়া থিরা খাইব, পরে তাহাই করিল। চিকিৎসক তাহাকে পাগল বিবেচনা করিয়া তাহার চিকিৎসায় পু বৃত্ত হইবেন!

প্রস্তাব লিখক আখবারে এসলামীয়া আহমদী সম্পাদক লিখিয়াছিলেন আপনার বন্ধু যিনি গোকুল নিখুল আশঙ্কা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাঁহার নাম কি, জানিতে ইচ্ছা করি। তিনি তাঁহার কিছুই উত্তর দেন নাই, তদুত্তরে আপনি বলিতেছেন “সকলেবই জানা আবশ্যক যে প্রস্তাব লিখক ও সম্পাদক বাস্তবিকই ভিন্ন শরীর ও ভিন্ন আকৃতি।” মহাশয় চটিয়া উঠিবেন না, ভাল, বলুন তো দেখি! যদি আপনার কোন বন্ধু আপনাকে জিজ্ঞাসা করেন, ভ্রাতঃ! আপনার ভ্রাতার নাম কি? যদি আপনি তাহার উত্তর না দেন আব আপনার ভ্রাতা বলেন আর আমার ভ্রাতা বাস্তবিকই ভিন্ন শরীর ভিন্ন আকৃতি। তবে এই উত্তর জায়েসঙ্গত কিনা? এবং বক্তার গালে আপনি দুটা চড় মারিবেন কিনা? আহমদী সম্পাদক যে আপনার নাম লুকাইয়া রাখিতে ইচ্ছা করেন, চাদরে ঢাকিয়া রাখিতে বাসনা করেন, উহাতে তাঁহার স্ববুদ্ধির পরিচয় দিতেছে। লোকে বলে হাত ছোট আঙ্গুর বড়—প্রমাদের কথা, সেদিন কথায় কথায় গোকুল নিখুল সঙ্কটে উঠিল, তাহাতে আমাদের জর্নৈক বন্ধু বলিলেন আপনারা কি আহমদী সম্পাদকের বন্ধুকে চিনেন, যিনি গোকুল নিখুল সঙ্কটে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন? আমরা বলিলাম—না। তিনি কহিলেন, সেই প্রবন্ধ লেখক সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া এই অঞ্চলে আসিয়াছেন। আমি তাঁহাকে ভালরূপে চিনি। —তিনি একটা ঝুটপুটাক ব্যক্তি, যদি আহমদী সম্পাদক বেড়ে আড়াই ফুট হন তবে তিনি অনুন পাঁচ ফুট হইবেন। যদি সম্পাদক দীর্ঘে তিন ফুট হন তবে তিনি অনুন চারি ফুট হইবেন। কিন্তু নাম বলিলেন না। মহাশয়! ধর্ম বিরুদ্ধ প্রবন্ধ লিখিয়া কেনই বা মেয়েলোকে মৃত লুকাইয়া থাকিতে ইচ্ছা করেন? এমন প্রবন্ধ লিখকের জীবনে খিক না দিয়া কে থাকিতে পারিবে?

প্রস্তাব লিখক ! আপনি লিখিয়াছেন “আহমদৌ সম্পাদক ও পাক্ষা মুসলমান।” তিনি যে পাক্ষা মুসলমান তাহা এ অঞ্চলের অনেকেই অবগত আছেন। তিনি পাক্ষা মুসলমানের ঔরবে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। সুনিয়াছি তিনি নাকি আহমদৌ প্রকাশের পূর্ব কতকদিন ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম মন্দিরে উপাসনায় যাইতেন। মৎস্য, মাংস ছাড়িয়াছিলেন, নামাজ পড়িতেন না। পরে মুসলমান সমাজে তিনি ঘৃণিত হওয়াতেই হউক কি মনের ইচ্ছাতেই হউক কি মুসলমান সমাজে চলাচল করার জগুই হউক কি মৎস্য মাংস পুনঃ রুচিবশতই হউক ঐ ধর্ম ছাড়িয়াছিলেন। বিগত ১৫ই শ্রাবণ আহমদৌ সম্পাদক সম্পাদকীয় স্তম্ভে যাহা লিখিয়াছেন, যাহাব উক্তব আখবাবে এসলামীয়াতে প্রকাশ হইয়াছে তাহা আপনাব ও পার্শ্বকগণেব নিকট অপ্ৰকাশ নাই। এমন ব্যক্তি যদি পাক্ষা মুসলমান হয়, তবে বলুন জগতে কাফেব কে ? এইক্ষণ শুনিতে পাই আহমদৌ সম্পাদক নাকি নমাজ ছাড়িয়াছেন। কয়েক দিবস হইল কলিকাতা অঞ্চল হইতে একটি হিন্দু বক্তা করটিয়া জমিদার বাটিতে আসিয়াছিলেন, সেই উপলক্ষে জমিদার বাটিতে একটা সভা আহত হয়। সে সভায় আহমদৌ সম্পাদকের আগমন হয়। মুসলমানগণ সভা হইতে উঠিয়া আছরের নমাজ পড়িতে গেলেন, আহমদৌ সম্পাদক বিজ্ঞ মস্তকে শালগ্রাম প্রস্তরের গায় সভা মধ্যে বসিয়া বহিলেন।

প্রস্তাব লিখক ! আপনি লিখিয়াছেন, “মন স্বাধীন, লিখনও স্বাধীন, কিন্তু বাধা অনেক, আশঙ্কা অনেক।” মহাত্মন ! যদি কেহ কোন কার্য্য করিতে উদ্যত হয়, তবে ঐ কার্য্য গায়সঙ্গত হইলে যদি কোন প্রতিবন্ধক হওয়ার কারণ সে কার্য্য সম্পাদিত হইতে না পারে তবে সেই প্রতিবন্ধককে বাধা বলে। কোন ভয়ে সেই কার্য্য সম্পাদিত হইতে না পারিলে তাহাকে আশঙ্কা বলে। ভরসা করি ইহা আপনারও স্বীকার্য্য। যদি কেহ বাধা ভয় না মানে, মন স্বাধীন বিবেচনায় মনে যাহা লয় তাহাই করে, তাহাই বলে, তাহাই লিখে, তাহা হইলে পাগলবই তাহাকে কি বলা যাইতে পারে। অতএব মনে যে কথাই উদয় হয় ঐ কথা সাংসারিক উপকারী কি অল্পকারী, হিত কি অহিত ভাল কি মন্দ, সং কি অসং প্রথম বুদ্ধির বিচারালয় উপস্থিত করিবে। যদি বুদ্ধির বিচারে সে কথা অসঙ্গত হয়, তবে তাহা কখনই করিতে নাই। যদি সঙ্গত হয়, তবে ঐ কথা দ্বিতীয়বার ধর্মের বিচারালয়ে

উপস্থিত করিবে। ধর্মের বিচারে যদি উহা অসঙ্গত হয়, তবে উহা পরিত্যজ্য। সঙ্গত হইলে অমনি সে কথা জীবনে পরিণত করিবে। বিনি প্রথম বিচারের অন্তথা করিবেন, তাঁহাকে পাগলবই কি সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে? বিনি দ্বিতীয় বিচারের অন্তথা করিবেন তিনি কথা বিশেষ কাজ বিশেষে পাপী, বিধর্মী, কাফের বলিয়া অভিহিত হইবেন। এইক্ষণ আপনার মন ক্লিপ স্বাধীন জানিতে ইচ্ছা করি।

গোমাংস

প্রস্তাব লিখক! আপনি লিখিয়াছেন, “খাও, অখাও, সুখাও।” আপনি এইরূপে ক্রমশঃ যে খাওদ্রব্যের বিভাগ কবিয়াছেন, গভীবভাবে বিবেচনা করিয়া দেখুন, উহাতে আপনার মোটা ভুল হইয়াছে কি না? আমরা বলি সাধারণ খাও, সাধারণ অখাও। যাহা খাওয়া যাইতে পারে তাহা সাধারণ খাও। যাহা খাওয়া যাইতে না পারে তাহা সাধারণ অখাও। সাধারণ খাদ্য দুইভাবে বিভক্ত, খাদ্য অখাদ্য, ধর্ম শাস্ত্রানুসারে যাহা খাওয়া সিদ্ধ তাহাই খাদ্য। যাহা খাওয়া অসিদ্ধ তাহা অখাদ্য। আবার ঐ খাদ্যদ্রব্য দুইভাগে বিভক্ত। সুখাদ্য ও কুখাদ্য। সুস্থাবস্থায় যাহা খাইলে শরীরের উপকার ব্যতীত অপকার না জন্মে, তাহাই সুখাদ্য। যাহা খাইলে শরীরেব অপকার না জন্মে, তাহাই কুখাদ্য। মহোদয়! জগতের সকল সত্যজ্ঞাতিই এক একটি ধর্ম বজ্জুতে আবদ্ধ আছেন। সকলেই আপন আপন ধর্ম অনুসারে খাদ্যখাদ্যের বস্তু ঠিক কবিয়া লন। তাহাতে কাহারও কথা চলে না। কাহারও তর্ক চলে না। অতএব যখন আমাদের পরিচিত কোরাণ শরীফে গোমাংস সেবনের ও গরু কোরবানি করণের বিধি স্পষ্ট লিখিত আছে, তখন গোমাংস যে আমাদের খাদ্য ইহা অপ্রাসঙ্গিক মনে বিচার করিয়া গোমাংস সেবন কবিয়া থাকি। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষে উহা কখন বা সুখাদ্য কখন বা কুখাদ্য পরিণত হয়। আহমদী সম্পাদক বেকরুপ শীর্ণদেহ ক্লীণকায় তাঁহার মত লোকের পক্ষে গোমাংস সেবন কবা অবশ্য কুখাদ্যের মধ্যে পরিণত হইবে। তাই বলিয়া কি পরিচিত কোরাণ শরীফের বিধি উড়িয়া যাইবে?

প্রস্তাব লিখক! আপনি লিখিয়াছেন “এইক্ষণে কথা এই বে দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া খাদ্যের ব্যবস্থা করা আবশ্যিক।” মহাশয় দেখা যাউক আপনার এই বক্তব্য কতদূর সত্যসঙ্গত। দেশ বিবেচনাই যদি খাদ্যের ব্যবস্থা করা কর্তব্য

হয়, তবে ভারতবাসী হিন্দু, মুসলমানগণ যখন শীতপ্রধান দেশ ইউরোপে গমন করিবেন তখন তাঁহাদের শরাব, শূকর, গোমাংস ইত্যাদি সেবন করা কর্তব্য হইবে। আবার যখন শীতপ্রধান দেশবাসী ইউরোপীয় মহাপুরুষগণ ভারতে আগমন করিবেন তখন তাঁহাদের চাল, ডাল, কাঁচকলা ইত্যাদি সেবন করা কর্তব্য হইবে। এই যুক্তিটি ভারতবাসী হিন্দু, মুসলমান ও ইউরোপীয় মহাপুরুষগণের পক্ষে মন্দ হয় নাই।

২। কেবল কাল বিবেচনাই যদি খাদ্যের ব্যবস্থা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে শীতকালে ভারতবাসী হিন্দু মুসলমানগণের শরাব, শূকর, গোমাংস সেবন করা কর্তব্য। আবার গ্রীষ্মকালে উহা পরিত্যাগ করা কর্তব্য হইবে। প্রস্তাব লিখক এই যুক্তি দিয়া ভারতবাসী হিন্দু মুসলমানের যে আশীর্বাদেব পাত্র হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

৩। কেবল পাত্র বিবেচনাই যদি খাদ্যের ব্যবস্থা করা কর্তব্য হয়, তাহা হইলে ভারতে হিন্দু মুসলমান মধ্যে যাহারা আহমদী সম্প্রদায়ের ত্রায় দুর্বল ক্ষীণকায় তাহাদের পক্ষে শূকর, শরাব, গোমাংস না খাওয়া কর্তব্য। আবার ভারতের হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যাহারা হুটপুটাদি তাহাদের পক্ষে শূকর, শরাব, গোমাংস খাওয়া কর্তব্য। প্রস্তাব লিখক এই যুক্তি দিয়া যে ভারতের হিন্দু, মুসলমানের আলিঙ্গনেব পাত্র হইয়াছেন সন্দেহ কি? ধন্য তাঁহার যুক্তি শক্তি। যদি বলেন দেশ, কাল, পাত্র সম্বন্ধে পৃথক পৃথক মাংস না করিয়া একত্র মাংস না করা কর্তব্য, মানিলাম। তাহা হইলেও তাহার ফল এইরূপ দাঁড়াইবে যে, ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমানগণ ইউরোপে গেলে তাঁহাদের মধ্যে ও ইউরোপীয়গণের মধ্যে যাহারা দুর্বল যাহাদের পরিপাক শক্তি নিম্নোক্ত তাহাদের ব্যতীত সকলেরই শরাব, শূকর, গোমাংস ইত্যাদি সেবন করা কর্তব্য হইবে। আবার ইউরোপ হইতে যে সকল মহাপুরুষগণ ভারতবর্ষে আগমন করিবেন তাঁহাদের ও ভারতের হিন্দু মুসলমানগণ মধ্যে শীতকালে যাহারা শক্তিহীন যাহাদের পরিপাক শক্তি অতি কম, তাঁহাদের ব্যতীত সমস্তেরই শরাব, শূকর, গোমাংস ইত্যাদি খাওয়া আবশ্যক হইবে। এইরূপ যুক্তিটিও ভারতবাসী হিন্দু মুসলমানগণের পক্ষে মন্দ হয় না।

আমরা বলি যাহার যে ধর্ম সেই ধর্মাম্বসারে প্রথম তাহার খাদ্যের জিনিস সকল নির্ণয় করিয়া লওয়া কর্তব্য। পরে দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনায় এই সকল

জিনিস মধ্যে যে সকল দ্রব্য যে দেশে যে সময় যাহাদের পক্ষে উপকারী তাহাই তাহাদের সেবা বাহা অপকারী তাহাই অসেবা ।

প্রস্তুত লিখক ! আপনি লিখিয়াছেন, “যে মৌলবী সাহেব গোমাংসের জন্ত এত লালায়িত, এক টুকরা গোমাংসের জন্ত এত জেদ এত প্রতিবাদ ধর্মত বলুন তো প্রতিদিন ছুবেলা কি তাহা খাইয়া থাকেন ? প্রতি সন্ধ্যা কি গোমাংসে ক্ষুধা নিবৃত্ত করেন ? না প্রতি সন্ধ্যাতে গোমাংস ব্যঞ্জে অন্ন রঞ্জিত করিয়া থাকেন ? না সপ্তাহে দুদিন কি একদিন গোমাংসের স্বাদে রসনা পরিতৃপ্ত করেন ? না প্রতি সন্ধ্যা খাইতে ইচ্ছা করেন ? ধর্মের দোহাই মিথ্যা বলিবেন না ।” মহাশয় কোন মৌলবী সাহেব গোমাংসের জন্ত লালায়িত নহেন, গোমাংসের জেদে প্রতিবাদও করেন না, প্রতিদিন প্রতি সন্ধ্যা তাহারা যে গোমাংস খাইয়া থাকেন একথা কোন মৌলবী সাহেব লিখেন নাই ও বলেন নাই । গোমাংস বলিয়া কথা কি, আপনি ধর্মত বলুন তো আজ যে যে ব্যঞ্জে অন্ন রঞ্জিত করিয়াছেন প্রতিদিন কি প্রতিসন্ধ্যায় তাহা কি খাইয়া থাকেন ? কখনই নয় । বিগত ১৫ই শ্রাবণের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দেখুন তাহাতে আপনি কত ধর্ম নিগহিত কথা লিখিয়াছেন, সে কথা কি দুমাস ছমাসেই ভুলিয়াছেন ? মহামান্য পবিত্র কোরাণ শরীফে খোদা-তালা আদেশ করিয়াছেন, “তোমরা গোমাংস সেবন কর ।” আপনি লিখিয়াছেন, “আমরা যেন আর গোখাদক বলিয়া অভিহিত না হই ।” তজ্জন্তই মৌলবীগণ আপনার প্রতি কাফেরের ফতওয়া দিয়াছেন । আপনি ধর্মত বলুন তো কখনও গোমাংসের ব্যঞ্জে আপনার অন্ন রঞ্জিত হইয়াছে কি না ? গোমাংসের স্তূরখা ঢালিয়া লইয়াছেন কিনা ? বাটী ভরা গোমাংস না পাইলে ক্রোধে জলিয়া ছার-খার হইয়াছেন কিনা । এখনও মধ্যে মধ্যে চুপেচুপে গোমাংসের বাটীর সামনে গমনাগমন করেন কিনা ? যাহারা কুড়ি ত্রিশ বৎসর গোমাংস সেবন করিয়া প্রকাশে গোমাংসের নিন্দা করে তাহাদিগকে ধিক ! শতধিক ।

মৌলবী সাহেবগণ বলেন, পবিত্র কোরাণ শরীফের ব্যবস্থানুসারে গোমাংস সেবন করা মুসলমানের পক্ষে হালাল । কোরবানি করাও হালাল । গোমাংস খাইলে বাহার শারীরিক উপকার হয় তাহার খাওয়ায় বাধা নাই, না খাইলেও পাপ নাই, জ্বাবর গোমাংস খাইলে বাহার শারীরিক অপকার হয়, তাহার না খাওয়াই কর্তব্য । কিন্তু গোমাংস ও কোরবানিকে হালাল বিশ্বাস করা মুসলমান মাত্রেরই

উচিত। যিনি মুসলমান হইয়া উহা হালাল না জানেন তিনি কাক্ষের মধ্য পরিগণিত, এই এসলামী ধর্মের সার ব্যবস্থা।

প্রস্তাব লিখক। আপনি লিখিয়াছেন “প্রকৃতি কাহারও নিকট কোন উপ-দেশ লইয়া কোন কার্য করে না। স্বভাবের বৈপরিত্যও সহজে ঘটে না জোর জোব্বান ঘটাইবার চেষ্টা করিলেও টেকে না।” মহাশয় যিনি কেবল আপনার এই মস্তে দীক্ষিত, তিনি নাস্তিক। যাহারা নাস্তিক তাহারা এসলামীয়া ধর্মামুসারে কাক্ষেয়। তাহারা কখনই মুসলমান বলিয়া গণনীয় নহে। আপনার এই মস্তটি যদি কেহ কাহাব পরিবারবর্গকে শিখাইয়া দেয়, এবং বলিয়া দেয় যে তোমাদের স্বভাবে যাহা লয় তাহাই কব কোন বাধা বিঘ্ন মানিও না। তবে তাহাব বাটিতে অনতিবিলম্বে কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা আছে কিনা? আবার যাহারা ঐ মস্ত জপ করিয়া থাকেন যদি তাহারা তাহাদের পবিবাবকে পিনজব পাখীর তায় আবদ্ধ রাখেন তবে তাহাদের প্রকৃতির আদেশ ভঙ্গ হয় কিনা?

প্রস্তাব লিখক! যাহারা গোমাংস সেবন করে তাহারা তো আপনার কথা-মুসারে প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া থাকে। মানিলাম! ভাল বলুন দেখি যাহারা গোবংশগুলাকে জবরদাস্ত ক্রমে ঝাধিয়া রাখিয়া তাহাদের জীবিকা কাড়িয়া খায়, তাহারা প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করে কিনা? আফসোস! খোদরা ফজিহত। দগররা নছিহত।

প্রস্তাব লিখক। আপনি লিখিয়াছেন, “যে দেশে যাহা প্রয়োজন, সে দেশের জন্ত করুণাময় ভগবান অপরিপাক্রূপে তাহা দান করিয়াছেন। মহাশয়! আপনার এই কথা স্বীকার্য। সেইজন্তই ভারতে মুসলমানগণ গরু খাইয়া থাকেন। কেননা খোদাতালা ভারতে অপরিপাক্রূপে গরু সৃষ্টি করিয়াছেন। দেখুন প্রায় সহস্র বৎসরাবধি মুসলমানগণ গরু খাওয়া সত্ত্বেও ভারতে গরুর কোন অংশেই ন্যূনতা নাই। সে দিগেই চাওয়া যায় সেইদিগেই শত শত গরু দৃষ্টিগোচর হয়। অতএব এদেশে গরু খাওয়া যে খোদাতালার অভিপ্রায় তাহা আপনার লিখাই প্রমাণ করিতেছে। যাহারা গরু খাওয়া নিষেধ করেন তাহারা খোদাতালার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন। নউজ বেলা মেন্‌হা!

প্রস্তাব লিখক! আপনি লিখিয়াছেন “আর চাই কি? দশটি কৃষ্টযোগাক্রান্ত ব্যক্তির পরিচয় লইয়া দেখিবে তাহার মধ্যে কয়জন হিন্দু আর কয়জন মুসলমান।” মহাশয়! আমরা বোধ করি মুসলমানের সংখ্যা অধিক হইবেক না, গোমাংসের

গুণ অধিক কি দেখাইব, ভাল আপান দশজন পুরুষতহানি রোগাক্রান্ত ব্যক্তিক পরিচয় লইয়া দেখুন, তন্মধ্যে কয়জন হিন্দু কয়জন মুসলমান। পিস্তুল গীড়িত দশজন লোকের পরিচয় লইয়া দেখুন কয়জন হিন্দু কয়জন মুসলমান। দশজন গৃহিনী রোগাক্রান্ত মেয়েলোকের পরিচয় লইয়া দেখুন কয়জন হিন্দু ও কয়জন মুসলমান। অতএব হালানী বস্তুর অসীম গুণ। ভরসা করি যাহার উদ্দেশ্যে মোরগের রাণ, গো-মাংসের স্করুয়া একবার প্রবেশ করিয়াছে সে এ-ভাবে ভুলিবার নয়।

প্রস্তাব লিখক! আপনি লিখিয়াছেন “ভ্রাতাগণ! সেই হাকিমানের বস্তু বিচার গ্রহে গোমাংসের গুণাগুণ কিরূপ বর্ণিত হইয়াছে অল্পগ্রহ করিয়া এক-বার পাঠ করিয়া দেখিবেন, যদি মূর্খতাদোষে সে গ্রহ পাঠের শক্তি না থাকে, তবে কোন হাকিমকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন।” মহাশয় এই লিখনুসারে ইউনানি হেকিমী বিজ্ঞায় যে আপনার বিশেষ অধিকার আছে ইহাই প্রকাশ পাইতেছে। প্রথম আপনি হাকিমী ও ডাক্তারী মতানুসারে গোমাংসের গুণাগুণ ও দুষ্কর গুণাগুণ আগামীবারে আহমদীতে প্রকাশ করুন। এবং তাহা কোন কের্তাবের কত অধ্যায় লিখিত আছে তাহা লিখিয়া দেউন, তৎপর বাহাদিরকে আপনি মূর্খ বলিয়া নির্দেশ করত দর্প করিয়াছেন তাহাদের কথা পরে শুনিবেন।

পাঠক! প্রস্তাব লিখকের প্রবন্ধটি নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। ঐ সম্বন্ধে আপনাদেব মতামত লিখিবেন, আগামীতে আশ্বাসে প্রকাশ হইবে।

(প্রতিবাদ সমাপ্ত)

পরিশোধ লিখকের কায়কটি কথা

১। প্রতিবাদকারী মহাশয়গণ লিখকের নাম, ধাম, পরিচয়, আহমদী সম্পাদক নিকট তলব করায় সম্পাদকের অনুরোধে লিখক পরিচয় দিতেছে।

২। আশ্বাসে এসলামীয়া সম্পাদক লিখকের পরিচয় আশ্বাসে “সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া এদেশে আসি।” যে লিখিয়াছেন, তাহা নহে। অদৃষ্টের চক্রে এবং অল্পজলের আর্কষণে সামান্ত দাসত্ব স্বীকার্য, গৌরী, পদ্মা, যমুনা, পার হইয়া সপরিবারে এ অঞ্চলে আসিয়াছে। নিবাস—বঙ্গরাজ্য মধ্যস্থিত বিখ্যাত নদীয়া জেলার অন্তর্গত সাবডিভিজান কুষ্টিয়ার অন্তিমিকট সামান্ত পল্লী লাহিনী-পাড়া গ্রামে জন্মস্থান—বৎসামান্ত বাসস্থান বর্তমান।

৩। এসলামীয়া সম্পাদক ও তাঁহার বহুকণী বন্ধু, যিনি কখনও মৌলবী, মুহম্মদ পরেই মুন্সী, চার পাঁচ ছত্র পরেই আবার হুফি পরিচয় দিয়া লিখককে কাকের সাবাস্ত করিয়াছেন, মুকব্বি-য়ানা মতে “তওবা” করিবারও উপদেশ দিয়াছেন।

৪। টাঙ্গাইলেব অবৈতনিক কাজী এবং নেকাহ তালকের সাক্ষী গোপাল মৌলভী স্থলতান আহাম্মদ সাহেব বিগত ১৮ বা ১৯ গুরুবার দিবা দ্বিপ্রহর তিন-টার সময় সাবডিপুটী মৌলবী সফাউদ্দিন সাহেবের বাসাবাটীস্থ কয়েক সপ্তাহ-স্থিত, মোসলমান ধর্মসভার সভাগণ সম্মুখে গোকুল নির্মূল প্রস্তাব বিষয়ে উল্লেখ করিয়া লিখককে “কাকের” এবং স্ত্রী “হারাম” হওয়া সাবাস্ত করিয়া উপস্থিত সভাগণকে বুঝাইয়া সমস্ত ব্যস্ত করেন। আরও বলেন যে, “যদি কোন মোসলমান ঐ প্রস্তাব লিখিয়া থাকেন তবে তিনি “তওবা” করুন।” সে সময় লিখকের নাম অপ্রকাশ। কিন্তু লিখক সে ধর্মসভায় উপস্থিত। কিন্তু কোন বাদ প্রতিবাদ করে নাই। —মাত্র বলিয়াছিল বিষয়টি বড়ই গুরুতর, বিবেচনা করিয়া আপনার এইমত প্রকাশ পত্রিকায় প্রকাশ করিলে ভাল হয়। অবশ্যই প্রস্তাব লিখকের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

৫। এইক্ষণে লিখক এসলামীয়া সম্পাদক মৌলবী নইমুদ্দীন ও তাঁহার বহুকণী বন্ধু এবং অবৈতনিক কাজী স্থলতান আহাম্মদ খাঁ সাহেবকে এতদ্বারা জ্ঞাপন করিতেছে যে, তাহার গো-জীবনের কোন কোন প্রস্তাবের, কোন কোন শব্দে লিখককে কাকের ও তাঁহার স্ত্রী হারাম হওয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেই সেই স্থানের সেই সেই শব্দ বা উক্তি বিশেষরূপে নিদৃষ্ট করিয়া অদা হইতে ত্রিশ-দিনের মধ্যে লিখকের প্রতিনিধি টাঙ্গাইল মুন্সেফী আদালতের উকিল শ্রীযুক্ত রাব্বুররহমান চক্রবর্তী মহাশয় নিকট প্রেরণ করুন এবং এসলামীয়া পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

৬। সুবিজ্ঞ মুসলমান ভ্রাতাগণ! গো-জীবনের আদি-অন্ত মনোঃসংযোগ পাঠ করিয়া কোফরে কালামের পদগুলি নির্ণয় করত প্রকাশ করিয়া লিখককে চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করুন। ইহাই লিখকের সাহসনয়ে প্রার্থনা।

৭। “কাকের” ও “স্ত্রী হারাম” দুইটি কথা যেমনই হৃদয় বিদারক, তেমনি ভয়ানক। লিখকের মনে বিশেষ আঘাত লাগিয়াছে। বথার্থ মোসলমান ভিন্ন

সে আঘাতের বেদন', অথ কোন সম্প্রদায় অতুভব করিতে সমর্থ হইবেন কিনা সন্দেহ। স্ত্রী বর্জিত—বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। এ বেদনা এ যাতনা স্ত্রী, প্রিয়জন মাত্রেই সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন।

৮। ঘোড়াশাল স্কুলের প্রথম শিক্ষক মহাশয় প্রতিবাদ ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া ৫ম ভাগ ৩ষ্ঠ সংখ্যা আখবাবে এসলামীয়া মাসিক পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে, “গোকুল নিখিল আশঙ্কা প্রস্তাবেব প্রতিবাদ আহমদী পত্রিকায় প্রকাশ জ্ঞাত পাঠান হইয়াছিল, সম্পাদক তাহা প্রকাশ করেন নাই।” যদিও এক্ষেত্রে সম্পাদক নিরব। কিন্তু লিখক বলিতেছে, এবং চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতেছে ১৫ই আশ্বিন ৫ম সংখ্যার আহমদী দৃষ্টি করুন। ভ্রম দূর হইবে। শিক্ষক মহাশয়ের লিখিত প্রতিবাদ লিখক বিশেষ মনোসংযোগের সহিত পূর্বেই পাঠ করিয়াছিল, গো-জীবন মুদ্রাঙ্কন সময়েও পাঠ করিয়াছে—গৃহীত প্রতিবাদ হইতে তাহাতে বিশেষ কোন নূতন কথা নাই বলিয়া গো-জীবনে গৃহীত হইল না। শিক্ষক মহাশয় ক্ষমা করিবেন।

৯। দয়াময় ভগবানের অমুগ্রহ হইলে এই গো-জীবন শীঘ্রই আরবী, ফারসী, উর্দু এবং হিন্দী ভাষায় অতুবাদিত হইয়া পবিত্রধাম মক্কা মোয়াজ্জমায় পূণ্যক্ষেত্রে বোগদাদে, মোসলমান রাজ্য প্রধান প্রদেশ তুরস্কে, হায়দারাবাদে, ঢোকে, দিল্লীতে এবং আজমীর শরীফে প্রেরণ করিয়া তথাকার প্রধান প্রধান মৌলবী মৌলানা, মহামতিগণের মতামত সংগ্রহ করিয়া যত সম্বরে হয় পুনঃ প্রকাশ হইবে। সর্বশক্তিমান ভগবানই লিখকের রক্ষক। সেই অদ্বিতীয় জগত-নিধান জগতপতি জগদীশ্বরই লিখকের আশ্রয়।

